দ্য হিস্ট্রি অব রয়্যাল লেডিস ইন মোঘল এমপায়ার

মো. রেজাউল করিম

রেজাউল করিম জয়পুরহাট জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন শাহাপুর গ্রামে নানার বাড়ীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মো. রইচউদ্দিন মন্ডল ও মাতা মোছা. তাহেরা খাতুন। তিনি ভাদসা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে এসএসসি পাশ করেন এবং জয়পুরহাট সরকারী কলেজ থেকে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে আইএ ও বিএ পাশ করেন। অতপর ১৯৯০ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২য় শ্রেণিতে এমএ (দর্শন) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি অধ্যাপনা পেশায় নুনগোলা কলেজে যোগ দেন এবং আজ পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

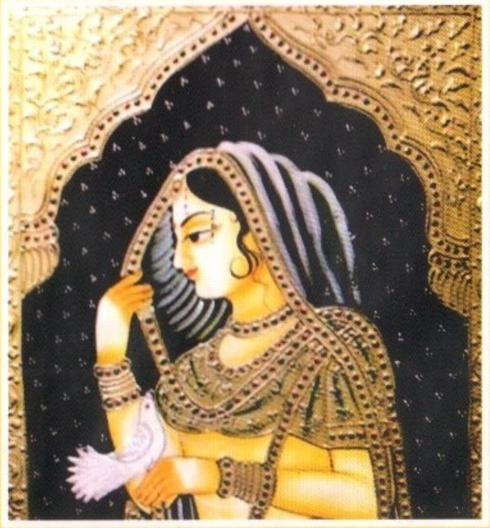

রাজপ্রাসাদে মোঘল সম্ভ্রান্ত-নারীদের জীবনযাপন প্রণালী, তাঁদের অন্দরমহলের ভেতর ও বাইরের কার্যকলাপ, পোশাক ও অলংকার, পর্দাপ্রথা, ধর্ম, বিদ্যাশিক্ষা এমনকি তাঁদের প্রেম ও উচ্চাভিলাষ, কৃতিত্ব ও অবদানগুলো এখনও অনেকের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে রয়েছে। মোঘল সাম্রাজ্যের নারীদের কাহিনি দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তাঁদের সম্বন্ধে প্রত্যেকটি যুগের ইতিহাসে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক রয়েছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে আলাদা ও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে...

প্রচ্ছদ :: ধ্রুব এষ

দ্য হিস্ট্রি অব রয়্যাল লেডিস
ইন
মোঘল এমপায়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্য হিস্ট্রি অব রয়্যাল লেডিস ইন মোঘল এমপায়ার

মো. রেজাউল করিম

অন্বেষা প্রকাশন

www.pathagar.com

দ্য হিস্ট্রি অব রয়্যাল লেডিস
ইন মোঘল এমপায়ার

মো. রেজাউল করিম

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

অন্বেষা ৫৩১

অন্বেষা

প্রকাশক
মো. শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ পি. কে রায় রোড, বাংলাবাজার ঢাকা
ফোন : ৭১২৪৯৮৫, ০১৯১১৩৯৪৯১৭

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
মো. নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
প্রগতি প্রিন্টার্স
২২/১ তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৪৭০.০০ টাকা মাত্র

The History Of Royal Ladies In Mughal Empire
by Md. Rezaul Karim
First Published February Book Fair 2016
Md. Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

e-mail : annesha2005@gmail.com

Price : Tk. 470.00 only US $ 24.00
ISBN : 978 984 92058 5 2 Code : 531

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় নারীরা সর্বদা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দর্শনভিত্তিক তাৎপর্য ও গতিবিধি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যুগে যুগে নারীর মূল্যবোধ পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনকালে সমাজে নারীদের সম্মানজনক পরিবেশ ছিল, নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করা হতো এবং সমাজে নারী পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি দেখা যেত। এমনকি নারীরা তাদের পছন্দমতো স্বামী বেছে নিতে পারত। কালক্রমে সমাজে নারীর উচ্চমর্যাদার অবনতি ঘটে। সমাজ এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও আচারব্যবহার ক্রমান্বয়ে আরও জটিলতর হতে থাকে। ইসলাম আগমনের সাথে সাথে ভারতীয় সাম্রাজ্যে নারীর মর্যাদার পার্থক্য ঘটে। ঐ সময় ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার আরও অবনতি ঘটে। আকস্মিক মুসলিম আক্রমণে কঠিন পর্দাপ্রথা ও নারীদের নিঃসঙ্গতার সূচনা হয়। নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করা হতো না। কন্যাসন্তানের জন্মকে সুখকর ঘটনা বলে বিবেচনা করা হতো না। সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় পরিবারের মহিলাদেরকে নিঃসঙ্গ (পুরুষসঙ্গবিবর্জিত) অবস্থায় রাখা হলেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির তুলনায় উচ্চতর শ্রেণি সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। তাঁরা সুশিক্ষা লাভ করতেন ও তাঁদের মেধা বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। কখনো কখনো তাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতেন। দিল্লির সুলতানি আমলে ইলতুতমিশের বুদ্ধিমতী, সহসী ও যোগ্য কন্যা সুলতানা রাজিয়া ইলবারি সুলতানদের মধ্যে একমাত্র মহিলা শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল সংক্ষিপ্ত হলেও ঘটনাবহুল ছিল। তাঁর অতুলনীয় সাহস ও বিচক্ষণতা তাঁকে আজও ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। সুলতানি আমলে দেখা যায় ইলতুতমিশের স্ত্রী ও রোকনুদ্দিন ফিরোজের মা শাহ তুর্কান, জালালউদ্দিন খিলজির রানি মালিকা-ই-জাহান, মুহাম্মদ তুঘলুকের বোন খুদাভানজাদা, বাহলোল লোদীর প্রধান রানি শামস খাতুন, বাহলোল লোদীর হিন্দু স্ত্রী ও সিকান্দার লোদীর মা বিবি আম্বার মতো আরও কয়েকজন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট মহিলা যাঁরা হেরেম রাজনীতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে মোঘলদের আগমন প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাঁরা পরবর্তী তিনশ একত্রিশ বছর হিন্দুস্তানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মোঘলদের আগমনের সাথে সাথে অনেক নতুন উপাদান ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে বিরাজমান সংস্কৃতির সাথে তা মিশে যায়। তাঁরা শুধু দেশের রাজনীতিকেই প্রভাবিত করেননি, হিন্দুস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক জীবনধারাকেও প্রভাবিত করেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে, কয়েকশ বছর পরেও বিরাজমান স্মৃতিসৌধ, মোঘল রন্ধনপ্রণালি, সোনা ও রুপার সামগ্রিক অলংকার, জারদোজি ও চিকনকারি অলংকার, প্রসিদ্ধ বেনারসি কিম-খোয়াব, রেশমি সূচিকর্ম, কাশ্মির, দিল্লি ও অমৃতসরের চামড়ার জুতা ও স্যান্ডেল, বিকানিরের চামড়াজাত পানির পাত্র, কাশ্মীরের শাল ও কার্পেট বা সংগীত এবং সেতার, সারোদ, সারেঙ্গি, সানাই, ও সানতুরের মতো সংগীতযন্ত্রের ক্ষেত্রে আজও মোঘল প্রভাব অনুভূত হয়। শুধু ভারতের অতীত মোঘল ইতিহাসের প্রচলনই নয়, এটা আমাদেরকেও অভিভূত করে। ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোঘলদের পর্যাপ্ত আবেদনও রয়েছে এবং তাঁরা যেসব স্মৃতিসৌধ রেখে গেছেন সেগুলো আজও দিল্লির লাল কেল্লার দেওয়ালে লেখা পারস্যদেশীয় অক্ষরগুলোর সারমর্ম উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

আগার ফেরদাউস বার রু জামিন আস্ত।
হামিন আস্ত হামিন আস্ত ওয়া হামিন আস্ত।

মোঘল যুগে শুধু সম্রাট ও শাহজাদাদের নয়, শাহজাদি, রানি ও হেরেমের অন্য মহিলাদেরও গৌরবময় কীর্তি দেখা যায়। মোঘল রাজবংশের সম্ভ্রান্ত মহিলারা ছিলেন পুরুষদের মতোই উল্লেখযোগ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর। এই সুন্দরী, শিক্ষিতা ও অতিশয় মেধাসম্পন্না মহিলারা শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, শৈল্পিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখেননি; তাঁরা প্রভাবিত ক্ষমতাও প্রকাশ করেছেন এবং সমকালীন রাজনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে, ঘোমটার আড়ালে ও অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও তাঁরা এত বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন যে, তাঁদের কিছু অবদান আজও আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে রয়েছে।

মোঘল ইতিহাস সম্বন্ধে শত শত বই লেখা হয়েছে। কিন্তু যখনই আমরা মোঘলদের সম্বন্ধে পাঠ করি তখন বেশিরভাগ সময় মোঘল পরিবারের প্রসিদ্ধ পুরুষেরা আমাদের মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জন করেন। আমরা কদাচিৎ

www.pathagar.com

এমন কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাই, যাতে মোঘল রাজকীয় পরিবারের মহিলা ও তাঁদের জীবন, কার্যকলাপ ও কৃতিত্ব সমন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। মোঘল যুগ থেকে শুরু করে সমসাময়িক পাসে রচনাবলিতে ছিল প্রধানত রাজদরবারের ইতিহাস এবং ক্ষমতাসীন সম্রাটের ঘটনাবহুল জীবনের বিচিত্র বর্ণনা। এসব ঐতিহাসিক বিবরণের নির্ধারিত নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে সুদীর্ঘ বর্ণনার অংশ হিসেবে রয়েছে মোঘল রাজকীয় মহিলাদের সম্বন্ধে উল্লেখ; কিন্তু তাঁদের জীবন সম্বন্ধে পৃথক ও বিস্তৃত বিবরণ বিশেষভাবে অনুপস্থিত। বাবর ও জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায়ও রয়েছে তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাজকীয় মহিলাদের সম্বন্ধে বিবরণ: কিন্তু সেখানেও এই মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নেই। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' সর্বশ্রেষ্ঠ সমসাময়িক গ্রন্থ, যাতে বাবর ও হুমায়ুনের আমলের রাজকীয় নারীদের জীবন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। সমসাময়িক বিদেশি পর্যটকদের বিবরণেও সম্ভ্রান্ত মোঘল বংশীয় নারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে; যদিও তা সাধারণ কিন্তু বিস্তৃতভাবে নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের রচনাবলিতেও, আমরা মোঘল বংশীয় শাহী নারীদের সম্বন্ধে উল্লেখ দেখতে পাই; কিন্তু এগুলোতে প্রদত্ত তথ্য অত্যন্ত সীমিত ও সংক্ষিপ্ত। নূরজাহানের মতো প্রসিদ্ধ মোঘল নারীগণ বা মোঘল হেরেম ব্যবস্থা বা তখনকার আমলে প্রচলিত পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। অন্যান্য রচনাতে মধ্যযুগীয় নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে সমীক্ষার অংশ হিসেবে বা মোঘল যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অংশ হিসেবে মোঘল নারীদের জীবনের নির্দিষ্ট কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রেখা মিশ্রার 'মোঘল ভারতে নারী' শীর্ষক গ্রন্থে নিশ্চয়ই রয়েছে রাজকীয় মোঘল নারীদের জীবন ও অবদান সম্বন্ধে আলোচনা, কিন্তু তাঁর রচনাতেও স্বতন্ত্রভাবে এই নারীদের সম্বন্ধে আলোচনা নেই। এই গ্রন্থে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে। জিনাত কাউসারের 'মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলিম নারী' শীর্ষক গ্রন্থে মোঘল নারীদের জীবনের সামাজিক দিকগুলো সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তাতে পৃথকভাবে মোঘল নারীদের সম্বন্ধে আলোচনা না করে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কে. এস. লালের 'মোঘল হেরেম' শীর্ষক গ্রন্থে মোঘল হেরেম ব্যবস্থা, হেরেমের বাসিন্দা ও তাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছবি রয়েছে। তিনি নূরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, রওশন আরা ও জীবন নিসার মতো খুব প্রসিদ্ধ মোঘল নারীদের জীবন ও অবদান সম্বন্ধেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু মোঘল রাজত্বকালে অন্যান্য রাজকীয় নারীর অবদান ও কৃতিত্ব দেখা যায় এবং যদি

www.pathagar.com

আমরা মোঘল রাজকীয় নারীদের জীবন ও অবদান সম্বন্ধে ব্যাপক বিবরণ দিতে সচেষ্ট হই তবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ নারীদের পাশাপাশি তাঁদের সম্বন্ধেও উল্লেখ করা উচিত। স্বতন্ত্র ও বিস্তৃতভাবে মোঘল রাজকীয় নারীদের জীবন ও কৃতিত্ব বিষয়ক কোনো রচনা খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত ও অপ্রতুল তথ্য এসব নারী, তাঁদের জীবন ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে পাঠককে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সহায়ক নয় এবং এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী ও বুদ্ধিমতী নারীদের প্রতি সুবিচার করতে সফল হয়নি।

তাই বর্তমান আলোচনাটি বাবর থেকে আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত যথাক্রমে বাবরের মাতামহী ও জননী আইসান দৌলত বেগম ও কুতলুঘ নিগার খানম; বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগম; বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, হুমায়ুনের স্ত্রী ও আকবরের মা হামিদা বানু বেগম; আকবরের সেবিকা মাহাম আনাগা; আকবরের স্ত্রী রোকেয়া বেগম, সেলিমা সুলতান বেগম ও যোধবাঈ; জাহাঙ্গীরের গুরুত্বপূর্ণ সহধর্মিণী নূরজাহান, মানবাঈ ও জগৎগোসাইন, শাহজাহানের প্রিয়তম পত্নী মমতাজমহল; দারাশিকোর স্ত্রী নাদিরা বেগম, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা ও রওশন আরা; আওরঙ্গজেবের কন্যা জীবন নিসা ও জীনাত উন-নিসার মতো প্রসিদ্ধ নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বসহ মোঘল রাজকীয় নারীদের জীবন ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে সমষ্টিগত ও বিস্তৃতভাবে লিখিত বিবরণ এই বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

যখন কোনো ব্যক্তি সম্রাটের হেরেমে বসবাসরত মোঘল নারীদের সম্বন্ধে চিন্তা করবে তখন তাঁর মন ভয় ও রহস্যময়তার অনুভূতিতে আজও ভরে উঠবে। রাজপ্রাসাদে মোঘল সম্ভ্রান্ত নারীদের জীবনযাপনপ্রণালি, তাঁদের অন্দরমহলের ভিতরে ও বাইরের কার্যকলাপ, পোশাক ও অলংকার, পর্দাপ্রথা ও ধর্ম, বিদ্যা ও শিক্ষা এবং এমনকি তাঁদের প্রেম ও বিরক্তিবোধ, তাঁদের উচ্চাভিলাষ, কৃতিত্ব ও অবদান সর্বদা অনেকের মনে কৌতূহলের বিষয় হয়ে থাকবে। তাঁদের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সবার কাছে তাঁদের আনন্দ ও বেদনা, দুঃখ ও সুখ, আশা ও হতাশা এবং ভালোবাসা ও ঘৃণাপূর্ণ কাহিনি উপস্থাপনে কোনো ক্ষতি নেই। ভারত সাম্রাজ্যের নারীদের কাহিনী দীর্ঘ ও বিস্তৃত। ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে প্রতিটি যুগের ইতিহাসে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক রয়েছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে আলাদা ও বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা প্রয়োজন। তাই আমি সম্পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে বাবর থেকে আওরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত মোঘল রাজকীয় নারীদের জীবন ও অবদান সম্বন্ধে বিস্ত ারিত আলোচনা বেছে নিয়েছি তাঁদের অত্যন্ত রঙিন ও ঘটনাবহুল জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোকপাত করব বলে।

www.pathagar.com

বর্তমান এই রচনায় মোঘল হেরেম বলতে মোঘল সম্রাটের হেরেম বোঝায়, শাহাজাদা ও গুরুত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্দরমহল– প্রধানত সম্রাটের হেরেম। সম্রাট বলতে বাবর থেকে বাহাদুরশাহ জাফর পর্যন্ত সব মোঘল সম্রাটকে বোঝানো হয়েছে; বিশেষ করে আকবর ও তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারী– জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব। আকবর মোঘল হেরেমকে বিস্তৃত প্রশাসনিক বিন্যাস প্রদান করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে তা একটি সুন্দর ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়।

হেরেমটি অবস্থিত ছিল আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি ও লাহোরে এবং সম্রাট ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত ব্যক্তিরা সেখানে বসবাস করতেন। এর অবস্থিতি ছিল আহম্মদাবাদ, বুরহানপুর, দৌলতাবাদ, মান্দু এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর এবং অন্য অনেক ছোট ও বড় শহর ও শিবিরে; কারণ সম্রাট যেখানে অবস্থান করতেন সেখানেই হেরেমের প্রয়োজন হতো। কিন্তু তারপরও হেরেমের অবস্থিতি ছিল মোঘলদের দুটি স্থায়ী রাজধানী আগ্রা ও দিল্লিতে। মোঘল হেরেম শুধু সুন্দরী নারীদের মোহনীয় কুঞ্জবন ছিল না। অবশ্যই সেটা ছিল সম্রাটের আনন্দ উপভোগের জন্য সবচেয়ে পছন্দনীয় সুন্দরীগণ ব্যতীত মা, চাচি, ফুফু, খালা, বোন, চাচাত বা খালাত ভাই-বোন, পত্নী, উপপত্নী, প্রধান শাহজাদি ও অপ্রধান শাহজাদি, নর্তকী ও পরিচারিকাদের বা বসবাসের জন্য একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং তাঁরা সকলেই একই বাসভবনে বসবাসরত যৌথ পরিবারের মত। প্রত্যেক মহিলার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এবং প্রত্যেকের প্রতি তাঁর প্রাপ্য অনুসারে শ্রদ্ধা, প্রশংসা, ভক্তি ও কঠোর নিয়মের সাথে ব্যবহার প্রদর্শন করা হতো। হেরেমে মর্যাদার ভিত্তিতে সর্বশীর্ষে রানিমাতা বা ক্ষমতাসীন সম্রাটের মাতা অবস্থান করতেন এবং তারপরে প্রধান স্ত্রী ও উপপত্নীগণ। এই শত শত পত্নী ও উপপত্নী এবং তাদের ভৃত্য, তরুণী দাসী ও বিনোদনকারিণীদের সম্প্রসারণ ঘটায় হেরেমের আয়তনের। মোঘল হেরেম ছিল কুখ্যাতিপূর্ণভাবে বিশাল আকৃতির। বর্তমান এই রচনায় এ সব মহিলা অর্থাৎ রানি, উপপত্নী, শাহজাদি, নর্তকী ও দাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি মোঘল সম্রাট ও অভিজাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এ যাবৎ মোঘল সম্রাট ও অভিজাত ব্যক্তিদের প্রসঙ্গটি ছিল মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাস রচয়িতা পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বর্তমান রচনাটির আলোচনার বিষয়বস্তু মোঘল বংশীয় রাজকীয় ও সম্ভ্রান্ত নারীদের জীবন। এই অর্থে এটি নতুন বিষয়ের একটি প্রথম প্রচেষ্টা এ যাবৎ উপেক্ষিত মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার এক নতুন

www.pathagar.com

ক্ষেত্র। কিন্তু নামকরণ অনুসারে সম্ভাব্য প্রত্যাশার সাথে এর বিষয় বস্তুর মিল নেই এবং এই গ্রন্থটি শুধু উষ্ণ প্রেমের বর্ণনা মাত্র নয়। একই সঙ্গে এটি নারীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিহিত অলংকার, তাঁদের প্রসাধনসামগ্রী ও বহির্বাসের নিরানন্দ তালিকা নয়। এটি ইতোমধ্যে জানা ও বিতর্কপূর্ণ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নয়। এতে অন্তঃপুরের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ, অনুষ্ঠিত খেলার প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য বা পঠিত বা বর্ণিত গল্পের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নেই। এতে মুসলিম সমাজে নারীদের মর্যাদা বা তাদের মধ্যে পর্দাপ্রথার উৎপত্তির মতো বিতর্কিত বিষয়ের কোনো বিস্তারিত আলোচনাও নেই। এতে শুধু হেরেমের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রচেষ্টা আছে। কোনো বিষয়ের রোমান্টিক বর্ণনার প্রচেষ্টা এতে নেই, তথাপি বেগম সাহেব ও শাহজাদিদের প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের বিষয়াবলি স্বাধীনভাবে এতে বর্ণিত হয়েছে। হেরেমের মহিলাদের রুচি ও মেজাজ, তাঁদের জীবনযাপনপ্রণালি ও ভালোবাসা, আনন্দ ও কষ্ট সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্তঃপুরের নারীদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা ছিল না। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সম্রাটকে যৌনসুখ দেওয়ার জন্য বেঁচে থাকতেন। তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি সর্বদা নজর রাখত তত্ত্বাবধায়িকা, নপুংসক প্রহরীরা। হেরেম ছিল অস্ত্রশক্তি ও ধনসম্পদের অপব্যবহার ও বিলাসিতার জীবন্ত প্রতীক।

'মোঘল সাম্রাজ্যে নারী' গ্রন্থে রাজকীয় মোঘল নারীদের জীবন আলেখ্য ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ধারায় নারীসমাজ ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে আবহমানকাল থেকেই। তবুও বিখ্যাত কিছু নারী যুগের সাথে সাথে নিজেদেরকে মহীয়সী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রেখে গেছেন স্মৃতিস্বরূপ তাঁদের অবদান। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জীবনের সকল প্রকার আশা-ভরসার প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থখানিতে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরা হলো। পঠন-পাঠনে তারা যদি আনন্দ লাভ করেন তবেই আমার লেখনী সার্থক হবে। এই গ্রন্থ রচনায় অনেকে প্রেরণা দিয়েছেন। বিশেষ করে জনতা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও শ্রী সুকুমার রঞ্জন সরকারের সহায়তায় এই বইটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য পাঠক সমাজের নিকট বিনীত আবেদন জানাই।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

যখন একজন ভারতীয় বা বিদেশি পর্যটক তাঁর বিশিষ্ট ভ্রমণ স্থান আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রি ও লাহোর রেডফোর্ড পরিদর্শন করেন তখন তার মনে বিভিন্ন কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা জাগে। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল বা সাম্রাজ্য এক শ্রেণির শাসক বা রাজা-বাদশাহ্ দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। যুগে যুগে রাজা-বাদশাহগণ কীভাবে তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল বা সাম্রাজ্য শাসন করতেন? রানি-পত্নী-উপপত্নী, শাহ্জাদা-শাহজাদি, উজির-নাজির, দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত ও প্রজা সবকিছুর সমন্বয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে কীভাবে সাম্রাজ্যে কাজে লাগানো হতো, তাদের প্রতি কী রকম ব্যবহার করা হতো– তারই বিচিত্র রূপরেখা তাঁর মনে অদম্য কৌতূহল জাগায়। আর পর্যটকদের মনেও নানান রকম জানা-অজানা চিন্তা ও জল্পনা-কল্পনার আবির্ভাব ঘটে। তারই পটভূমিকায় আমার মনে এক অনবদ্য জীবন জিজ্ঞাসা থেকে কিছু তুলে ধরেছি এই 'মোঘল সাম্রাজ্যে নারী' গ্রন্থে। আমি বেশ কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা স্বচক্ষে দেখেছি। সেগুলো সম্পর্কে বহু চিন্তা ও গবেষণা করেছি– এই দেখা থেকে আমি কিছু লিখব বলে চিন্তা করেছি। প্রকৃত তথ্য-উপাত্তের বড়ই অভাব। বাংলা ভাষায় তেমন বস্তুনিষ্ঠ বই-পুস্তকও কেউ লিখেননি। মোঘল নারীদের সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখার ছিল। তাঁরা পুরুষদের তুলনায় কিছুটা পিছনে থাকলেও তাঁদের কৃতিত্ব ও অবদান একেবারে তুচ্ছ নয়। যদিও অনেকে ইতঃপূর্বে অনেক কিছু লিখতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেগুলো আদৌ ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণে নির্ভুল নয়; অনেকটাই কল্পনাপ্রসূত ও কিংবদন্তির অপলাপ মাত্র।

ভারতে মোঘল শাসনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হলেও ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ সময়ের নারীদের সম্পর্কে যা তারা দাবি করেন সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে পারেননি। একটা দেশে নারীদের মর্যাদা নিখুঁতভাবে ঐ সময়ের সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধ দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে একটা জরিপ প্রয়োজন। বর্তমান লেখায় নারীদের, প্রধানত সম্ভ্রান্ত নারীদের, মোঘল যুগের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানো

www.pathagar.com

হয়েছে। সাম্রাজ্যে নারীরা যেখানে নির্জনে বসবাস করত, সেখানকার প্রকাশ্য বর্ণনা যতদূর সম্ভব বর্জন করা হতো। ফলে পারস্য বা ভারতীয় ঐতিহাসিকরা তাঁদের সম্পর্কে কোনোকিছু খুব কমই উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে একজন নারী যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতি, সাহিত্য বা ধর্ম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ না করতেন। ঠিকমতো অধ্যয়নের পর একজন পাঠক তাদের সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন– যা তাকে তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। এই লেখার পরিধি মোঘলদের অধীন বিশেষ করে উত্তর ভারতের নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ঐ সময়ের কতিপয় বিখ্যাত নারী সম্ভ্রান্ত পরিবার ও মোঘল রাজপরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে এই বিবরণের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ সময়ের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সাধারণ নারীদের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জড়িত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। উৎস সম্পর্কে বলতে গেলে খোদ পারস্য ও বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য ও চিত্রকলাতে কিছু তথ্যপ্রমাণ স্বরূপ তাঁদেরকে চিত্রিত করা হয়েছে।

'মোঘল সাম্রাজ্যে নারী' গ্রন্থটির লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে। মোঘল শাসনের ইতিহাস খুব লম্বা-চওড়া। প্রথম পানিপথ যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে) বাবরের বিজয়ের মাধ্যমে মোঘল শাসনের যুগ শুরু হয় এবং প্রায় ৩৩১ বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের শাসনকাল (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইতিহাসের এই দীর্ঘ কালপরিক্রমায় অসংখ্য নারী চরিত্র উঠে এসেছে। তাই একটি ভলিউমে সম্পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা সম্ভব না হওয়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ আকারে প্রকাশের সুবিধার্থে 'মোঘল আমলে নারী' আর একটি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেটির পাশাপাশি এটিও প্রকাশ করা হলো।

এই বইটি লিখতে গিয়ে অনেক জ্ঞানীগুণী ও সজ্জন ব্যক্তির প্রেরণা পেয়েছি। তাঁরা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযেগিতা করেছেন। কেউ লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছেন, কেউ ইংরেজি থেকে অনুবাদকর্মে সহযোগিতা করেছেন– এভাবে লেখার কলেবর বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষভাবে জনতা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ও শ্রী সুকুমার রঞ্জন সরকার আমাকে অনুবাদে সহায়তা করেছেন। পাঠক সমাজ যদি এই বইখানি পড়ে আনন্দ পান তবেই আমি সার্থক হব বলে মনে করি।

ইতি–

মো. রেজাউল করিম

বগুড়া, ১৫ নভেম্বর, ২০১৪

www.pathagar.com

শুভেচ্ছা বাণী

৫০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অনেক স্নেহধন্য ছাত্র-ছাত্রী আমার হৃদয় মন্দিরে এক শাশ্বত মননশীলতার উজ্জ্বল আলোকিত রূপ পরিগ্রহের উন্মেষ ঘটিয়েছে। তাদের মধ্যে মোঃ রেজাউল করিম যেন উদিত সূর্যের মতোই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। যে স্পৃহা, উদ্দীপনা ও অনুপম সাধনা নিয়ে অসাধ্য সাধন করতে যাচ্ছে শিক্ষক হিসেবে আমি গর্বিত, উদ্বেলিত এবং হৃদয়াবেগে অনুরণিত। তার লিখিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে নারী' লিখে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশের উন্মেষ ঘটিয়েছে আশা করি তা সকল শ্রেণির পাঠকের মন ও মননশীলতায় এক সুন্দর আভার সৃষ্টি করবে। আমার মনের মণিকোঠায় তার এই অকৃত্রিম প্রচেষ্টা চিরদিন কিশলয়ের মতো জাগরূক থাকবে। ইতিহাসের আলোকে সাহিত্য সৃষ্টি ও সেবায় তার জ্ঞান ও দীপ্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক এবং এক উদ্ভাসিত মনের অধিকারী হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে পাঠক সমাজের, আপামর জনসাধারণের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে বেঁচে থাক– এই প্রত্যাশা রেখে আন্তরিক দোয়া জানাচ্ছি।

পরিশেষে তার সুন্দর, শাশ্বত ও দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

মো. কামাল উদ্দিন

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

ভাদসা উচ্চ বিদ্যালয় ও

অধ্যক্ষ পুলিশ লাইনস্ একাডেমী, জয়পুরহাট।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম অধ্যায়
মোঘলদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় নারীদের অবস্থা ১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় ও ইউরোপীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি ৫২
তৃতীয় অধ্যায়
মোঘল হেরেম ও অভিজাত নারীগণ ৭৮
চতুর্থ অধ্যায়
রাজকীয় মহিলাদের উপভোগ করা বিশেষ সুবিধাদি ৮৬
পঞ্চম অধ্যায়
সমসাময়িক রাজনীতিতে ভারতীয় নারীদের অবদান ১০৪
ষষ্ঠ অধ্যায়
মোঘল হেরেমে বসবাসরত নারীগণ এবং তাঁদের বাসস্থান ১৫০
সপ্তম অধ্যায়
রাজকীয় মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলির কয়েকটি দিক ১৯৫
অষ্টম অধ্যায়
মোঘল রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণ ২৩৭
নবম অধ্যায়
অর্থনৈতিক জীবনে মোঘল নারীদের অবদান ২৭২
দশম অধ্যায়
সাহিত্যক্ষেত্রে মোঘল নারীদের অবদান ২৮৬
একাদশ অধ্যায়
মোঘল নারীদের শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবদান ৩২৮
গ্রন্থপঞ্জি ৩৭৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মোঘলদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় নারীদের অবস্থা

মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণির নারীদের মর্যাদা

১. সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা

স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষের পাশাপাশি নারীও সামাজিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠনে ভূমিকা রেখে আসছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা মূল্যবোধের বিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, যাকে পণ্ডিতেরা সামগ্রিক উন্নতি বলে বর্ণনা করেছেন। তার সামাজিক মর্যাদা যেকোনো যুগ বা দেশের সাংস্কৃতিক মান নিরূপণের মাপকাঠি। মোঘল আমলে নারীদের মর্যাদা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য আগের যুগগুলোতে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে নারীরা সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে সংকটময় মুহূর্তে। তারা তাদের স্বামীদেরকে বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে আসছে। এমনকি তারা তাদের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ও দেশের সম্মান রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলে নিতেও দ্বিধা করেনি।

প্রাচীনকাল থেকে পরলোকগত স্বামীর খেতাব ও সম্পত্তি প্রাপ্ত নারীদের দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা তাঁদের রাজ্য শাসন করেছেন সাফল্যের সাথে। মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে হর্ষবর্ধনের শাসনকালে তাঁর বোন রাজেশ্বরী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইয়ের পাশে সম্মানজনক স্থান লাভ করেন এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়ের কাজেও অংশগ্রহণ করেন।[১] এমনকি রাজপুত শাসন আমলেও শাসক পরিবারের মেয়েদেরকে দেওয়া হতো প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ।[২]

---

১. Harshavardhan by G.S. Chatterji, P.87; The Wonder that was India by A.L. Basham, P.91.

২. Vijiaya Bhattarika of Chalukya House (7th Century A.D.). Sugandha and Didda of Kashmir (10th Century A.D.), managed their states fairly successfully. The position of women in Hindu Civilization by A.S. Altekar. PP. 21 & 187. When her husband Samarasi along with Prithviraj died in battlefield in 1193 A.D. Kurmadevi took the administration of Mewar in her hands and repulsed the attacks of Qutubuddin. Annals and Antiquities of Rajasthan by Tod. vol.1 PP.303-4; Altekar, P.187.

www.pathagar.com

রাজদরবারে মহিলাদের ভূমিকার সীমারেখার মধ্যে তাদেরকে রাজপ্রাসাদে ব্যক্তিগত সেবিকা, দ্বাররক্ষী বা এমনকি সশস্ত্র প্রহরীরূপে নিয়োগ করা হতো। হর্ষবর্ধনের শাসনকালে প্রতিহারিস নামক মহিলা রক্ষীরা রাজপ্রাসাদে আগন্তুকের উপস্থিতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে তাদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করত। তারা সোনার কলস ও রাজছত্র ধরে থাকত এবং চাউরি দোলাত। তারা পান পরিবেশনকারিণী ও মালিনী হিসেবে চাকরি গ্রহণ করত।[৩] রাজকীয় রন্ধনশালা ও সংরক্ষিত মদ্য ভাণ্ডারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করত নারীরা। তারা হাতির পিঠে ও রথের উপরে আরোহণ করত এবং শিকার অভিযানে রাজার সঙ্গে যেত।[৪] রাজপ্রাসাদের উৎসব ও অনুষ্ঠানে পরিচারিকাগণ সংগীত ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করত। তাদেরকে ব্যবহার করা হতো গুপ্তচর বৃত্তি ও শত্রুকে বিষ প্রয়োগের কাজেও।[৫]

প্রাচীনকালে পর্দাপ্রথা সাধারণভাবে প্রচলিত না থাকলেও তা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না।[৬] এটা বিশেষ করে অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পালিত হতো। ধর্ম বিষয়ে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমান মর্যাদা ভোগ করত।[৭] তারা তাদের স্বামীদের দ্বারা আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বলিদান অনুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত। তাদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ মঠগুলোতে যোগদান করে ভিক্ষুণীতে (সন্ন্যাসিনীতে) পরিণত হতো।[৮]

শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীরা ভোগ করত সম্মানজনক মর্যাদা।[৯] অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা শিক্ষয়িত্রী ও তার্কিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[১০] এমনকি শিক্ষা বৃত্তির ক্ষেত্রেও নারীদের আগ্রহ অব্যাহত থাকে মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত।[১১] এই

---

৩. Altekar, P. 182; Journal of Indian History, vol.17 (1938) P.24.

৪. Life in Gupta Age by R.N. Saletore, P.182.

৫. Referance of Vish Kanyas or Pretty girls used for the purpose of poisoning the enemies was usually found. Hostory of Medieval India by C.V. Vaidya, vol.1, P. 6.

৬. References to seclusion of women is made in Arthashastra. Arthashastra by Kautilya, Tr. P. 188; Abhigyan Shakuntalam Kalidasa. Tr. P. 327; Harsha

৭. Hindu Social Organization by P.N. Prabha, PP. 257-8.

৮. Rajyashri was interested in the principle and philosophy of Buddhism Harshavardhan by G.S. Chartterji. P.308.

৯. সুব্রিতৃত ও ব্রাহ্মণ দু'ধরনের শিক্ষিত মহিলা ছিল। তারা বিবাহিত জীবনের পরবর্তী সময় পর্যন্ত সারাজীবনের জন্য তৎকালীন 'ধর্ম শিক্ষায়' আত্মনিয়োগ করত। ভারতের বিখ্যাত মহিলা শীর্ষক গ্রন্থ 'মধুবানন্দ ও মজুমদার', পৃষ্ঠা ৫।

১০. ব্রাহ্মউপনিষদ আমলে সুলেব', গরজি ও মৈত্রেয়ীর মতো অনেক মহিলা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতে আগ্রহী হন। ভারতের বিখ্যাত মহিলা শীর্ষক গ্রন্থ 'মধুবানন্দ ও মজুমদার', পৃষ্ঠা, ৩০; 'হিন্দু সামাজিক সংগঠন' গ্রন্থ পি.এন. প্রভু, পৃষ্ঠা ২৬৪।

১১. রাজেশ্বরীকে বৌদ্ধধর্মের নীতিশিক্ষা দিতে দিবাকর মিশ্রাকে নিযুক্ত করার কথা বানায় নথিভুক্ত হয়েছে। আর.কে. মুখার্জী কর্তৃক লিখিত 'ঈশ্বরী হর্ষবর্ধন', পৃষ্ঠা-১৭৬. মন্দন মিশ্রার স্ত্রী বিতর্কে শনকাশ্রয়িকাকে পরাজিত করেন। বিখ্যাত কবি রাজশেখরের স্ত্রী আভন্তি

www.pathagar.com

সময়ে (৬০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) আত্মপ্রকাশকারী সংস্কৃত মহিলা কবিদের মধ্যে ইন্দ্রলিখা, শীলা ও শুভদ্রার কথা উল্লেখযোগ্য।[১২] অনেক বালিকা অঙ্কশাস্ত্রেও আগ্রহী ছিল।[১৩] চারুকলা বিষয়ে পড়াশোনা করা ছিল মহিলাদের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। বিশেষ করে উচ্চতর শ্রেণির মহিলারা চিত্রাঙ্কন, সংগীত, নৃত্য ও সাজ সজ্জার মতো চারুশিল্পে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।[১৪]

মহিলারা বিভিন্ন প্রকার শখ ও ক্রীড়া কৌতুকের মাধ্যমে তাদের অবসর সময় কাটাত। সংগীত ও নৃত্য ছিল তাদের বিনোদনের প্রধান উপকরণ। লুকোচুরি ও দৌড় দিয়ে ধরার মতো আঙ্গিনায় খেলা যায় এমন খেলাগুলো ছিল অত্যন্ত সাধারণ।[১৫] মেয়েরা সাঁতার কাটতেও বাইরে যেত।

এছাড়াও তারা বাগান করা, মালা গাঁথা, খেলনা তৈরি ও গৃহসজ্জার কাজে আনন্দ লাভ করত ।[১৬] এসব বিনোদনের উপায় রাজপুত শাসন আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল বলে মনে হয়। সম্ভ্রান্ত নারীদের বাসভবনে থাকত প্রশস্ত আঙ্গিনা, বাগান ও খেলার মাঠ।[১৭] রাজপুত মহিলারা স্বামীর সাথে শিকার অভিযান ও যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রাচীন রীতি টিকিয়ে রাখে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা তাদের স্বামীদের সাথে যোগদান করত।[১৮]

মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে নারীরা শাড়ি পরিধান করতে শুরু করে এবং তারা দেহের উপরিভাগ আঙ্গিয়া (বডিস) দ্বারা ঢেকে রাখত। বাড়ি থেকে বাইরে যাওয়ার সময় তারা বিভিন্ন রকম দীর্ঘ দোপাট্টা বা আধহানি (স্কার্ফ) ব্যবহার করত।[১৯] উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নারীরা লেহেঙ্গা (দীর্ঘ স্কার্ট) প্রায়ই পরিধান করত। মহিলাদের ব্যবহৃত কাঞ্চুল ও চোলির (ব্লাউজের) কথাও উল্লেখিত

সুন্দরীও খুব শিক্ষিত ছিলেন। পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো ৫২-৫৩।

১২. পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সাংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৫৩।

১৩. পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সাংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৫৩।

১৪. রাজা হর্ষবর্ধনের বোন রাজেশ্বরীকে সংগীত ও নৃত্যে পর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। জে.এস. চ্যাটার্জী কর্তৃক লিখিত 'হর্ষবর্ধন' পৃষ্ঠা-৩০৮, আর.কে. মুখার্জী কর্তৃক লিখিত 'শ্বরী হর্ষবর্ধন' পৃষ্ঠাগুলো-১৯৩-৪. পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৫৩, বিখ্যাত সংস্কৃত কবি কালিদাসও মহিলাদের নাচ চর্চার কথা ব্যক্ত করেন। মালাভিকাগনি মিত্র, কালিদাস, অনুবাদ পৃষ্ঠাগুলো-২ এবং ৪১.

১৫. অলতিকার, পৃষ্ঠাগুলো-১৫-১৬।

১৬. Abhigyan Shakuntalam by Kalidasa, tr. P.44; Altikar, P.20.

১৭. Rajputani Ka Itihus by Ojha, vol. 1. P.77.

১৮. Ibid., p. 88.

১৯. 'ভারতীয় বেশভূষা' মতিচন্দ্র লিখিত, পৃষ্ঠাগুলো-৬৯ ও ৮১।

www.pathagar.com

আছে। পরিবর্তনশীল ঋতুগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে তারা তাদের পোশাক পরিবর্তন করত।[২০] গ্রীষ্মকালে তারা বেশি পছন্দ করত সূক্ষ্ম হাল্কা বস্ত্র পরিধান করতে। তারা বিশেষ করে রঙিন ও ছাপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করতে পছন্দ করত।[২১]

ভারতীয় নারীদের কাছে অলংকার ছিল অত্যন্ত প্রিয়। তারা সাজগোজ করত ফুল ও অলংকার দ্বারা। সাধারণভাবে ব্যবহৃত অলংকারের মধ্যে ছিল শিষপহল বা শিখাপাশা (কপালে পরিধানের জন্য ব্যবহৃত), কানের দুল, বাজু, বালা, আংটি, কোমর বন্ধনী, পায়েল ইত্যাদি।[২২] মনে হয় সমগ্র হিন্দু শাসন আমলে নাকের ফুল নামক অলংকারটি ছিল অপরিচিত।[২৩] সাধারণত সোনা, রুপা ও বিভিন্ন মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি হতো অলংকার।[২৪] এমনকি গরিব মহিলারাও সাধারণত গজদন্ত, পিতল ও কাচের তৈরি করা অলংকার ব্যবহার করত।[২৫]

২০. Ibid.. I, PP. 158-9
২১. পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৪৩।
২২. Ibid., I, P.44; Altikar. PP.298-9.
২৩. Altikar. P.302.
২৪. Ibid., I. P.298.
২৫. The wonder that was India by Basham, P.212.

www.pathagar.com

অলংকার ছাড়াও ভারতীয় নারীরা বিশেষ মনোযোগ দিত তাদের প্রসাধন সামগ্রীর প্রতি। তারা ব্যবহার করত জাফরান মিশ্রিত চন্দন অনুলেপনের মতো বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও অনুলেপন।[২৬]

তারা বিভিন্ন কায়দায় তাদের চুলের বেণি তৈরি করত এবং বেণির সৌন্দর্য সাধনের জন্য ব্যবহার করত ফুল ও অলংকার।[২৭] তারা প্রশস্ত বেণি বা আলগা খোঁপার আকারে কেশবিন্যাস করত। কণ্ঠদেশে প্রায়শ সুতোয় বাঁধা মণিরত্ন দ্বারা বড় খোঁপা তৈরি করা ছিল তাদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কেশবিন্যাস রীতি।[২৮] তারা চোখে কাজল, কপালে সিঁদুর পরত এবং তাদের মুখমণ্ডল সৌন্দর্যমণ্ডিত করত।[২৯] তারা ঠোঁটে, হাতের আঙ্গুলের পিঠে, পায়ের বৃদ্ধাআঙ্গুলে ও হাতের তালুতে ব্যবহার করত বিভিন্ন রকমের রং ও অনুলেপন।[৩০]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী ছিলেন গৃহস্থালি বিষয়াদি ও সম্পত্তির যৌথ মালিক। বিবাহের সময় স্বামীকে এই শপথ গ্রহণ করতে হতো যে, সে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। যৌথমালিকানা স্বত্বটিতে স্ত্রীকে পুরোপুরি সম অধিকার না দিলেও গৌণ অধিকারগুলো লাভে সহায়তা করত। যদিও অলংকার, দামি পোশাক, বাসনপত্র ইত্যাদির সমন্বয়ে 'স্ত্রীধনের প্রতি' বলে নারীদের দাবি ছিল তথাপি উত্তরাধিকারসূত্রে নারীদের সম্পত্তি অর্জনের কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[৩১] নিম্নতর শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে সাহায্য করত বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তারা সক্রিয়ভাবে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করত।[৩২] তারা তীর-ধনুকের মতো যুদ্ধ উপকরণ তৈরি করত। কাপড় বোনা, নকশা শিল্প ও ঝুড়ি তৈরির কাজে তারা আত্মনিয়োগ করত।[৩৩] তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাজপ্রাসাদে কর্মে নিযুক্ত হতো।[৩৪] মোটকথা তুর্কিদের পরবর্তী আমলে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা একেবারে হতাশাব্যঞ্জক ছিল না। যদিও প্রাচীনকালে নারীদের উপভোগ্য স্বাধীনতার অধিকার ও সম্মান সামাজিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ক্ষুণ্ন হতে থাকে, তবুও ভারতে নারীদের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা একেবারে অর্থহীন নয়।

---

২৬. Altikar, P.300.
২৭. পি.এন. ওঝার 'মধ্যকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি' গ্রন্থের পৃষ্ঠা-৪৪।
২৮. The wonder that was India by Basham, P.211.
২৯. Altikar, P.300.
৩০. Ibid., P.300; The wonder that was India by Basham, P.212.
৩১. Altikar, PP.214-15.
৩২. Ibid., P.179.
৩৩. Ibid., P.188.
৩৪. Ibid., P.182; Journal of Indian History, vol.17 (1938), P. 24.

www.pathagar.com

২. তুর্কি নারীদের মর্যাদা

তুর্কিরা যখন ভারতে আসে তখন তারা আরবের আব্বাসীয় বংশের লোকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিজ উত্তরাধিকার সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে নারীদের মর্যাদা সম্মানজনক ছিল বলে মনে হয়। তুর্কি নারীরা রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। শুরুতে নারীদের নির্জন জীবনব্যবস্থা কঠোরভাবে মানা হতো না; কিন্তু দশম শতাব্দীর পরে তা কঠোর হতে শুরু করে।

কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা বুদ্ধিজীবী কর্মক্ষেত্রেও প্রবল আগ্রহ পোষণ করতেন; কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দেওয়া হতো না। চারুশিল্পের প্রতি তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং সংগীত ও নৃত্যশিল্প ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্যাশনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। এমনকি একাদশ শতাব্দীতে সংগঠিত বড় আন্দোলনের মধ্যে নারীরা ছিল যত্ন, প্রীতি ও বীরত্বের প্রতীক। এসব ঐতিহ্য, প্রথা ও আচার-আচরণ তুর্কিরা এই দেশে নিয়ে আসে এবং রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও তুর্কি সৈন্যরা এগুলো অনুসরণ করে। কালক্রমে এগুলো দেশজ অবস্থার প্রভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়।

দিল্লির সুলতানদের ছিল বড় বড় হেরেম ও তাদের উল্লেখযোগ্য সময়ের অংশ কাটত তাদের পত্নী ও উপপত্নীদের সান্নিধ্যে। তাঁদের মা বোন ছাড়াও পরিবারের অন্য আত্মীয়রা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত হতেন। সুলতানের মাকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হতো এবং তার পরে সবচেয়ে বেশি সম্মান লাভ করতেন প্রধান পত্নী। রাজপুত ও পারস্যের ঐতিহ্য অনুসারে রানি অপেক্ষা সম্রাটের মা অধিকতর ক্ষমতাপূর্ণ পদের অধিকারিণী ছিলেন। এসব রাজকীয় মহিলা উচ্চ পদমর্যাদা ভোগ করতেন এবং তাদেরকে দেওয়া হতো মালিকা-ই-জাহান, মাখদুমা-ই-জাহান ইত্যাদি খেতাব।[৩৫] কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী মহিলা রাজনীতির প্রতিও আকৃষ্ট হন। সুলতানি আমলের সমসাময়িক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপকারী প্রথম মহিলার দৃষ্টান্ত হলেন ইলতুতমিশের স্ত্রী ও রোকনুদ্দিন ফিরোজের মাতা শাহতুরকান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মহিলা। যদিও ইলতুতমিশ রাজিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারিণী বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তথাপি শাহতুরকান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে হস্তক্ষেপ করার। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কিছু পরে (১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি তাঁর অলস ও আমোদপ্রিয় পুত্র রোকনুদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসনে বসানোর জন্য

---

৩৫. আই.এইচ. কোরেশী লিখিত 'দিল্লির সুলতানদের শাসন ক্ষমতা' পৃষ্ঠা-৬৫।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যমূলকভাবে চেষ্টা করেন এবং তাঁর নিজ হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে শুরু করেন।[৩৬] তাঁর উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য তিনি অনেক হেরেমবাসীকে হত্যা করেন এবং এমনকি ষড়যন্ত্র করেন সুলতানা রাজিয়ার বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে তাঁকে আর ক্ষমতাবান করা হয় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁকে কারাবন্দি করেন; তাঁর পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়।

৩. সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ

রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টান্ত হলেন সুলতানা রাজিয়া। রাজিয়া তাঁর মেধা ও দক্ষতা দ্বারা পিতা ইলতুতমিশকে এতটা প্রভাবিত করেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মাহমুদের ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পরে তিরি তাঁর পুত্র রোকনুদ্দিন ফিরোজ, মুইজুদ্দিন বাহরাম ও নাসির উদ্দিন মাহমুদের চেয়ে অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাজিয়াকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজিয়ার সিংহাসনের দাবির ভিত্তি ছিল সালতানাতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। প্রশাসনিক ব্যাপারে সঠিক প্রশিক্ষণ দান ও তাঁকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য ইলতুতমিশ সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালান।[৩৭] ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান উপলক্ষে তিনি যখন রাজধানী ত্যাগ করেন তখন তিনি রাজিয়াকে দিল্লির শাসনভার দিয়ে যান[৩৮] এবং তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেন।

ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে রাজিয়া মনোনয়ন লাভের সাথে সাথে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। পারস্যদেশীয় জনগণের কাছে নারীদের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের অধিকার ছিল পরিচিত বিষয়; কিন্তু ভারতে এটা ছিল নতুন বিষয়।[৩৯] যে সময় থেকে তুর্কিরা মুসলিম বিশ্বে তাঁদের ক্ষমতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারে নারীর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি দেখা যায়নি। মনে হয় তুর্কিরা পারস্যবাসীদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছিল এবং মহিলাদের দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের অধিকার মেনে

---

৩৬. মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন 'শাহ্ তুরকান রাজ্য দখল ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।' তাবকাত-ই-নাসিরি, ভলিউম, প্রথম, পৃষ্ঠা-৬৩২।

৩৭. মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবকাত-ই-নাসিরি', অনু. ভলিউম, প্রথম, পৃষ্ঠাগুলো-৬৩৭-৩৮.

৩৮. এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ কর্তৃক রচিত 'ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি', পৃষ্ঠা-১০৭ ; Ibid., PP.637-38.

৩৯. Indian Historical Quarterly, vol. II (1940), P 753.

www.pathagar.com

নিয়েছিল। গোয়ালিয়র থেকে ফেরার পরে যখন ইলতুতমিশ তাঁর প্রধানমন্ত্রী তাজুল মুলককে একটি আদেশ লিখতে বললেন, রাজিয়াকে তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে[৪০] তখন কয়েকজন সভাসদ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রদের উপস্থিতিতে একজন কন্যাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সাংবিধানিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি কিংবা কোনো মুসলিম আইনবিদ এ ধরনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করেননি।

এমনও হতে পারে যে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একজন মহিলা তাঁদেরকে শাসন করবে[৪১] এমন ধারণার সাথে একমত হতে পারেননি।[৪২] তাঁদের এই বিদ্বেষ ছিল সম্ভবত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে নারীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং তাঁরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে তাঁদের অর্থাৎ পুরুষের একচেটিয়া ব্যাপার বলে বিবেচনা করতেন। যাইহোক, সুলতানা রাজিয়া রোকনুদ্দিন ফিরোজের অদক্ষতা ও কুশাসনের সুযোগ নিয়ে দিল্লির জনগণ ও দিল্লির সেনাবাহিনীর কাছে তাঁকে সাহায্য করার ও তাঁকে সিংহাসনে বসানোর আবেদন জানান।[৪৩] তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পরে সবকিছু আবার স্বাভাবিক নিয়ম ও রীতিতে চলতে শুরু করে।[৪৪] যারা তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে একটি যুক্তি বা অন্য একটি যুক্তিতে বিরোধিতা করেছিল তাঁদেরকে কারাবন্দি করা হয় এবং প্রায় চার বছর যাবৎ (১২৩৬-১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি তাঁর শাসনকার্য সার্থকভাবে পরিচালনা করেন।

দিল্লির সালতানাতের ইতিহাসে রাজিয়ার সিংহাসন আরোহণ বিরাট একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। এই প্রথমবারের মতো শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে সিংহাসন লাভে একজন নারীর দাবিকে সম্মান জানানো হয়। তাঁর সিংহাসনে আরোহণ এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মতো সর্বোচ্চ পদমর্যাদাও নারীদের জন্য উন্মুক্ত। এটা তুর্কিদের মানসের এই সজীবতা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করে যে তারা সমাজের শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্য ছাড়াই

---

৪০. মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবকাত-ই-নাসিরি', অনু. ভলিউম, প্রথম, পৃষ্ঠা-৬৩৮।

৪১. ড. আর,পি, ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত 'মুসলিম শাসনের কিছু দৃষ্টিকোণ', পৃষ্ঠা-২৯: এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ কর্তৃক রচিত 'ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি', পৃষ্ঠা-১০৭।

৪২. ড. আর. পি. ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত 'মুসলিম শাসনের কিছু দৃষ্টিকোণ', পৃষ্ঠা-২৮।

৪৩. মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবকাত-ই-নাসিরি', অনু. ভলিউম প্রথম, পৃষ্ঠা-৬৩৬।

৪৪. Ibid., P. 639

www.pathagar.com

ব্যক্তির গুণাবলি সম্পূর্ণভাবে বিবেচনায় আনতে প্রস্তুত ছিল।[৪৫] রাজিয়ার দৃষ্টান্ত রাজকীয় মহিলাদের কাছে ধীরে ধীরে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানের রূপ লাভ করে।

৪. মালিক-ই-জাহানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে আর একজন রাজকীয় মহিলার সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আরেকটি দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় মালিকা-ই-জাহানের মধ্যে। তিনি ছিলেন জালালউদ্দিনের স্ত্রী এবং রোকনউদ্দিন ইব্রাহিমের উচ্চাভিলাষী মাতা। তাঁর আধিপত্য বিস্তারকারী স্বভাব দ্বারা তিনি তাঁর জামাতা আলাউদ্দিনের পারিবারিক জীবন এত বেশি অসুখী ও শোচনীয় করে তোলেন যে, তিনি রাজধানী ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১২৯১ খ্রিষ্টাব্দে কারাতে চলে যান সেই প্রদেশের শাসনকর্তারূপে। ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তিনি রুস্তম-ই-জামানি বলে অপেক্ষাকৃত ভালো নামে পরিচিত জালালউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরকালি খানের দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চেষ্টা করেন তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে ও নিজ হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য।[৪৬] তিনি ধীরে ধীরে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেন এবং রাজকীয় আদেশ জারি করে প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনা করতে শুরু করেন।[৪৭] তাঁর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের কারণে আরকালি খানের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে।[৪৮] এবং আরকালি খান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আলাউদ্দিন রোকনউদ্দিন ইব্রাহিমকে আক্রমণ করেন তখন মালিকাকে সাহায্য করতে অসম্মত হন। যাহোক, মালিকা-ই-জাহানের পুত্র সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আরকালি খানের সাথে মুলতানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বা মহিলাদেরকে বেশি সুযোগ দেওয়া হয়নি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে, কারণ সুলতান নিজেই ছিলেন একজন অত্যন্ত শক্তিশালী স্বৈরাচারী শাসক।[৪৯] তবুও কয়েকটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তাঁর হেরেমের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত

---

৪৫. ড. আর. পি. ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত 'মুসলিম শাসনের কিছু দৃষ্টিকোণ', পৃষ্ঠা-২৯।
৪৬. তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী (খালজী মধ্যকালীন ভারত), বারানি, পৃষ্ঠা-৩৯.
৪৭. Ibid..
৪৮. Ibid..
৪৯. History of the Khalji by K.S. Lal-207.

www.pathagar.com

হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৫০] তুঘলুক শাসনকর্তারাও নারীদের প্রতি খুব দুর্বল ছিলেন। মুহম্মদ তুঘলুক তাঁর মায়ের প্রতি এত বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রবণ হয়ে ওঠেন যে তিনি তাঁকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রভাব খাটানোর অনুমোদন দিতেন।[৫১] মনে হয় যে, তাঁর মা সুলতানের রানিদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার লাভ করতেন। মুহম্মদ তুঘলুকের মৃত্যুতে তাঁর বোন খুধাভান্দজাদা তাঁর পুত্র দাওয়ার বখশকে সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেন।[৫২] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মুহম্মদ তুঘলুকের মৃত্যুর স্থান থাট্টাতে অবস্থানরত ফিরোজ শাহকে এ ব্যাপারে সমর্থন দেন। তথাপি তিনি (খুধাভান্দজাদা) তাঁর পুত্রের সিংহাসনের দাবিতে চাপ দেন এবং অভিযোগ আছে যে, তিনি ফিরোজকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেন।[৫৩] যাহোক, তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি।

এমনকি লোদি বংশের রাজত্বকালেও সমসাময়িক রাজনীতিতে নারীদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তারের নিদর্শনও কম নেই। বাহলোল লোদী ও জুয়ানপুরের শারকি শাসনকর্তার মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতে জুয়ানপুরের কয়েকজন রাজকীয় মহিলা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। সাঈদের শাসক সুলতান আলাউদ্দিনের কন্যা এবং জুয়ানপুরের সুলতান মাহমুদ শারকির স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মহিলা এবং তিনি মাহমুদ শারকিকে দিল্লি থেকে বিতাড়িত করে বাহলোল লোদীর হাতে তাঁর পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।[৫৪] তিনি তাঁর স্বামীকে বাহলোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্ররোচিত করেন। সুলতান মাহমুদ শারকি দিল্লির দুর্গটি অবরোধ করেন যা বাহলোল লোদীর অনুপস্থিতিতে ইসলাম খানের বিধবা পত্নী বিবি মাট্টার নেতৃত্বে আফগানদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।[৫৫]

৫. অন্যান্য মহিলাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা

সুলতান মাহমুদ শারকির মা বিবি রাজিও ছিলেন একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও গুণান্বিতা মহিলা।[৫৬] সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পরে তিনি আমিরদের

---

৫০. খালজী কালীন ভারত, পৃষ্ঠা-১৭২.

৫১. ইবনে বতুতা (তুঘলুক কালীন ভারত) ভলিউম প্রথম, পৃষ্ঠা-২৩৪; History of the Qaraunah Turks in India by Dr. Ishwari Prasad. P. 310.

৫২. তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী আফিফ (তুঘলুক কালীন ভারত), ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা-৫৬।

৫৩. Ibid., P. 66.

৫৪. নিয়ামতউল্লাহ কর্তৃক অনূদিত 'মাখজান-ই-আফগান', পৃষ্ঠা-৩৬।

৫৫. Ibid., P. 13.

৫৬. Ibid., P. 37; Tabqat. vol. I. P. 342; Ferishta. vol. I. P. 555.

www.pathagar.com

সাহায্য লাভ করেন এবং শাহজাদা ভিখানকে সিংহাসনে বসান। তিনি শারকি শাসনকর্তা ও বাহলোল লোদীর মধ্যে তাঁদের অধিকৃত জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তিতে সফল হন।[৫৭] তিনি জুয়ানপুরের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেন এবং তিনি শাহজাদা হুসাইনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভের সহায়ক হন।[৫৮] শারকি রাজবংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা হুসাইন শাহের রানি মালিকা-ই-জাহানও সমসাময়িক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তাঁর স্বামীকে সুলতান বাহলোলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে প্ররোচিত করেন, যদিও দুইজনের মধ্যে ছিল একটি মৈত্রীচুক্তি।[৫৯]

লোদীর হেরেমের মহিলারাও রাজনীতিতে কম সক্রিয় ছিলেন না এবং বাহলোল লোদীর প্রধান পত্নী শামস্ খাতুন তাঁকে পীড়াপীড়ি করেন যেন সুলতান মাহমুদ শারকির দ্বারা কারারুদ্ধ তাঁর ভাই কুতুবখানের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম গ্রহণ না করেন।[৬০] সুলতান বাহলোলের হিন্দু স্ত্রী বিবি আম্বা এবং পরবর্তীকালে সিকান্দার লোদী নামে পরিচিত নিজাম খানের মা ছিলেন সমানভাবে উচ্চাভিলাষী মহিলা।[৬১]

তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি দেখতে পান যে, তাঁর পুত্র নিজাম খানের সিংহাসনের দাবি বাহলোল লোদীর ভাগ্নে জনৈক ঈসা খান কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এই যুক্তির ভিত্তিতে যে নিজাম খান একজন হিন্দু জননীর সন্তান। বিবি আম্বা খান-ই-খানান নুবানীর নেতৃত্বে একদল আফগান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমর্থন লাভে সফল হন এবং যোগ্যতার সাথে তাঁর পুত্রের সিংহাসনের দাবি তুলে ধরেন।[৬২] তিনি একটি পর্দার আড়াল থেকে তাঁর পুত্রের স্বপক্ষে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেন[৬৩] এবং চূড়ান্তভাবে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে সফল হন।

এইভাবে লোদী বংশের শাসনকালেও সক্রিয় রাজনীতিতে মহিলাদের আগ্রহ অবাধে বিদ্যমান ছিল। তুর্কি ও লোদী সালতানাতের হেরেম প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোঘল আমলে বিকশিত হেরেমের মতো এত বেশি বিস্তৃত ছিল না। সাধারণত উক্ত হেরেম তাদেরকে সেবা ও পরিচর্যা প্রদানকারী ও

---

৫৭. Ibid., P. 37; Ferishta, vol. I. P. 555; Tabqat, vol. I. P. 342.
৫৮. নিয়ামতউল্লাহ কর্তৃক অনূদিত 'মাখজান-ই-আফগান', পৃষ্ঠা-৪৫।
৫৯. Ibid.,
৬০. Ibid., P.38; Tabqat, vol. I, P. 343; Ferishta, vol. I, P. 555.
৬১. Ibid., Tabqat; Ferishta, vol. I, P. 563.
৬২. নিয়ামতউল্লাহ কর্তৃক অনূদিত 'মাখজান-ই-আফগান', পৃষ্ঠা-২৪।
৬৩. Ferishta, vol. I. P. 563.

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানকারী রাজকীয় মহিলা ও তাঁদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ, গৃহভৃত্য, মহিলাভৃত্য, ক্রীতদাস ও নপুংসকদেরকে নিয়ে গঠিত হতো। সুলতানকে সকলের নেতৃস্থানীয় বলে মনে করা হতো এবং হেরেমের সব সদস্য ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ আদেশের অধীন। হেরেমের বাসিন্দাদের জন্য প্রাসাদের মধ্যে বরাদ্দ করা হতো পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত আবাসিক ব্যবস্থা।[৬৪] এমনকি হেরেমের মধ্যেও পর্দাপ্রথা পালিত হতো।[৬৫] সাধারণত সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত একজন হাকিমা ও শাসনকর্ত্রী হেরেমের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি দেখাশোনা করতেন।[৬৬] এছাড়া খাজা সারাকে বহির্ভাগ থেকে হেরেম পরিদর্শন ও রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো।[৬৭] এই পদটি ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং বিশেষত যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে তা প্রদান করা হতো।

সুলতানি আমলে হিন্দু মহিলারাও হেরেমে প্রবেশ করে। গুজরাটের রাইকারান বাঘেলার স্ত্রী কমলাদেবীর সাথে আলাউদ্দিনের বিবাহ হয় এবং তাঁর হেরেম প্রবেশ এই রীতির প্রথম দৃষ্টান্ত চালু হয়।[৬৮] এই দৃষ্টান্তের মতো একইভাবে হিন্দু মহিলাদের সাথে সুলতানদের ও শাহজাদাদের আরও বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন রামচন্দ্র দেবের কন্যাকেও বিবাহ করেন। তিনি রাইকারানের কন্যা দেবল দেবীর সাথে তাঁর পুত্র খিজির খানের বিবাহ দেন।[৬৯] একজন রাজপুত মহিলার গর্ভে ফিরোজ তুঘলুকের জন্ম হয়।[৭০] সিকান্দার লোদীর মাতাও একজন হিন্দু মহিলা ছিলেন।[৭১] কিন্তু হেরেমের মধ্যে এসব নারীর প্রবেশের ঘটনা কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেনি। এ থেকে এই ধারণা জন্মে যে, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অবদমিত করে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদেরকে কোনো ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে দেওয়া হয়নি। সুলতানরা তদবধি মিশ্র সংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

কয়েকজন রাজকীয় মহিলা তাঁদের উদারতা ও মানবপ্রেমের জন্য পরিচিতি লাভ করেন। শাহ তুর্কান তাঁর পরোপকারিতা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য

---

৬৪. কোরেশী কর্তৃক রচিত 'দিল্লি সালতানাতের শাসনব্যবস্থা' পৃষ্ঠা-১৫০।
৬৫. Ibid..
৬৬. বারানি কর্তৃক বিরচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-২১৮।
৬৭. কোরেশী কর্তৃক রচিত 'দিল্লি সালতানাতের শাসনব্যবস্থা', পৃষ্ঠা-১৫০।
৬৮. আমির খশরু কর্তৃক রচিত 'দুভালো রানি খিজির খান' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৭২।
৬৯. ইসামী কর্তৃক রচিত 'ফতুয়াস-সালাতিন' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৭৩।
৭০. আমির খশরু কর্তৃক রচিত 'দুভালো রানি খিজির খান' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৭৩
৭১. আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' (তুঘলুক কালীন ভারত), ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা-৫৪

www.pathagar.com

বিখ্যাত ছিলেন।[৭২] মুহম্মদ তুঘলুকের মাতাও তাঁর উদারতার জন্য জনসাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করেন এবং এই গুণের কারণে তিনি অর্জন করেন সামাজিক উচ্চ মর্যাদা। তিনি বিদেশি পর্যটকদেরকে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা এবং মূল্যবান উপহার দিতেন।[৭৩] তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষিত পণ্ডিতদেরকে উপহারসামগ্রী পাঠানো হতো। তিনি দান খুব পছন্দ করতেন। তিনি অনেক খানকা নির্মাণ করেন যেখান থেকে বিনামূল্যে পর্যটকদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হতো।[৭৪] বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রেও নারীরা তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রাজিয়ার কর্মদক্ষতা প্রমাণ করে যে, তুর্কি বংশের রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কন্যাদেরকে শিক্ষা বিষয়টিতে অবহেলা করেননি। রাজিয়া ছিলেন সুশিক্ষিতা এবং কবি যদিও পর্দাপ্রথার কারণে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান ছিল তথাপি এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।[৭৫] প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসাথে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করত।[৭৬] তারপরে মেয়েদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হতো বা মেয়েস্কুলে পাঠানো হতো।[৭৭] ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসভবনে অবস্থিত স্কুলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে যেত। কখনো কখনো মুসলিম বিধবারা তাদেরকে কোরান শিক্ষা দিত। উচ্চ শ্রেণির মেয়েরা নিজ বাড়িতে ব্যক্তিগত শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে পেশাজীবী শিক্ষিত মহিলা বা প্রধান ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষা লাভ করত।[৭৮] ছেলে ও মেয়ে উভয়কে মক্তবের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হতো এবং তাদেরকে একইভাবে দীক্ষা দেওয়া হতো।[৭৯] অভিযোগ আছে যে, মুহম্মদ তুঘলুকের কারাজল পাহাড় আক্রমণের পিছনে ছিল ঐ দেশের প্রসিদ্ধ মেধাবী গুণান্বিতা নারীদেরকে অধিকারের আকাঙ্ক্ষা।[৮০] মালোয়াতে (১৪৬৯-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান গিয়াসউদ্দিনের অন্দর মহলে অনেক স্কুল শিক্ষিকা ও সংগীত শিল্পী বাস করতেন এবং শিক্ষিত মহিলারা খুৎবা পাঠ করতেন[৮১] এবং এ থেকে প্রমাণিত

---

৭২. নিয়ামতউল্লাহ কর্তৃক অনূদিত 'মাখজান-ই-আফগান', পৃষ্ঠা-২৪।
৭৩. মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত 'তাবকাত-ই-নাসিরি', অনু. ভলিউম, প্রথম, পৃষ্ঠা-৬৩১।
৭৪. ইবনে বতুতা (তুঘলুক কালীন ভারত) ভলিউম প্রথম, পৃষ্ঠা-১৬৬।
৭৫. Ibid., P.34.
৭৬. Promotion of Learning in India by N. N. Law, P. 201.
৭৭. Education in Muslim India by Jafar, P. 85.
৭৮. Ibid., P.192.
৭৯. Ibid., P.85.
৮০. Jafar, PP. 190; Law, P. 200.
৮১. ড. ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক রচিত 'ভারতে তুর্কিদের কোরানিক ইতিহাস', পৃষ্ঠা-১৩২।

www.pathagar.com

হয় যে, সুলতান মেয়েদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতেন। দেবল রানির গুণপনা এটা প্রকাশ করে যে, হিন্দু শাসকরাও তাঁদের কন্যাদেরকে সমানভাবে শিক্ষা দিতে আগ্রহী ছিলেন।[৮২]

শিক্ষা ছাড়াও সংগীত ও নৃত্যের প্রতি নারীদের অনুরাগ ছিল। জালালউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে দু'জন প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিল ফাতুহা ও নুসরাত খাতুন।[৮৩] তাদের ছিল সুরেলা মধুর কণ্ঠ এবং তারা সংগীতে ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। দুক্তার খাসা, নুসরাত বিবি ও মেহের আফরোজ ছিলেন নৃত্য পারদর্শিনী।[৮৪] মেয়েরা তাল নামক একটি সংগীত যন্ত্র বাজাত।[৮৫] তারা এটা তাদের আঙ্গুলের চার ধারে পরত। সংগীতের মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করত।[৮৬] এভাবে মহিলারা সংগীত ও নৃত্য নিয়মিতভাবে চর্চা করত এবং রাজকীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ করত। পোশাকের ব্যাপারে বলা যায় যে, হিন্দুরা দু' রকমের পোশাক পরিধান করত। একটি পোশাক তৈরি হতো সূক্ষ্ম মসলিনের লম্বা চাদর দ্বারা (আধুনিক শাড়ির মতো), ছোট আস্তিনযুক্ত একটি চোলি (ব্লাউজ) এবং বয়ঃপ্রাপ্তা বা বিবাহিতা মেয়েদের জন্য কালো বর্ণের আঙ্গিয়া (বডিস)। অন্য এক প্রকারের পোশাকের মধ্যে ছিল একটি লাহাঙ্গা (দীর্ঘ ঢিলা স্কার্ট), একটি চোলি ও একটি রুপাসিয়া যুক্ত আঙ্গিয়া (দীর্ঘ স্কার্ফ)।[৮৭] দ্বিতীয় পোশাকটি দোয়াব অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল। মুসলমান নারীরা পরিধান করত ঢিলা বহির্বাস, একটি স্কার্ট ও একটি দীর্ঘ স্কার্ফ।[৮৮] এছাড়াও তারা ঘোমটা ব্যবহার করত। প্রাত্যহিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীরা নীল রং বর্জন করত; কারণ এটা ছিল শোক প্রকাশের বর্ণ। নারীরা বেশি পছন্দ করত উজ্জ্বল রং ও ছাপ। এভাবে দেখা যায় যে, এই আমলে নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

ভারতের নারীরা সব সময় অলংকার পছন্দ করত। অলংকার ছিল তাদের সাজসজ্জার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অলংকারাদি ছিল একজন বিবাহিতা ভারতীয় নারীর সোহাগের বৈশিষ্ট্য এবং একজন বিধবাকে অলংকার পরিত্যাগ করতে হতো। মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের অলংকার পরিধান করা হতো। শিসপহল (কপালের জন্য), ঝুমার (মাথার জন্য), কানের

---

৮২. Fenshta, vol. IV. P. 236; Law. P. 201.
৮৩. Ashraf. P. 243.
৮৪. বারানি কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৬।
৮৫. বারানি কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৬।
৮৬. আমির খশরু কর্তৃক রচিত 'দুভালো রানি খিজির খান' (খালজী কালীন ভারত), পৃষ্ঠা-১৭৩।
৮৭. আফিফ কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', পৃষ্ঠা-১৪৪
৮৮. Ashraf. P. 278.

www.pathagar.com

দুল, গলার হার, বালা, বাহুবন্ধনী, আংটি, কোমর বন্ধনী ও পায়েল (পায়ের পাতার জন্য) হলো অলংকারগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম। এই সময়ে প্রচলিত একটি অলংকার হলো নাকের ফুল। মনে হয় যে, এই অলংকারটি মুসলমানদের কাছ থেকে প্রচলনে আনা হয়।[৮৯] মুসলিম ও হিন্দু নারীদের ব্যবহৃত অলংকারের আকার ও নকশা পরস্পর থেকে পৃথক হলেও মূলত সেগুলো ছিল একই রকমের।

গহনাগাটির ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করা ছাড়াও তারা যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করত প্রসাধনসামগ্রীতে। তারা চন্দনের অনুলেপন, মৃগনাভি, সুবাসিত তেল ব্যবহার করত। গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের নারীরা বিভিন্ন অনুলেপন দ্বারা তাদের দেহ সুবাসিত করত। কেশবিন্যাসের প্রতিও উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হতো। সাজসজ্জার উপকরণের মধ্যে ছিল চোখের কাজল, চোখের ভ্রুর জন্য এক প্রকার কালো গুঁড়া, বক্ষদেশের জন্য মৃগনাভি, হাত ও পায়ের জন্য মেহেদি ও ঠোঁটের জন্য পান।[৯০] মনে হয় যে, আগের দিনের মতো এ সময়েও একই রকমের প্রসাধনসামগ্রীর প্রচলন ছিল। বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মনে হয় তারা উচ্চ শ্রেণির নারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত।[৯১] কিন্তু এটা বেশ স্পষ্ট যে, মুসলমানদের আগমনের সময় থেকে বিরাজমান নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার কারণে সাধারণ মেয়েদের অবস্থার পুনরায় অবনতি ঘটে। পর্দাপ্রথা আরও কঠোর হয়, বাল্যবিবাহ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয় এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত জওহারব্রত ও সতীদাহ প্রথা আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[৯২] কখনো কখনো মুসলিম নারীরাও জওহারব্রত পালন করত।[৯৩] ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার লোদি তীর্থস্থানে মহিলাদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে নারীদের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীদের ভাগ্য খুব সুখকর ছিল না।

৬. ভারতে মধ্যম ও নিম শ্রেণির মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা

সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় সমাজে নারীদের মর্যাদায় অনেক বৈষম্য দেখা যায়। তুর্কি শাসনকালে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় নারীরা যে

৮৯. Ibid.
৯০. Altikar, P 302
৯১. Ashraf. P 280.
৯২. Ibid., P.243.
৯৩. Ashraf. PP. 256. 261; Tughlaq Kaleen Bharat, Part I. P. 172.

www.pathagar.com

সম্মানজনক মর্যাদা লাভ করত পর্যায়ক্রমে তার অবনতি ঘটে। পুরাতন ঐতিহ্য অনুসারে সমাজের কতক ক্ষেত্রে তাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ অব্যাহত থাকলেও কিছু লোক তাদেরকে ঘৃণা করত[৯৪] এবং মানুষের মূল্যবোধ পতনের আসল কারণ হিসেবে তাদেরকে দোষারোপ করত।[৯৫] বিশেষ করে একজন হিন্দু মেয়েকে শৈশবকাল থেকেই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে শিক্ষা দেওয়া হতো। তাকে তার স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও মান্য করতে হবে বলে ধারণা দেওয়া হতো।[৯৬] তার কাছে প্রত্যাশা করা হতো যে, সে তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত হবে ; এমনকি তার দুঃখের সময়ও সে তার স্বামীর সেবা করবে।[৯৭] তাকে পতিব্রতা ধর্ম (স্বামীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভক্তি) পালন ও অত্যন্ত পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।[৯৮]

পারিবারিক পরিবেশ ছিল একজন নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। তাকে পরিবারের সমস্ত কাজ করতে হতো।[৯৯] খুব সকালে তাকে শস্য গুঁড়া করতে হতো। তারপর সে নিজে খাদ্য তৈরি করে পরিবেশন করত।[১০০] সে কুয়া থেকে পানি আনতে যেত।[১০১] সে ঘরের মেঝে কাদামাটি দিয়ে লেপন করত ও বাড়িঘর ঝাঁট দিত। অবসরে সে পোশাক তৈরির জন্য সুতা কাটত।[১০২] এভাবে তার সম্পূর্ণ দিন গৃহস্থালি কাজকর্মে অতিবাহিত হতো।

৬. ক) যৌতুক প্রথা

যৌতুক প্রথার কারণে কখনো কখনো মেয়েদের বিবাহ কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দিত। মেয়ের বিবাহের সময় মেয়ের মা-বাবা যৌতুক দিতেন। মণিরত্ন, অলংকার, আসবাবপত্র, হাতি, ঘোড়া, দাসী ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য ছিল যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। এটা পুরাতন প্রথা ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা কঠোর আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা ধনীদের মধ্যে এই প্রথা বেশি প্রচলিত ছিল। ধারণা করা হয় যে, এই প্রথা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না।[১০৩]

---

৯৪. Tuzuk-i-Taimuri (E & D. vol. III), P.426

৯৫. বাউলার কর্তৃক অনূদিত 'মনুর বিধান', পৃষ্ঠা-৮৫।

৯৬. বিজাক, কবির দাস, পৃষ্ঠা-১৮৯; বিষ্ণু মিত্র, পৃষ্ঠাগুলো ৭১-৭৩।

৯৭. রামচন্দ্র কৃষ্ণের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৩৪।

৯৮. রামচন্দ্র কৃষ্ণের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৩৫।

৯৯. দাদু দয়ালের 'দয়াল কা বানী', পৃষ্ঠা-৯৫।

১০০. দোবাইস কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু রীতিনীতি, প্রথা ও উৎসবগুলো', পৃষ্ঠা-৩৪৬।

১০১. লোকসাহিত্যে পরিবারের কাজকর্মে নারীদেরকে দেখা যায়।

১০২. ফিঞ্চের 'ভ্রমণের শুরুতে', পৃষ্ঠা-১৯

১০৩. কে.ভি. উপাদিয়ার সম্পাদনায় 'ভোজপুরি গ্রাম গীত', পৃষ্ঠা-১৫০।

www.pathagar.com

মা-বাবার আর্থিক সংগতি অনুসারে যৌতুকের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। বিদেশি পর্যটকরাও ভারতে প্রচলিত যৌতুক প্রথাটি লক্ষ করেন।[১০৪]

সচরাচর বরপক্ষ যৌতুক গ্রহণ করত। কিন্তু এর বিপরীত কার্যক্রমকেও নাকচ করে দেওয়া যায় না এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে কনের অভিভাবকরাও যৌতুক গ্রহণ করত। এই প্রথাটি প্রধানত বর্তমান উত্তর প্রদেশ ও বিহার প্রদেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রথাটি বিশেষ করে ধনী ও বয়স্ক পাত্ররা যুবতি মেয়েদেরকে যারা বিবাহ করতে ইচ্ছুক তারা অনুসরণ করত। এর সাথে কনেদেরকে অর্থের বিনিময়ে কিনে নেওয়ার প্রথাও দেখা যায়।[১০৫] মনে হয় এই প্রথাটি বাংলা প্রদেশে আরও কঠোরভাবে চালু ছিল[১০৬]। যৌতুকের অংশ হিসেবে কনের ছোট বোনকে কনের সাথে প্রদানের অদ্ভুত প্রথাও বিদ্যমান ছিল।[১০৭]

৬. (খ) বাল্যবিবাহ

মোঘল আমলে জনপ্রিয় সামাজিক বৈশিষ্ট্যরূপে বাল্যবিবাহ দেখা যেত। নয় বা দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই সাধারণত মেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া হতো।[১০৮] হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই কুপ্রথার শিকারে পরিণত হয়। হিন্দুদের মধ্যে মেয়েদেরকে এমনকি কথা বলতে শেখার আগেই কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হতো।[১০৯] মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত খুব অল্প বয়সে কন্যাদেরকে বিবাহ দেওয়া হতো।[১১০]

---

১০৪. আইন-ই-আকবরী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৯।

১০৫. মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১; কারাবী, পৃষ্ঠা-২৪৮; ভি.পি. সিং কর্তৃক সম্পাদিত ভোজপুরি গ্রাম গীত, মি কারান রাম, পৃষ্ঠা-৩৬৮।

১০৬. মানুচী বলেন যে, একজন স্বামীর পক্ষে তার স্ত্রীকে ক্রয় করা কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে যদি বর কনেকে বিবাহ করতে অস্বীকার করত তবে সে অর্থ পেত না এবং যদি কনে বিবাহে অস্বীকৃতি জানাত তবে কনের পিতামাতাকে দ্বিগুণ অর্থ ফেরত দিতে হতো। মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫.

১০৭. টি.সি. দাসগুপ্তের 'বাঙ্গালী সমাজের রূপরেখা' পৃষ্ঠা-৪; কে দত্ত রচিত 'বাংলা সুবার ইতিহাস' পৃষ্ঠা-৭১।

১০৮. টি.সি. দাসগুপ্তের 'বাঙ্গালী সমাজের রূপরেখা', পৃষ্ঠা-৩।

১০৯. আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭; আবুল ফজল লিখেছেন, 'আকবর বয়প্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত নর-নারীর বিবাহকে ঘৃণা করতেন।' ফিঞ্চের ভ্রমণের শুরু, পৃষ্ঠাগুলো-১৬, ১৯। উইদিংটনের ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-২২১। পিলসার্ট লিখেছেন, 'হিন্দুরা মাত্র চার-পাঁচ বছর বয়সে তাদের সন্তানদের বিবাহ দিত।' পীলসার্ট পৃষ্ঠা-৮৪; ড. ভি. পি. সিং কর্তৃক সম্পাদিত 'ভোজপুরি গ্রাম গীত', মি কারান রাম, পৃষ্ঠা-৪০৪.

১১০. মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৯। তিনি আরও লিখেছেন যে ব্রাহ্মণ মেয়েদের বিবাহের স্বাভাবিক বয়স ছিল চার বা পাঁচ বছর এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখা যেত, কিন্তু কখনো তার বেশি নয়।

www.pathagar.com

৬. (গ) সন্তান প্রসব

বিদেশি পর্যটকরা আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষ করেন যে, সাধারণ ভারতীয় মহিলারা সন্তান প্রসবের ব্যাপারটি খুব সহজভাবে দেখত। শিশুর জন্মের ঠিক পরের দিনই মায়েদেরকে চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে দেখা যেত। ভ্রমণপথে সন্তান প্রসব করলে তারা পরের দিন শিশুসন্তানসহ ঘোড়ার পিঠে চড়ত।[১১১] কিন্তু এই ব্যাপারটি কার্যত ঘটত শুধু গরিব শ্রমজীবী স্ত্রীদের ক্ষেত্রে।

৬. (ঘ) সতীদাহ প্রথা

একজন হিন্দু মহিলার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল তাঁর স্বামীর মৃত্যু। মোঘল আমলে কিছু নিম্ন শ্রেণি ব্যতীত হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ অনুমোদিত ছিল না।[১১২] একজন বিধবাকে স্বামীর মৃতদেহের সাথে আগুনে আত্মাহুতি দিতে হতো বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যের অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার সহ্য করে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করতে হতো।[১১৩] যে সমস্ত বিধবা সতীদাহ প্রথা পালন করত না, সমাজ তাদেরকে উপেক্ষা করত।[১১৪] তাদেরকে মাথার চুল বড় রাখা, অলংকার ও ভারী পোশাক পরিধানের অনুমতি দেওয়া হতো না।[১১৫] বৈধব্যকে বিগত জন্মের পাপের শাস্তি বলে গণ্য করা হতো।[১১৬] স্বেচ্ছায় সতীদাহ প্রথা পালন করা ছিল একটি প্রাচীন প্রথা,[১১৭] কিন্তু ধীরে ধীরে স্বামীর মৃত্যুর পর এমনকি মহিলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতীদাহ প্রথা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।[১১৮] এটা প্রধানত পালন করা হতো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বার্নিয়া সম্প্রদায়ের মহিলাদের দ্বারা। মোঘল আমলে ভারত ভ্রমণকারী সকল পর্যটক উল্লেখ করেছেন যে, মহিলারা তাদের স্বামীর মৃতদেহের সাথে আগুনে আত্মাহুতি দিত।[১১৯] তারপরও অনেক মহিলা সতীদাহ প্রথা পালনে অস্বীকৃতি

---

১১১. কেরারী বিশেষভাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে বলেছেন, 'ভারতীয় মুসলমানরা খুব কম বয়সে বিবাহ করত, কিন্তু হিন্দুরা যেকোনো বয়সে বিবাহ করত বা বিবাহ দিত।' কেরারী, পৃষ্ঠা-২৪৮।

১১২. টেরীর ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-৩০৯; থিভিনট, পৃষ্ঠাগুলো-৬৬, ১১৮; কেরারী, পৃষ্ঠা-২৪৮।

১১৩. বাদাউনি, ২য় খণ্ড (হড়বি), পৃষ্ঠা-৩৬৭; থিভিনট, পৃষ্ঠা-১১৯; কেরারী পৃষ্ঠাগুলো-২৫৬-৫৭; কেরারী বলেন যে দুধ ব্যবসায়ী, বাগানের মালী, ধোপা, জেলে ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা তাদের বিধবা মহিলাদেরকে পুনরায় বিবাহ করতে অনুমতি দিত।

১১৪. মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০; থিভিনট, পৃষ্ঠা-৮৪.

১১৫. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-৩১৪; থিভিনট, পৃষ্ঠা-৮৪, স্টাভারনিয়াম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৪৪০-৪১।

১১৬. উইদিংটন এর ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-২১৯; মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১।

১১৭. পেট্রডেলাভেলী, পৃষ্ঠা-৪৩৫; বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-৩১৪।

১১৮. কেরারী পৃষ্ঠা-২৫০

১১৯. বার্নিয়ার বর্ণনা করেন যে, ১২ বছরের একজন বিধবাকে বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা পালন করতে বলা হয়েছিল। বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো-৩১৩-১৪।

www.pathagar.com

জানাত।[১২০] বিশেষ করে রাজপুতনায় মহিলারা সতীদাহ প্রথার মতো জওহরব্রত পালন করত। যখন একজন রাজপুত সমরনায়ক ও তাঁর সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতো তখন তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে হত্যা করত অথবা তাদেরকে ঘরে তালাচাবি দিয়ে আবদ্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে মেরে ফেলত এবং তারপরে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করত।[১২১]

কয়েকজন মোঘল সম্রাট এই প্রথা বাতিল করতে চেষ্টা করেন। কথিত আছে যে, আকবর এই মর্মে আদেশ জারি করেন যে, কোনো মহিলাকে দিয়ে বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা পালন করানো যাবে না।[১২২] কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীরও সতীদাহ প্রথা বাতিল করেন। বিশেষ করে যুবতি বিধবাদের ক্ষেত্রে এটা সম্রাটের অনুমতি ছাড়া করা যেত না।[১২৩] ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব

---

১২০. উইলিয়াম ফিন্স (১৫৮৩-৯১) সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে বলেন যে, স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী একা হওয়ায় স্বামীর সাথে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। যদি সে তা না করত তবে তার চুল কেটে দেওয়া হতো এবং তার সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কোনো খোঁজখবর নেয়া হতো না। ভ্রমণের শুরুতে ফিন্স, পৃষ্ঠাগুলো-২০, ২২; উইদিংটন সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ করে দশ বছরের কম বয়স্কা একজন বিধবার কথা বলেছেন। ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-২১৯, হাউকিন্সের ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-১১৯; ভিলেট বলেন, 'যখন স্বামী মারা যেত তখন তার বিধবা স্বেচ্ছায় চিতায় উপরে লাফ দিয়ে উঠত এবং স্বামীর মৃতদেহের সাথে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যেত এবং এটা সুবিদিত বাস্তব ঘটনা।' পৃষ্ঠা-৮৭-৮৮; পিলসার্ট মন্তব্য করেন, 'যখন রাজপুত পুরুষ মারা যায় তখন তার স্ত্রীগণ স্বেচ্ছায় আগুনে জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এই প্রথাটি বার্নিয়া ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে চালু ছিল এবং এ ধরনের ঘটনা আগ্রাতে সপ্তাহে দুই বা তিন বার সংঘটিত হতো।' পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯; মানুচী একথাও বলেন যে, একদা তিনি তার আমেরিকার তরুণ বন্ধুর সাথে থাকা অবস্থায় একজন বিধবাকে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাকে বিবাহ করেন। ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০। বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো-৩০৩-৫৩।

১২১. পীলসার্ট বলেন, 'এমন শত শত হাজার হাজার মহিলা ছিল যারা সতীদাহ প্রথা পালন করত না।' পৃষ্ঠা-৮০। বার্নিয়ার বলেন, 'এই প্রথা পালনকারীদের সংখ্যা অতিরিক্ত এবং এর শিকার মহিলার সংখ্যা আগের তুলনায় বর্তমানে কম। এই দেশের শাসক মুসলমানগণ এই বর্বরোচিত প্রথা দমনের জন্য সবকিছু করেছেন।' পৃষ্ঠা-৩০৬.

১২২. আবুল ফজল চিতোরের রাজপুতদের পতনের সময় এই আত্মঘাতী সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন, 'কারণ এটা হলো একটা ভারতীয় প্রথা যখন উহাতে একটা দুর্যোগ ঘটে তখন যতটা সম্ভব বেশি করে চন্দন কাঠ, ঘৃতকুমারী গাছের কাঠ ইত্যাদি স্তূপীকৃত করা হয় এবং জ্বালানি কাঠ ও তেলের সাথে তা সংযোজিত করা হয়। তারপরে তারা পাষাণ হৃদয়ের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে তাদের মহিলাদেরকে রেখে যায়। পরাজয় যখন নিশ্চিত হয়ে যায় এবং পুরুষরা নিহত হলে এসব একগুয়ে লোকেরা নির্দোষ মহিলাদের আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলে।' বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবর নামা', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭২।

১২৩. বাদাউনি বলেন, 'যদি কোনো হিন্দু মহিলা তার স্বামীর সাথে আগুনে আত্মাহুতি দিতে চায় তবে তারা বাধা দিবেন না; কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক তা করতে দেওয়া হবে না।' বার্নিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৮।

www.pathagar.com

সতীদাহ প্রথা বাতিল করে একটি আদেশ জারি করেন।[১২৪] তথাপি নিঃসন্তান বিধবাদেরকে সতীদাহ প্রথা পালন করার অনুমতি দেওয়া হতো, কিন্তু সন্তান আছে এমন বিধবাদেরকে এই অনুমতি দেওয়া হতো না।[১২৫] এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মোঘল শাসনামলে সতীদাহ প্রথা পুরাপুরি দমন করা যায়নি।

৬. (ঙ) পর্দাপ্রথা

প্রধানত মুসলমান মহিলারা পর্দাপ্রথা পালন করত এবং হিন্দু মহিলাদের মধ্যে তেমন কঠোর পর্দাপ্রথা ছিল না।[১২৬] নিষ্ঠাপূর্ণভাবে বোরখা পরিধান ছিল মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। ভারতে তুর্কিদের আগমনের সাথে সাথে বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে সম্মান রক্ষা করার জন্য হিন্দু মহিলারাও তা রক্ষণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে।

ধারণা করা হয় যে, শাসকশ্রেণিকে পর্দাপ্রথার প্রবণতা অনুকরণ করতে মদদ জোগাত। সমসাময়িক বিদেশি পর্যটকদের বিবরণে পর্দাপ্রথা পালনের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়।[১২৭] প্রধানত ধনী ও স্বচ্ছল শ্রেণির মধ্যে পর্দাপ্রথা সীমাবদ্ধ ছিল।[১২৮] বিশেষ করে গ্রামের গরিব মহিলারা মাঠে মাঠে কাজ করত এবং তারা পর্দাপ্রথা পালন করতে পারে না।[১২৯]

---

১২৪. উইদিংটন এর ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-২১৯; কিন্তু এই আদেশ সর্বদা মান্য করা হতো না এবং জাহাঙ্গীর আগ্রায় সতীদাহ প্রথা দমন করতে পারেননি। হকিন্সের ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-১১৯।

১২৫. মানুচী বলেন, 'আওরঙ্গজেব এই মর্মে একটি আদেশ জারি করেন যে, মোঘলদের নিয়ন্ত্রণে কোনো রাজ্যে সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আর কখনো কোনো মহিলাকে আগুনে পুড়ে মরতে অনুমতি দিবেন না।' মানুচী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৭।

১২৬. মানুচী বলেন, 'বংশধারা রক্ষার্থে একজন রাজপুত রাজার নিঃসন্তান প্রধান পত্নীকে সতীদাহ প্রথা পালনের অনুমতি প্রদান করে না।' মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৬.

১২৭. ডিলেট, পৃষ্ঠা-৮১; মানুচী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২।

১২৮. ডিলেট লিখেন, 'গরিব বা অভদ্র প্রকৃতির মুসলমান মহিলা না হলে জনগণের নিকটে আসে না। তারা মাথায় ঘোমটা দেয়...' পৃষ্ঠা-৮০। পেট্রোডেলাভেলী বলেন, 'মুসলমান মহিলারা অসৎ বা গরিব না হলে বাহিরে আসে না।' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪-৪৫। তিনি আরও বলেন যে, এমনকি মুসলমানরা তাদের উপস্থিতি ব্যতীত তাদের স্ত্রীদেরকে তাদের আত্মীয়দের সাথে কথা বলার অনুমতি দিত না। পৃষ্ঠা-৪৩০। আরও ট্যাভারনিয়ারের বর্ণনায়, পৃষ্ঠা-১৮১। মানুচীর মতে, মুসলমানদের মধ্যে একজন স্ত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদি সরাতে বাধ্য হলে তা পরিবারের জন্য এক বিরাট অসম্মান। ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫। থিভিনট বলেন, এই ভারতীয় নারীরা যদি প্রতিমা পূজক হয় তবে তারা মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখে এবং মুসলমান হলে ঘোমটা দিয়ে রাখে। পৃষ্ঠা-৫৩। কেরারী মন্তব্য করেছেন, 'মুসলনাম মহিলারা অসভ্য ও অসৎ চরিত্রের না হলে তারা জনসাধারণের সামনে আসে না। তারা তাদের মস্তক আবৃত রাখে....।' পৃষ্ঠা-২৪৮। হ্যামিলটন লিখেছেন, 'বাইরে যাওয়ার সময় মুসলমান মহিলারা

www.pathagar.com

৭. মহিলাদের ভূমিস্বত্ব অধিকার

কতিপয় মহিলা জমিদারি মালিকানা স্বত্ব ও জমির মালিক ছিলেন। তাঁদের ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ, বিক্রয় ও হস্তান্তরের স্বাধীনতা।[১৩০] জনৈক মোহন সিংয়ের বোন সাভানু তাঁর গ্রাম দেবীদাসপুরকে ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রয় করেন।[১৩১]

ভিকান নামক অন্য একজন মহিলা ছিলেন বাঈভুরা ও বাঈভুরী দুটি গ্রামের মালিক ১৬৭২ খ্রিষ্টাব্দে।[১৩২] অনুরূপ নথিপত্রে সমসাময়িক আরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[১৩৩] এই আমলে জারিকৃত অনেক ফরমানের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মহিলারা জমি, বাগান ও সরাইখানার মালিক ছিলেন। ভাকিল ইনায়েতুল্লাহর স্ত্রী রাখি বিবির পক্ষে মীর গোলাম হায়দারের কাছে একটি জমি বিক্রি করেন।[১৩৪] বিবি সুখি কিলাকুলির বাইরে দুইশত রুপির বিনিময়ে একটি জমি বিক্রি করেন। আব্দুর রাজ্জাক তার পক্ষে এর অনুলিপি তৈরি করেন।[১৩৫] শেখ সাদুল্লাহ তার মা বিবি সাবার পক্ষে কোল নিবাসী শেখ মোহাম্মাদ ইউসুফের কাছে একশত এক টাকার বিনিময়ে পাঁচ বিঘার একটি বাগান বিক্রি করেন।[১৩৬] আব্দুর রাজ্জাক তার মা সাখির পক্ষে দুইশত টাকায় একটি সরাইখানা বিক্রি করেন।[১৩৭] কিছুসংখ্যক মহিলা মদদ-ই-মাশ এর মতো ভূমির মঞ্জুরিও লাভ করেন।[১৩৮]

সর্বদা যায় বোরখা পরে।' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৩। বারবোসা বলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের তিন বা চারজন পত্নী থাকে। তারা তাদেরকে সযত্নে বাড়িতে আবদ্ধ করে রাখে। বারবোসা ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৭। বাউরি লিখেন যে, বাঙ্গালীরা তাদের পত্নী ও উপপত্নীদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিত না। তারা তাদেরকে রাখত খোজা প্রহরীদের দায়িত্বে। বাউরি, পৃষ্ঠা-২০৭। এমনকি বাদাউনি এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন যে, 'যদি কোনো যুবতি মহিলাকে গলিতে বা বাজারে বিচরণ করতে দেখা যেত এবং সেই সময়ে ঘোমটা না দিত তবে তাকে গণিকালয়ে যেতে হতো এবং তাকে অবলম্বন করতে হতো এই পেশা।' বাদাউনি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৬।

১২৯. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-৪১৩; পেট্রোডেলাভেলী, পৃষ্ঠা-৪৬১; পি. এন. চোপরা কর্তৃক লিখিত 'মোঘল আমলের সমাজ ও সংস্কৃতি', পৃষ্ঠা-১০৪.

১৩০. ডিলেট, পৃষ্ঠা-৮১।

১৩১. ইরফান হাবিবের লেখা, 'আগ্রার নিয়মে মোঘল ভারত', পৃষ্ঠা-১৫৫।

১৩২. উত্তরপ্রদেশ নথিপত্র অফিস, এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশের সিংহাসন আরোহণের খতিয়ান, গবেষণা পরিষদ, নথিপত্র নং- এস. ১২১৫ এবং ১২১৬, ড. ইরফান হাবিব কর্তৃক লিখিত মোঘল ভারতে আগ্রার নিয়মে চলত বলে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা-১৫৫।

১৩৩. Ibid., পৃষ্ঠা-১৫৫।

১৩৪. Ibid.,

১৩৫. ফরমান নং- ২ (১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) আজাদ গ্রন্থাগার, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, এটি একটি বিক্রয়ের দলিল

১৩৬. ফরমান নং- ২২ আজাদ গ্রন্থাগার। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৭. ফরমান নং গুলো- ৪৯, ৫৭, আজাদ গ্রন্থাগার, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৮. Ibid., পৃষ্ঠা-১৫।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪১ তম বছরে ইলাহী গজ দ্বারা সত্তর বিঘা জমি কোল পরগনাতে পরিমাপ করা হয় এবং মদদ-ই-মাস হিসেবে খাতুনকে দেওয়া হয়।[১৩৯] তাছাড়া একই পরগনাতে পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি মাহামকে দেওয়া হয়।[১৪০] আচি বিবি ছিলেন মদদ-ই-মাস হিসেবে আঠারো বিঘা পাকতা জমির মালিক (১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে)।[১৪১] ফারুক শিয়ারের রাজত্বকালে কোল পরগনাতে পঁচাশি বিঘা জমি মদদ-ই-মাস নামক রাজকীয় দান হিসেবে আয়েশা নামে একজন মহিলাকে দেওয়া হয়।[১৪২]

জালালি পরগনাতে দুই বিঘা জমি মদদ-ই-মাস হিসেবে শাহ বিবি নামক অন্য একজন মহিলাকে প্রদান করা হয়।[১৪৩] মোঘল ফরমানগুলোত এমন অনেক উল্লেখ আছে যা থেকে মদদ-ই-মাসরূপে মহিলারা জমির মালিক ছিলেন বলে প্রমাণিত।[১৪৪]

৭. (ক) ধর্ম

হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের জীবনে ধর্মের প্রাধান্য ছিল। একজন হিন্দু মহিলা বিভিন্ন প্রকার উপবাস ব্রত পালন ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করত। আর একজন মুসলমান মহিলা তদ্রূপ কোরান পাঠ, নামাজ আদায় ও রোযা করত। তারা উভয়ে বিপুল উৎসাহে ধর্মীয় উৎসব পালন করত। কিছুসংখ্যক মহিলা পুরোপুরি ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করত এবং সন্ন্যাসিনী বা সুফি ব্যক্তিতে পরিণত হতো। এঁদের মধ্যে শেখ ফরিদউদ্দিনের বোন ফাতেমা সায়মান ছিলেন এবং নিজামুদ্দিন আওলিয়ার মা বিবি জুলেখা ছিলেন।[১৪৫] তামাক বিক্রয়কারিণী অন্য একজন মহিলা বিবি নাওনি

---

১৩৯. মদদ-ই-মাস ছিল একটি দান কার্য। এটা শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণ ও দুস্থ ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হতো যাঁরা কাজ করতে অক্ষম এবং সদ্বংশজাত মহিলারা এই দান লাভ করত। আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮-৯. আবুল ফজল বলেন, ইরানি ও তুরানি মহিলারা অর্থ মঞ্জুরি লাভ করত। জাহাঙ্গীরের বাবার একজন বিশিষ্ট বোন ছিলেন মহিলাদের অর্থ মঞ্জুরির দায়িত্বে। তুযুক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬। মহিলাদের অধিকারভুক্ত চাষার মোছাম্মতি ও পুরুষদের অধিকারভুক্ত মোজাখারাতি নামক দুই রকম জমির কথা উল্লেখ রয়েছে এবং তা ইরফান হাবিব লিখিত আগ্রার নিয়মে মোঘল ভারত, পৃষ্ঠা-৭০৭।

১৪০. ফরমান নং ২১২, আজাদ গ্রন্থাগার, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪১. Ibid.. পৃষ্ঠাগুলো-২১৩, ২২০।

১৪২. Ibid.. পৃষ্ঠা-১৭৬ (১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে)।

১৪৩. ফরমান নং ১৯৫, আজাদ গ্রন্থাগার, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৪৪. ফরমান নং ১৯৬, আজাদ গ্রন্থাগার, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪৫. Ibid.. নম্বরগুলো ১৯৮, ২০১, ২০৫, ২০৭, ২০৯, ২১৬-২১২, ২২৩-২২৫, ২৩৮, ২৪৬, ও ২৫৫।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে সুফিতত্ত্বের উপর সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন।[১৪৬] গুরু গোবিন্দ সিংয়ের হেরেমের একজন মহিলা তার নিজস্ব একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিখ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা তার মঠে যোগ দিতে আসেন।[১৪৭] এভাবে বোঝা যায় যে মহিলারাও অধ্যাত্মিক সাধনায় রত হতেন এবং তারা যোগিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।[১৪৮]

৭. (খ) শিক্ষা

সাধারণ মহিলাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বেশি শিক্ষা লাভ করত না। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মেয়ে বিদ্যালয়ে যেত এবং বয়স্কা নারীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিগত শিক্ষা নিকেতনে যেত।[১৪৯] কখনো কখনো মেয়ের বাবাও শিক্ষাদানের কাজ করতেন।[১৫০] মসজিদের মৌলবি ও পাঠশালার পণ্ডিতদের দ্বারা সংগৃহীত এবং প্রশিক্ষিত খুব কমসংখ্যক মেয়ে ব্যতীত গরিব পরিবারের মেয়েরা প্রায় অশিক্ষিত অবস্থায় থাকত।[১৫১] প্রধানত শিক্ষাদানের বিষয় ছিল সূচিকর্ম, নকশাশিল্প, রান্না ও গৃহকর্মের মতো গার্হস্থ্য বিষয়ভুক্ত শিক্ষা।[১৫২] মোট কথা, সাধারণ নারীদের শিক্ষার প্রসার ছিল না। তাদের জন্য নিয়মিত ও পৃথক বিদ্যালয় ছিল না। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা একসাথে লেখাপড়া করত কিন্তু প্রচলিত কঠোর পর্দাপ্রথার কারণে

---

১৪৬. চান্ডারম্যান খেয়াখা কর্তৃক রচিত 'চাহার গুলশান', পৃষ্ঠা-২৮ a.

১৪৭. একদা শাহনাগা নামে একজন সন্ন্যাসী তার দোকানের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে কিছু তামাক দিলেন। তিনি যখন দোকান থেকে চলে যান বিবি নওনি তখন এক বিস্ময়কর অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি সেই যোগীকে অনুসরণ করে তার আশ্রমে উপস্থিত হন। যোগী খুব রাগান্বিত হয়ে তাকে চলে যেতে বলেন, কিন্তু তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেননি এবং কয়েক দিন পরে তিনি অধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেন এবং অধ্যাত্মিকতার উচ্চতম মর্যাদা লাভ করলেন।

১৪৮. Ibid., পৃষ্ঠা-১৫০.

১৪৯. একটি চিত্রকর্মে একজন যোগিনীকে রাজদরবারের মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। পৃষ্ঠা-১৭২। অন্য একটি চিত্রকর্মে বর্ণিত আছে যে, একজন যোগিনী তার সঙ্গীকে নিয়ে বসে আছেন এবং একজন মহিলা দুই হাত জোড় করে তাকে কিছু একটা দিচ্ছেন। যোগিনী একটা পাগড়ি পরে আছেন এবং একটি জপমালা হাতে নিয়ে নেংটি পরে বসে আছেন।

১৫০. ইউসুফ হোসাইন কর্তৃক রচিত 'মধ্যযুগে ভারতে শিক্ষাগত পদ্ধতি', ইসলামের সংস্কৃতি, ভলিউম ৩০, ১৯৫৬) পৃষ্ঠা-১২২। ইউসুফ হোসাইন কর্তৃক রচিত 'মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব,' পৃষ্ঠা-৯৩।

১৫১. যদুনাথ সরকারের 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠাগুলো- ৩০১-২।

১৫২. Ibid., জাফর, পৃষ্ঠা-৮।

www.pathagar.com

মনে হয় তাও সম্ভব হতো না।[১৫৩] তাছাড়া অল্প বয়সে বিবাহ প্রথার কারণে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হতো।[১৫৪]

৭. (গ) সাহিত্যিক কার্যাবলি

মোঘল আমলে সাধারণ নারীদের শিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত হলেও অনেক মহিলা সাহিত্যকর্মে অত্যন্ত আগ্রহী হন। তারা শুধু সেই আমলের কবিদের অনুপ্রেরণা ছিলেন না, এমনকি তারা তাদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা সমসাময়িক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। সমকালীন হিন্দি সাহিত্যের নিবিড় সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে, সাহিত্যক্ষেত্রে মহিলাদের গুণগত বেশ সমৃদ্ধ অবদান ছিল।

আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে মোঘল আমলের মহিলা সাহিত্যিকদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যথা– (১) ভক্তি চেতনা দ্বারা প্রভাবিত রাম বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ মহিলা কবি ; (২) অলংকার ও ছন্দরীতিতে নারীর দৈহিক সৌন্দর্যে অনুরাগী সমকালীন ধারায় প্রভাবিত মহিলা কবি; (৩) বহুমুখী বিষয়ের ওপরে লিখিত মহিলা কবি। যাহোক তাদের অধিকাংশই ধর্ম থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং তাদের পছন্দ মতো ঐশ্বরিক রূপের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কবিতা রচনা করেন।

৮. সন্ন্যাসিনী কবিগণ

কিছুসংখ্যক মহিলা কবি নির্গুণ ভক্তির দ্বারাও প্রভাবিত হন। তাদের আলোচিত বিষয় ছিল সাধারণত গুরুর আবশ্যকতা, প্রসিদ্ধ সাধকদের প্রশংসা করা, জ্ঞানের আবশ্যকতা ইত্যাদি। তাদের আবেগের প্রকাশভঙ্গি ও অনুভূতি ছিল চমৎকার কিন্তু সাধারণত তারা উপদেশমূলক কবিতা লিখতেন। সন্ন্যাসিনী কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ রয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে খ্যাতি অর্জনকারিনী প্রাণনাথের পত্নী ইন্দ্রামতির নাম এবং তিনি ১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে কিছুসংখ্যক মন্ত্র রচনা করেন।[১৫৫]

আকবরের আমলে কিছু সন্ন্যাসিনী কবি খ্যাতি লাভ করেন। হিতজির দুইজন শিষ্যা গঙ্গা ও যমুনা এই সময়ের কবি। এই একই ধারার অন্য কবিরা

---

১৫৩. পি. এন. ওঝা কর্তৃক সম্পাদিত 'উত্তর ভারতীয় সমাজ জীবনের কিছু অভিমত', পৃষ্ঠা-১১০।

১৫৪. মানুচী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫; জেমস টডের রচিত 'রাজস্থানের ভাস্কর্য ও বর্ষকীর্তি' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭১২

১৫৫. ঐ, পৃষ্ঠা-২০০।

www.pathagar.com

হলেন কালমাসী দেবী, রানি রারধারী ও নাভলা দেবী ;[১৫৬] কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এই ধারাটি পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের মধ্যে চরণদাসের শিষ্যা দয়াবাঈয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি তার কবিতা রচনা করেন। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে দয়াবাঈ ও বিনয়মালিকা রচনার দুটি ধারা এখনও পাওয়া যায়।[১৫৭] দয়াবাঈয়ের সমসাময়িক একজন কবি হলেন চরণদাসেরই শিষ্যা সাজোবাঈ। তার অন্যতম লভ্য সাহিত্যকর্ম 'সহজ প্রকাশ' গ্রন্থে তিনি একজন সৎ গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও একজন সন্ন্যাসীর গুণাবলি সম্বন্ধে লিখেন।[১৫৮]

৮. (ক) কৃষ্ণ মার্গের মহিলা কবিরা

সগুণ ভক্তির দুটি ধারা ছিল কৃষ্ণ মার্গ ও রাম মার্গ। কিছুসংখ্যক মহিলা কবি ভগবান_কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট হন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন তাদের প্রভুর প্রশংসায় চমৎকার কবিতা রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মীরাবাঈ ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত খ্যাতি অর্জনকারিণী। উদয়পুরের শাসনকর্তা কুম্ভের সাথে তার বিবাহ হয়।[১৫৯] মীরা ভগবান কৃষ্ণের একজন বড় ভক্ত ছিলেন এবং তিনি তার প্রভুর প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন। মীরার বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম যেমন 'নরসী-জী কা মাহরা; গীতা গোবিন্দ কা টীকা; রাম গোবিন্দ গর্ভগীত, স্ফুতাপদ এবং মিরা কা পদ' আজও দেখতে পাওয়া যায়।[১৬০] তার কবিতাগুলো সহজ সরল এবং প্রায়ই সংগীতের মতো গাওয়া হয়। এগুলো রাজস্থান, ব্রাজ ও গুজরাটি ভাষায় রচিত হয়েছে।

এই ভাবধারার আর একজন মহিলা কবি হলেন বাবরি সাহেব এবং তিনি ছিলেন আকবরের সমসাময়িক। তিনি ছিলেন ভয়ানন্দের শিষ্যা এবং ঈশ্বরের প্রতি অতিশয় ভক্তির কারণে তিনি ছিলেন বাবরি (পাগল) নামে পরিচিত। তিনি অনেক পদ রচনা করেন এবং হিন্দি ও উর্দু ভাষাতে তার ভালো দখল ছিল।[১৬১]

---

১৫৬. যদুনাথ সরকারের 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠা- ৩০১।

১৫৭. সিনহা, পৃষ্ঠা-৮৩।

১৫৮. রাশেলের সাহিত্য প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১০৮।

১৫৯. সিনহা, পৃষ্ঠা-৬৭।

১৬০. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-৫১-৫২।

১৬১. Ibid., পৃষ্ঠা-১০৫।

www.pathagar.com

কৃষ্ণমার্গের তৃতীয় মহিলা কবি ছিলেন গঙ্গাবাঈ। তিনি মথুরার সন্নিকটে মহাবনে বাস করতেন এবং তিনি ছিলেন ভিত্তাল দাসের শিষ্যা।[১৬২] তার জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায়নি। তিনি কৃষ্ণের বাল্যরূপের আরাধনা করতেন। তিনি 'গঙ্গাবাঈ কা পদ' নামে একটি স্বাধীন সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। পুষ্টিমার্গীয় সন্ন্যাসীদের সংগৃহীত সাহিত্যকর্মের মধ্যে তার পদাবলি দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বিখ্যাত মহিলা কবি সানুকুমারী ছিলেন এই শ্রেণিভুক্ত। তিনি ছিলেন অম্বর পরিবারের শাহজাদি। তিনি 'স্বরনবেলিকা কবিতা' নামে একটি সাহিত্যকর্ম রচনা করেন।[১৬৩] সপ্তদশ শতাব্দীর তাজ ছিলেন এই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত মহিলা কবি। তার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। তিনি কারুলি গ্রামে বাস করতেন।[১৬৪] মুসলমান হলেও তিনি কৃষ্ণের আরাধনা করতেন। তিনি ব্রজভাষাতে অনেক কবিতা রচনা করেন। মীরাবাঈয়ের পরবর্তী স্তরে তার সাহিত্যকর্ম স্থান পেয়েছিল।[১৬৫] এভাবে কৃষ্ণ মার্গের বহু সংখ্যক কবি খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের সাহিত্যকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ভগবান কৃষ্ণের প্রতি বহুধা ভক্তি। সাহিত্যের দিক থেকে তারা পুরোপুরি সফল ছিলেন এবং মীরাবাঈ ও তাজের মতো কয়েকজন অনুরূপ উচ্চমর্যাদা লাভ করেন।

৮. (খ) রাম মার্গের মহিলা কবিগণ

রাম মার্গের কাব্যক্ষেত্রে শুধু একজন মহিলা কবিকে দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয় যে অনুভূতি প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কৃষ্ণ মার্গের মতো এই রাম মার্গটি জনপ্রিয় ছিল না। রামকে মর্যাদাবান পুরুষোত্তম বলে দেবতার মতো ভক্তি করা হতো এবং তাই রামের ক্ষেত্রে অনুভূতি প্রকাশে কিছু নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হতো। রাম মার্গের একমাত্র মহিলা কবি হলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের লেখিকা মাধুর আলি। মধুকর শাহ যখন উড়িষ্যা রাজ্যটি শাসন করতেন তখন তিনি সেখানে বাস করতেন।[১৬৬] এটা একেবারেই বিস্ময়কর যে, সমস্ত জৌলুসপূর্ণ পরিবেশে তিনি শৃঙ্গার প্রীতি বেশি পছন্দ করতেন। রাম চরিত ও গণেশ দেব লীলা তার সাহিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর একটিও এখন পাওয়া যায় না।

---

১৬২. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-১৩১-১৩২

১৬৩. দ্বিভেদী কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দি সাহিত্য', পৃষ্ঠা-১৪০।

১৬৪. সিনহা, পৃষ্ঠা-১৫৮।

১৬৫. Ibid., পৃষ্ঠা-১৬৩

১৬৬. Ibid., পৃষ্ঠা-১৮৬

www.pathagar.com

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাতেও চন্দ্রাবতী নামক একজন মহিলা কবি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি বংশী দাসের কন্যা। মৌলিকত্ব ও কাব্যিক সৌন্দর্যের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ একটি রামায়ণ পদাবলি রচনা করেন।[১৬৭]

৯. কাব্য প্রকরণের মহিলা কবিগণ

মোঘল আমলে এক প্রকার হিন্দি কাব্যধারার অগ্রগতি সাধিত হয়। এর প্রবণতা ছিল কাব্যশৈলীর ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং বিস্তারিত পূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা। এই প্রথার অনুসারীগণ পরিচিত হন চারণ কবি হিসেবে। কয়েকজন মহিলাও এর প্রতি আকৃষ্ট হন ; বিশেষ করে এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যগত দিকটির প্রতি যা 'শৃঙ্গার কাব্য' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে পারভীন রাইপাত্তুর, রূপমতি, তিন তারাং ও রাঙ্গা রিজিন উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তারা সকলে খ্যাতি লাভ করেন। পারভিন রাইপাত্তুর পেশাগতভাবে একজন গায়িকা ও নর্তকী ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রজিতের রাজদরবারে তার শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করেন। রাজা ইন্দ্রজিৎ ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি নিজেও ছিলেন সংগীতে দক্ষ।[১৬৮]

কথিত আছে যে, রাই পারভিন তার স্বরচিত গান গাইতেন। তার রচিত গীতিকবিতার সামগ্রিক সংগ্রহ পাওয়া যায়নি তবে যেখানে সেখানে তার ছড়িয়ে থাকা গীতিকবিতাগুলো তার প্রতিভা ও প্রকাশভঙ্গির মৌলিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।[১৬৯]

এই শিল্পের আর একজন মহিলা কবি ছিলেন রূপমতি। তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর সন্নিকটে সারাঙ্গপুরের একজন বেশ্যার কন্যা। তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।[১৭০] আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি যিনি তিন তারাং নামে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি উড়িষ্যার রাজা মধুকর শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তার কাব্যানুরাগ অক্ষুণ্ন রাখেন।[১৭১] তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি হলেন শেখ রাংগ্রিজিন। তিনি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।[১৭২] শৈশবকাল থেকেই তিনি কাপড়ে রং করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধারণা করা হয় মোঘল রাজদরবারে তার স্বাধীন

---

১৬৭. সিনহা, পৃষ্ঠা-১৯২।

১৬৮. Ibid., পৃষ্ঠা-২২২।

১৬৯. টি. সি. দাসগুপ্তা কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গালী সমাজের দিকে', পৃষ্ঠা-২০১।

১৭০. সিনহা, পৃষ্ঠাগুলো-২৩৯-৪০।

১৭১. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-২৪০-৪১।

১৭২. Ibid., পৃষ্ঠা-২৪৮: ৪. কথিত আছে যে, কোকশাস্ত্রে গ্রন্থ রচিত হয়: দ্রষ্টব্য, সিনহা, পৃষ্ঠা-২৫২।

www.pathagar.com

প্রবেশাধিকার ছিল এবং প্রায়ই তিনি শাহজাদা মোয়াজ্জেমের দরবারে যেতেন।[১৭৩] পরবর্তীতে আলমের সাথে তার বিবাহ হয় এবং তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কবিতা রচনা করতেন। তাদের কবিতাগুলোর অধিকাংশই আরবি ও ফার্সি শব্দের সংমিশ্রণে ব্রজভাষাতে রচিত।[১৭৪] তার কবিতাগুলো সংকলিত হয় 'আলম কেলি' নামক একটি গ্রন্থে এবং তা শৃঙ্গার রসের একটি ভালো দৃষ্টান্ত।[১৭৫]

৯. (ক) বিভিন্ন বিষয়ের মহিলা কবিগণ

এছাড়াও অন্য একটি শ্রেণির কবি ছিলেন যারা নৈতিক উপদেশ, নারীর কর্তব্য, পতিভক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করতেন। তাদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছেন বিখ্যাত সাধক কবি তুলসী দাসের সহধর্মিণী রত্নাবতী। তিনি বহু শ্লোক রচনা করেন।[১৭৬] সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্যাতি অর্জনকারিণী খাজানিয়া অন্য একজন মহিলা কবি ছিলেন। তিনি উনাত্তরের কাছে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব জনপ্রিয় পালি নামে অনেক ধাঁধাঁ রচনা করেন।[১৭৭] এই ধারার তৃতীয় মহিল কবি সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত হিন্দি কবি কেশব দাসের পুত্রবধূ। তার সম্বন্ধে খুব কম তথ্য পাওয়া যায়। কথিত আছে যে তিনি 'সাভাইয়া' নামক ছন্দে কিছু কবিতা লিখেন ।[১৭৮] পরিশেষে উল্লেখযোগ্য অন্য একজন মহিলা কবি ছিলেন লোকনাথ চৌবির স্ত্রী কবি রানি চৌবি। তিনি ছিলেন বান্দির রাজা বুধসিংয়ের দরবারের সভাকবি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ তার রচনাকাল ছিল।[১৭৯]

উপর্যুক্ত মহিলা কবিগণ ছাড়াও রাজস্থানের কয়েকজন মহিলা দিনজাল ভাষায় কবিতা রচনা করেন। দিনজাল ভাষার মহিলা কবিগণ বাস করতেন প্রাসাদের অভ্যন্ত রে, সেখানে তারা রানির সেবা ও মনোরঞ্জন করতেন।[১৮০] চম্পা দি রানি তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বিকানিরের রাজা ও কবির ভাই পৃথ্বীরাজের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি তার স্বামীকে কবিতা রচনায় সাহায্য করতেন। তার সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়নি।[১৮১] ষোড়শ শতাব্দীর শেষে তিনি তার কবিতা রচনা করেন।

---

১৭৩. Ibid..
১৭৪. সিনহা, পৃষ্ঠা-২৫৪।
১৭৫. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৬৮।
১৭৬. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৫৪।
১৭৭. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৮০।
১৭৮. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৮৭।
১৭৯. সিনহা, পৃষ্ঠা-২৮৮।
১৮০. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৮৯।
১৮১. Ibid.. পৃষ্ঠা-২৮।

www.pathagar.com

দিনজাল ভাষার আর একজন মহিলা কবি ছিলেন পদ্মাচারিণী।[১৮২] তিনি একই সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন চরন মল জিসাহুর কন্যা এবং ভারত শংকরের স্ত্রী। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি বিকানিরের রাজপ্রাসাদে বাস করতেন।[১৮৩] এই শ্রেণির অন্য একজন মহিলা কবির নাম ছিল কাক রিচিজি। তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ঠাকুর বাখেলা আগ্রাজির কন্যা এবং তার বিবাহ হয় মেবারের নাহার নারহার দাসের সাথে। শাহজাহানের রাজত্বকালে তার স্বামী যুদ্ধে মারা যান।[১৮৪]

নাথি নামক ভগবান বিষ্ণুভক্ত একজন মহিলা কবিও কিছুসংখ্যক ভালো কবিতা রচনা করেন। তিনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে খ্যাতি লাভ করেন।[১৮৫] দিনজাল ভাষার এসব মহিলা কবি ভক্তিমূলক পদ ও দোহা রচনা করেন। তাদের গীতি কবিতাগুলোতে ছিল শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কবিতাগুলোকে উচ্চমানের বলা যায় না।[১৮৬] মোটকথা হিন্দি সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য যে প্রেম মার্গীয় সাহিত্যকর্ম ব্যতীত তারা সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। প্রেম মার্গে মহিলা কবিদের কোনো অবদান ছিল না। শুধু বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সাজোবাঈ, দয়াবাঈ, গঙ্গাবাঈ, শেখ রাংগ্রিজিন ও প্রাভিন রাইয়ের মতো কয়েকজন মহিলা কবির নাম উল্লেখযোগ্য এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অবদান মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়।

৯. (খ) মহিলাদের সংস্কৃত ভাষা ও চর্চা

সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রে মহিলাদের আগ্রহ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। মনে হয় নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিশেষ করে মহিলাদেরকে এ ক্ষেত্রে কোনো উৎসাহ দেওয়া হতো না। তার ফলে তারা

---

১৮২. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-৩৬-৩৭।

১৮৩. সিনহা, পৃষ্ঠাগুলো- ৩০-৩১।

১৮৪. কথিত আছে যে, একবার যখন বিকানিদের রাজা অমর সিং ঘুমাচ্ছিলেন তখন আকবর তার প্রাসাদ আক্রমণ করেন। কেউই তাকে ঘুম থেকে জাগানোর সাহস করল না। পদ্মা তাকে তার গান গেয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। সিনহা, পৃষ্ঠা-৩১।

১৮৫. কথিত আছে যে তার শ্বশুর, স্বামী ও পুত্রগণ শাহজাহানের অধীন চাকরি করতেন। সিনহা, পৃষ্ঠা-৩৫।

১৮৬. সিনহা, পৃষ্ঠা-৩৪, অনুমান করা হয় যে, তিনি ছিলেন ভোজরাজের কন্যা। তার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারত না। তারপরও দক্ষিণ ভারতে মহিলাদের সংস্কৃত শিক্ষার ঐতিহ্য কিছু পরিমাণে অব্যাহত থাকে। মনে হয় এর কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, মহিলাদের দ্বারা কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার উৎপত্তি অভিনন্দিত হয়। সেগুলো শিখতে তাদের সুবিধা ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার চেয়ে এই ভাষাগুলোর মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করাকে অধিকতর সুবিধাজনক ও সহজ বলে মনে করত।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষার অভাব ছিল এবং এর অভাবে মহিলারা এ ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারত না। পরিশেষে ফারসি ভাষার (যা এই সময় রাজদরবারের ভাষা ছিল) প্রভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হতো না। স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা এই ভাষাতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করতে পারত না। এই সময়ে খ্যাতি অর্জনকারিণী একজন সংস্কৃত ভাষার মহিলা কবির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শিবরামের কন্যা ও রঘুনাথের স্ত্রী প্রিয়ংবদা।

তিনি (১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে) বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাসবাস করতেন। শ্যামারহস্য নামক বিখ্যাত কবিতাটি তিনি সম্পাদনা করেন এবং তার সর্বপ্রথম কবিতাটি রচিত হয় কৃষ্ণের প্রশংসায়।[১৮৭]

৯. (গ) পোশাক পরিচ্ছদ

সাধারণত মুসলমান মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল একটি জামা ও একটি পায়জামা।[১৮৮] তাদের পায়জামা ছিল বিভিন্ন রকমের। কেউ কেউ শালোয়ার ও অন্যরা ঘাগরা (ঢিলা স্কার্ট) পরিধান করত।[১৮৯] ধনী পরিবারের কিছু সংখ্যক মহিলা কাশ্মিরি শাল ও কুবা ব্যবহার করত।[১৯০] বাইরে যাওয়ার সময় মহিলারা ঘোমটা দিয়ে তাদের মাথা আবৃত করত।[১৯১] বিদেশি পর্যটকগণ মুসলমান মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে প্রায়ই বর্ণনা করেছেন।[১৯২] হিন্দু মহিলারা সাধারণত

---

১৮৭. Ibid., পৃষ্ঠা-২৮.

১৮৮. এম. কৃষ্ণমাচারী কর্তৃক সম্পাদিত 'চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', পৃষ্ঠা-৩০৪.

১৮৯. পেট্রোডেলাভেলি, পৃষ্ঠা-৪১১.

১৯০. জামার নিচে পরিধান করা হতো শালোয়ার ও ঘাগরা। শালোয়ার আঁটসাঁট ছিল এবং উপর থেকে বিনুনি করে নিচের দিকে ঢিলা করা হতো।

১৯১. মানুচী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪১.

১৯২. ভিলেট, পৃষ্ঠা-৮১: টেরির ভ্রমণ শুরু, পৃষ্ঠা-৩০৯: পেট্রোভেলাভেলি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৪৪-৪৫: থিভিনট, পৃষ্ঠা-৫৩: হ্যামিল্টন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩: ফ্রাইয়ার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১১৭-১৮.

www.pathagar.com

বুকের চারধারে জড়ানো আঁটসাঁট পোশাক চোলি পরিধান করত[১৯৩] এবং তার নিচে শাড়ি পরিধান করত।[১৯৪] হিন্দি সাহিত্যে শাড়ি সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ রয়েছে।[১৯৫]

হিন্দু মহিলারা লাল রং সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত।[১৯৬] মানুচী হিন্দু মেয়েদের পোশাকের বর্ণনার সময় লিখেন যে, নয় বা দশ বছর বয়স পর্যন্ত তারা ছেলেদের মতো একই পোশাক পরিধান করে। সেই সময়ের পর তারা একটি সাদা বা লাল কাপড় পরিধান করে এবং তারা তাতে সায়ার মতো বাঁধন দিয়ে পরিধান করত। কখনো কখনো তাদের ভাষায় এই পানজাম[১৯৭] কাপড়টি রঞ্জিত করা হতো দুটি রঙে। এই পানজামের অর্ধেকটা কাঁধের বা মাথার উপরে ছড়ানো থাকে যখন তারা যেকোনো মর্যাদার ব্যক্তির সাথে কথা বলে। কিন্তু যখন তারা কুয়া বা ঝর্ণাতে জল আনতে যায় এবং বাড়িতে কাজ করে তখন তার সমস্ত পানজামটি জড়িয়ে রাখে কোমরে এবং তখন শরীরের উপরের দিকটি অনাবৃত থাকে।[১৯৮]

বাঙালি মহিলাদের পোশাক ছিল একটু ভিন্ন রকমের। তারা সূক্ষ্ম কাপড়ের শাড়ি ব্যবহার করত।[১৯৯] দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাড়িগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের যেমন ময়ূরপঙ্খী, মাঘদাম্বার, পাতার বোনাই, নীলাম্বরী, গঙ্গাজালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারা কাঞ্চুকিও (ব্লাউজ) পরিধান করত।[২০০] কাঞ্চুকি ছিল দুই প্রকার– একটি শুধু বক্ষদেশ আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত এবং অপরটি ছিল লম্বা আকারের ও কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা ফিতা দ্বারা পিঠের সাথে বাঁধা

---

১৯৩. হ্যামিলটন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৩, ১৬৮৮ থেকে ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণকারী হ্যামিলটন মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তাদের পোশাকের পার্থক্য আছে কিন্তু তা পুরুষদের পোশাকের চেয়ে খুব সামান্য পৃথক ধরনের। তাদের কোটগুলো জামা ও শরীরের সাথে আঁটসাঁট পোশাকের কাজ করে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের পরিধানযোগ্য। পুরুষের কোটগুলো নাভির নিচে ভাঁজ করা এবং মহিলাদর কোটগুলো নাভির কিছুটা উপরে জড়ানো যাতে তাদের কোমর ছোট বলে প্রতীয়মান হয়। তারা নারী ও পুরুষ উভয়েই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত পায়জামা পরিধান করে'।

১৯৪. আইন-ই-আকবরি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩.

১৯৫. এইচ. ব্যাভারেজ কর্তৃক অনূদিত বাবর নামা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৯.

১৯৬. মতিরাম সাতসাঁইর দোহা ১৩২. পৃষ্ঠাগুলো-৪৫২-৪৯৩.

১৯৭. মানুচী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪১: পেট্রাডেলাভেলি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫. তারা ছাপানো কাপড়ও পরিধান করত।

১৯৮. মানুচী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০ (পাদটীকা), উত্তর ভারতে এটাকে শাড়ি বলা হতো।

১৯৯. মানুচী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০.

২০০. টি.সি. দাসগুপ্তার বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টিকোণ (ভূমিকা), পৃষ্ঠা-২৭ এবং পৃষ্ঠাগুলো-৪৬, ২২৮, ২৭০.

www.pathagar.com

থাকত। কাঞ্চুকি সূক্ষ্ম ও শিল্প সম্মত সূচিকর্মের সাহায্যে শোভিত করা হতো। তারা সায়ার মতো একটি অন্তর্বাস পরিধান করত। অভিজাত পরিবারে ঘাগরা ব্যবহার করা হতো।[২০১] রাজপুত মহিলাদের জনপ্রিয় পোশাক ছিল লিহঙ্গা ও চোলি। লিহঙ্গা ছিল দীর্ঘ ও ঢিলা কামিজ এবং চোলি বা আঙ্গিয়া দেহের উপরের অংশে পরিধান করা হতো। একটি দোপাট্টা বা দীর্ঘ স্কার্ফ মাথা ও দেহের উপরের অংশ আবৃত করার জন্য জড়ানো হতো।[২০২] শিখ মহিলারা তাদের পোশাক হিসেবে সুথান নামক পায়জামা পরিধান করত।[২০৩]

এটা ছিল সুচি নামক এক প্রকার রঙিন সুতিবস্ত্র দ্বারা তৈরি। অনেক মহিলা কূর্তা ও ফতুয়া পরিধান করত।[২০৪] মাথা ও কাঁধের উপরে একটি চাদর পরিধান করা হতো। এটা হতো (যুবতিদের ক্ষেত্রে) রঙিন বা বর্ণহীন। এটা গারহা (মোটা কাপড়) বা ধোতার দ্বারা তৈরি করা হতো– এটা শীতকালে পুরু হতো এবং গ্রীষ্মকালে পাতলা। মাঝে মাঝে এটি একটি রং করা কাপড় হতো এবং তাতে প্রায়ই রেশমি ফুলের কারুকাজ থাকত (ফুলকুঁড়ি সিতারি)।[২০৫] কখনো কখনো তারা ঘাগরা, চোলি ও শাড়ি পরিধান করত।[২০৬] দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড় তৈরি হতো বাড়িতে বোনা অমসৃণ অথচ মজবুত ও টেকসই উপকরণ দ্বারা।[২০৭] সাধারণ রং ছিল নীলের জন্য নীল গাছের নীল এবং লাল ও হলুদের জন্য কুমকুম রং।

গুজরাটি মহিলাদের পোশাক সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে ভারত ভ্রমণকারী ডিউরেট বারবোসা বলেন, 'তাদের পোশাক তাদের স্বামীর পোশাকের মতো লম্বা। তারা পিছন দিকে নিচুভাবে কাটা আঁটসাঁট আস্তিনযুক্ত রেশমের বক্ষবন্ধনী এবং বাইরে যাওয়ার সময় গায়ে চাদর নামক আলখেল্লা পরিধান করত।'[২০৮] কাশ্মীরের মহিলারা পরিধান করত একটি ঢিলা বহির্বাস[২০৯]

---

২০১. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ২৭, ৪২, ২৮৮-৮৯; স্ট্যাভারনিয়াস লিখেন, 'তারা একটি নাইলনের কাপড়ের টুকরা দিয়ে তাদের বুকের উপর দিকে চেপে রাখে যা তাদের বাহুর নিচ দিয়ে পৃষ্ঠদেশ বেঁধে রাখে।' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৫.

২০২. টি.সি. দাসগুপ্তার বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টিকোণ, পৃষ্ঠা-২৭.

২০৩. আইন-ই-আকবরি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২; রাজপুতনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯.

২০৪. এইচ. আর. গুপ্তা কর্তৃক রচিত শিখদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৯১.

২০৫. Ibid., পৃষ্ঠা-১১২.

২০৬. এইচ. আর. গুপ্তা কর্তৃক রচিত শিখদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৯১.

২০৭. Ibid., পৃষ্ঠা-২৯১; মুহাম্মদ আকবর কর্তৃক সম্পাদিত মোঘলদের অধীনে পাঞ্জাব, পৃষ্ঠা-২৫৮.

২০৮. এইচ. আর. গুপ্তা কর্তৃক রচিত শিখদের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৯১.

www.pathagar.com

বা পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ রোমানদের মতো পরিচ্ছদ। তারা কোনো ফিতা ব্যবহার করত না। নারী ও পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করত কোমর বন্ধনী। হিন্দু মহিলারা কালো তামাটে লাল রং বা নীল রঙের পোশাক পরিধান করত এবং কোমরের চারধারে সাদা কাপড়ের কটিবন্ধ পরিধান করত।[২১০] কাশ্মীরের মুসলিম মহিলারা কোনো কটিবন্ধ পরিধান করত না এবং তাদের টিউনিক ছিল জাঁকজমকপূর্ণভাবে সূচিশিল্প শোভিত।[২১১] এছাড়া মহিলাদের কপালে থাকত একটি ফিতা এবং তার উপরে মাথা থেকে কাঁধ ও পা পর্যন্ত প্রসারিত একটি দীর্ঘ ঢিলা বহির্বাস।[২১২] মুসলিম মহিলাদের মাথার পরিচ্ছদকে কুসাবা বলা হতো এবং হিন্দু মহিলাদের মাথার পরিচ্ছদকে তারাং বলা হতো যা একটি ঝুলন্ত পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত মস্তকাবরণীর সাথে বাঁধা থাকত।[২১৩]

৯. (ঘ) অলংকার

সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারগুলো ছিল অভিজাত মোঘল মহিলাদের অলংকারের মতো।[২১৪] তাদের অলংকারের প্রধান পার্থক্য ছিল উপাদানগত এবং কখনো কখনো গড়ন বা নামের ক্ষেত্রে।[২১৫] সাধারণ মহিলারা সোনা, রুপা ও মূল্যবান রত্নের পরিবর্তে তামা, টিন ও গজদন্ত ব্যবহার করত।[২১৬]

সমসাময়িক রাজনীতিতে মোঘল নারীদের অবদান

কোনো নিশ্চয়তামূলক তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু তুর্কি মোঙ্গলীয় আমলে রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোগ করা অধিকার নিরূপণ করা কঠিন। শুধু এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মোঘল ও তুর্কি উভয় আমলে নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগ করত। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর সন্তানদেরকে শৈশব অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করত তখন মহিলাদের মর্যাদা হয়ে উঠত খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানরা বয়োপ্রাপ্ত ও বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিধবারা

---

২০৯. ম্যানসেল লংওয়ার্থ ডেমস্ কর্তৃক সম্পাদিত ডুরেট বারবোসার গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১১৩-১৪.
২১০. উইলিয়ম রবার্ট লাউরেন্সের কাশ্মীরের উপত্যকা, পৃষ্ঠা-২৫২.
২১১. Ibid., পৃষ্ঠা-২৫২.
২১২. উইলিয়ম রবার্ট লাউরেন্সের কাশ্মীরের উপত্যকা, পৃষ্ঠা-২৫২.
২১৩. মহিবুল হাসান কর্তৃক রচিত সুলতানদের অধীনে কাশ্মীর, পৃষ্ঠা-২২৯.
২১৪. Ibid., পৃষ্ঠা-২২৯; উইলিয়ম রবার্ট লাউরেন্সের কাশ্মীরের উপত্যকা, পৃষ্ঠা-২৫১.
২১৫. টি.সি. দাসগুপ্তার 'বাঙ্গালী সমাজের দৃষ্টিকোণ', পৃষ্ঠাগুলো- ৫১-৫৬.
২১৬. ফিঙ্গের 'ভ্রমণের শুরুতে', পৃষ্ঠা-১৩.

www.pathagar.com

এমনকি গোত্রের নেতৃত্বসহ স্বামীর সকল অধিকার লাভ করত। এমন যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদেরকে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতো।

(১) তৈমুর ও চেঙ্গিস খানের পরিবারের নারীরা তাঁদের স্বামীর সাথে যেতেন যুদ্ধের ময়দানে। (২) তাঁরা শুধু যোদ্ধাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনা করতেন না, প্রকৃত যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধের সংঘাত ও ভয়ানক সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী অনেক মহিলা পুরুষদের সাথে লড়াই করতেন এবং সাহসী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করতেন এবং বর্শা তরবারির আঘাতে ও তীর নিক্ষেপ করে শক্তিশালী যোদ্ধাদেরকে পরাস্ত করতেন। (৩) পারস্যবাসীদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য আত্মস্থকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতায় নারীর অধিকার মেনে নেওয়া তুর্কিরা ভারতে ইতিমধ্যেই একজন মহিলাকে সিংহাসনে বসান এবং এভাবেই তারা গ্রহণ করেন অত্যন্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ। রাজিয়ার দৃষ্টান্ত রাজকীয় মহিলাদেরকে উৎসাহিত করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে। এই রীতি ভারতে সমগ্র তুর্কি শাসন আমলে অব্যাহত ছিল এবং মনে হয় আফগানরাও তাদের মহিলাদেরকে রাজনীতিতে মতামত দেওয়ার অনুমতি দেন। উত্তরাধিকার সূত্রে চেঙ্গিস খান ও তৈমুরের ঐতিহ্য প্রাপ্ত বাবরের পরিবার তার নারীদেরকে পর্যন্ত রাজনৈতিক অধিকার অনুমোদন করেন, এভাবে তাঁদেরকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলেন, কিন্তু তাঁদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়েছেন বলে মনে হয় না। (১) ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন ওমর শেখ মির্জা মারা যান তখন বাবরের বয়স বড়জোর এগারো বছর এবং তিনি ফারগানা সীমান্তে দুটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হন। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি তাঁর নানি আইসান দৌলত বেগমের দ্বারা ফলপ্রসূভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং তাঁর দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ বাবরের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। আইসান দৌলত বেগম প্রকৃত শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব হিসেবে কাজ করেন, জরুরি প্রশাসনিক সমস্যাগুলো দেখাশোনা করেন এবং এমন কৌশলের সাথে সংকটপূর্ণ অবস্থায় সবকিছু সামাল দেন যে, তার ফলে বাবরকে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি। (২) শুধু তাই নয়, পাঁচ বা ছয় মাস পরে যখন তার অন্যতম সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাসান বাবরকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তখন আইসান দৌলত বেগম আবার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে সংগঠিত করেন, তাদের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আটক করেন এবং এভাবে সমস্যাটির সমাধান করেন। (৩) তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ও

www.pathagar.com

দূরদর্শী মহিলা এবং বাবরকে তার দেশ শাসনের কাজে মূল্যবান সহযোগিতা প্রদান করেন। (৪) সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে আইসান দৌলত বেগমের সক্রিয় ভূমিকা মোঘল পরিবারে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়। বাবরের মা ও তার উপপত্নীরাও তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখেন। তার মা কুতলুঘ নিগার খানমও যুদ্ধক্ষেত্রে ও ভ্রমণকার্যে তাকে সান্নিধ্য দান করেন। (১) কিন্তু তার শিয়া ধর্মাবলম্বী পত্নী মাহিম বেগম আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি ছিলেন সুলতান হোসেন বাঈকারার আত্মীয়া এবং ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি তার স্বামীর সাথে বাদাখশানে ও ট্রান্স অকসিয়ানাতে গমন করেন এবং সকল অবস্থাতেই তার পাশে থাকেন। (২) তিনি বাবরের আমলে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন এবং তিনিই একমাত্র রানি ছিলেন যিনি দিল্লিতে সম্রাটের পাশে সিংহাসনে বসবার অনুমতি পান। (৩) তার স্বামীর মৃত্যুর আড়াই বছর পরেও তিনি অব্যাহত রাখেন সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা। বাবরকে তার কয়েকটি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যে অন্য একজন পত্নী তাকে সাহায্য করেন তিনি হলেন বিবি মুবারিকা, যাকে তিনি ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে বিবাহ করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতীয় ও ইউরোপীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি

পারস্য ঐতিহাসিকগণ দূরবর্তী স্থান থেকে সাম্রাজ্যের রাজকীয় হেরেম সম্বন্ধে লিখেছেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কোনো ইতিহাসবেত্তা বা পণ্ডিত এমনকি আবুল ফজলের মতো কোনো আল্লামা হেরেমে প্রবেশ করতে, সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে ও লিখতে পারতেন না। অধিকাংশ পারস্য ঐতিহাসিক ছিলেন রাজপরিবারের ইতিহাসবেত্তা। প্রয়োজনের তাগিদে ঐতিহাসিক বর্ণনার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সম্রাটকে তারা বেছে নিতেন। হেরেম ছিল সম্রাটের ব্যক্তিগত সুখের স্থান এবং তাঁর সম্মানিত মহিলাদেরকে ঐতিহাসিকগণের সরকারি পর্যবেক্ষণ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হতো। তাই রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির অন্দর মহল সম্বন্ধে তাঁদের উদ্ধৃতি দূরবর্তী স্থান থেকে পর্যবেক্ষণভিত্তিক এবং তা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত জ্ঞানভিত্তিক নয়। তাঁদের ঐতিহাসিক বিবরণে হেরেমের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন বা তাঁদের অনুভূতি ও আবেগ সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

'হেরেম' শব্দটি মূলত আরবি এবং এর অর্থ 'আশ্রয় স্থান'; কিন্তু কালক্রমে এটা অভিজাতদের মহিলা বাসভবন ও এর বাসিন্দাদেরকে সমার্থক শব্দে পরিণত করে।[২১৭] এই আশ্রয়স্থান সম্বন্ধে সরকারি ঐতিহাসিক বর্ণনায় লেখা প্রথাসিদ্ধ ছিল না। যে সমাজে মহিলারা নিঃসঙ্গভাবে বসবাস করতেন তাঁদের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে সরকারি উদ্ধৃতি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হতো উপযোগিতার বিচক্ষণ অনুভূতি ও শালীনতা সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা হেতু।

১. রাজকীয় স্মৃতিকথা

যা হোক, এই অভাব কিছুটা পূরণ করা হয়েছে রাজকীয় পরিবারের ব্যক্তিবর্গের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিকথার দ্বারা। মোঘল রাজবংশের প্রথম সম্রাট (১৫২৬-

---

২১৭. The Encyclopaedia of Islam. Leyden. 1924.

www.pathagar.com

১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বাবর তাঁর বিখ্যাত স্মৃতিকথা 'বাবর নামা'তে তাঁর মহিলা আত্মীয়স্বজন দাদিমা, মা, বোন, কন্যা ও সেই সাথে স্ত্রীদের সম্পর্ক ছিল আবেগপূর্ণ; এমনকি মান-অভিমানমূলক অনুভূতিও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। হুমায়ুনের আমলের হেরেম সম্বন্ধে (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর বোন গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা' আরও ভালো স্মৃতিচারণ গ্রন্থ। স্বয়ং হেরেমে বসবাসকারিণী শাহজাদি গুলবদনের ছিল এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। একজন মহিলা হিসেবে তাঁর আগ্রহ ছিল মূলত নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোকপাত করা এবং তিনি অকপটে লিপিবদ্ধ করেন হেরেমবাসিনীদের সম্বন্ধে। 'হুমায়ুন নামা' কোনো বিশাল গ্রন্থ নয়; কিন্তু পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা, তথ্যমূলক টীকা এবং হেরেমের প্রসিদ্ধ মহিলাদের পরিচয়মূলক আত্মজীবনী সংবলিত একটি দীর্ঘ সূচিপত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থ। এ. এস. বেভারেজের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থটিকে বিশেষ পূর্ণতা দান করেছে[২১৮] এবং দুই জন মোঘল সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের আমলের হেরেম সম্বন্ধে গ্রন্থটিতে আকাঙ্ক্ষিত সকল তথ্য পাওয়া যায়। এই সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি হচ্ছে নূর-উদ্দিন জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে। বাবরের তুলনায় জাহাঙ্গীরের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন সত্যিকার ভারতীয়।[২১৯]

সম্রাট হিসেবে হেরেম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল আন্তরিক এবং তিনি যা কিছু লিখেছেন তা শুধু তথ্যমূলক নয়, বরং প্রামাণিক। তাই আমাদের গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর জীবনীগ্রন্থ অন্য যেকোনো প্রকরণ গ্রন্থ বা সরকারি ঐতিহাসিক বিবরণ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোতে রয়েছে বাবরের স্মৃতিকথার চেয়ে দ্বিগুণ বিষয়বস্তু[২২০] এবং মোতামিদ খান ও মুহাম্মদ হাদীর মতো দুজন মোঘল ঐতিহাসিকের সাথে যোগ করেছেন সম্পূরক অংশ। জাহাঙ্গীর রাজত্ব করেন ২২ বছর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ), কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষে রুগ্‌ণ স্বাস্থ্য ও দুঃখকষ্ট হেতু ছেড়ে দেন আত্মজীবনী লেখার কাজ। তারপরে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখার দায়িত্ব দেন মোতামিদ খানকে, যিনি এই স্মৃতিকথা রচনার কাজ চালিয়ে যান তাঁর রাজত্বকালের উনিশ বছরের শেষ সময় পর্যন্ত। তারপর মোতামিদ সম্রাটের

২১৮. Mrs. Annotte, A.S. Beveridge's translation of Gulbandan Begam's Humayun Nama, Published under the title History of Humayun. Photoprint by Idarah-i-Adibiyat-i-Delhi, Delhi-1972.

২১৯. Tuzuk.-i-Jahangiri or Memories of Jahangir. translated by Alexander Rogers and Henry Beveridge. Originality published in 1909-1914, in two volumes. Indian Edition (Delhi, 1968). Preface P.X.

২২০. Ibid., p. ix.

www.pathagar.com

নামে এই স্মৃতিকথা রচনার কাজ বন্ধ করেন, কিন্তু তিনি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই জীবন বৃত্তান্ত রচনার কাজ চালিয়ে যান তাঁর নিজের ভাষায় 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী' শিরোনামে। মুহাম্মদ হাদীও স্মৃতিকথা রচনার কাজ চালিয়ে যান জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত; কিন্তু তিনি তাঁর স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেন দেরিতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থ ভাগে।[২২১] জাহাঙ্গীরের জন্ম থেকে সিংহাসনে অভিষেক পর্যন্ত সময়ের বিবরণ সংবলিত আর একটি রচনা কাসমির হুমাইনীর মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে হাদির ভূমিকাটি সম্পূর্ণভাবে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।[২২২] জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশাতেই তার স্মৃতিকথার কয়েকটি রচনা প্রচলিত ছিল। দাওয়াজদা-সালা-ই-জাহাঙ্গীরী সম্রাটের বারো বছরের রাজত্বকালের একটি বিবরণ। মোতামিদ খানের 'ইকবাল নামা' ও মুহাম্মদ হাদীর 'তাতিমা-ই-ওয়াকিত-ই-জাহাঙ্গীরী' এই স্মৃতিকথার অগ্রগতি, সম্পূর্ণতা ও উপসংহার স্বরূপ। এই স্মৃতিকথার আর একটি সংস্করণ হচ্ছে 'তারিখ-ই-সেলিম শাহী'।[২২৩] এই গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের মানস জগৎ সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না, কিন্তু সেলিম শাহীর কিছু অংশ কল্পকাহিনির পর্যায়ভুক্ত।[২২৪] এতে রয়েছে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পনেরো বছরের বিবরণ। 'ইন্তিখাব-ই-জাহাঙ্গীর শাহী' নামক একটি ছোট গ্রন্থ রচিত হয় জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক সঙ্গীদের দ্বারা।[২২৫] এগুলোর সবই লক্ষ করা যায় সমালোচনাসহ অনূদিত অংশ ইলিয়ট ও ডাউসনের রচনাতে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে তাঁর রাজত্বকালের সপ্তদশ বর্ষের সূচনা পর্যন্ত সম্রাটের নিজের লেখা 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী' বা 'জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। এটা হলো সেই রচনা যা পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার রজার্স ও হেনরি বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত।

ভগ্ন স্বাস্থ্য ও অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু জাহাঙ্গীর অতিবাহিত করতেন হেরেমের মধ্যে প্রচুর সময়। এই অবস্থা তাঁকে হেরেম সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে লিখতে সাহায্য করে। হেরেম সম্বন্ধে তাঁর রয়েছে অনেক ও বিচিত্র উদ্ধৃতি। তিনি তাঁর বোন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সম্মন্ধে লিখেছেন আবেগের সাথে। তিনি তাঁর প্রথম কনে শাহ বেগমের মৃত্যুতে কান্না করেন নিদারুণভাবে এবং

---

২২১. E & D. vi. p. 392.

২২২. Ibid., pp. 251-264.

২২৩. Translated under the title of Memories of the Emperor Jahangir, written by himself, by Major David Price (London, 1829), Indian edition. Bangabasi Press, Calcutta, 1906. Some extracts also in E & D, vi, pp. 256-64.

২২৪. E & D. vi. p. 257.

২২৫. Ibid., pp. 446-47.

www.pathagar.com

পর পর কয়েকদিন যাবৎ কোনো সান্ত্বনা বাক্যেও কর্ণপাত করেন নি। তিনি তাঁর প্রিয় পত্নী নূরজাহান সম্বন্ধে লিখেছেন আবেগের সাথে এবং নূরজাহান পতিভক্তি দ্বারা জয় করেন তাঁর হৃদয়। তিনি তাঁর মদপান উৎসব, ভোজ সভা ও নারীদের সান্নিধ্যে উৎসাবাদি সম্বন্ধে লিখেছেন খোলামেলাভাবে। তিনি বর্ণনা করেছেন নওরোজ উৎসব, ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠান, শিকারের উদ্দেশ্যে মহিলাদের সাথে বহির্ভ্রমণ সম্বন্ধে। রানি ও শাহজাদিদের সাথে তিনি বিনিময় করেন জাঁকজমকপূর্ণ বস্ত্র, স্বর্ণ ও মণিরত্ন উপহার এবং তাঁদের জন্য উদার বৃত্তি মঞ্জুরি পুনরায় অনুমোদন করেন। জাহাঙ্গীরের মতো হেরেমে বসবাসকারী আর কোনো লেখক মোঘল অন্দরমহল সম্বন্ধে পরিবেশন করেননি এমন ব্যাপক তথ্য।

২. আকবরের রাজত্বকালের ঐতিহাসিকগণ

মোঘল সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিকগণও লিখেছেন রাজকীয় হেরেম সম্বন্ধে। কিন্তু আকবর ও তাঁর পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে

www.pathagar.com

উপস্থাপনামূলক পার্থক্য বিদ্যমান হয়েছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' এবং নিজাম উদ্দিন আহম্মদের 'তাবাকাত-ই-আকবরী' আকবরের হেরেম সম্বন্ধে দিয়েছেন প্রধানত প্রাসাদ ও শিবিরের প্রশাসন বিষয়ে বিনয়পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আবুল ফজল ভারতীয় শাহজাদিদের সাথে আকবরের বিবাহ, মক্কা ও মদিনাগামী প্রবীণ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তীর্থযাত্রা অথবা সম্রাট কর্তৃক মায়ের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার সম্বন্ধেও বর্ণনা করেছেন। আব্দুল কাদের বাদাউনি তাঁর 'মন্তাখাব-উত-তারিখ' গ্রন্থে প্রায়ই আকবরের সমালোচনা করে তাঁর ইন্দ্রিয়শক্তিপূর্ণ আকর্ষণ ও দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিদ্রূপাত্মকভাবে প্রদান করেছেন ঐতিহাসিক বিবরণ। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি রাখা হয় আকবরের আমলে গোপন অবস্থায়। জাহাঙ্গীরের আমলে এই গ্রন্থটি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয়।[২২৬] কারণ সম্রাট আকবরকে জনসাধারণ সম্মান ও ভয় দুই-ই করত। আকবরের আমলে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো যাতে হেরেমের বাসিন্দাদের সম্বন্ধে এমন কিছু লেখা না হয় যা রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা অনুমোদনযোগ্য নয়। তাই আকবরের ইতিহাস রচয়িতাগণ হেরেমের নারীদের সম্বন্ধে কদাচিৎ কিছু উল্লেখ করতেন, যদি না তাঁরা বয়সে প্রবীণ ও রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতেন।

৩. জাহাঙ্গীর থেকে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত

আকবরের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে মোঘল হেরেম সম্বন্ধে সূচিত হয় ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বে নতুন অধ্যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিবাহ করেন ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি শুধু তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন না, সরকারি ব্যবস্থাপনাতেও ছিলেন তাঁর অংশীদার। সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর কাজ শুধু রাজকীয় সঙ্গিনী নয়, বরং প্রকৃত ক্ষমতাশালিনীর পর্যায়ভুক্ত এবং তা রাজকীয় হেরেমকে পরিণত করে পারস্যের ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয়ে। নূরজাহান রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন সক্রিয়ভাবে। শাহী দরবারে, হেরেমে এবং ঐতিহাসিক মহলে তাঁর ছিল বন্ধু ও শত্রু। কেউ কেউ ছিলেন তাঁর প্রতি অনুগ্রহশীল এবং কেউ কেউ ছিলেন তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় যেখানেই তাঁর নাম উল্লেখকৃত হয়েছে সেখানেই তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্ত গুণান্বিতা মহিলা হিসেবে। তাঁর দোষগুণ যেমনই হোক না কেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরেও তাঁকে মানুষ ভুলে যায়নি। শাহজাহানের শাসনকালের মধ্যেই (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে) সমগ্র হেরেমের

---

২২৬. Ibid., v. p. 479.

www.pathagar.com

অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। হেরেম পরিণত হয় একটি অত্যন্ত আলোকিত ও উজ্জ্বল স্থানে এবং এর আকর্ষণ মানুষের চোখে পড়ে বাদাউনী আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতো পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিকগণের দ্বারা। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হেরেম নিবাসীদের কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আরোপিত হয় কতকগুলো নিষেধাজ্ঞা; কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে লেখালেখির বেলায় স্বাধীনতা বজায় ছিল যা জৈনবাদীর প্রতি আওরঙ্গজেবের প্রেম আসক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও চটপটে বিবরণ, হামিদ উদ্দিন খানের আহকাম-ই-আলমগীরী বা কাফি খানের রচনায় লাল কুনওয়ারের প্রতি জাহান্দার শাহের প্রেম আসক্তি থেকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আকবরের শাসনকালের পরে পারস্য ঐতিহাসিকগণ সম্রাজ্ঞী এবং শাহজাদিদের কার্যকলাপ, রাজনীতিতে তাঁদের ভূমিকা, তাঁদের প্রিয় বিষয় ও শখ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে শুরু করেন কিছু পরিমাণে লিখতে। এটা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, যেহেতু নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহানারা, রওশন আরা এবং বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ মহিলা শুধু মোঘল হেরেমেই প্রাধান্য বিস্তার করেননি, মোঘল রাজদরবারেও প্রাধান্য বিস্তার করেন প্রায় এক শতাব্দী ধরে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল মনোমুগ্ধকর ও তাঁদের জীবন কাহিনি ছিল উত্তজনাপূর্ণ। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সৌন্দর্য ও তোষামোদ, আমোদ আহ্লাদ, প্রেম ও রোমান্স প্রকাশের জন্য সবচেয়ে মানানসই পারস্য ভাষায় তাঁদের সম্বন্ধে লিখেছেন ভারতীয় ইতিহাস। হেরেম নিবাসীদের কার্যকলাপ, ধন-সম্পদ, জায়গির, দালানকোঠা, উদ্যানগুলো, জশন এবং এমনকি তাঁদের প্রেমাবেগ– এ সবকিছুই ছিল চিত্তাকর্ষক এবং পারস্য ঐতিহাসিকদের লেখায় তা প্রকাশ পেয়েছে চমৎকারভাবে।

৪. পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ

যখন মোঘল সাম্রাজ্যের অবনতি হতে শুরু হয় এবং মোঘল হেরেমের দুর্দিন দেখা দেয়, তখন হেরেমের বাসিন্দারা ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। হেরেমের নারীরা মাঝে মাঝে পর্দাপ্রথা ত্যাগ করে এবং কেউ কেউ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়। তাঁদের দুরবস্থা পারস্য ঐতিহাসিকদের মনে করুণার উদ্রেক করে এবং মোঘল হেরেমের অবনতির কথা গৌরবময় বিবরণের মতো মনোমুগ্ধকর ভাষাশৈলীতে প্রকাশ করেন। তাঁরা উপপত্নী লাল কুনওয়ার এবং জায়েদ খানের মতো নপুংসকের দ্বারা হেরেম জীবনের অবনতি সম্বন্ধেও লিখেছেন স্বাধীনভাবে। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, পারস্য ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন শুধু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত নারীদের সম্বন্ধে। তাঁদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে

www.pathagar.com

হতো কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে এবং উপেক্ষা করতে হতো অন্যান্য বিষয়, কারণ তাঁদেরকে মেনে চলতে হতো সনাতন মননশীল পদ্ধতি ও রচনা পদ্ধতি। প্রথা অনুযায়ী তাঁরা প্রশংসা করতেন সব সম্রাটের। তাঁরা প্রশংসা করেন সম্রাট শাহজাহানকে, উপেক্ষা করেন তাঁর যৌনদুর্বলতাকে। এবং তৎকালীন গণনৈতিকতা ও রাজনৈতিক নীতিবোধের অজুহাতে তাঁর কিছু জঘন্যতম কাজকে বৈধ অনুমোদন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।[২২৭] একইভাবে প্রচলিতপ্রথা বিরোধী বলে হেরেমের নারীদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক সুবিধা সম্বন্ধে উল্লেখ করেননি। তথাকথিত প্রথা বলতে অর্থহীন অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছু বোঝায় না, তবুও তাঁরা এই প্রথার প্রতি আসক্তিতে জড়িত হন। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, শাহীদরবারের ঐতিহাসিকগণ দিল্লির অট্টালিকাসমূহের গৌরব ও সৌন্দর্যকে আটধারবিশিষ্ট বেহেস্ত এবং ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণাঢ্যতায় ইসলাম ধর্মে প্রতিশ্রুত বেহেস্তের প্রাসাদগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনা মতে, শাহজাহানাবাদের প্রাসাদের, অভ্যন্তরে হাম্মামাখানার দেওয়ালের অলংকরণ এতই উৎকর্ষ লাভ করে যে, ইরানের বিহজাদ যদি তা দেখতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই এর ভারতীয় ভাস্কর্য ও কারিগরদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেন।[২২৮] আর একটি ত্রুটি ছিল এই যে, পারস্যের লেখকেরা এ দেশে আগত ইউরোপীয় পর্যটকদের সাথে কোনো তথ্য আদান-প্রদান করেননি যাঁরা স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করতেন ও নিজ দায়িত্বে ইতিহাস লিখতেন মোঘল হেরেম সম্বন্ধে। হেরেম সম্বন্ধে বিশেষ করে তাঁদের নিজের আরোপিত প্রেমলীলাঘটিত সেন্সরশিপ এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের সাথে যোগাযোগের অভাবে হেরেম সম্বন্ধে অপবাদমূলক ইউরোপীয় কাহিনির সমর্থন বা সেগুলোর প্রতিবাদ করা থেকে তাঁদেরকে নিবৃত্ত করে এবং তার ফলে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির উৎসটি প্রায়ই বাজারের গল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫. বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ

পক্ষান্তরে ইউরোপীয় পর্যটকরা মোঘল সাম্রাজ্যের হেরেম জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন স্বাধীনভাবে। তাঁদের তথ্য প্রাপ্তির উৎসগুলো ছিল সীমিত এবং তাই তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো তথ্য সংগ্রহ করতেন বিস্তারিত বিবরণ বা ছোট

---

২২৭. Saksena, B.P., History of Shahjahan, p. 336.
২২৮. Saleh, Amal-i-Saleh, vol. III, pp. 34-35; Waris, Badshah Nama, pp. 48-49.

www.pathagar.com

উপাখ্যান আকারে। তাঁদের কোনো বিবরণই ছাপাখানায় ছাপানোর উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি। এই সত্যের কারণে তাঁদের বিবরণ কোনো কোনো সময়ে সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়েছে এবং সামান্য বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে বিস্তারিতভাবে; আর অন্য সব বিষয় টীকা আকারে বর্ণিত বা একেবারেই বর্জিত হয়েছে।[২২৯] ঠিক এখানেই নিহিত আছে তাঁদের গুরুত্ব। পারস্যের ঐতিহাসিকদের রচনা উঁচু প্রতিমূর্তির পাদদেশ থেকে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় সামান্য বিষয়গুলো অবহেলা করে লিখিত হলেও ইউরোপীয় বিবরণ প্রচুর ছোট বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে পরিপূর্ণ। ফ্রানকোইস বার্নিয়ার এর গুরুত্ব বুঝতে পেরে বলেন, 'আমি প্লুটার্চের সাথে একমত যে, সামান্য বিষয় গোপন করা উচিত নয়; এগুলো প্রায়ই কোনো জনসমষ্টির রীতিনীতি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির চেয়ে কোনো জনসমষ্টির রীতিনীতি ও প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদেরকে প্রায়ই আরও সঠিক মতামত গঠনে সাহায্য করে।[২৩০] প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় লেখকদের সবচেয়ে বড় অবদান হলো পারস্য ঐতিহাসিকদের তথ্যের পরিপূরক অংশটুকু তুলে ধরে মোঘল হেরেমের চিত্রকে পূর্ণতা দান করা। তাঁদের সূক্ষ্ম বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীত পারস্যের ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে যেত ভাসাভাসা ও নিষ্প্রাণ অবস্থার চিত্র। এই বিদেশি পর্যটকগণ শাহীদরবার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, সেনাবাহিনী, জনপ্রশাসন, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি এবং সাধারণ মানুষ ও তাদের দারিদ্র্যের মতো বিষয়সহ মোঘল সাম্রাজ্যের সকল দিক সম্বন্ধে লিখেছেন। তাঁদের রচনাবলি আমাদেরকে পণ্যের বাজারমূল্য; কারখানার অবস্থান, বাণিজ্যিক চলাচলের পথ ও ব্যবসায়; ভূমি ও ভূমির ব্যবহার, খাজনা নির্ধারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত করে। একইভাবে তাঁরা লিখেছেন রাজকীয় হেরেম ও সম্ভ্রান্তদের হেরেম জীবন সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁদের আরও অনেক বিষয়ের পর্যবেক্ষণকে সত্য বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা রয়েছে এই অজুহাতে যে, তাঁরা অপবাদ ছড়ানোতে অত্যন্ত আনন্দ পেতেন।

ভারতীয় বা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কেউই পারেননি এই প্রলোভনের উর্ধ্বে যেতে। কিন্তু শুধু এই কারণে তাঁদেরকে রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে মনগড়া কাহিনি উদ্ভাবনের জন্য সন্দেহ বা তাঁদের ভাবমূর্তি বিকৃত করার জন্য দোষারোপ করার প্রয়োজন নেই। একথা স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, কোনো শাহী দরবারভুক্ত ঐতিহাসিক মোঘলদের পক্ষে অসম্মানজনক

২২৯. Foster, William, Early Travels in India. Preface. P.X.
২৩০. Bernier, Francois, Travels in the Mugal Empire. p. 274.

www.pathagar.com

কিছু লেখার সাহস করতেন না। কিন্তু জনসাধারণ এ রকম বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করত। ভারতীয় নারী ও পুরুষ, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ সকলেই হেরেমের অভ্যন্তরের ঘটনাবলি সম্বন্ধে আলাপ বা কানাঘুষা করত কিন্তু এসব সম্বন্ধে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা কোনোকিছু লেখার সাহস পেতেন না, কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা তা স্বাধীনভাবে কানাঘুষা করতেন, স্বাধীনভাবে লিখতে পারতেন। ইউরোপীয় পর্যটকরা অপবাদ আবিষ্কার করতেন না; তাঁরা যা শুনতেন ও দেখতেন শুধু তাই লিখতেন।

ইউরোপীয় লেখকদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হলো যে, তাঁরা উচ্চমন্যতায় ভুগতেন এবং মোঘল সমাজজীবন সম্বন্ধে ছড়াতেন অখ্যাতি। এই অভিযোগও সূক্ষ্ম পরীক্ষায় টিকতে পারেননি। এটা সত্য যে, বার্নিয়ার ও মানুচী মাঝে মাঝে ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা যথার্থই শাহীদরবারের ভৃত্যাদের ব্যবহার ও দৃঢ় প্রতিবাদের মধ্যে তোষামোদ, অতিরঞ্জন ও কপটতার আমেজ লক্ষ করেছেন।[২৩১] এই পর্যায়েও ভারতে আগত ইউরোপীয় পর্যটকরা ছিলেন ভারতীয় শাসকদের প্রতি অনুনয়প্রবণ। তাঁদের অনেকেই কোনো কাজ বা অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মোঘল সাম্রাজ্যে অনেক চেষ্টার পরে সামান্য বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন।[২৩২] এই সময়ে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদেরকে গণ্য করা হতো সামান্য ব্যবসায়ী হিসেবে, যেহেতু পারস্যের ঐতিহাসিকরা এমনকি তাঁদের প্রতি লক্ষও করেননি। এটা হয়তো এই কারণে হয়ে থাকবে যে, মোঘল ঐতিহাসিকরা ছিলেন তাৎপর্যহীন সামাজিক অবস্থাধীন বিদেশিদের প্রতি ক্ষীণদৃষ্টিপূর্ণ মনোভাব। এটা হলো পদকের একটি দিক। অন্যদিকটি হলো এসব বিদেশি লোকজনে আগমন ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল।

উইলিয়াম হকিন্স গুজরাট উপকূল সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা। তিনি লিখেছেন, 'উপকূলে পৌঁছলে আমাকে সদয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, অসংখ্য লোক আমাকে অনুসরণ করল এবং সকলেই আমাকে নবাগত ব্যক্তি বলে দেখতে আগ্রহান্বিত হলো।'[২৩৩] গোলন্দাজ বিভাগ ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার জন্য তাঁরা শীঘ্রই মোঘল রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণির

২৩১. Manucci, Niccolao, Storia do Mogol, II, p. 324; III, p. 303; Bernier, p. 264.

২৩২. Manucci was first employed by Prince Dara on rupees eighty per month. Later on he got service under Kirat Singh, son of Raja Jai Singh, On rupees ten per day as a captain of artillery. Manucci, Introduction, p. I viii. Similarly, The Salary of a European Physician, a blood- letter, appointed by Prince Shah Alam, was two rupees a day which was latter raised to seven rupees. Manucci, iv, p. 218.

২৩৩. Hawkins, in Foster's Early Travels, p. 71.

www.pathagar.com

মধ্যে অর্জন করেন অনুগ্রহপূর্ণ মর্যাদা ও অবস্থান।[২৩৪] আকবর তাঁদেরকে এত ভালোবাসতেন যে যখন একদিন ফাদার মুনসিরেট তাঁর হঠকারিতার কারণে মুসলিম সভাসদদের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন তখন আকবর তাঁকে এমনকি প্রাসাদের মধ্যে বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ছিল ইউরোপীয়দের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। তিনি উইলিয়াম হকিন্সকে (১৬০৮-১৩ খ্রিষ্টাব্দে) পীড়াপীড়ি করেন তাঁর দরবারে আবাসিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে থাকার জন্য। তাঁকে চারশ ঘোড়ার অধিনায়ক বানানো হয় এবং তাঁকে ইংলিশ খান হিসেবে উপাধি দেওয়া হয়। তিনি আর্মেনীয় একজন খ্রিষ্টানকে বিয়ে করে বিশিষ্ট মোঘল রীতিতে জীবন যাপন করেন। তিনি সম্রাটের মদ্যপান পার্টিতে উপস্থিত থাকার সুবিধা ভোগ করেন। ফ্রান্সের চিকিৎসক বার্নার্ডও মোঘলদের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং সম্রাটের মদ্যপানের টেবিলের সঙ্গী হন যেখানে তাঁরা একত্রে পান করতেন মাত্রাতিরিক্তভাবে।[২৩৫] ক্যাট্রো বলেন যে, 'ইউরোপের যেকোনো জাতির ব্যক্তিকে দেওয়া হয় তার মদ্যপান উৎসবে (জাহাঙ্গীরের) স্বাধীন প্রবেশাধিকার।'[২৩৬] স্যার টমাস রোঁর মতে, জাহাঙ্গীরের অনুচরবর্গের মধ্যে ছিল অনেক ইংরেজ ভৃত্য।[২৩৭] মানুচী ও বার্নিয়ার নিয়োজিত ছিলেন দারার চাকরিতে। দারা ইংরেজ ও ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদেরকে খুব ভালোবাসতেন। মানুচী পরে আওরঙ্গজেবের পুত্র মোয়াজ্জেমকে বা যুবরাজ শাহ্ আলমের চাকরিতে যোগ দেন। আওরঙ্গজেব নিজেও হল্যান্ডবাসীদেরকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি হল্যান্ডের দূতগণকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন।[২৩৮] ট্যাভার নিয়ার প্রায় সম্পূর্ণভাবে ছিলেন সাম্রাজ্যের রাজকীয় রত্ন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মোঘল দরবারে ইংরেজগণ ভোগ করতেন অনুগ্রহ ও সুবিধাপূর্ণ পদমর্যাদা। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদেরকে নির্বিচারে অনুগ্রহ করা হতো। খারাপ আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে মাঝে মাঝে তাদেরকে অপমান করা হতো ও শাস্তি দেওয়া হতো।[২৩৯] তারপরও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরেজগণ শাহীদরবারে সুবিধাজনক পদমর্যাদা ভোগ করতেন। তাঁরা ছিলেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং

---

২৩৪. Manucci, I, p. 95.
২৩৫. Bernier, p. 274.
২৩৬. Ibid., p. 274n.
২৩৭. The Embassy of Sir Thomas Roe, Hakluyt Society (London, 1899), pp. 321-24.
২৩৮. Manucci, I, p. 223; Bernier, pp. 127-28.
২৩৯. Ibid., I. p. 90. Jahangir once punished Hawkins as the latter had come to the court drunk against the King's order.

www.pathagar.com

তাঁরা দেশ, শাহীদরবার ও প্রাসাদ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতেন। হেরেম জীবন সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ভাসা ভাসা প্রাকৃতিক নয়।

ইউরাপীয় পর্যটক, ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে যারা আকবরের রাজত্ব কালে ভারতে আসেন এবং মোঘল হেরেম সম্বন্ধে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে ফাদার এনথনি মুনসিরেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুনসিরেট ছিলেন একজন পর্তুগিজ এবং ১৫৮০-১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়া থেকে মোঘল রাজদরবারে আগত প্রথম খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের একজন সদস্য। তিনি আট বছর তাঁর ধারা বিবরণী পুস্তকের কাজ করেন[২৪০] এবং তা ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে শেষ করেন। তিনি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪১] মুনসিরেট লিখেছেন মোঘল শাহজাদা ও শাহজাদিদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে। তিনি সম্ভ্রান্ত নারীদেরকে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে দেখেন এবং তাঁদের ভ্রমণকাল শিবিরবাস সম্বন্ধে লিখেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হিন্দুস্তানে অবস্থানরত ইংরেজ সাহেব এডওয়ার্ড টেরি লিখেছেন হেরেম শিবিরের জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে ও (১৬১৬-১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ)। উইলিয়াম হকিন্স (১৬০৮-১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ) রাজকীয় হেরেম ও নওরোজ উৎসবের খরচ সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন এবং উইলিয়ম ফিন্স (১৬০৮-১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে) সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদিগণের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আনন্দদায়ক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লাহোরের দুর্গ ও মহলের নারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন; তিনি বিস্তারিত লিখেছেন আগ্রার দুর্গ ও সেখানে বসবাসরত কাঞ্চনি বা নর্তকীদের সম্বন্ধে। স্যার টমাস রো (১৬১২-১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে) পর্দার আড়ালে নারীদের দ্রুত সম্বাতারী দৃশ্যগুলো অবলোকন করেন এবং তাদের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেন। সোনার কাজ করা কাপড়ে আবৃত চার চাকার গাড়িতে চড়ে নূরমহল কীভাবে বাইরে যেতেন তার একটি চিত্র এঁকেছেন তিনি। সেবাস্তিয়ান মানরিক (১৬২৮-৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) ও মানসিয়ার ডি থিভিনট ও (১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) হেরেম সম্বন্ধে লিখেছেন। এ সবকিছু সমষ্টিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। যহোক, এ সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু মোঘল হেরেম সম্বন্ধে তথ্যভাণ্ডার সরবরাহ করে।

৬. পিলসার্ট, মানুচী ও বার্নিয়ার

যে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কিছুটা বিস্তারিতভাবে রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হেরেম জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে

---

২৪০. Translated from Latin by J.S. Hoyland and annotated by S.N. Banerjee under the title of the Commentary of Father Monserrate. p. 72.

২৪১. A.N. Introduction. pp. xx. xxii.

www.pathagar.com

ফ্রানসিসকো পিলসার্ট, নিকোলাই মানুচী ও ফ্রান্সিস বার্নিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁদের রচনাকালের বিস্তৃতি (১৬২০-১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ) এক শতাব্দী। পিলসার্ট ছিলেন ওলন্দাজ, মানুচী ইতালিয়ান ও বার্নিয়ার ফরাসি; কিন্তু হেরেম সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান চমৎকার। ফ্রানসিসকো পিলসার্ট ছিলেন ইল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সরকারি কর্মচারী। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে ভারতে পাঠানো হয় এবং তিনি সিনিয়র ফ্যাক্টর পদে উন্নীত হয়ে ভারতে থাকেন ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত। তিনি অধিকাংশ সময় আগ্রাতে থাকতেন, কারণ কোনো ইংরেজ বণিক ভারতে এসে নীল ব্যবসাকে অবহেলা করতে পারতেন না এবং আগ্রার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে সর্বোৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হতো। এছাড়া আগ্রা ছিল জাহাঙ্গীরের রাজধানী। পিলসার্টের কড়াপ্রতিবাদ বা প্রতিবেদন সংক্ষিপ্তভাবে আগ্রাতে তাঁর সাত বছরের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে।[২৪২] এটা প্রধানত একটি বাণিজ্যিক দলিল; কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, পিলসার্ট এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিবেশের বিস্তারিত বিবরণ। এই সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিবেশের মধ্যেই পরিচালিত হতো ব্যবসা-বাণিজ্য।[২৪৩] ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও সরকারি পদমর্যাদা তাঁর সাথে শাহীদরবার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখত। সম্রাটের অভ্যাস, নূরজাহানের রাজনৈতিক উত্থান ও ব্যবসার প্রতি নূরজাহানের আগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত জ্ঞান।[২৪৪] পিলসার্টের সাথে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যাঁরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং যাঁদের বাসভবনে তিনি বেড়াতে যেতেন প্রায়ই।[২৪৫] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসস্থান এবং হেরেমের মধ্যে তাঁদের জীবন যাপন প্রণালি বিপুল পরিমাণ সত্যতায় সুস্পষ্ট।

নিকোলাই মানুচী মোঘল হেরেম সম্বন্ধে সবচেয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাই তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছুটা পুনঃমূল্যায়ন করা দরকার। চৌদ্দ বছর বয়সে ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি ভেনিস ত্যাগ করেন এবং ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি অবতরণ করেন ভারতে। একই বছর জুন মাসে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ দারাশিকোর সেনাবাহিনী গোলন্দাজ বিভাগে তিনি নিজেকে তালিকাভুক্ত করেন। সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি

---

২৪২. Moreland, W.H., and Geyl, p. Jahangir's India, being an English Translation of Francisco Pelsaert's Remonstrantie, Introduction, P.X.

২৪৩. Ibid., Preface, p. v.

২৪৪. Pelsaert, pp 4.51-53.

২৪৫. Ibid., pp. 3-5.

www.pathagar.com

দারাশিকোর সাথে ছিলেন। যুবরাজের সাথে পালিয়ে তিনি যাত্রা করেন মুলতান ও ভাক্কারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দারা বন্দি হওয়ার পরে মানুচী ফিরে আসেন দিল্লিতে এবং তিনি পুনরায় চাকরি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তিনি আওরঙ্গজেবকে অপছন্দ করতেন।[২৪৬] তিনি পাটনা, রাজমহল ও ঢাকা ভ্রমণ করে কাশিমবাজার হয়ে ফিরে আসেন আগ্রাতে। ধীরে ধীরে তিনি আগ্রা ও দিল্লিতে চিকিৎসা পেশা অবলম্বন করেন। ইতোমধ্যেই তিনি অম্বরের জয়সিংয়ের অধীন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসেবে চাকরি গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে যাত্রা করেন দাক্ষিণাত্যের দিকে। তিনি ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন বা জুলাই মাসে সম্রাটের শিবিরে দেখতে পান শিবাজিকে। বিজাপুরের বিরুদ্ধে দক্ষিণ অভিমুখে জয়সিংয়ের পরবর্তী সামরিক অভিযানে মানুচীও অংশগ্রহণ করেন।[২৪৭] স্পষ্টত তাঁর পদের দায়িত্ব পালনে পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি কাজে ইস্তফা দেন। ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোয়াতে যান, কিন্তু ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ফিরে আসেন আগ্রা ও দিল্লিতে। তিনি লাহোরে ছয়-সাত বছর ধরে চিকিৎসা কাজ চালিয়ে যান এবং এ ক্ষেত্রে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কারণে ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে দামানে দেখা যায়; পরে তিনি বোম্বে দুর্গের উত্তরে বান্দ্রাতে তৈরি করেন তাঁর বাসা। কিন্তু মাত্র দুই বছর পরে মানুচী মোঘল দরবারে আর একবার ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। তিনি দিল্লিতে ফিরে এলে সেখানে শাহ আলমের অন্যতম স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য তাকে ডাকা হয় এবং তাঁর কানের ছিদ্রপথে আস্তরণ জমে ওঠাজনিত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে মানুচীর চিকিৎসা পেশার প্রতি শাহ আলমের উক্ত স্ত্রী স্বয়ং অনুপ্রাণিত হন এবং সেই যুবরাজের অন্যতম চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নিয়োগ অর্জন করেন। এই নিয়োগের ব্যাপারটি ঘটে ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারির পরে, যে তারিখে শাহ আলম দক্ষিণের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মানুচী তাঁর অনুচরের সঙ্গে সেখানে গমন করেন।[২৪৮] কিন্তু সেখানে তাঁর অবস্থা বিরক্তিকর দেখতে পেয়ে তিনি পালিয়ে যান ইংরেজ বসতি নারসাপুর ও মাসুলিপাত্তামে। পরে তিনি ইংরেজ বসতি মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন এবং পুনরায় শুরু করেন চিকিৎসকের পেশাগত কাজ। ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী মারা যান এবং ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তিনি তাঁর

---

২৪৬. Manucci. Introduction by William Irvine. 1. p. I viii.
২৪৭. Loc. Cit.
২৪৮. Manucci. Irvine's Introduction. p. I iv.

www.pathagar.com

বাসা পরিবর্তন করেন পন্ডিচেরিতে। পরবর্তী বছরে তিনি মোঘল শাহীদরবারে ভ্রমণে যাওয়ার প্রস্তাব করেন– পাঁচ বছর পূর্বের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত শাহ আলমের অনুরোধে। মাদ্রাজ কাউন্সিল ও মোঘলদের সাথে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর মধ্যস্থতাকে কাজে লাগাতে ইচ্ছা পোষণ করেন, কারণ তাঁর ছিল পারস্য ভাষায় জ্ঞান, কিন্তু শাহ আলমের মৃত্যুতে মানুচীর দিল্লিতে ভ্রমণ পরিকল্পনার অবসান ঘটে।[২৪৯] কথিত আছে যে, মানুচী ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে অশীতিবর্ষীয় লোক হিসেবে মারা যান ভারতে।[২৫০]

মানুচীর কর্মজীবনের এসব বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনি কতটা ভ্রমণশীল ব্যক্তি ছিলেন তা দেখানোর জন্য। তিনি সমগ্র ভারত, ভারতের কিছু স্থান ও অঞ্চল অনেকবার ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যুবরাজ দারা ও শাহ আলম, রাজা জয় সিং ও তাঁর পুত্র কিরাত সিংয়ের অধীন চাকরি করেন। তিনি ইউরোপীয় স্বদেশবাসীর সঙ্গেও তাঁদের জন্য কাজ করেন। তিনি শিবাজি ও শম্ভুজীর সাথে আলোচনা করেন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার হিসেবে বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অবশ্যই তিনি একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে মোঘল রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু বছর ধরে কাজ করেন।

এ সবকিছুর চেয়েও বড় কথা হলো যে, তিনি 'স্টোরিয়া ডু মোগল (১৬৫৩-১৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে)' নামে মোঘল ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, বড় বড় চারটি ভলিউমে। এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মোঘল হেরেম সম্বন্ধে বিবরণ।

হেরেম জীবন সম্বন্ধে লেখার জন্য মানুচী ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করেন এবং যদিও তিনি পর্তুগিজ ভাষায় কাহিনিটি রচনা করেন, তিনি ভারতকে গ্রহণ করেন তাঁর বাসস্থান হিসেবে এবং বেশিরভাগ সময় মোঘল রাজদরবারে বসবাস করেই তিনি ভারতে সময় অতিবাহিত করেন। তিনি পারস্য ভাষা শিক্ষা করে প্রাচ্যরীতিতে জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক যুবরাজ শাহ আলম এমনকি এটাও চেয়েছিলেন যে, তিনি একজন মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করে মোঘল জীবন যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন; কিন্তু মানুচী অস্বীকার করেন এ ধরনের প্রলোভনের শিকার হতে।[২৫১] তৎসত্ত্বেও তিনি বহু সংখ্যক মানুষের সংস্পর্শে আসেন এবং তিনি মোঘল রাজনীতি ও সমাজ সম্বন্ধে অর্জন করেন বিপুল তথ্য।

---

২৪৯. Ibid., Introduction, p. I xiv.
২৫০. Ibid., p. I xvii.
২৫১. Ibid., II, p. 403.

www.pathagar.com

শাহ্ আলমের হেরেম, জাহানারা বেগমের মহল এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসভবনে ছিল তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার। তার চাকরি জীবনের শুরুতে চোখবাঁধা অবস্থায় নপুংসকগণ কর্তৃক তাঁকে নেওয়া হতো হেরেমে।[২৫২] কিন্তু পরে যখন তিনি এতে বিরক্তি বোধ করতেন তখন মানুচীকে চোখ বাঁধা ছাড়াই হেরেমে আসার অনুমতি দেন শাহ আলম ।[২৫৩] ঠিক কোন্ সময়ে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু ধারণা করা যায় যে, মানুচীর অত্যন্ত পরিণত বয়সে এবং তিনি যখন চিকিৎসক হিসেবে সাফল্যের জন্য হেরেম নারীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তখন তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল এই অনুমতি ।[২৫৪] এর আগে জাহানারার বাসভবনে তাঁকে পরিচিত রীতিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হতো এবং তিনি হেরেমের প্রধান মহিলা ও তাঁদের নপুংসকদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ।[২৫৫] সম্ভবত ভারতে তাঁর আগমনের ঠিক পরেই ষোল বা সতেরো বছরের যুবক হিসেবে তিনি যুবরাজ দারার চাকরিতে যোগদান করেন এবং তদানীন্তন চল্লিশোর্ধ্ব শাহজাদি প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্যের কাজকর্মের তদারকি করতেন। এভাবেই তিনি জানতে পারেন রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়িকা, রাজগণিকা ও নর্তকীদের নাম। তাঁর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাদের অনেককে চিনতেন ব্যক্তিগতভাবে। তিনি ছিলেন প্রফুল্ল ও মিশুক প্রকৃতির। তিনি ছোট মেয়েদের সাথে কৌতুক করতেন এবং অবিবাহিতা যুবতিদের প্রতি জ্ঞাপন করতেন শ্রদ্ধা ।[২৫৬] সত্যিকার অর্থেই হেরেমের অনেক বাসিন্দার প্রেমঘটিত সমস্যা সমাধানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহায়ক ।[২৫৭]

এভাবেই মানচি মোঘল হেরেমের বিষয়াদি সম্বন্ধে অর্জন করেন মৌলিক জ্ঞান এবং তিনি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেননি। তিনি লিখেছেন, 'আমি একথা অবশ্যই যোগ করব যে, আমি অন্যদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিনি এবং আমি এমন কিছু সম্বন্ধে বলিনি যা আমি দেখিনি এবং হিন্দুস্তানে আমার আটচল্লিশ বছরের জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করিনি। আমি এক স্থানে থাকিনি, আমি সর্বদা ভ্রমণরত ছিলাম যা আমাকে দিয়েছে এই বিশাল সাম্রাজ্যে সংঘটিত সবকিছু সম্বন্ধে অধিকতর সঠিক জ্ঞান অর্জনের উপায় ।'[২৫৮] তিনি এই মতামত

---

২৫২. Ibid., pp. 356-57.
২৫৩. Ibid., p. 400.
২৫৪. Ibid., Introduction, I, p. I xi.
২৫৫. Ibid., I, p. 220
২৫৬. Ibid., II, p. 341.
২৫৭. Ibid., pp. 397-98.
২৫৮. Ibid., p. 329.

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছেন বিশেষত রাজকীয় বাসভবনের নিয়ম ও প্রথা এবং সাধারণত মহল বা অন্দর মহল নামে পরিচিত লোকদের সাথে ব্যবহার রীতি সম্বন্ধে লেখার আগে।[২৫৯] একজন ঐতিহাসিক হিসেবে মানুচীকে ভারতে তাঁর আগমনের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য বিশ্বাস করা যাবে না; কিন্তু শাহজাহানের রাজত্বকালের পরবর্তী বছরগুলো ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের পঞ্চাশ বছরের জন্য মানুচীর মতো একজন ইতিহাস লেখকের বিবরণ উপেক্ষা করা যায় না। তিনি জীবনের ক্ষীণ সময়গুলোতেও লেখনী ধারণ করেন, কোনো কোনো ঘটনা সংঘটনের ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পরে লেখা হয়েছে, কিন্তু এসব বিবরণের সত্যতা বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া মানুচীর ঐতিহাসিক বর্ণনা নির্ভুল এবং এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার অনুমান এই যে, যেখানে এ ধরনের কোনো সমর্থন নেই সেখানেও তাঁর ঐতিহাসিক বর্ণনা সমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য।[২৬০] স্থান ও তারিখের নির্ভুলতার সাথে সঠিক ও বিশ্বাস উদ্রেককারী বিস্তারিত বিবরণ প্রদানে মানুচীর সহজাত প্রবণতা আছে।

ফ্রানকোইস বার্নিয়ার মানুচীর দুই বছর পরে ভারতে পৌঁছেন ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও উচ্চ শিক্ষিত।[২৬১] তিনি ভ্রমণও করেন অনেক স্থানে। সুরাটে অবতরণ করে তিনি ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দারার শিবিরে যোগ দেন এবং তাঁর সঙ্গে যান চিকিৎসক হিসেবে। মোঘল রীতি অনুসারে, হেরেমের নারীদের সাথে আলোচনা ও চিকিৎসার জন্য হেরেমের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁকে নপুংসকগণ কর্তৃক মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত শাল কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হতো।[২৬২] কিন্তু তাঁর ছিল বিপুল পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।[২৬৩] আগ্রা ও দিল্লি ছাড়াও তিনি উত্তরে কাশ্মির ও পূর্বদিকে বাংলা পর্যন্ত যান। তিনি ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এ পর্যন্ত সর্বাধিক পঠিত অন্যতম ঐতিহাসিক বর্ণনাকারী ব্যক্তিত্ব।[২৬৪] মোঘল হেরেম সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গভীর, কারণ তথ্যাবলির উৎস অনেক ও বিচিত্র এবং দীর্ঘ কয়েক বছর তিনি মোঘল হেরেমে অবস্থান করেন।[২৬৫]

---

২৫৯. Ibid., p. 330.
২৬০. Ibid., Irvine's Introduction, pp. l xxi-l xxii.
২৬১. Irvine in Manucci, Introduction. I. p. l xxiii.
২৬২. Bernier, Travels, p. 267.
২৬৩. Preface, p. xvi.
২৬৪. Beni Prasad, History of Jahangir, p. 406.
২৬৫. Bernier, p. 237.

www.pathagar.com

৬. (ক) তাঁদের তথ্যাবলির উৎসসমূহ

বিদেশিরা কোথা থেকে মোঘল হেরেম সম্বন্ধে তথ্যাবলি পেয়েছিলেন? সাধারণত ইউরোপীয়রা বিশেষ করে মানুচী ও বার্নিয়ারের জন্য মোঘল হেরেম সম্বন্ধে তথ্যের প্রধান উৎস ছিল স্বয়ং হেরেমবাসীগণ। মহলের তত্ত্বাবধায়িকা ও নপুংসকগণ ছিল সবচেয়ে সংযোগসাধক ও বহুভাষী; চাকরানিরাও পিছিয়ে ছিল না এ ব্যাপারে। মোঘল অন্দরমহলেও অভিজাতদের হেরেমে ইউরোপীয় নারীরাও ছিল। বিশেষ করে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে পর্তুগিজ কলোনিতে শাহজাহানের সামরিক আক্রমণের পরে যখন চারশ খ্রিষ্টানকে আগ্রাতে নেওয়া হয় তখন তাদের উপস্থিতি হেরেমে প্রাধান্য অর্জন করে। সুন্দরী নারীদেরকে শাহী অন্দর মহলের বাসিন্দা করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও কম সুন্দরীদেরকে উমরাহদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।[২৬৬] যখন মানুচী ও বার্নিয়ার ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেষে পৌঁছেন তখন ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে যুবতি অবস্থায় আটককৃত নারীরা ২৬-২৭ বছর পরে হয়তো বৃদ্ধ হয়ে যান ও তাদের চলাফেরায় খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এমনকি ভিন্নতর অবস্থাতেও তারা হয়তো মুসলমানদের পালনীয় ব্যাপক পর্দাপ্রথার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি। রাজধানীতে ছোট ইউরোপীয় সমাজ ছিল একত্রিত এবং এই ইউরোপীয় সমাজের সদস্যরা পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করত।[২৬৭] এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, বার্নিয়ার রাজপ্রাসাদের বিষয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন একজন পর্তুগিজ মহিলার কাছ থেকে। এই পর্তুগিজ মহিলা ছিল একজন দাসী, যে খুশিমতো মহলের মধ্যে ও বাইরে যাওয়ার সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছিল।[২৬৮] মানুচীও অনেক কিছু জানতে পরেন প্রাসাদের পর্তুগিজ মহিলাদের কাছ থেকে। তাঁর অন্যতম সংবাদদাতা ছিল মারিয়া ডি টাইডেস নামক একজন বোন, সম্রাট শাহজাহানের প্রাসাদে বসবাস করত এবং যাকে বাংলা থেকে বন্দিনী অবস্থায় আনা হয়েছিল।[২৬৯] মারিয়া ডি টাইডেসকে পরে বিবাহ দেওয়া হয় আলী মর্দান খানের সাথে[২৭০] এবং আর একজন পর্তুগিজ মহিলাকে বিবাহ দেওয়া হয় সাদাত খানের সাথে।[২৭১] হুগলির পতনের সময় থোমাজিয়া মার্টিনস নামে একজনকেও বন্দি করা হয়। তিনি ছিলেন রাজকীয়

---

২৬৬. Ibid., p. 177. Abdul Hamid Lahori, Badshah Nama, E&D, vii, pp. 31-35, 42-43. Also C.H.I., iv, p. 192.
২৬৭. Nicholas Withington in Foster, Early Travels, pp. 222-23.
২৬৮. Bernier, p. 132.
২৬৯. Manucci, III, p. 179.
২৭০. Loc. Cit.
২৭১. Ibid., I, p. 202

www.pathagar.com

খানাপিনা টেবিলের কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং রওশন আরা বেগম তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁকে মাসে সাত দিন স্বামীর গৃহে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে কী ঘটছে তা তিনি আমাকে জানাতেন।[২৭২]

এটা সুবিদিত ঘটনা যে, মোঘল রাজ্য কতকগুলো শিবিরে বিভক্ত ছিল। যদি কোনো ইংরেজ কোনো একজন শাহজাদা বা অভিজাত ব্যক্তির প্রিয়ভাজন হতেন তবে অন্য একজন ইংরেজ অন্য এক শাহজাদা বা অভিজাত ব্যক্তির প্রিয়ভাজন হতেন। মোঘল সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুচী ও বার্নিয়ার ছিলেন পরস্পর বিপরীত পক্ষে। মানুচী ছিলেন দারার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং বার্নিয়ার ছিলেন আওরঙ্গজেবের পক্ষে এবং অযাচিতভাবে শত্রুদেরও তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে গল্প-গুজব স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ছড়াত সংশ্লিষ্ট শিবিরের তত্ত্বাবধায়িকা ও নপুংসকগণ। কারণ তারা ছিল শ্রেষ্ঠ গল্পবাহক বা গল্পকথক এবং ইউরোপীয়রা ছিল শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রাহক। মানুচী ও বার্নিয়ার দুইজনেই ছিলেন চিকিৎসক। তাঁদের রোগীরা ছিল সব শ্রেণির মানুষ– রানি ও শাহজাদি থেকে চাকর-চাকরানি পর্যন্ত। বিশেষ করে চিকিৎসকের সাথে খোলাখুলিভাবে গল্প করা রোগীদের অভ্যাস। তারা চিকিৎসকের সাথে ব্যক্তিগত বা অন্য কোনো তুচ্ছ বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গল্প করে মনের উত্তেজনা প্রশমিত করত। তাই মানুচী ও বার্নিয়ার ছিলেন হেরেম বা নগরীতে সংঘটিত বিষয়াদি, ভাসমান গুজব, বাস্তব ঘটনা ও কাল্পনিক কাহিনি জানার মতো সুবিধাজনক অবস্থাতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, রাজপ্রাসাদে দিল-জো নামে শাহ্ আলমের একজন দাসী ছিল। দাসীটি পীড়াগ্রস্ত হলে সে অনিদ্রা, মতিভ্রম ও মূর্ছারোগে ভোগে। তার জন্য কিছু নিরাময়কারী ওষুধ ব্যবহার করার পরে মানুচীকে তার চিকিৎসার জন্য বলা হয়। সে ছিল যুবতি এবং কয়েকদিন চিকিৎসার পরে মানুচী পরামর্শ দেন যে, তাকে বিবাহ দিতে হবে এবং এভাবেই সে ফিরে পাবে তার স্বাস্থ্য। মেয়েটিকে যুবরাজের বাসভবনের একজন ভৃতের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। এর দুই মাস পরে সে পূর্ণস্বাস্থ্য উপভোগ করতে শুরু করে। অন্যান্য মহিলা ভৃত্যও একইভাবে চিকিৎসা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং মানুচী তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করেন তাঁর সব শক্তি দিয়ে এবং তারপরে কয়েকজনকে বিবাহ দেওয়া হয় তাদের পছন্দ অনুসারে।[২৭৩] এতে তারা এতই আনন্দিত হয় যে, তারা তাঁকে মহলের সমস্ত ঘটনা বলত।

২৭২. Ibid., II, p. 35.
২৭৩. Ibid., II, pp. 397-98.

www.pathagar.com

৬. (খ) তাঁদের বিবরণ অবহিতকরণ

এইভাবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের তথ্যাবলি নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। এটা সম্ভব যে, কতকগুলো দিক ও ঘটনা সম্বন্ধে তাঁদেরকে সঠিকভাবে জানানো হয়নি। এটাও সত্য যে, কয়েকজন পর্যটকের ভারতে অবস্থান ছিল সংক্ষিপ্ত এবং তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়ে তাঁরা এই দেশটিকে বুঝতে পারেননি এবং একজন বেগম বা একজন তত্ত্বাবধায়িকা সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছেন তাই সমগ্র হেরেমের জন্য সাধারণ ব্যাপার বলে ধরে নিয়েছেন। দ্রুতগতিতে সাধারণ ধারণা তৈরির জন্য তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অপবাদ রটানোর দোষে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না। তাঁদের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে উল্লেখকৃত মোঘল হেরেম জীবনচিত্রের অত্যাবশ্যক বস্তুসমূহ কৌতূহল উদ্দীপক, তথ্যমূলক ও সাধারণভাবে সত্য। এগুলো গুরুত্বপূর্ণও বটে, বিশেষ করে এই কারণে যে, সমাজ জীবনের এই দিকটি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছা করে অবজ্ঞা করেছেন। তাঁদের মনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করারও প্রয়োজন নেই। হিন্দুস্তানে ইউরোপীয়রা ছিলেন বিদেশি। তাঁদের কাছে ভারতীয় জীবনপ্রণালি ছিল ভিনদেশি। এখানকার সব প্রথা তাঁদের কাছে নতুন বলে মনে হতো এবং তাদের মনে জাগত বিভিন্ন কৌতূহল। স্বভাবতই তাঁরা ভারতীয় সমাজচিত্রের মৌলিকত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং নিজের দেশের সাথে তুলনা করত।

পিলসার্ট কঠোর পর্দাপ্রথার মধ্যে জীবনযাপনরত অভিজাত মোঘল নারীদের প্রেমবঞ্চিত জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেন, 'আমাদের দেশের নারীদের এই বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হওয়া উচিত তাদের জন্মগত সৌভাগ্য ও অন্য দেশগুলোর নারীদের অবস্থার তুলনায় তাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে।'[২৭৪] বার্নিয়ারের মন্তব্যও একই রকম। জাহানারার একটি বা দুটি প্রণয়ঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে লিখে বার্নিয়ার মন্তব্য করেছেন, 'আমি লিখছি এই কারণে যে, এশিয়ার মতো ইউরোপে প্রেমের দুঃসাহসিক ঘটনা একই রকমের বিপদসংকুল নয়; ফ্রান্সে প্রেমের ঘটনা শুধু আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, হাস্য উদ্রেক করে এবং তা ভুলে যাওয়া হয়; কিন্তু পৃথিবীর এই অঞ্চলে প্রেমের ক্ষেত্রে ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক দুর্যোগ এড়িয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত খুব কম।'[২৭৫] অন্য বহু তুলনা ও লৌকিকতা ইউরোপীয় পর্যটকদের প্রেরণা দেয় মোঘলদের

---

২৭৪. Pelsaert. p. 66.
২৭৫. Bernier. p. 12.

www.pathagar.com

জীবন সম্বন্ধে লিখতে। তাঁরা মোঘল জীবনের জাঁকজমক দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং মোঘল জীবনের আড়ম্বর দেখে অভিভূত হন। মানুচী লিখেছেন, 'আমি নিশ্চয়তার সাথে বলছি মোঘল সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও সর্বোপরি সম্রাট এমন জাঁকজমকের সাথে জীবন যাপন করেন যে বহুমূল্য ইউরোপীয় রাজসভা ভারতীয় রাজসভায় পরিদৃষ্ট দীপ্তির সাথে সম্পদ ও জাঁকজমকের দিক থেকে তুলনীয় নয়।'[২৭৬] পিলসার্টের মনে সৃষ্ট ধারণাও অনুরূপ।[২৭৭]

অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তি এভাবে মোঘল রাজদরবার ও হেরেমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতি হন। তাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে লিখতেন। তাঁদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক উদ্দীপনাও বিরাজ করত। তাঁরা পরস্পরের সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে লিখতেন এবং জানতেন যে তাঁরা কোনো সন্দেহমূলক বা মিথ্যা বিষয় লিখলে তাঁদের স্বদেশবাসীরা তা প্রকাশ করে দেবে। তাই তাঁরা অপবাদ প্রচার না করে চেষ্টা করেন বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবতাপূর্ণ বিবরণ প্রদান করতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, যখন মানুচী দেখেন যে বার্নিয়ারকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে তখন তিনি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি অত্যন্ত বিস্মিত যে মুনসিয়ার বার্নিয়ার প্রধান নাজির, প্রধান নপুংসক, শাহজাদি জাহানারা বা অন্য কোনো সূত্রে তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। জাহানারার মহলে আকাঙ্ক্ষিত কোনো ব্যক্তিকেও তাঁর প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দিতেন না এবং এই কারণেই তিনি নাজিরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তিটি তাঁকে মান্য করতেন, তাঁকে তুষ্ট করার সব পদ্ধতি অনুসরণ করতেন– তাঁর বিরুদ্ধে কাজ না করার ফলস্বরূপ বড় লাভের কথা বুঝতে পেরে।'[২৭৮] তিনি আরও জোরালো ভাষায় তাঁর সমালোচনা চালিয়ে যান যখন বার্নিয়ার শাহজাহান ও জাহানারার মধ্যে অজাচারমূলক সম্পর্কের অভিযোগ তুলে ধরেন।[২৭৯] সংক্ষেপে বলতে গেলে মোঘল সমাজে ইউরোপীয় পর্যটকগণ মোঘল হেরেমের জীবন সম্বন্ধে রেখে গেছেন বাস্তবভিত্তিক চিত্র। তাদের ঐতিহাসিক বিবরণ আসলেই অত্যন্ত মূল্যবান যদি তা স্বেচ্ছাকৃত বিবরণ না হয়। তাঁরা অর্থহীন অলংকার দ্বারা তাঁদের বিবরণ হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করেননি। পারস্যের ঐতিহাসিকদের তুলনায় অভিজাত ব্যক্তিদের প্রেমকাহিনির বর্ণনায় তাঁরা অধিকতর বিনম্র।[২৮০] এই

---

২৭৬. Manucci. II, p. 330.
২৭৭. Pelsaert. pp. 1-5.
২৭৮. Manucci. I. p. 220.
২৭৯. See infra chapter vi.
২৮০. See for example the narrative of Hamid Uddin Khan regarding the episode of Aurangzeb's falling dead long in love with Zainabadi. Vide chapter ix.

www.pathagar.com

ইউরোপীয়রা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারিণীর তুষ্টির বা অহমিকাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য লিখেন নি; তাঁরা কোনো শাসনকর্তা বা মনসবদারের ভয়েও ভীত ছিলেন না। তাই তাঁরা লিখতেন স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরকে বাদ দিয়ে মোঘল হেরেম বিষয়ক আলোচনা থেকে যেত নীরস ও নির্জীব। উৎসস্বরূপ তথ্যাবলির অবহিতকরণে স্পষ্টতই এই গ্রন্থ রচনার জন্য পঠিত সকল গ্রন্থের উল্লেখ নেই। সঠিক স্থানে এগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়ার মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে মোঘল হেরেম বিষয়ক অধ্যয়নে বিশেষ করে তিন জন অত্যন্ত মূল্যবান লেখক বলে প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন পণ্ডিত আবুল ফজল, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও বিদেশি পর্যটক মানুচী। আকবরের রাজত্বকালের যোগসূত্র ধরে আবুল ফজলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' নামক গ্রন্থদ্বয়কে বর্তমান আলোচনার জন্য অপরিহার্য করে তুলেছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর স্বাস্থ্য ও অভ্যাসগত কারণে তাঁর প্রচুর সময় হেরেমের অভ্যন্তরে অতিবাহিত করেন এবং তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে লিখেছেন সজীবতা ও সরলতার সাথে। নিকোলাই মানুচী একজন ইউরোপীয় হলেও কয়েক বছর ও দশক ছিলেন মোঘল হেরেমের একজন নিয়মিত পরিদর্শক এবং মোঘল হেরেম সম্বন্ধে অন্য যেকোনো বিদেশি পর্যটকের চেয়ে তিনি বেশি জানতেন। তিনটি বিভিন্ন মাত্রার ধারণা, নিষেধ এবং মতামতও এই লেখকেরা প্রদান করেছেন। আবুল ফজল ছিলেন একজন পেশাগত ঐতিহাসিক, একজন গুণী পণ্ডিত এবং সাম্রাজ্যের একজন বড় সরকারি কর্মচারী। জাহাঙ্গীর ছিলেন শিল্প ও প্রকৃতি প্রেমিক। তিনি কাউকে ভয় করতেন না, কারণ তাঁকে খুশি করতে হতো না কাউকে। মানুচী ছিলেন সমানভাবে একজন ভারতীয় ও বিদেশি। স্বাভাবিকভাবেই এই তিনজন লেখককে একত্রে গ্রহণ করলে তাঁরা মোঘল অন্দরমহল সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাই এই তিনজন লেখকের রচনা থেকে পৌনঃপুনিকভাবে ও ব্যাপকভাবে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে।

৬. (গ) মোঘল চিত্রকলা

পারস্যের ঐতিহাসিকদের রচনা ও বিদেশি পর্যটকদের ঐতিহাসিক বর্ণনার সঙ্গে মোঘল চিত্রকলা ও মোঘল হেরেম সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এগুলো 'মোঘল অনুচিত্রাবলি' নামে আখ্যায়িত এবং এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এগুলো কয়েক শতাব্দী যাবৎ মোঘল শাসনকাল জুড়ে বিস্তৃত এবং মোঘল জীবনের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে চিত্রিত

www.pathagar.com

করেছে। এগুলোর অধিকাংশই সম্রাট ও অভিজাত ব্যক্তিদের চিত্র দিয়ে সাজানো। অন্য অনেক অনুচিত্রে রয়েছে রাজদরবারের দৃশ্য, যুদ্ধের দৃশ্য, শিকার, পশুদের লড়াই, দুর্গ নির্মাণ ইত্যাদির দৃশ্য। তাছাড়া অনুচিত্রাবলির অনেক চিত্রে রয়েছে হেরেমের দৃশ্যাবলির বিস্তৃত চিত্র। মোঘল ঐতিহাসিকগণের মতো মোঘল চিত্রশিল্পীরাও আকবরের শাসনকালের পরবর্তী সময়ের মতো কাজ করেছেন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। জাহাঙ্গীরের শাসনকাল থেকে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা হেরেমের দৃশ্য বাধাহীন স্বাধীনতায় বর্ণনা করতে শুরু করেন। এসব চিত্র যথার্থই সাহায্য করে হেরেমের পরিবেশ সম্বন্ধে পুনরায় বর্ণনা করতে। হালকা বাদামি রঙের চক্ষুবিশিষ্ট সুন্দরীদেরকে স্নানরত অবস্থায়, নিজেদেরকে পরিপাটি অবস্থায়, গাছপালা থেকে হাত বাড়িয়ে ফুল সংগ্রহ করতে, বীণা বা সেতার বাজাতে বা হ্রদের তীরে বিষণ্ন অবস্থায় বা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরে তাদের প্রেমিকদের জন্য অপেক্ষারত অবস্থা চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁদের সরল ও মনোহর পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রয়েছে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে থাকা লতানো গাছ ও কিচির মিচির শব্দে পাখিদের কূজন নিয়ে সুশোভিত স্থলভাগের দৃশ্য এবং প্রেমালাপরত তাদের নারী সঙ্গী ও নির্জনতার একাকিত্ব।

এ ব্যাপারে শুরুতেই একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা দরকার। কথিত আছে যে, হেরেমের দৃশ্য বর্ণনাকারী চিত্রাবলি শুধু আনুমানিক ও কাল্পনিক, কারণ রাজদরবারের চিত্রশিল্পীদের শাহী অন্দর মহলে যেতে বাধা ছিল এবং তাঁদের এ ধরনের দৃশ্যের প্রকৃত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ ছিল না।[২৮১] এটা সত্য যে, বিশেষ করে সম্রাজ্ঞী, উপপত্নী ও শাহজাদিগণ এবং সাধারণত অন্য নারীরা বাইরের লোকদের আগমনে পর্দা বজায় রাখতেন। কিন্তু হেরেমের অভ্যন্তরে তাঁরা প্রায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতেন এবং শত শত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতেন যাঁরা হেরেমের ভিতরকার সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে জানাতেন বাইরের লোকদেরকে। আনাগা বা পালকমাতা, দারোগা বা তত্ত্বাবধায়িকা, উর্দুবেগিরা বা সশস্ত্র নারী রক্ষীরা, মহলদার বা পরিদর্শকদের মতো হেরেমের সরকারি নারী কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন বিবাহিতা। তাঁরা কাজ করতেন হেরেমের সরকারি কর্মচারী হিসেবে কিন্তু কর্তব্য কর্মের সময় ব্যতীত তাঁরা থাকতেন নিজেদের বাসস্থানে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা পরিবারের লোকদেরকে হেরেমে যা কিছু দেখতেন তা বলতেন বলে অনুমান করা যায়। অভিজাত ব্যক্তিদের মহিলা, নর্তকী ও চিকিৎসকদের জন্য হেরেম সর্বদা খোলা থাকত

২৮১. Nihar Ranjan Ray, Mughal Court Paintings, Indian Museum (Calcutta, 1975), pp. 158, 188.

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের প্রবেশাধিকার। বিশেষ করে নপুংসকগণ হেরেমের ভিতর ও বাইরে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখত। হেরেমের বাইরে রাজকীয় কারখানাতে তৈরি করা হতো হেরেমনিবাসীদের জন্য বিশেষ আকার ও আকৃতির পোশাক, পরিচ্ছদ, অলংকার, জুতা ও অন্যান্য শত শত প্রকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কারখানার শ্রমিকরা জানত কী দ্রব্য উৎপন্ন করা হচ্ছে ও কার জন্য উৎপন্ন করা হচ্ছে। এভাবে দেখা যায় যে, হেরেম একটি বন্ধ করে রাখা গ্রন্থ ছিল না এবং চিত্রশিল্পীরা তাঁদের লভ্য তথ্যাবলির ভিত্তিতে হেরেমের বিষয়গুলো অংকন করতেন বিস্তারিতভাবে।

সম্রাট ও অভিজাত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে আগ্রহী ছিলেন হেরেমের দৃশ্যাবলি সচিত্র বর্ণনা করতে। অন্যথায় হেরেমের অনেক চিত্র পাওয়া যেত না। সাধারণত সরকারি উৎসবাদির চিত্রাবলি তুলে ধরত শাহজাদাদের জন্ম ও বিবাহের বর্ণনা। জন্মকালীন বর্ণনা সংবলিত দৃশ্যাবলি বহুকক্ষ যুক্ত এবং তা বর্ণনা করে অনেক ঘটনা; এমনকি একটি চিত্রে আবদ্ধ কক্ষও আছে।[২৮২] বান্দি. লাল ও মুকুন্দের মতো আকবরের শাসনকালের অনেক শিল্পী এঁকেছেন ইউরোপীয় ও ভারতীয় নারীদের ছবি, নারী সংগীত শিল্পীর দল ও বাগানে সংগীত গোষ্ঠীর ছবি।[২৮৩] হেরেম জীবনকে পুনরায় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনাকারী চিত্রাবলিতে অংকন করা হয়েছে দাবা ও চৌপার খেলায় রত মহিলাদেরকে, তাদের পায়ে রং মাখানো ও তাদের দ্বারা একটি নৃত্য অনুষ্ঠান বা হোলি উৎসব উপভোগের দৃশ্য।[২৮৪] শাহজাদিদের ঘোড়ায় চড়া বা পোলো খেলার দৃশ্য ছাড়াও রয়েছে এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে নারীদের নাচ দৃশ্যের চিত্রাবলি।[২৮৫] এগুলোর মধ্যে রয়েছে তত্ত্বাবধায়িকাদের সান্ত্বনাপ্রাপ্ত প্রেমবঞ্চিত নারীদের ছবি (১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ),[২৮৬] এক হাতে বাজপাখি ধরে রাখা ও তাদের মাথায় পরিহিত স্বচ্ছ পোশাকে সজ্জিত শাহাজাদিদের ছবি,[২৮৭] [২৮৮]একজন শাহজাদাকে একজন

---

২৮২. Geeti Sen. Paintings from the Akbar Nama. depicting birth of prince Salim pts. 56-57. Also in J.V.S. Wilkinson, Mughal paintings, p. 10. The Image of India, a painting depicts the birth of prince Murad. pl. 142; N. R. Ray. op. cit., pl. xx. p. 182, shows the marriage of prince Khurram.

২৮৩. S.P. Verma. Sixteenth Century Miniatures at the Royal Library and the India Office Library, p. I. H.C 1981. pp. 258-67.

২৮৪. Pratapditya pal. Court paintings of India, pls. 65,67,68.

২৮৫. Percy Brown. Indian paintings, pp. 138-49.

২৮৬. Woman of India, National Museum. No. 2014-60.

২৮৭. N.R. Ray. op. cit., pl. 9. p. 158.

২৮৮. Of C.E. 1760. Victoria and Albert Collection. London.

www.pathagar.com

শাহজাদির ফুলের মালা উপহার দেওয়ার দৃশ্য[২৮৯] বা একজন শাহাজাদার প্রেয়সীকে বরণ করার দৃশ্য।[২৯০]

এখন একথা অনুমানে বলা যায় যে, এসব চিত্র শুধু শিল্পীর কল্পনার ফল নয়। এই ছবিগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এগুলোর ধারণার জন্য নারীরা শিল্পীদেরকে কোনো ভঙ্গিমা প্রদর্শন করেননি অথবা মোঘল হেরেমে কোনো চিত্রশিল্পীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে মনে করাও ভ্রান্তিজনক হতে পারে। বাবরের স্ত্রী মাহাম বেগম সিংহাসনে বসতেন তাঁর স্বামীর পাশে।[২৯১] 'আকবর নামা'র একটি বিশাল চিত্রে মাহাম আনাগার কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রশস্ত মুখমণ্ডল, গাট্টাগোট্টা চেহারা, আকর্ষণীয় সাদা ও হলুদ বহির্বাস ও তাঁর কৃতিত্বমূলক হাবভাব।[২৯২] এটা নিশ্চিতভাবে বোঝায় যে কেউ তাঁকে কাছ থেকে দেখলে এমন ব্যক্তির দ্বারা আঁকা তাঁর সত্যিকারের ছবি।

সম্রাজ্ঞী হিসেবে নূরজাহান পর্দা মেনে চলতেন না। তিনি প্রায়ই হাজির হতেন ঝড়োকাতে। তাঁর প্রতিকৃতিগুলোও সম্ভবত তাঁর নিজস্ব মডেল অনুসারে তৈরি। অনেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজপুত বংশীয় রানিরাও এমনকি মোঘল হেরেমের মধ্যে পর্দা মেনে চলতেন না।[২৯৩] এটা সুবিদিত যে, মোঘল রানি ও শাহজাদিরা পোলো খেলতেন, অশ্বারোহণ ও পশু-পাখি শিকার উপভোগ করতেন। এই কাজগুলো তাঁদের মুখ ঢেকে রাখা অবস্থায় করা সম্ভব হতো না। এমন দৃশ্য আঁকা অনেক মোঘল অনুচিত্র আছে। এটা খুব সম্ভব যে, পর্দা মেনে চলা হেরেমের অনেক নারীর ছবি এঁকেছেন নারী চিত্রশিল্পীরা। এমন একটি মোঘল অনুচিত্র আছে যাতে দেখা যায় যে, একজন মহিলা নিজেই তাঁর ছবি আঁকছেন এবং তাঁর পরিচারিকা একটি আয়না হাতে তাঁর দিকে মুখ করে বসে আছে।[২৯৪] আবুল ফজল আকবরের আমলের একশ চিত্রশিল্পীর একটি তালিকা প্রস্তুত করার সময় একজন নারী শিল্পীর নামও উল্লেখ করেননি; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনো নারী শিল্পী ছিলেন না। তাঁর আমলে কবিদের তালিকায় তিনি কোনো মহিলা কবির নাম দেননি, যদিও এটা

---

২৮৯. Pratapditya pal. op., cit., pls. 54,171, attributed to the artist payag.
২৯০. N.R. Ray. pl. xxviii. p. 200.
২৯১. S.K. Banerjee. Humayun Badshah. p. 60.
২৯২. Geeti Sen. op., cit.. pls. 16-18 facing pp. 63-66.
২৯৩. Tod. Annals and Antiquities of Rajasthan. II. p. 287
২৯৪. Khamsa. British Museum of 12208. fol 206 a reproduced in A.J. Qaiser. The Indian Response to European Technology and Culture pl. 7a.

www.pathagar.com

সুবিদিত যে, রানি ও শাহজাদিগণ সহ অনেক কবি ছিলেন হেরেমে। একইভাবে সাক্ষ্য দেখা যায় যে, মোঘল হেরেমে নারী চিত্রশিল্পীও ছিলেন।[২৯৫] রাইকৃষ্ণ দাসের মতে, শাফিকা বানু নামক একজন নারী শিল্পীর প্রতিকৃতির কথা প্রকাশ পেয়েছে।[২৯৬] অবশ্যই নারী চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা ছিল কম এবং চিত্রশিল্পে পুরুষদের অংশগ্রহণ ছিল সর্বদা বাধ্যতামূলক। এটা আরও সত্য এই কারণে যে, একটি মোঘল অনুচিত্র তৈরি করা হতো অনেক শিল্পীর সমবেত প্রচেষ্টায়।[২৯৭]

বিশেষ করে মোঘল চিত্রশিল্প ও হেরেমের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আরও একটি সমস্যা আছে। কখনো কখনো একটি মোঘল অনুচিত্রের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। হেরেমের দৃশ্য বর্ণনাকারী কিছু চিত্রকর্ম বিশুদ্ধরূপে মোঘল চিত্রশিল্প নয় এবং এগুলো রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ ও আভাদের। কিন্তু সমস্যাটি বাস্তবে কতটুকু তার চেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান। উক্ত চিত্রকর্ম সম্পাদনের তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য পঞ্চাশ বছরের হলেও তাতে খুব বেশি কিছু এসে যায় না, কারণ তা চিত্রকর্মের মূলভাব বা এমনকি কখনো শিল্প আদর্শকে প্রভাবিত করত না। সমগ্র মোঘল আমলে রাজস্থানি ও মোঘল শিল্পীরা পরস্পরকে প্রভাবিত করত এবং উভয় শিল্পরীতিতে হেরেম বিষয়ক চিত্রাবলিতে একই শিল্প উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের অবনতির সময় অনেক চিত্রশিল্পী চলে যান রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য রাজ্যে। যদিও তাঁদের চিত্রশিল্পগুলো উপরোক্ত দুটি শিল্পরীতিতে ভাগ করা যায়, তবুও আসলে এগুলো মোঘল শিল্পীদের চিত্রকর্ম বা সেগুলো অভ্রান্ত ভাবে মোঘল শিল্পরীতির প্রভাব স্বরূপ।

তা যেমনই হোক না কেন, হেরেমের চিত্রাবলি আসলে প্রতিফলন ঘটায় হেরেম জীবনের। যদি চিত্রশিল্পীরা সর্বদা হেরেমের যে নারীদের ছবি আঁকতে হবে তাদের মুখ দেখতে না পারতেন তবে হোলি বা পোলো[২৯৮] খেলায়রত হেরেম নারীদের ছবি আঁকতে কখনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত না।[২৯৯] এজন্য অপরিহার্যভাবে বিশিষ্ট মহিলা ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ জীবনচিত্র তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল না।

---

২৯৫. Ganguly. o.c. Roopa Lekha, xxi. No. 2. 1950. Kaumudi. Mughal Miniature with a rare Motif. Roopa Lekha No. 1. 1951. Also Lady Painter in the Zenana, fig. 141 in the Image of India.

২৯৬. Rai Krishna Das. Mughal Miniature. Lalit kala Academy, 1955, note to pl. 7.

২৯৭. Ain.. I, p. 114; Mathur. N.L. Indian Miniatures, p. 22. Also Geeti Sen, Appendix, Collaboration of Artists, pp. 158-164.

২৯৮. Krishna Chaitanya. A History of Indian Paintings. pl. 36 (C.1775), reproduced from a painting in the National Museum.

২৯৯. Ibid.. pl. 49. copy of a painting from Municipal Museum. Allahabad.

www.pathagar.com

হিন্দু চিত্রশিল্পীর সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতার কারণে আবুল ফজল আবেগের সাথে লিখেছেন 'তাঁদের চিত্রকর্মগুলো আমাদের বস্তু বিষয়ক ধারণাকে ছাড়িয়ে যায়।'[৩০০] হিন্দুদের মধ্যে কোনো পর্দা ছিল না এবং যে সমস্ত শিল্পী স্বাধীনভাবে হিন্দু সুন্দরীদেরকে দেখতেন তাঁদের পক্ষে তাদের মুখশ্রী মোঘল হেরেমের নারীদের কাছে স্থানান্তর বা প্রতিস্থাপন করা কঠিন ছিল না। চিত্রশিল্পীদের কাছে সকল সুন্দর মুখই ছিল এক রকম। এটা বিশেষ করে প্রযোজ্য সেই সমস্ত ছবিতে যেখানে নারীদেরকে দেখা যায় খোশালাপরত অবস্থায়। এই ছবিগুলোতে সকলের জন্য রয়েছে আদর্শ ধরনের মুখমণ্ডল। যা হোক, মুখমণ্ডলের প্রকৃত পার্শ্বরেখা ব্যতীত চিত্রশিল্পীর ছিল তাঁর মডেল বা শিল্পাদর্শ, নারীদের পোশাক, কেশ বিন্যাস প্রণালি ও অলংকার, তাঁদের পছন্দনীয় বিষয়, শখ ও অবসর যাপন প্রণালি; তাঁর আনন্দ-বেদনার সময় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা এবং এগুলো তিনি এঁকেছেন বিশ্বস্তভাবে। মোঘল অনুচিত্রাবলি বস্তুগতভাবে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ এবং মোঘল হেরেম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

---

৩০০. Ain., I, p. 114.

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
মোঘল হেরেম ও অভিজাত নারীগণ

মোঘল যুগে সম্রাটের মহিলাদের বাসস্থানকে মহল বলা হতো। আবুল ফজল এর নামকরণ করেন 'শাবিস্তান-ই-ইকবাল' বা 'শাবিস্তান-ই-খাস।' কারণ সহজে সেখানে প্রবেশ করা যেত না, তাই হেরেম সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বিবরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাজপ্রাসাদের বড় একটি অংশ থাকত সম্রাট পরিবারের নারীদের দখলে। আকবরের আমলে তাঁর হেরেমে পাঁচ শতাধিক মহিলা সেখানে বসবাস করত। তাঁদের প্রত্যেকের ছিল পৃথক পৃথক বাসস্থান।[৩০১] আওরঙ্গজেবের আমলে নারীগণের সংখ্যা বেড়ে যায়।[৩০২] তাছাড়া এসব মহিলার বাসস্থান ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। রোকেয়া সুলতান বেগম, শাহজাদি খানম, গুলজার বেগম ও মরিয়ম মাকানির মতো মহিলাদের প্রাসাদ ছিল আগ্রাতে অবস্থিত।[৩০৩] সম্রাটের আরও তিনটি প্রাসাদ তার উপপত্নীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এগুলো ছিল লিথিভার (রবিবার), মঙ্গলবার ও জেনিসার (শনিবার) মহল নামে পরিচিত।[৩০৪] এইসব দিনে সম্রাট উল্লেখিত প্রাসাদগুলো পরিদর্শন করতেন। তাছাড়া সম্রাটের আর একটি প্রাসাদে বিদেশি উপপত্নীগণ বাস করতেন। এর নাম হলো বাঙ্গালী মহল।[৩০৫] আগ্রা থেকে প্রতি ষোল মাইল ব্যবধানে সম্রাট আকবর নারীদের জন্য অনেকগুলো বাসস্থান নির্মাণ করেন এবং দাসীসহ ষোল জন মহিলা এই বাসস্থানে থাকতে পারত।[৩০৬] কয়েকজন বিদেশি পর্যটক জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্মিত লাহোর দুর্গের তিনটি মহল সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দেন। প্রথম মহলটি ছিল দ্বিতল ভবন এবং প্রতিটি তলায় আটটি সুন্দর বসবাসের জায়গা ছিল

---

৩০১. আইন-ই-আকবরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪.

৩০২. টীকা, মানুচী একটি তালিকা তৈরি করেন-তাতে সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী ও তত্ত্বাবধায়িকার না রয়েছে : মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩০.

৩০৩. টীকা, ডিলেট রোকেয়া সুলতান বেগম, গুলজার বেগম, শাহজাদি খানম, মরিয়ম মাকানি এই সব মহিলার আগ্রাতে মালিকানাভুক্ত প্রাসাদের একটি তালিকা দেন : ডিলেট, পৃষ্ঠাগুলো ৩৭-৩৯.

৩০৪. ডিলেট, পৃষ্ঠাগুলো- ৩৭-৩৯; পিলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো- ৩-৪.

৩০৫. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ৩৯-৪০.

৩০৬. Ibid.,পৃষ্ঠা- ৪৪.

www.pathagar.com

কয়েকজন মহিলার জন্য। দ্বিতীয় মহলটিতে ছিল দুইশ মহিলার থাকার জায়গাসহ একটি বর্গাকৃতি অট্টালিকা। তৃতীয় মহলটি ছিল সবচেয়ে চমৎকার ষোলটি বাসস্থান, পাকা রাস্তাসহ উঠান ও পুকুর বিশিষ্ট এবং তাতে ছিল সামান্য প্রমোদের ব্যবস্থা। এটা ছিল আয়না ও রং করা ছবি দ্বারা সজ্জিত। কক্ষটির দরজা শুধু বাইরে থেকে বন্ধ করা যেত এবং ভেতর থেকে কেউ এটা বন্ধ করতে পারত না।[৩০৭]

মরিয়ম মাকানি ও অন্যান্য মহিলার বাসভবন ছিল ফতেপুর সিক্রিতে দেওয়ান-ই-খাসের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণে।[৩০৮] রানিদের ব্যক্তিগত কক্ষগুলো ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং তাঁরা সেখানে বসতেন ও সবকিছু দেখতে পেতেন; কিন্তু তাঁদেরকে কেউ দেখতে পেত না।[৩০৯] শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারার বাসস্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তাঁর কক্ষটি ছিল শাহবুরুজ ও সম্রাটের শয়নকক্ষের মাঝখানে অবস্থিত। এটার ছিল চমৎকার ও রুচিশীল চিত্র দ্বারা শোভিত দেওয়াল।[৩১০] লাহোরে অবস্থিত বেগম সাহেবের প্রাসাদটি ছিল শ্বেত মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত এবং তার মধ্যে ছিল খাল, ঝরনা ও উদ্যান। অন্যান্য মহিলার বাসস্থানও সেখানে ছিল। সমগ্র অট্টালিকার জন্য খরচ হয়েছিল প্রায় সাত লক্ষ রুপি।[৩১১] এভাবে বোঝা যায় যে মহিলারা ঐশ্বর্য, জাঁকজমক ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করতেন। তাঁরা অন্দর মহলে তাঁদের পদমর্যাদা ও উপার্জনের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলেন। প্রতিটি কক্ষে ছিল পানি সংরক্ষণের পাত্র, উদ্যান, পায়ে হাঁটার পথ এবং ছায়াশ্রিত বিশ্রামের স্থান।[৩১২]

ক. হেরেমের সংগঠন

সুলতানি আমলের চেয়ে পৃথকভাবে মোঘল আমলের হেরেমকে সম্রাটগণ বিস্তৃতভাবে সংগঠিত করেন। হেরেমের দারোগা ও পরিদর্শক পদে নিষ্পাপ

---

৩০৭. ফিন্স, পৃষ্ঠাগুলো ১৬২-৬৫; পার্সেজ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৫৪-৫৫.

৩০৮. ফিন্স, পৃষ্ঠা ১৪৯.

৩০৯. ভ্রমণের শুরুতে হকিন্স, পৃষ্ঠা ১১৮.

৩১০. একটি প্রাসাদ সম্বন্ধে আর বর্ণনা আছে: লাহোর, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪১; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩১৩

৩১১. ওয়ারিশ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠাগুলো ৫৩-৫৪.

৩১২. বার্নিয়ার টীকায় বলেন, 'তারা আমাকে অবগত করেন যে রাজকীয় অন্দর মহলে পৃথক পৃথক বাসস্থান রয়েছে এবং সেগুলো মহিলাদের পদমর্যাদা ও উপার্জন অনুসারে কমবেশি প্রশস্ত ও চমৎকার। প্রায় প্রতিটি কক্ষের দরজায় ধাবমান জলরাশির সংরক্ষণ স্থান আছে। প্রত্যেক পার্শ্বে রয়েছে উদ্যান, সুন্দর চলার পথ, ছায়াশ্রিত বিশ্রামের স্থান, স্রোতস্বিনী ঝরনা, দিনের বেলা সূর্যতাপ থেকে আশ্রয়দানকারী গভীর পরিখা, উঁচু মন্ত্রণা গৃহ ও রাতে গভীর নিদ্রা উপভোগের জন্য চত্বর।' বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ২৬৭।

www.pathagar.com

মহিলাদের নিয়োগ দেওয়া হতো এবং বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনার জন্য তাঁদের নিয়োগ করা হতো একইভাবে হেরেমের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তত্ত্বাবধায়িকাদের নিয়োগ করা হতো। হেরেমের বিস্তারিত সকল বিবরণ সংরক্ষণের জন্য লেখিকা পদে একজন মহিলাকে নিয়োগ করা হতো।[৩১৩] এসব মহিলাকে পর্যাপ্ত বেতন দেওয়া হতো। তাঁদের বেতনের জন্য তাঁরা তহবিলদার বা কোষাধ্যক্ষের কাছে আবেদন করতেন।[৩১৪] হেরেমের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী মহিলা সেবিকা হলেন মহলদার। তিনি ছিলেন ঠিক বড় পরিবারের তত্ত্বাবধায়িকার মতো। তিনি সম্রাটের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করতেন।[৩১৫] মহলদারগণের হস্তক্ষেপের ফলে প্রায়ই মহলদার ও রাজকীয় পরিবারের শাহজাদাদের মধ্যে কলহ দেখা যেত। কারণ শাহজাদারা এসব মহলদারের সতর্ক দৃষ্টিতে খুশি হতেন না ।[৩১৬] অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে হেরেমে পাহারা দেওয়া হতো। হেরেমের মধ্যে পাহারা দেওয়ার জন্য সংযমী

---

৩১৩. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩০-৩১.

৩১৪. টীকা: আইন-ই আকবরির মতে, সর্বোচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন মহিলারা প্রতি মাসে ষোল শত থেকে ষোল শত দশ রুপি পর্যন্ত বেতন পেতেন। অন্যরা প্রতি মাসে পঞ্চাশ থেকে কুড়ি রুপি পর্যন্ত বেতন পায়। আইন-ই-আকবরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৪৪-৪৫; মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩০-৩১.

৩১৫. টীকা: হামিদা বানু ছিলেন মুহাম্মদ মোয়াজ্জেমের (বাহাদুর শাহের) হেরেমের একজন মহলদার। তিনি সম্রাটকে মুলতান প্রদেশ থেকে জানান যে শাহজাদা কলমের বাক্স ও স্মারকলিপি বই তাঁর ব্যক্তিগত কক্ষে নিয়েছেন। 'প্রায় প্রতি রাতে শাহজাদার গোপন কক্ষে তাঁর প্রিয়জনেরা আসেন, তিনি নিজের সাথে কলমের বাক্স ও স্মারকলিপি বই নিয়ে যান। রাজদরবারের নিয়ম অনুসারে শিষ্টাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সেই সময় মহলদার বা তাঁর প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া হতো না। মহান সম্রাট আপনি যখন এই বৃদ্ধ দাসীকে (লেখিকাকে) পত্রপাঠে বিদায় দেন তখন তাঁকে আপনি মৌখিকভাবে বলেছিলেন এবং পরবর্তীতে একটি রাজকীয় চিঠিতে এটা উল্লেখ করেছিলেন যে শাহজাদা কলমের বাক্সটির জন্য যখনই তলব করবেন তখনই এই বৃদ্ধা সেবিকা বা তাঁর প্রতিনিধি শরিফুন্নিসা উপস্থিত থাকবে। এই সব হলো বাস্তব ঘটনা। এ বিষয়ে সম্রাটের কী আদেশ করার আছে? সম্রাট তাঁকে এই বলে আদেশ দেন তিনি যেন শাহজাদার কাছে কলমের বাক্সটি ছেড়ে না আসেন। আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৬৫।

৩১৬. টীকা: শাহজাদার নাজির বারুজ খান সম্রাটের কাছে খবর পাঠান, 'শাহজাদার মহলদার নুরুন নিসার প্রতি এমন খারাপ ব্যবহার করেন যে তিনি আহম্মদাবাদের শাহী উদ্যানে ভ্রমণের সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। মহলদার হেরেমের বাইরে আমার কাছে শাহজাদার ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে একটি পত্র পাঠান তাই এই মহিলা ভৃত্য এসে সম্রাটের বিনা আদেশে শাহজাদার বহির্গমন বন্ধ করে। শাহজাদা তাঁর দরবার থেকে মহলদারকে বহিষ্কার করেছেন। সম্রাট তাঁকে শাহজাদার বহির্গমন প্রতিরোধ করতে আদেশ দেন এবং তাঁকে শাস্তি দেন। আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠাগুলো ৭১-৭২।

www.pathagar.com

ও কর্মঠ মহিলাদের নিয়োগ করা হতো।[৩১৭] সাধারণত হাবশি ও তাঁতার মহিলাদের এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হতো। সম্রাটের বাসস্থানের কাছে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মহিলা প্রহরীদের রাখা হতো। বাইর সীমানায় খোজা প্রহরীদের রাখা হতো এবং তাদের থেকে সঠিক দূরত্বে বিশ্বস্ত রাজপুত প্রহরী দল নিযুক্ত থাকত। মূল দরজায় দারোয়ানদেক নিযুক্ত করা হতো। তাছাড়া চারপাশে থাকত অভিজাত ব্যক্তিদের আহাদিস নামক প্রহরীরা এবং তাদের পদমর্যদা অনুসারে অন্যান্য সেনাদল।[৩১৮] হেরেমে কেউ সহজে প্রবেশ করতে পারত না। সূর্যাস্তের সময় হেরেমের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং মশাল জ্বালানো হতো।

প্রত্যেক মহিলা প্রহরী হেরেমের সমস্ত ঘটনা নাজিরকে জানাত।[৩১৯] হেরেমে যত প্রকার ঘটনা ঘটত সব নাজিরকে জানাত।[৩২০] কতিপয় অভিজাতদের স্ত্রীগণ বা বেগমেরা হেরেম পরিদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করলে তাদেরকে প্রথমে অন্দর মহলের ভৃত্যদের কাছে জানানো হতো। তারপর ভৃত্যরা তাঁদের অনুরোধ সম্বন্ধে প্রাসাদের উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারীদের জানাত এবং তারপর যাঁরা উপযুক্ত তাঁদেরকে হেরেমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। উচ্চপদস্থ কিছুসংখ্যক মহিলাকে হেরেমে পুরো এক মাস থাকার অনুমতি দেওয়া হতো।[৩২১] হেরেম সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, সম্রাট মহলের বহির্ভাগের মতো ভিতরেও মহিলাদের মধ্য থেকে অনুরূপ উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্মচারী নিয়োগ করতেন।[৩২২] কিছুসংখ্যক মহিলা ছিলেন রাজদরবারের পদের সমতুল্য। মহলে সংঘটিত সব ঘটনার প্রতিবেদন সম্রাটের কাছে পাঠানো হতো। এর উত্তর বা সম্রাটের আদেশগুলো তাঁর নির্দেশ মতো হেরেমের লেখিকারা লিখতেন।[৩২৩]

---

৩১৭. মানুচী জানান যে, হেরেমের দরজায় পাহারা দেওয়ার জন্য কাশ্মিরি মহিলাদের নিয়োগ করা হতো। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২।

৩১৮. আইন-ই আকবরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫: মানুচী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৫০-৫১ পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১.

৩১৯. নাজির শব্দটি হেরেমের খোজা প্রহরীদের বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো প্রত্যেক শাহজাদির একজন করে নাজির ছিল যাঁর প্রতি তিনি খুব আস্থা রাখতেন। মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০.

৩২০. Ibid., পৃষ্ঠা ৩৫২.

৩২১. আইন-ই-আকবরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫: মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৫০-৫১.

৩২২. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩০-৩১.

৩২৩. Ibid., পৃষ্ঠা-৩৩১

www.pathagar.com

সাধারণত মহলের মহিলারা সম্রাটের উপস্থিতিতে রাত নয়টায় ওয়াকিয়া পাঠ করতেন।[৩২৪] রাত্রিকালে তীর নিক্ষেপকারী ও অস্ত্র পরিচালনায় অন্যান্য দক্ষ মহিলা সম্রাটকে পাহারা দিত।[৩২৫] সম্রাটের শোভাযাত্রায় কানিজরা (ভৃত্য মহিলারা) প্রায়ই সঙ্গিনী হতো।[৩২৬]

খ. অভিজাত মহিলারা

অভিজাত ব্যক্তিদের স্ত্রীগণ রাজকীয় মহিলাদের চালচলন অনুসরণ করতেন। সাধারণত একজন অভিজাত ব্যক্তি তিন বা চারজনেরও বেশি স্ত্রীকে বিবাহ করতেন।[৩২৭] সবচেয়ে বড় স্ত্রী বেশি শ্রদ্ধা পেতেন। এই স্ত্রীগণ তাদের স্বামীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করত।[৩২৮] তার কারণ প্রাসাদের সমগ্র ব্যবস্থাপনা ছিল তাঁদের হাতে এবং তাঁরা যেকোনো বস্তু দিতে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। অভিজাত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট স্ত্রীর সাথে নির্ধারিত দিনে সাক্ষাৎ করতেন এবং সেই সময় তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানানো হতো। ক্রীতদাস ও দাসীরা তাঁর জন্য সকল প্রকার আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করত। বাইরে যাওয়ার সময় অভিজাত ব্যক্তির সাথে শুধু তাঁর প্রিয় পত্নী সঙ্গিনী হতেন। অন্য পত্নীদেরকে হেরেমে

৩২৪. Ibid..

৩২৫. Ibid..

৩২৬. Ibid.. পৃষ্ঠাগুলো ৩৩১-৩২: বায়েজীদ রচিত তারিখ-ই-হুমায়ুন ওয়া আকবর, পৃষ্ঠা ২৫২. বিবি ফাতেমার কন্যা ছিলেন হুমায়ুনের হেরেমের একজন নারী সৈনিক বা উদূবেগী

৩২৭. আসহাব. প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০.

৩২৮. পিলসার্ট . পৃষ্ঠা ৬৪; ডিলেট. পৃষ্ঠাগুলো ৯০-৯১.

www.pathagar.com

রেখে যাওয়া হতো এবং তারা খোজা প্রহরীদের সাহচর্য উপভোগ করত। তারা বাইরে যেতে শুধু বাধাগ্রস্ত হতো। এসব মহিলা সবচেয়ে দামি পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করত, সবচেয়ে সুস্বাদু খাদ্য খেত এবং স্বামীর সাহচার্য ব্যতীত সকল পার্থিব আনন্দ উপভোগ করত।[৩২৯] তারা স্বামীর ভালোবাসা লাভের জন্য প্রায়ই পরস্পরকে ঈর্ষা করত; কিন্তু তাদের স্বামী যাতে বিরক্ত না হন সে কথা ভেবে কখনো তারা অনুভূতি প্রকাশ করত না। প্রত্যেক স্ত্রীকে পাহারা দিতে খোজা প্রহরী ও বাঙালি ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হতো। এটা নিশ্চিত করতে যে স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যেন তাকে দেখতে না পায়।[৩৩০] খোজা প্রহরীরা যদি তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হতো হবে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।[৩৩১] অভিজাত ব্যক্তির পত্নীরা বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। তাঁদের বাসস্থান ছিল জাঁকজমকপূর্ণ ছবির মতো। জাফর খানের স্ত্রী ছিলেন সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী ও উদার হৃদয়ের মহিলাদের মধ্যে অন্যতম।[৩৩২]

তাঁর একটি প্রাসাদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে তিনি একটি জমকালো ভোজের আয়োজন করেন এবং তাতে সম্রাটকেও নিমন্ত্রণ করেন।[৩৩৩] খলিলুল্লাহ খানের স্ত্রী এবং আসফখানের নাতনি পর্যাপ্ত জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের মধ্যে জীবন যাপন করতেন।[৩৩৪] প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী একটি পৃথক বাসগৃহে বাস করতেন এবং তাদের স্বামীর কাছ থেকে পারিবারিক খরচ বাবদ (আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ইত্যাদি) মাসিক ভাতা পেতেন।[৩৩৫] এসব মহিলা অনেক সোনা ও রুপা নির্মিত বাসনপত্রের অধিকারিণী হতেন। তাঁদের সেবার জন্য ছিল অনেক ক্রীতদাসী ও পরিচারিকা।[৩৩৬] স্বামীর ওপরে তাঁদের প্রভাব অনুযায়ী জাঁকজমকের পার্থক্য

---

৩২৯. পিলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো ৬৪-৬৫.

৩৩০. Ibid., পৃষ্ঠা ৬৬.

৩৩১. Ibid., টীকা পিলসার্ট বলেন যে শুধু কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তির পত্নী সতী ছিলেন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বামীর অনুপস্থিতিতে আনন্দ উপভোগ করত। পিলসার্ট পৃষ্ঠা৬৮. কিন্তু মনে হয় শোনা কথায় এই মতামত দেওয়া হয়েছে। তারা কঠোর নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাস করত।

৩৩২. টীকা টাভার নিয়ার বলেন, জাফর খানের পত্নী হলেন সমগ্র ভারতে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী ও উদার মহিলা এবং তিনি একাই সম্রাটের সকল পত্নী ও কন্যার চেয়ে বেশি খরচ করতেন। তাঁর পরিবারটি সবসময় ঋণগ্রস্ত থাকত। ট্যাভার নিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৯।

৩৩৩. Ibid..

৩৩৪. টীকা মানুচী জানান যে খলিলুল্লাহ খানের স্ত্রী ও আসফখানের নাতনি মূল্যবান পাথর খচিত তিন মিলিয়ন রুপি মূল্যের জুতা পরিধান করতেন মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১৯৩-৯৪.

৩৩৫. ভিলেট পৃষ্ঠাগুলো ৯০-৯১; পিলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো ৬৪-৬৫.

৩৩৬. Ibid..

www.pathagar.com

হতো। এসব মহিলার বাসস্থানের চারদিকে ছিল বড় বড় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তাঁদের বিনোদনের জন্য বাসস্থানের ভেতরে পুকুর ও উদ্যান থাকত।[৩৩৭] পিলসার্টের ভাষায়, 'মহলগুলোতে ছিল কামউদ্দীপক ইন্দ্রিয় চেতনা, কামুকতাপূর্ণ ও বেপরোয়া সাজসজ্জা, অতিরিক্ত জাঁকজমক, অশালীন অহমিকা ও অলংকারপূর্ণ রুচিশীলতায় সাজানো।'[৩৩৮]

গ. উপপত্নীগণ

রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপপত্নী রাখার প্রথাটি ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার।[৩৩৯] উপপত্নীরা তাদের স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে ধরে রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করত। তাঁরা তাঁদের কামনা জাগিয়ে তুলতে সুগন্ধি দ্রব্য ও মধুর ঘ্রাণবিশিষ্ট অনুলেপন ব্যবহার করত এবং তাঁদেরকে আফিম ও নেশার উত্তেজক ব্যবহার করতে উৎসাহ জোগাত।[৩৪০] তারা মাছি তাড়িয়ে হাত পা মর্দন করে ও সঙ্গীত যন্ত্র বাজিয়ে স্বামীর সেবা করত।[৩৪১] তারা কখনও কখনও তাদের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করে প্রকৃত স্ত্রীর স্থান দখল করত।

প্রত্যেক উপপত্নীর ছিল নিজস্ব বাসগৃহ।[৩৪২] তাদেরকে শক্তিশালী প্রহরীরা নিরাপত্তা দিত। খোজা প্রহরী বা মহিলাভৃত্য ব্যতীত তাদের প্রাসাদের মধ্যকার কক্ষগুলোতে কেউ প্রবেশ করতে পারত না।[৩৪৩] এই প্রহরীদের মধ্যে কেউ তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এই মহিলারাও তাদের স্বামীর সঙ্গ লাভের জন্য ইচ্ছা পোষণ করত, কারণ সুবিধামতো তিনি খুব কমই তাদের কাছে আসতেন।[৩৪৪] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পত্নী ও উপপত্নীরা তাদের স্বামীর অনুগ্রহ ও সঙ্গ লাভের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিতা হতো।[৩৪৫]

---

৩৩৭. Ibid.,
৩৩৮. পিলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো ৬৪-৬৫.
৩৩৯. ওভিংটন, পৃষ্ঠা ২৩৪.
৩৪০. কেরিরি, পৃষ্ঠা ২৪৭.
৩৪১. Ibid., পিলসার্ট, পৃষ্ঠা ৬৫, কীভাবে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করা হয় তা নিয়ে ক্রীতদাসীরা অধ্যয়ন করত।
৩৪২. পিলসার্ট, পৃষ্ঠা ৬৫.
৩৪৩. ডিলেট, পৃষ্ঠা ৯৯.
৩৪৪. Ibid., পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা- ২০১.
৩৪৫. টীকা পিলসার্ট বলেন, মহিলারা অত্যন্ত কামুক স্বভাবের ছিল কিন্তু তারপরও তারা ক্ষমা লাভের উপযুক্ত কারণ তাদের স্বামীরা কৃষক হলেও শুধু সময় পেলে তাদেরকে কাছে ডাকত।' পিলসার্ট পৃষ্ঠা ৬৫.

www.pathagar.com

ঘ. মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তাগণ

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দানকারী মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তারাও হেরেমে থাকত। জাহাঙ্গীরের আমলে যখন চৌদ্দ বা পনেরো হাজার রুপি মূল্যমানের একটি মুক্তা হারিয়ে যায় তখন একজন মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তা গণনা করে বলেন যে, এটা শীঘ্রই পাওয়া যাবে এবং একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা এটা নিয়ে আসবে। তার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয় এবং তাকে পুরস্কৃত করা হয়।[৩৪৬] একজন মহিলা জ্যোতিষী জাহাঙ্গীরকে বলেন যে একজন সাদা বস্ত্র পরিহিতা সুন্দরী মহিলা তাঁকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।[৩৪৭] তৃতীয় দিনে একজন উপপত্নী (তুর্কি) হাসতে হাসতে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন যে, শাহজাদাকে ঢোলপুরে পাঠানো হয়েছে, তিনি সেখানে সফল হবেন।[৩৪৮] মনে হয় এইভাবে মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তাগণ তখনকার দিনে টিকে থাকত এবং তারা ভবিষ্যদ্বাণী করত। ঘটনাটি এমনও হতে পারে যে, পুরুষ ভবিষ্যদ্বক্তারা মহিলাদের কক্ষে প্রবেশ করতে পারত না এবং এভাবে মহিলা ভবিষ্যদ্বক্তারা ভেতরে আসত।

ঙ. গুপ্তচরগণ

মোঘল রাজদরবারে মহিলারা গুপ্তচর হিসেবেও চাকরি করত। আকবর ও হুমায়ুনের আমলে আগা-ই-সার্ভকাদ নামক একজন মহিলাকেও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ইতিপূর্বে বাবরের হেরেমে থাকতেন। তিনি গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে আসেন এবং খান-ই-খানান ও অন্যান্য বড় আমিরদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতেন।[৩৪৯]

---

৩৪৬. টীকা এ সম্বন্ধে ট্যাভারনিয়ার মন্তব্য করেন, 'যেহেতু প্রথা অনুসারে প্রথম জন্মগ্রহণকারী পুরুষ সন্তান সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করত সেহেতু সম্রাটের হেরেমে মহিলারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিতা ছিল।' তারা অন্য স্ত্রীদের অসময়োচিত গর্ভপাত ঘটাতে সকল পন্থা গ্রহণ করত। ট্যাভারনিয়ার যখন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পাটনাতে ছিলেন তখন এইভাবে তথ্য সরবরাহ করেন যে শায়েস্তা খানের শল্য চিকিৎসক তাঁকে এমন নিশ্চয়তা দেন যে তাঁর শাহজাদি স্ত্রী এক মাসে তাঁর হেরেমে আটটি অসময়োচিত গর্ভপাত ঘটান এবং তাঁর নিজের সন্তান ব্যতীত অন্য কারো সন্তান জন্ম হতে দেননি। ট্যাভারনিয়ার , প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৩.

৩৪৭. তুযুক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫

৩৪৮. ইকবাল নামা, পৃষ্ঠা-১৯৩

৩৪৯. বায়েজী রচিত 'তারিখ-ই-হুমায়ুন ওয়া আকবর', পৃষ্ঠা ২৯০.

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
রাজকীয় মহিলাদের উপভোগ করা বিশেষ সুবিধাদি

রাজকীয় মহিলারা মোঘল শাহী দরবারে উৎকৃষ্ট মর্যাদা লাভ করতেন। তাঁদেরকে এত প্রভাবশালিনী মনে হতো যে, অনেক ব্যক্তি তাদের মাধ্যমে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে সাফল্য লাভ করতেন। তাঁরা সম্রাটের কাছে পেশকৃত আবেদনপত্রে সুপারিশ করতেন। সাধারণত তাঁদের সুপারিশগুলো গুরুত্ব বহন করত।

১. পদ

এসব মহিলার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের কয়েকজনকে সম্মানজনক পদবি দেওয়া হতো। বিশেষ করে তাঁদেরকে এসব পদবি ধরে ডাকা হতো। আকবরের মা মরিয়ম মাকানি উপাধি লাভ করেন (দুই জগতের মাতা মেরি)।[৩৫০] জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম-উজ-জামানি (বিশ্বের মাতা মেরি) নামে পরিচিত হন।[৩৫১] শাহজাহানের মাকেও একইভাবে বিলকিস মাকানি (পবিত্র ভুবনের সম্মানিত নারী) উপাধি দেওয়া হয়।[৩৫২] কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত উপাধি লাভ করেন মেহেরুন্নিসা। জাহাঙ্গীর তাঁকে নূরমহল (রাজপ্রাসাদের আলো) উপাধি অর্পণ করেন ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে এবং পরবর্তীতে তাঁকে নূরজাহান (জগতের আলো) উপাধি প্রদান করেন।[৩৫৩] শেষের উপাধি এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাঁর আসল নামটি একেবারে নেপথ্যে হারিয়ে যায়। শাহ বেগম (রাজপরিবারের সম্মানিত মহিলা) নামেও পরিচিত হন তিনি ।[৩৫৪]

---

৩৫০. বেভারেজের অনূদিত 'আকবরনামা' তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১৫.

৩৫১. রোজারর্স ও বেভারেজের সম্পাদনায় 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর শাহী' প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৭৬.

৩৫২. কাজ উইনি, পৃষ্ঠাগুলো ১৩, ৪৯.

৩৫৩. রোজারর্স ও বেভারেজের রচিত 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর শাহী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৯.

৩৫৪. ইকবালনামা, পৃষ্ঠা ৫৬: মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজপুত স্ত্রী (শাহজাদা খশরুর মা) মানবাঈকেও সম্রাট শাহ বেগম উপাধি দেন। রোজারর্স ও বেভারেজের সম্পাদনায় 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর শাহী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫৫-৫৬.

www.pathagar.com

শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী যাঁর স্মৃতিতে বিখ্যাত তাজমহল নির্মিত হয় তিনিও জনপ্রিয়তার জন্য 'মমতাজ মহল' নামে (রাজপ্রাসাদের অন্যতম মর্যাদাবান নারী) পরিচিত হন এবং তাঁর আসল নাম ছিল আর্জুমান্দ বানু বেগম। তিনি মালিকা-ই-জাহান (জগতের সম্মানিত মহিলা) উপাধি লাভ করেন। জাহানারাকে তাঁর মৃত্যুর পরে ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয় এবং তাঁকে শাহীবাত-উজ-জামানি (যুগের গৃহলক্ষ্মী) উপাধি দেওয়া হয়।[৩৫৫] তিনি পাদশাহ্ বেগম উপাধিও লাভ করেন।[৩৫৬] সাধারণত তিনি 'বেগম সাহেব' নামে পরিচিত হন।[৩৫৭] আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় কন্যা জিনাত-উন-নিসাও পাদশাহ্ বেগম উপাধি লাভ করেন।[৩৫৮] সচরাচর আওরঙ্গজেবের পত্নীরা স্থানের নাম অনুসারে পরিচিত হন; যেমন আওরঙ্গাবাদী মহল, উদয়পুরী মহল ইত্যাদি।[৩৫৯] এতে মনে হয় যে তিনি তাঁর পত্নীদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার ধারণা পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে জাহান্দার শাহের প্রিয় রানিলাল কুনওয়ারকে ইমতিয়াজ মহল (রাজপ্রাসাদের পছন্দের নারী) উপাধি দেওয়া হয়।[৩৬০] মুহাম্মদ শাহের মা একইভাবে হাসরাত বেগম (উৎকৃষ্ট মহিলা) উপাধি লাভ করেন।[৩৬১] মুহাম্মদ শাহের পত্নীকে (মালিকা-ই-জামানি) পৃথিবীর রানি উপাধি দেওয়া হয়।[৩৬২] এসব উপাধি ছাড়াও রাজকীয় মহিলারা শ্রদ্ধাসূচক উপাধি লাভ করেন এবং কখনো কখনো কিছু মর্যাদা ও ঐশ্বর্যসূচক উপনাম ধারণ করতেন। সাধারণত আকবরের শাসনকাল থেকে পরবর্তীতে হেরেমের মহিলাদেরকে বেগম নামে সম্বোধন করা হতো।[৩৬৩]

২. বৃত্তি ও ভরণপোষণ মঞ্জুরি

মোঘল হেরেমের মহিলাদের তাঁদের ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহের জন্য নিয়মিত ভাতা ও ভরণপোষণ মঞ্জুরি দেওয়া হতো। বিভিন্ন কারণে তাঁরা সম্রাটের কাছ হতে সুগন্ধি দ্রব্য পান ও অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয়ের জন্য উপহারও নিতেন।[৩৬৪] সাধারণত ভাতার অর্ধেক অর্থ রাজকীয় কোষাগার থেকে নগদে

---

৩৫৫. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা- ২১৩; সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮.
৩৫৬. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৭; সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮.
৩৫৭. সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৮.
৩৫৮. আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা- ৭২; আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২.
৩৫৯. সরকার, প্রথম খণ্ড,পৃষ্ঠা- ৬৩.
৩৬০. ফারুকি, পৃষ্ঠা-৩৭; কানওয়ার, পৃষ্ঠা- ৩৩৭; সিয়ার পৃষ্ঠা-৩৮৫.
৩৬১. আসাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৭.
৩৬২. Ibid., পৃষ্ঠা- ২০; ভাববিনোদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১৪২.
৩৬৩. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩৩.
৩৬৪. Ibid., পৃ ৩৭৫.

www.pathagar.com

প্রদান করা হতো এবং বাকি অর্ধেক অর্থ সচরাচর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভূমির রাজস্ব থেকে পরিশোধ করা হতো।[৩৬৫]

কখনো কখনো তাঁদেরকে বেশ বড় জায়গির দেওয়া হতো। এভাবে বেগমদের হস্তান্তরিত পরগনাগুলো বর্গা নামে পরিচিত হতো।[৩৬৬] মোঘল আমলে মোঘল হেরেমের মহিলাদেরকে পরগনার স্বত্ব হস্তান্তরের রীতি বাবর চালু করেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীর মাকে সাত লক্ষ রুপি মূল্যের একটি পরগনা হস্তান্তর করেন।[৩৬৭] তিনি দেশের সমতল অঞ্চলে আবু সাঈদ মির্জার কন্যাদেরকেও কতকগুলো জায়গির ও জমির স্বত্ব হস্তান্তর করেন।[৩৬৮] তাঁর সিংহাসন আরোহণের পরে হুমায়ুন তাঁর মা ও বোনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদেরকে জায়গির দেন।[৩৬৯] আফগান শাসনকর্তা শেরশাহ মস্তফা ফারমুলির পত্নী বিবি ফতেহ মালিকাকে তার ভরণ পোষণের জন্য দুটি পরগনা মঞ্জুর করেন।[৩৭০] আকবরের আমলে এ ধরনের ভূমি মঞ্জুরি প্রদান সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত তথ্য নেই। কিন্তু এ থেকে এমনটি বোঝায় না যে, এই রেওয়াজটি উঠে গিয়েছিল।[৩৭১] জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে হেরেমের মহিলাদেরকে প্রদত্ত ভাতা প্রদানের নিশ্চয়তা বেড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পরে শীঘ্রই তিনি রাজকীয় হেরেমের মহিলাদের ভাতা তাঁদের অবস্থা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুসারে বৃদ্ধি করেন শতকরা ২০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত।[৩৭২] সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বাধীনভাবে মহিলাদের ভূমি মঞ্জুরির রেওয়াজটি অনুসরণ করেন বলে মনে হয়।[৩৭৩] তাঁর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান

---

৩৬৫. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৫.

৩৬৬. আনন্দ রাম কর্তক সম্পাদিত 'মিরাট-উল-ইসতিলা' পৃষ্ঠা ১৫.

৩৬৭. ব্যাভারিজ কর্তৃক অনূদিত বাবরনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৮.

৩৬৮. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'গুলবদনের হুমায়ুননামা', পৃষ্ঠা ৮৯.

৩৬৯. Ibid., পৃষ্ঠা ৩.

৩৭০. আববাছ খানের রচিত তারিখ-ই-শেরশাহ (ইলিয়ট ও ডাওসন), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৫; কে আর কানুনগো রচিত শেরশাহ, পৃষ্ঠা ৩.

৩৭১. মুনসিরেট অবহিত করেন যে গুলবদন বেগম মক্কায় যাওয়ার সময় সুরাটে অবস্থানকালে পর্তুগিজদেকে বুটজারিস অর্পণ করেন। তারপর তিনি তাদের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করেন। মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে চাইলেন না এবং এটা ফেরত চাইলেন। এতে পর্তুগিজরা বিব্রত বোধ করে এবং ক্রোধ প্রকাশ করে। মুনসিরেট, পৃষ্ঠাগুলো ১৬৬-৬৭.

৩৭২. রোজার্স ও বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০.

৩৭৩. Ibid., পৃষ্ঠা ৪৬; 'আমি আমার বাবার অন্যতম পালিত বোন হাজি কোকাকে ভূমি ও অর্থ উপহার পাবার উপযুক্ত মহিলাদেরকে আনতে বললাম আমার সামনে প্রাসাদের মধ্যে।'

www.pathagar.com

সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী কিছুসংখ্যক জায়গির ভোগ করতেন। তাঁর রামসারের জায়গিরটি আজমিরের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।[৩৭৪]

জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা খুররমের নেতৃত্বে সম্রাট বাহিনী কর্তৃক দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আনন্দ সংবাদ শ্রবণ করেন এবং এই শুভ লগ্নে তিনি নূরজাহানকে টোডা জায়গির এবং এর বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ২,০০,০০০ রুপি উপহার হিসেবে প্রদান করেন।[৩৭৫] ভাতা ও ভূমি মঞ্জুরি ছাড়াও নূরজাহান তাঁর সুবিধাজনক পদমর্যাদার জন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী সম্মান ও বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন। ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলাহ যখন মারা যান তখন তাঁর মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো নূরজাহানকে হস্তান্তর করা হয় এবং সম্রাটের ড্রাম বাজনা ও অর্কেস্ট্রার পরে তাঁর পক্ষে ড্রাম বাজানো ও অর্কেস্ট্রার বিশেষ সুবিধা ভোগের অনুমতি দেওয়া হয়।[৩৭৬] শুধু তাই নয়, এ কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সেকেন্দ্রাবাদ, বাংলা ও ভুটান থেকে আসা পণ্যসামগ্রীর ওপর নগর শুল্ক আদায়ের অধিকার লাভ করেন।[৩৭৭] মনে হয় সম্রাট শাহজাহান রাজকীয় মহিলাদের জন্য ভূমি মঞ্জুরি ও ভাতা প্রদানের রীতি অব্যাহত রাখেন। সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরে তিনি বার্ষিক দুই লক্ষ রুপির ভরণপোষণ ভাতা নূরজাহানের জন্য মঞ্জুর করেন। তিনি মমতাজ মহলেরর জন্য দশ লক্ষ রুপি ভাতা নির্ধারণ করেন।[৩৭৮] কিন্তু এই রাজকীয় অনুগ্রহে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন জাহানারা। তিনি 'বেগম সাহেব' নামেও পরিচিত হন। তাঁকে মঞ্জুর করা জায়গিরগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল আচচোলের গ্রামগুলো।[৩৭৯] ফারজাহারা,[৩৮০] বাচচোলের সরকারগুলো[৩৮১] সাফাপুর[৩৮২] ও দোহারাহ।[৩৮৩]

---

৩৭৪. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী (R&B), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪২।

৩৭৫. Ibid., পৃষ্ঠা-- ৩৮০: এটাকে বোদা বলে উল্লেখ করেছে থাকে একটি ভুল বলে মনে হয়। ভারতীয় অফিসের পাণ্ডুলিপিতে ও মুন্সি দেবীপ্রসাদ তাঁর হিন্দি সংস্করণে এটাকে টোডা বলে উল্লেখ করেছেন।

৩৭৬. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী (R&B), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২২৮.

৩৭৭. ভিলেট, পৃষ্ঠা- ৪১; পিলসার্ট, পৃষ্ঠা- ৪.

৩৭৮. লাহোরী, প্রথম খণ্ডের ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-গুলো ৯৬-৯৭.

৩৭৯. কাজভইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬২৬; লাহোরী, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫১। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৯.

৩৮০. লাহোরী, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৫৮২.

৩৮১. কাজভইনী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬২৬; লাহোরী, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫১। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২০৯.

৩৮২. লাহোরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২৬.

৩৮৩. তাঁর বাগানের খরচ বাবদ তাঁকে দোহারা দেওয়া হয়েছিল; রুকাত-ই আলমগিরি; পৃষ্ঠা ৭৭.

www.pathagar.com

শাহজাহানের রাজত্বের ২৩তম বছরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁকে পুনরায় পানিপথ নামক পরগনাটি মঞ্জুর করা হয় এবং এই পরগনার বার্ষিক রাজস্ব ছিল এক কোটি ডাম (মুদ্রা)।[৩৮৪]

তাছাড়া তাঁর বিভিন্ন খরচের জন্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উন্নয়নশীল বাণিজ্যিক নগরগুলোর অন্যতম সুরাট নগরের রাজস্ব মঞ্জুর করা হয়।[৩৮৫] তিনি ছিলেন শাহজাহানের প্রিয় সন্তান এবং মনে হয় তাঁর প্রিয় পত্নী মমতাজ মহলের মৃত্যুর পরে তাঁর পিতাকে দেখাশোনা করতেন এবং সমস্ত স্নেহ জাহানারাকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি তার বার্ষিক ভাতা ছয় লক্ষ রুপি থেকে দশ লক্ষ রুপিতে বর্ধিত করেন।[৩৮৬] তাছাড়া তিনি বহু শুভ অনুষ্ঠানে অনেক মূল্যবান পাথর ও উপহার গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি বিপুল ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন।[৩৮৭] এ কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তাঁর বার্ষিক উপার্জন ছিল প্রায় তিন মিলিয়ন রুপি।[৩৮৮] প্রকৃতপক্ষে জাহানারা দারা শিকোর পক্ষপাতী হলেও আওরঙ্গজেব তাঁর প্রতি সদয়, মর্যাদাপূর্ণ ও সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন এবং তাঁকে ব্যক্তিগত ভাতা প্রদান চালু রাখেন। সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি এত বেশি সমস্যার সম্মুখীন হন যে, তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন। কিন্তু জাহানারার বেলায় তিনি তাঁর ভাতার পরিমাণ হ্রাস করেননি। যার ফলে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শুভ ঈদ উপলক্ষে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন এবং তাঁর বার্ষিক ভাতা পাঁচ লক্ষ রুপি বাড়িয়ে সতেরো লক্ষ রুপিতে উন্নীত করেন।[৩৮৯] এ কথা বলা হয়েছে যে, জাহান্দার শাহের রাজত্বকালে লাল কুনওয়ার অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও দুই কোটি রুপি ভাতা লাভ করেন।[৩৯০] মুহাম্মদ শাহের মাতা নবাব কুদসিয়া ও হেরেমের অন্য মহিলাদের খরচের জন্য মাসিক পনেরো হাজার রুপি পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়।[৩৯১] এই ধরনের ভরণপোষণ ভাতা রাজকীয় পরিবারের ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিজাত ব্যক্তিদের পত্নীরাও এই সুবিধা ভোগ করতেন।[৩৯২]

---

৩৮৪. অমল-ই-সালেহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৯.

৩৮৫. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫.

৩৮৬. কাজভইনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪০ এবং তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯.

৩৮৭. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১৬; বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা- ১১.

৩৮৮. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২১৬.

৩৮৯. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা- ৩৬.

৩৯০. আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৪.

৩৯১. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪.

৩৯২. টীকা: মুহাম্মদ শাকি মুস্তাইদ খান বর্ণনা করেছেন যে, আওরঙ্গজেব লাহোরের সুবাদার খলিলুল্লাহ খানের মৃত্যুর পরে তাঁর বাড়িতে যান এবং তাঁর বিধবা পত্নী হামিদা বানুকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার বৃত্তি প্রদান করেন। মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা- ২৩.

www.pathagar.com

এসব ভূমি মঞ্জুরি ও ভাতা সম্রাটের সুখের সময় অব্যাহত থাকত এবং কখনো কখনো এ রকম ভূমি বরাদ্দ ও বৃত্তির সুবিধাভোগীরা তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার দ্বারা সম্রাটকে বিরক্ত করলে সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হতো।[৩৯৩]

৩৯৩. ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা আকবর যখন বিদ্রোহ করেন শাহজাদি জীবন নিসা তখন তাঁর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার কারণে তাঁকে সন্দেহ করা হয় এবং জীবন নিসাকে তাঁর বার্ষিক চার লক্ষ টাকার অবসর ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয় ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ১২৬। ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহ আলমের (আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্রের) প্রিয় পত্নী নূরুন নিসা বেগমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁকে সকল স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তিনি তাঁর স্বামীর সাথে ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয় তাঁর স্বামী গোলকুণ্ডা অবরোধের সময় সেখানকার শাসনকর্তা কুতুবশাহের সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন এবং কুতুবশাহের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেন এবং এভাবে সামরিক প্রস্তুতিতে শৈথিল্যের সূচনা করেন সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-গুলো ৪৬-৪৭.

www.pathagar.com

৩. রাজকীয় হেরেম নারীদের অধীন কর্মচারীগণ

রাজকীয় হেরেম মহিলাদেরকে বিভিন্ন জায়গির বরাদ্দ দ্বারা প্রাপ্ত জমি দেখাশোনার জন্য তাঁদের নিজস্ব দাপ্তরিক কর্মচারী ও ভৃত্যদেরকে নিযুক্ত করা হতো। মানুচী জানান যে, উচ্চপদস্থ প্রত্যেক মহিলার সম্পত্তি, জমি ও উন্নতি দেখাশোনার জন্য একজন নাজির আছে।[৩৯৪] নূরজাহানের নিজস্ব ভাকিল ছিল[৩৯৫] যারা তাঁরা জায়গিরগুলো দেখাশোনা করত। হাকিম হামামও হাকিম কাশির পুত্র নওয়াব মমতাজ বেগমের দেওয়ান পদে সরকারের কাজ করতেন।[৩৯৬] ইসহাক বেগ মমতাজ মহলের মীর-ই-সামান হন এবং পরবর্তীকালে তিনি জাহানারা বেগমের মীর-ই-সামান নিযুক্ত হন।[৩৯৭] তিনি জাহানারার সরকারে চাকরি করতেন এবং সাতশ রুপি উপার্জন করতেন। পরে এই উপার্জনের সাথে আরো দুইশ রুপি যোগ করা হয়।[৩৯৮] পরে জাহানারা তাঁকে দেওয়ান পদে পদোন্নতি দেন এবং তাঁকে হকিকত খান উপাধি প্রদান করেন।[৩৯৯] ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে জাহানারার মীর-ই-সামান পদে সৈয়দ আশরাফকে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে খান উপাধি দেওয়া হয়।[৪০০]

সাদুল্লাহ খান পাদশাহ বেগমের (জীনাত-উন-নিসার) মীর-ই-সামান পদে নায়েব নিযুক্ত হন।[৪০১] এই সকল সরকারি কর্মচারীকে তাঁদের পুরুষ সেবকদের সাথে হেরেম থেকে সুবিধাজনক দূরত্বে থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়।[৪০২]

৩. (ক) মঞ্জুরিকৃত পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহার গ্রহণ

মোঘল দরবারের মহিলারা শুধু উপহার ও মঞ্জুরি গ্রহণ করতেন না, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত অভিজাত ব্যক্তি ও সেনাপতিকে সম্মানজনক পোশাক ও অন্যান্য উপহার প্রদান করেন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুনের সিংহাসনে

---

৩৯৪. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৫০-৫১.
৩৯৫. তুযুক (R&B) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৯২.
৩৯৬. কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫৮.
৩৯৭. কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯.
৩৯৮. লাহোরী, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১০৪.
৩৯৯. Ibid., পৃষ্ঠা- ১৪২.
৪০০. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা- ১২৭.
৪০১. আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৭.
৪০২. বায়েজীদ জানান যে আস্তুর উদ্যান তুলগুলগু বুরুজে নবাব গুলচেহারা বেগম গুলবদন বেগম মরিয়ম মাকানি বেগম ও মাচুচাক বেগমের রাজকীয় কর্মচারীরা ও খাজা সারায় বসবাস করতেন। বায়েজীদ রচিত তারিখ-ই-হুমায়ুন ওয়া আকবর, পৃষ্ঠা ২১০।

www.pathagar.com

আরোহণের সময় তাঁর মা মাহিম বেগম একটি বিশাল ভোজের আয়োজন করেন এবং ভোজ শেষে তিনি প্রায় সাত হাজার ব্যক্তিকে বিশেষ ধরনের সম্মানজনক লম্বা ঢিলা পোশাক মঞ্জুর করেন।[৪০৩] শুধু তাই নয়, তিনি কিছুসংখ্যক উট, খচ্চর, ঘোড়া ইত্যাদি ও উক্ত শুভলগ্নে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে উপহার দেন।[৪০৪] সুবিধাজনক পদমর্যাদার কারণে নূরজাহানও বিপুল পরিমাণে এই রেওয়াজটি অনুসরণ করেন। যখন মেবারের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাটির ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্তি ঘটে এবং মেবারের রানা অমর সিং রাজকীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তখন পুত্র শাহজাদা করণ সম্রাটের দরবারে আসেন। সম্রাটের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপহারের সাথে নূরজাহান তাঁকে একটি মূল্যবান সম্মানের পোশাক, একটি রত্নখচিত তরবারি, জিনসহ একটি ঘোড়া ও একটি হাতি উপহার দেন।[৪০৫] তিন বছর পরে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন খুররমকে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সাফল্যের জন্য শাহজাহান উপাধি দেওয়া হয় তখন নূরজাহান আনন্দে পুলকিত হন এবং তিনি এই বিজয় উপলক্ষে একটি ভোজের আয়োজন করেন এবং তাঁকে মূল্যবান সম্মানের পোশাক ও কিছুসংখ্যক অন্যান্য উপহার প্রদান করেন। তিনি তাঁর সন্তানদের, তাঁর হেরেমের মহিলাদের ও প্রধান ভৃত্যদেরকে মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার রুপি খরচ করেন।[৪০৬]

শুধু রাজকীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এমন উপহার লাভ করেননি; রাজদরবারের অভিজাত ব্যক্তি ও বিশ্বস্ত ভৃত্যরাও এমন শুভলগ্নে একই উপহার

---

৪০৩. গুলবদনের 'হুমায়ুননামা' (বেভারেজ), পৃষ্ঠা- ১১৪। উল্লিখিত পরিসংখ্যানে মিথ্যা প্রমাণের মতো সাক্ষ্যের অভাব দেখা যায়। কিন্তু তারপরও পরিসংখ্যানটি কাল্পনিক বলে ধারণা করা হয়।

৪০৪. ইকবালনামা, পৃষ্ঠা- ১০৫.

৪০৫. তুযুক (R&B) প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠাগুলো- ২৭৭-৭৮.

৪০৬. Ibid., পৃষ্ঠা- ৩৯৭. টীকা: জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেন, 'আমার পুত্র খুররমের বিজয়ের জন্য নূরজাহান বেগম একটি ভোজের আয়োজন করেন এবং তাঁকে সূচিকর্ম শোভিত ফুল বিশিষ্ট একটি নাদিরি, দুর্লভ পাথর শোভিত একটি সারপিচ (পাগড়ির অলংকার), মুক্তার ঝালরযুক্ত একটি পাগড়ি, মুক্তা বসানো একটি কোমর বন্ধনী, অলংকার যুক্ত কোমর বন্ধনীসহ তরবারি, একটি ফুল কাটা বা (ছুরিকা), দুইটি ঘোড়া বিশিষ্ট একটি মুক্তার সাদা (যার একটিতে ছিল অলংকৃত জিন) এবং দুইটি মাদীবাচ্চাসহ একটি বিশেষ হাতিসহ মূল্যবান সম্মানের পোশাক। একইভাবে তিনি তাঁর সন্তান ও সম্মানিত মহিলাদের সকল প্রকার সোনার অলংকারসহ তিরকুজ নয় টুকরা বিশিষ্ট সম্মানের পোশাক এবং তাঁর প্রধান ভৃত্যদেরকে উপহারস্বরূপ একটি ঘোড়া, একটি সম্মানের পোশাক ও অলংকৃত ছুরিকা উপহার দেন। এই আপ্যায়নের জন্য ৩,০০,০০০ রুপি খরচ হয়েছিল

www.pathagar.com

লাভ করেন।[৪০৭] জাহানারাও এ ধরনের মঞ্জুরি প্রদানের সুবিধা ভোগ করতেন। তিনি অনেক শুভ অনুষ্ঠানে বিদেশি দূত[৪০৮] অভিজাত ব্যক্তি ও রাজদরবারের মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে খিলাত উপহার দিতেন।[৪০৯] পরবর্তীকালেও এই রীতিটি অব্যাহত থাকে। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের সময় যখন রাজকর্মচারীরা তাঁকে নিতে আসেন তখন তাঁর মা নবাব কুদসিয়া তাঁদের সম্মানের পোশাক অর্পণ করেন।[৪১০]

৩. (খ) ফরমান, সনদ, নিশান ও পরোয়ানা

রাজকীয় ফরমান জারি করার অধিকারটি ছিল শুধু সম্রাটের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন নূরজাহান। তিনি জাহাঙ্গীরের সাথে এই অধিকারের অংশীদার ছিলেন এবং কদাচিৎ তিনি তাঁর এই ফরমান জারির অধিকার প্রয়োগ করতেন।[৪১১] ফরমান ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী দ্বারা জারিকৃত হাসবুল হুকুমের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে প্রচার করা হতো।

রাজবংশজাত শাহজাদাদের জারিকৃত নিশান রাজদরবারের অন্য যোগ্য কর্মচারীদের দ্বারা জারিকৃত সনদ ও পরোয়ানা ছাড়াও ছিল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিলপত্র। একজন রানি বা শাহজাদি খুব কম ব্যাপারে হুকুম, সনদ, নিশান ও পরোয়ানা জারি করতেন।[৪১২] এই বিরল অধিকার হামিদা বানু

---

৪০৭. তুযুক (R&B), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১ : ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের চন্দ্রবছর অনুসারে ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানে নূরজাহান ৪৫ জন আমির ও ব্যক্তিগত ভৃত্যকে সম্মানের পোশাক প্রদান করেন।

৪০৮. বেগম সাহেব রুমির দূত জুলফিকার খানকে ১৫,০০০ রুপি ও একটি খিলাত প্রদান করেন। আমল-ই সালেহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৮.

৪০৯. দারার বিবাহের সময় তিনি আসফখান ও অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তিকে সূচিশিল্প শোভিত খিলাত উপহার দেন। কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫০০; তিনি শাহজাদা সুজার বিবাহের সময় খিলাত বিতরণ করেন : কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫০৭.

৪১০. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪.

৪১১. ইকবালনামা, (E এবং D), ষ'খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩৫. অন্যান্য রাজার দেওয়া খেতাব ছাড়াও সম্রাট নূরজাহানকে সার্বভৌমত্ব ও সরকারের অধিকার মঞ্জুর করেন। তাতিমা-ই-ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরী (E & D) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৮ : তাঁর নামে মুদ্রা অংকিত হতো এবং ফরমানে রাজকীয় সিলমোহরে তাঁর স্বাক্ষর থাকত : বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠাগুলো ১৯৩-৯৪ নূরজাহানের অন্যান্য ফরমানের নমুনার জন্য পরিশিষ্ট A দ্রষ্টব্য

৪১২. নূরজাহান ও জাহানারার নিশানের জন্য পরিশিষ্ট B এবং C দ্রষ্টব্য। দারার স্ত্রী নাদীরা বানু বেগমও কিছুসংখ্যক নিশান জারি করেন রাজস্থানের শাহজাদাদের প্রতি মোঘল সম্রাটের ফরমান, নিশান মঞ্জুরি ব্যাপারে একটি তালিকায় উল্লেখিত : পৃষ্ঠাগুলো ৩২,৩৫.

www.pathagar.com

বেগম,[৪১৩] মরিয়ম-উজ-জামানি,[৪১৪] নূরজাহান ও জাহানারার মতো যাঁরা সম্রাটের হেরেমে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ছিলেন তাঁদের অনুমোদন করা হতো। এটা উল্লেখ করা মজার ব্যাপার যে, উক্ত মহিলাদের দ্বারা জারিকৃত ফরমান ও নিশান শুধু তাঁদের জায়গিরগুলোতে কার্যকর হতো না; তারপরও তাঁদের সুযোগ কিছুটা সীমিত বলে ধারণা করা হয়। এসব মহিলার যে ফরমানগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর রাজনৈতিক মূল্য খুব বেশি নয়। সেগুলোতে নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করেনি। সামান্য অনুগ্রহ ও ছোটখাটো ব্যাপার যেমন ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব জায়গিরের মালিক রাজকীয় মহিলাদের কাছে প্রায়শ উল্লেখ করা হতো। তার ফলে তাঁরা এই ধরনের অনুরোধ মঞ্জুর করার আদেশ জারি করতেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদের ঝুলানো বারান্দায় বসতেন এবং অভিজাত ব্যক্তিরা হাজির হয়ে তাঁর নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর নামে মুদ্রা অংকিত হতো এবং তার শিরোনামে থাকত 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশক্রমে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নামের ছাপ দেওয়াতে সোনার সাথে শত গুণের ঔজ্জ্বল্য যুক্ত হয়েছে।' সকল ফরমানেও সম্রাটের স্বাক্ষর গ্রহণের পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নাম একত্রে সংযুক্ত হতো।

৩. (গ) রাজকীয় সিলমোহর

রাজকীয় ফরমানে সিলমোহর দেওয়া ছিল রানিদের বিশেষ অধিকার। তাই গোলাকার ছোট রাজকীয় সিলমোহরটি যা চাগতাই নামে উজুক বলে পরিচিত ছিল তা নিয়ম অনুসারে রাজকীয় হেরেমে থকত।[৪১৫] এটা পদবি উচ্চপদে

---

৪১৩. কে, এম, জাভারির ৩ নং শাহী ফরমানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট আকবরের মাতা হামিদা বানু কর্তৃক জারিকৃত আদেশ সম্বন্ধে, যা তিনি আগ্রা সরকারের মহাবন পরগনাতে ভিতল নামক একজন ব্রাহ্মণকে স্বাধীনভাবে গরু চরানোর জন্য অনুমতি দেন। যদিও ইহা একটি হুকুম তবুও তা ফরমানের রীতিতে লেখা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট D দ্রষ্টব্য।

৪১৪. ভারতীয় ঐতিহাসিক কমিশনের নথিপত্র ভলিউম viii, ১৬২৫, পৃষ্ঠাগুলো ১৬৭-১৬৯। এটি মরিয়ম উজ জামানি কর্তৃক জারিকৃত মোদাব্বির বেগের অনুকূলে চৌপলা (আধুনিক মুরাদাবাদ) পরগনাতে জনৈক সূর্যমল কর্তৃক অন্যায়ভাবে অধিকৃত জায়গির পুনরুদ্ধারে জন্য। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট 'E' দ্রষ্টব্য।

৪১৫. মুনসিরেট, পৃষ্ঠা- ২০৯। টীকা : খুব বিশ্বস্ত কিছু আমির অত্যন্ত জরুরি কাজে এই সিলমোহরটি ব্যবহার করতেন শুধু সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের প্রতি অনুগ্রহবশত তাঁর পিতাকে কিছু সময়ের জন্য এটি প্রদান করা হয় যিনি সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হন। ইবনে

www.pathagar.com

নিয়োগ জায়গির ও বড় অংকের মঞ্জুরিবিষয়ক ফরমান-ই-সারতির জন্য ব্যবহার করা হতো। শাহজাহানের আমলে তাঁর প্রিয়পত্নী রানি মমতাজ মহলের মৃত্যুর পরে সিলমোহরটি জাহানারা বেগম সাহেবকে দেওয়া হয়।[৪১৬] সম্রাটের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত সিলমোহর ছাড়াও মহিলাদের বাসস্থানের সাথে সকল সম্পর্কযুক্ত একটি আলাদা সিলমোহরও ব্যবহার করা হতো।[৪১৭]

৪. রাজকীয় মহিলাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

মোঘল আমলে বিশেষ করে এই দেশের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত; কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজপরিবারের শাহজাদা ও শাহজাদিদের মতো রাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক অভিজাত ব্যক্তিও প্রবল আগ্রহ পোষণ করত বলে এমন কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে।[৪১৮] বিশেষ করে রাজপরিবারের মহিলারা ব্যবসা-বাণিজ্যের পেশায় ততটা আগ্রহী ছিল না, তবুও মোঘল আমলে কিছুসংখ্যক মহিলা এর প্রতি আকৃষ্ট হন, কারণ এই সময় অত্যন্ত সমৃদ্ধিপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি করা হয়েছিল। ভারতীয় জাহাজ আরব সাগরে স্বাধীনভাবে চলাচল করত এবং ভারত থেকে বানানো পোশাক, মরিচ, মসলা, আদা, রং, গাঁজা ইত্যাদি পশ্চিম এশিয়ার দিকে বহন করে নিয়ে যেত (আরব দেশ, আফ্রিকা, পারস্য)[৪১৯] এবং মদ, সুগন্ধি দ্রব্য, বুটিতোলা রেশমি পোশাক, চীনা দ্রব্য, সোনা, রূপা, গজদন্ত, তেলস্ফটিক, মুক্তা, ঘোড়া ইত্যাদি ভারতে নিয়ে আসত।[৪২০] এটা যথেষ্ট কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার যে পারস্যের ইতিহাস এ ব্যাপারে নীরব।

বাণিজ্যিক কার্যকলাপে রাজকীয় মহিলাদের আগ্রহ তাঁদেরকে তাঁদের নিজস্ব জাঙ্ক সামনে ও পেছনের দিক একই আকৃতি বিশিষ্ট চীনা প্রনালিতে তৈরি জাহাজ লাভে উৎসাহিত করত। সেগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক জাহাজের

হাসানের মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কাঠামো দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং ইং ১০২; ড. বি. পি সাক্সেনার দিল্লির ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ৬৫।

৪১৬. ইবনে হাসানের 'মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় অবকাঠামো' পৃষ্ঠা- ১০২ কাজউইনি বলেন, 'তিনি তাঁর মায়ের মতো সিলমোহরটি শাতি খানমের কাছেও ন্যস্ত করেন যিনি তাঁকে দেখাশোনা করতেন, যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৪৯।

৪১৭. ইবনে হাসানের 'মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় কাঠামো', পৃষ্ঠা- ১০০।

৪১৮. সপ্তদশ শতকে মোঘল সম্রাটদের বাণিজ্যিক কার্যাবলিতে ড. শতিশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা-গুলো ২৬৪-৬৯।

৪১৯. প্যান্ট, পৃষ্ঠা- ১০৬.

৪২০. Ibid., পৃষ্ঠা- ১০৭.

www.pathagar.com

ওজন ছিল প্রায় ১২০০ টন। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একজন বড় মাপের উদ্যোক্তা জাহাঙ্গীরের মা এ রকম একটি জাঙ্ক চালাতেন।[৪২১] তাঁর জাহাজগুলো সুরাট ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলোর মধ্যে রমরমা ব্যবসায় করত। উইলিয়াম ফিন্স বলেন 'সম্রাটের মা এবং তাঁর নিরাপত্তায় বাণিজ্যিক কার্যে রত অন্য মহিলারা সুবিস্তৃত বাণিজ্যিক অভিযান চালাতেন এবং এই সময়ে তাঁর নিজস্ব একটি জাহাজে করে নীল ভর্তি করা হয় মক্কাতে যাত্রা করার জন্য।[৪২২] একইভাবে জন জরুদাইন জানান যে, খাজা আব্দুল হাসান তাঁর কাছে (ক্যাপ্টেন হকিন্স) অভিযোগ করে বলেন যে, তিনি নীল ক্রয় করার জন্য রানিমাতার পক্ষে বিয়ানাতে লোক পাঠান এবং রানির প্রতিনিধির কাছে মূল্য প্রদান করেছেন।'[৪২৩] রানিমাতার নিজস্ব একটি জাহাজের রাহিমি নামে পরিচিত ছিল[৪২৪] উহা মক্কাতে পণ্য বহন করত।[৪২৫] ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে একসময় এই জাহাজটি (রাহিমি) পর্তুগিজরা দখল করলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের সাথে যুদ্ধের রূপ লাভ করে ।[৪২৬] নূরজাহান বেগম বাণিজ্যিক কার্যাবলিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি কিছুসংখ্যক জাহাজ চালাতেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে আগ্রহী হন।[৪২৭] তিনি হাল্কাভাবে নীল ও সূচিশিল্পে শোভিত কাপড়ের ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন।[৪২৮] নূরজাহানের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন আসফখান। আসফখানের কাছ থেকে নূরমহলের নামে চলতি মাসের ২১ তারিখে আমার কাছে সংবাদ আসে যে, তিনি আরেকটি ফরমানের খরচ নির্ধারণ করেছেন ও তিনি এটা পেয়েছেন এবং তিনি প্রস্তুত আছেন আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে, তাঁর ভৃত্যদেরকে দিয়ে দেখাশোনা ও আদেশ পালন করাতে এবং তিনি লক্ষ রাখবেন যাতে আমাদের প্রতি অন্যায় করা না হয়।[৪২৯]

ইংরেজদের প্রতি উপর্যুক্ত অনুগ্রহের প্রধান কারণ হলো তিনি ইংরেজদের জাহাজে তাঁর মালপত্র পাঠাতে আগ্রহী হন। কারণ তাঁর মালপত্র মোঘল ও

---

৪২১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্র গ্রহণ, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৬১৩-১৫ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা ২১৩. জন জরুদাইনের পত্রিকা, পৃষ্ঠাগুলো- ১৮৬, ২০৯.

৪২২. ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা- ১২৩.

৪২৩. জন জরুদাইনের পত্রিকা, পৃষ্ঠা-গুলো ১৫৫-৫৬.

৪২৪. ভুলবশত জরুদাইন একে মাঝে মাঝে রেহেমি নামে অভিহিত করেন। জন জরুদাইনের পত্রিকা, পৃষ্ঠাগুলো ১৮৬,১৯১,২০৯.

৪২৫. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ১৫৫-৫৬, ২০৯.

৪২৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্র গ্রহণ, দ্বিতীয় খণ্ড (১৬১৩-১৫ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা- ২১৩।

৪২৭. আর, কে, মুখার্জির 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস', পৃষ্ঠা- ৮৩।

৪২৮. প্যান্ট, পৃষ্ঠা- ১৬৫।

৪২৯. শপ্তদশ শতাব্দীতে রো এবং ফ্রাইয়ারের ভারতে ভ্রমণ, পৃষ্ঠা- ১৪৪।

www.pathagar.com

পর্তুগিজদের মধ্যে খারাপ সম্পর্কের জন্য ভারতের বাইরে যেতে পারত না।[৪৩০] পরবর্তীকালে তিনিও ইংরেজদের মালপত্রের রক্ষাকারী হন।[৪৩১] মাঝে মাঝে তাঁর মালিকাধীন জাহাজ চালক ও পণ্যসামগ্রীতে কাজ চলত এবং অন্য কোনো মালিকের কাছ থেকে তিনি জাহাজ ভাড়া করতেন।[৪৩২] তিনি দামান ও দিউয়ের যে পর্তুগিজরা ভারত ও পশ্চিমের দেশগুলোর মধ্যে রমরমা ব্যবসায় করে আসছিল তাদের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[৪৩৩] কখনো কখনো নিজস্ব লাভের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যে রত সম্রাট, সম্রাটের মাতা ও স্ত্রীর হস্তক্ষেপের ফলে জটিলতা দেখা যেত।[৪৩৪] এই প্রচলিত রীতিটি শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারা বেগমও বজায় রাখেন। তিনি নিজ লাভ ও সুবিধার্থে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন এবং তিনি কিছু জাহাজের মালিকও হন।[৪৩৫] তিনি ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাদের সাহায্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়ে যান এবং তিনি বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেন।[৪৩৬]

৪. (ক) বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ

সাধারণত বাইরের দেশ ও বিদেশি মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সাথে সকল যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার বিষয়টি ছিল মোঘল সম্রাট ও তাঁর দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, রাজকীয় মহিলারাও মাঝে মাঝে বিদেশি মর্যাদাবান ব্যক্তিদের চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত উপহার গ্রহণের অধিকার ভোগ করতেন।

আকবরের আমলে মীর মুহাম্মদ মাসুম বাক্কারিকে পারস্যের শাহ আব্বাসের কাছে দূত হিসেবে পাঠানো হয় এবং তিনি যখন ফিরে আসেন

---

৪৩০. প্যান্ট, পৃষ্ঠা- ১৬৪।

৪৩১. বিখ্যাত মোঘলদের দরবারে স্যার টমাস রোর দূতাবাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৪৩৬,৪৪৪.

৪৩২. আর, কে, মুখার্জি রচিত 'ভারতে অর্থনীতির ইতিহাস', পৃষ্ঠা- ৮৩; ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬২২-২৩), পৃষ্ঠা- ২০৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে, '১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী অনেক ভারতীয় জাহাজ অবরোধ করে (লোহিত সাগরে যার মধ্যে বাবেল মান্দাল এর প্রণালিগুলো আছে এবং আরো উত্তরে মক্কা বন্দরের জেদ্দাতে) লোহিত সাগরে তাদের সাথে বাণিজ্য শুরু করার জন্য সম্রাটের ওপর চাপ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে। এগুলোর একটির নাবিক ও মালপত্রের মালিক ছিলেন সম্রাট, নরমাল (নূরমহল)।

৪৩৩. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬১৮-১৬২১ খ্রিষ্টাব্দ), পৃষ্ঠা-৮১; নূরমহলের জাঙ্ক নামক জাহাজগুলো পর্তুগিজদেরকে শুল্ক প্রদান করে।

৪৩৪. প্যান্ট, পৃষ্ঠা- ১৬৪.

৪৩৫. Ibid., পৃষ্ঠা- ২১১.

৪৩৬. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৪২-৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা- ১৪৮.

www.pathagar.com

তখন শাহের খালার কাছ থেকে মরিয়ম ম্যাকানির জন্য একটি পত্র নিয়ে আসেন।[৪৩৭] জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান তুরানের শাসনকর্তা ইমাম কুলি খানের মায়ের বাণিজ্যিক প্রসার ও বকেয়া পাওনার পূর্ণপ্রাপ্তির রসিদ স্বরূপ একটি পত্র পান।[৪৩৮] সেই চিঠির সাথে তিনি তাঁর দেশের কিছু দুর্লভ বস্তু পাঠিয়ে দেন। প্রত্যুত্তরে নূরজাহান খাজা নাসিরের নেতৃত্বে তুরানের শাসনকর্তার মায়ের জন্য একটি পাল্টা প্রতিনিধিদলকে ভারতের সবচেয়ে পছন্দনীয় উপহারসহ সমরখন্দে প্রেরণ করেন।[৪৩৯] এইভাবে মাঝে মাঝে রাজকীয় মহিলারা বাইরের দেশগুলোর রাজকীয় মহিলাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং তা ভারত ও বিভিন্ন পশ্চিম এশীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটায় ও সমঝোতার উন্নয়নে অবদান রাখে।

৪. (খ) রাজকীয় মহিলাদের প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা

মহিলাদের প্রতি মোঘলদের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদেরকে ভদ্র, হৃদয়বান, অতিথি বৎসল ও সৎ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তাঁদের দুর্ব্যবহারের কথা কখনো কেউ শোনেননি এবং বিশেষ করে তাঁরা তাঁদের পরিবারের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা হতো এবং সচরাচর তাঁদের ইচ্ছা বা পরামর্শ মেনে চলা হতো।[৪৪০]

মোঘলরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁরা তাঁদের মহিলাদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করেন। তারা তাঁদেরকে প্রায়ই শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন ও তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন এবং তাঁদেরকে সুখী করার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করতেন না। এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হলেন ভারতের প্রথম মোঘল শাসনকর্তা বাবর। নারীদের প্রতি তাঁর ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাবোধ। তাঁর চাচি, খালা ও ফুপু এবং হেরেমের অন্যান্য বয়স্ক মহিলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট ভালোবাসা ছিল। তিনি প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন এবং তাতে কখনো কখনো তিনি এমনকি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াকেও গ্রাহ্য করতেন না।[৪৪১]

---

৪৩৭. বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৫১.

৪৩৮. রোজার্স ও বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৫।

৪৩৯. Ibid.,

৪৪০. এইচ, এইচ, হুওয়ার্থের রচিত 'মোঘলদের ইতিহাস', চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠাগুলো ৩৮-৩৯।

৪৪১. একবার বাবর যখন মাহিম বেগমের কাছে বেড়াতে যান তখন মাহিম বেগম তাঁকে গ্রীষ্মকালে বাইরে ছুটাছুটি করতে নিষেধ করেন। তার উত্তরে বাবর বলেন 'মাহিম এটা বিস্ময়কর যে তুমি এমন কথা বলবে। আবু সাঈদ মির্জার কন্যারা তাদের পিতা ও

www.pathagar.com

তাঁদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য তিনি উপযুক্ত ভূমি মঞ্জুর করেন এবং খাজা কাসিম নামে একজন স্থপতিকে তাঁদের পছন্দমতো ব্যক্তিগত প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দেন।[৪৪২] শুধু তাই নয়, বাবর হেরেমের মহিলাদের প্রতি ছিলেন খুবই শিষ্টাচারপূর্ণ এবং তিনি তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজধানীর বাইরেও যেতেন। একদা যখন তাঁর ফুপু ফাকার-ই-জাহান বেগম ও খাদিজা সুলতান বেগম রাজধানীতে পৌঁছেন তখন তিনি সিকান্দ্রাবাদ পার হয়ে তাঁদের সেবা করতে যান।[৪৪৩] তিনি এ ব্যাপারে এত যত্নবান ছিলেন যে, কখনো কখনো উপযুক্ত যানবাহন না থাকায় তিনি তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পায়ে হেঁটে যেতেন।[৪৪৪] প্রকৃতপক্ষে হুমায়ুন ছিলেন একজন অত্যন্ত হৃদয়বান ব্যক্তি। মহিলাদের প্রতি ছিল তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা। তিনি বিশেষত তাঁর বোনদেরকে খুবই ভালোবাসতেন এবং তাঁর অসুস্থতার সময় তাদের প্রায়ই স্মরণ করেন।[৪৪৫] ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি তাঁর মাতা ও বোনদের শ্রদ্ধা জানাতে যান এবং তাঁদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। তিনি তাঁর বেদনাদায়ক পিতৃবিয়োগে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং তাদের জন্য জায়গির মঞ্জুর করেন।[৪৪৬] তারপরে তিনি গুলবদনের বাসভবনে প্রায়ই যেতেন যেখানে হেরেমের সকল মহিলা সমবেত হতেন।[৪৪৭] মনে হয় যে, তাঁর মা ও বোনদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও তাঁদের আরাম-আয়েশের প্রতি তার ব্যক্তিগত মনোযোগ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে তুলত এবং বিগা বেগম তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।[৪৪৮] কিন্তু হুমায়ুন অবস্থাটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেন এবং চূড়ান্তভাবে শুধু তাঁদের মন থেকে এই

ভ্রাতাদেরকে হারিয়েছেন! আমি যদি তাদেরকে আনন্দ দিতে না পারি তবে কীভাবে তা হবে? গুলবদনের হুমায়ুন নামা (ব্যাভারিজ) পৃষ্ঠাগুলো ৯৭-৯৮.

৪৪২. Ibid., পৃষ্ঠা- ৯৮.

৪৪৩. টীকা : গুলবদন বেগম লিখেন যে, কাবুল থেকে বেগমরা আগ্রাতে পৌঁছার খবর শুনে 'আমার সম্রাট পিতা আমার প্রিয়তম মহিলা খানজাদা বেগমকে নওগ্রাম পর্যন্ত সম্মানজনক শ্রদ্ধা জানাতে যান। গুলবদনের 'হুমায়ুন নামা' পৃষ্ঠা- ১০৩.

৪৪৪. টীকা : গুলবদন বেগমের মতে, মাহিম বেগম যখন কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে আসেন তখন বাবর কুল জালালী (আলিগড়) তে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু মাহিম বেগম তাঁর চেয়ে আগে এসে পৌঁছেন; একথা শুনে আমার সম্রাট পিতা ঘোড়ার জিন সাজানোর আগেই পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন। গুলবদনের হুমায়ুন নামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠাগুলো ১০০-১০১.

৪৪৫. Ibid., পৃষ্ঠা- ১০৪.

৪৪৬. Ibid., পৃষ্ঠা- ১১০.

৪৪৭. Ibid., পৃষ্ঠা- ১১১.

৪৪৮. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠাগুলো ১৩০-১৩১.

www.pathagar.com

অনুভূতি দূর করতে সফল হননি, তাদের কাছ থেকে লিখিতভাবে একথা আদায় করতে সফল হন যে, তিনি তাঁদেরকে অবহেলা করেননি।[৪৪৯] তিনি ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন কাবুল জয় করেন তখন তাঁর মা দিলদার বেগম এবং বোন গুলচেহারা বেগম ও গুলবদন বেগম তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে যান। তিনি তাঁদের আগমনে এত বেশি পুলকিত হন যে তিনি তাঁদের সম্মানে উৎসবের আয়োজন করেন।[৪৫০] আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি হেরেমের মহিলাদের প্রতি সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বপুরুষদের রীতিটি অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি মরিয়ম মাকানির প্রতি বিপুল শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন[৪৫১] এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি রাজধানীর বাইরে যান।[৪৫২] তিনি তাঁর ফুপু-খালাদের প্রতিও ছিলেন সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের প্রতি তিনি সদয় ব্যবহার করতেন।[৪৫৩]

জাহাঙ্গীর ছিলেন হেরেমের মহিলাদের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সচেতন। মায়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি প্রায়ই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে রাজপ্রাসাদের বাইরে যেতেন।[৪৫৪] এমন নয় যে, তিনি শুধু একাই তাঁর মাকে শ্রদ্ধা করতেন, এমনকি তিনি তাঁর পুত্রের কাছেও এটা আশা করতেন। রাই কারানের আত্মসমর্পণের পরে যখন খুররমকে সম্মানিত করা হয় তখন জাহাঙ্গীর তাঁকে তাঁর মায়েদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে সেবা করতে বলেন।[৪৫৫] তাঁর বোন শুকুরুন্নেসার প্রতিও তাঁর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল এবং তাঁকে তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন।[৪৫৬] নূরজাহানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সুবিদিত। নূরজাহানের হৃদয়ানুভূতির প্রতি তাঁর এত

---

৪৪৯. Ibid.,

৪৫০. Ibid., পৃষ্ঠা- ১৭৮.

৪৫১. টীকা : আবুল ফজল বলেন যে, একদা যখন বিহাতে রাজকীয় শিবির ছিল তখন একথা আকবকে জানানো হয় যে মরিয়ম মাকানির ডুলি নিকটে এসেছে। তিনি এই সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁকে সম্মান জানাতে আয়োজন করেন। আকবরনামা, ব্যাভারিজ কর্তৃক অনূদিত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৬। তিনি আরো লিখেন যে যখন ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মরিয়ম মাকানি দিল্লিতে পৌঁছেন তখন সম্রাট এই সংবাদ পেয়ে খুশি হন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান এবং সব রকমের ধুমধামসহ তাঁর বাসস্থানে নিয়ে আসেন। আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭০৯.

৪৫২. আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৮১.

৪৫৩. আবুল ফজল বলেন, 'তিনি হাজি বেগমের বাসস্থানে বেড়াতে যান এবং তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।' আকবরনামা (ব্যাভারেজ) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৪১.

৪৫৪. তুযুক-ই- জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৭৬, ১৩১.

৪৫৫. Ibid., পৃষ্ঠা- ২৭৭.

৪৫৬. Ibid., পৃষ্ঠা- ৩৬.

www.pathagar.com

বেশি শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁর পীড়াপীড়িতে তিনি মদ্যপানের মাত্রা কমিয়ে আনেন।[৪৫৭] নূরজাহান ছিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত। ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে একদা যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নূরজাহান এই সংবাদ কাউকে জানাননি এই আশঙ্কায় যে, সংবাদটি অনাবশ্যক ভীতি ছড়াতে পারে এবং সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের ওপরই পূর্ণ আস্থা রাখেন এবং তাঁকে তাঁর অসুস্থতা সম্বন্ধে অবহিত করেন।[৪৫৮]

জাহাঙ্গীরের পরে তাঁর পুত্র শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের প্রথম দিকে তিনি তাঁর মাকে হারান। প্রায় সকল বয়স্ক মহিলা প্রসঙ্গত প্রত্যক্ষভাবে শাহজাহানের একের পর এক যাঁরা পরলোকগত হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তাই তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল বেগমের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয় তাঁর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। স্বামীর জন্য মমতাজের আন্তরিক ভক্তি ও ভালোবাসা প্রমাণিত হয় বিপদে-আপদে স্বামীর সংস্পর্শে থাকা এবং তার বিদ্রোহের সময়ে অপরিহার্য দীর্ঘ ও কঠিন ভ্রমণকালে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে।[৪৫৯] শাহজাহানও তাঁর প্রতি সমানভাবে অনুরাগী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের মাত্র তিন বছর পরে মমতাজ মারা যান। তিনি তাঁর অকালমৃত্যুতে এতই ব্যথিত ও শোকাহত হন যে, তাঁর চুলে ধূসর বর্ণ ধারণ করে মাত্র এক রাতে।[৪৬০] কালক্রমে ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত মমতা তাঁর জ্যেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় কন্যা জাহানারার প্রতি নিবদ্ধ হয়। ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একদা যখন জাহানারা মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন তখন তাঁর চিকিৎসার জন্য তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর আরোগ্য লাভের পর তিনি একটি বড় উৎসবের আয়োজন করেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে ভিক্ষা বিতরণ করেন।[৪৬১] একমাত্র মহিলা যিনি আওরঙ্গজেবের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন বলে মনে হয় তিনি হলেন জাহানারা বেগম। আওরঙ্গজেব তাঁকে দারাশিকোর প্রিয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি জাহানারার প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সর্বদা তাঁর আদেশ পালনে প্রস্তুত।[৪৬২] যতদিন শাহজাহান জীবিত

---

৪৫৭. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২১৩-১৪.

৪৫৮. তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেন, 'আমি শুধু নূরজাহান বেগমকে এটা অর্পণ করেছিলাম যাঁর চেয়ে অন্য কাউকে আমি আমার প্রিয় বলে ভাবতাম না।' তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী , দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৬।

৪৫৯. লাহোরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৮৭, ৩৯০, কাফিখান প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৫৯.

৪৬০. লাহোরী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৮৬-৮৮; যদুনাথ সরকার shudies পৃষ্ঠাগুলো ২৭-২৮.

৪৬১. লাহোরী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-গুলো ৩৬৩-৬৯.

৪৬২. আদাব, পৃষ্ঠা- ১৯৬; রোকেয়াত,পৃষ্ঠা- ১৯৪.

www.pathagar.com

ছিলেন ততদিন জাহানারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁকে দেখাশোনা করতেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লিতে যান এবং তাঁকে আরামে থাকার জায়গা করে দেন আলীমর্দান খানের বাসস্থানে। ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাঁর সেবা যত্নের জন্য দানিশ মান্দ খানকে আদেশ করেন। শুধু সম্রাটগণই নন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও রাজদরবারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও পর্যাপ্ত শ্রদ্ধা করতেন মহিলাদেরকে।[৪৬৩] তাঁরা দূরে থাকতেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়তেন ও কুর্নিশ করতেন মহিলাদেরকে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ব্যক্তিগতভাবে শাহজাদিদেরকে দেখতে পেতেন না। তাঁদের সংবাদ পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত খোজা প্রহরীদের মাধ্যমে তাঁদের কাছে পাঠানো হতো। অনুমতি পেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে যেতেন ধীর পদক্ষেপে। বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ মহিলারা খোজা প্রহরীদের হাতে পান পাঠিয়ে দিতেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কুর্নিশ করে উপহার গ্রহণ করতেন এবং এভাবে তাঁরা মহিলাদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করতেন।[৪৬৪]

---

৪৬৩. যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৬. টীকা : অন্য একমাত্র যে মহিলার জন্য আওরঙ্গজেবের হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক হতো বলে কথিত আছে তিনি হলেন হীরাবাঈ (উপনাম জৈনাবাদী বেগম)। মনে হয় তাঁর দ্বারা তিনি এক সময়ে মুগ্ধ হন। এ ব্যাপারে সমসাময়িক নথিপত্রে কিছু বলা হয়নি। যা হোক এমন কিছু যদি হয়ে থাকে হবে তা অবশ্যই একটি উপেক্ষিত পর্যায় যা সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সমসাময়িক রাজনীতিকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। যদুনাথ সরকার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৬৫-৫৬।

৪৬৪. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৪।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
সমসাময়িক রাজনীতিতে ভারতীয় নারীদের অবদান

ক. রাজনীতিতে নারীদের ভূমিকা

কোনো নিশ্চয়তামূলক তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু তুর্কি-মোঙ্গলীয় আমলে রাজনীতির ক্ষেত্রে মহিলাদের ভোগ করা অধিকার নিরূপণ করা কঠিন। শুধু এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, মোঘল ও তুর্কি উভয় আমলে নারীরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগ করত। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর সন্তানদেরকে শৈশব অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করত তখন মহিলাদের মর্যাদা হয়ে উঠত বড় গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানরা বয়োপ্রাপ্ত ও বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিধবারা এমনকি গোত্রের নেতৃত্বসহ স্বামীর সকল অধিকার লাভ করত। এমন যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদেরকে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হতো।[৪৬৫] তৈমূর ও চেঙ্গিস খানের পরিবারের নারীরা তাঁদের স্বামীর সাথে যেতেন যুদ্ধের ময়দানে।[৪৬৬] তাঁরা শুধু যোদ্ধাদের সুখ-সুবিধা দেখাশোনা করতেন না, প্রকৃত যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধের সংঘাত ও ভয়ংকর সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী অনেক মহিলা পুরুষদের সাথে লড়াই করতেন এবং সাহসী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করতেন এবং বর্শা, তরবারির আঘাতে ও তীর নিক্ষেপ করে শক্তিশালী যোদ্ধাদেরকে পরাস্ত করতেন।[৪৬৭] পারস্যবাসীদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য আত্মস্থকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতায় নারীর অধিকার মেনে নেওয়া তুর্কিরা ভারতে ইতোমধ্যেই একজন মহিলাকে সিংহাসনে বসান এবং এভাবে তারা গ্রহণ করেন অত্যন্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ। রাজিয়ার দৃষ্টান্ত রাজকীয় মহিলাদেরকে উৎসাহিত করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে। এই রীতি ভারতে সমগ্র তুর্কি শাসন আমলে অব্যাহত ছিল এবং মনে হয় আফগানরাও তাঁদের মহিলাদেরকে রাজনীতিতে মতামত দেওয়ার অনুমতি দেন।

---

৪৬৫. রালফ ফক্স কর্তৃক লিখিত 'চেঙ্গিস খান', পৃষ্ঠা ৪৪।

৪৬৬. Ibid., p. 45.

৪৬৭. জে, এইচ, স্যান্ডারস কর্তৃক অনূদিত 'তৈমুর লং', পৃষ্ঠা ৩২৪।

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার সূত্রে চেঙ্গিস খান ও তৈমুরের ঐতিহ্যপ্রাপ্ত বাবরের পরিবার তাঁর নারীদেরকে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক অধিকার অনুমোদন করেন এবং এভাবে তাঁদেরকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলেন, কিন্তু তাঁদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার দিয়েছেন বলে মনে হয় না।[৪৬৮] ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন ওমর শেখ মির্জা মারা যান তখন বাবরের বয়স বড়জোর প্রায় এগারো বছর এবং তিনি ফারগানা সীমান্তে দুটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হন। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি তাঁর নানি আইসান দৌলত বেগমের দ্বারা ফলপ্রসূভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ বাবরের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। আইসান দৌলত বেগম প্রকৃত শীর্ষস্থানীয় নেত্রী হিসেবে কাজ করেন, জরুরি প্রশাসনিক সমস্যাগুলো দেখাশোনা করেন এবং এমন কৌশলের সাথে সংকটপূর্ণ অবস্থায় সব কিছু সামাল দেন, তার ফলে বাবরকে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।[৪৬৯] শুধু তাই নয়, পাঁচ বা ছয় মাস পরে যখন তাঁর অন্যতম সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারী হাসান বাবরকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তখন আইসান দৌলত বেগম আবার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে সংগঠিত করেন তাঁদের সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আটক করেন এবং এভাবে সমস্যাটির সমাধান করেন।[৪৭০] তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ও দূরদর্শী মহিলা এবং বাবরকে তাঁর দেশ শাসনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন।[৪৭১]

সমসাময়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে আইসান দৌলত বেগমের সক্রিয় ভূমিকা মোঘল পরিবারের জন্য কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নয়। বাবরের মা ও তাঁর উপপত্নীরাও তাঁদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অবদান রাখেন। তাঁর মা কুতলুঘ নিগার খানমও যুদ্ধক্ষেত্রে ও ভ্রমণকার্যে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন।[৪৭২]

---

৪৬৮. টীকা-বাদাখশানের শাহ বেগম একবার বাবরের কাছে পত্র লিখেন যে নারী হওয়ায় তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবেন না সেহেতু তাঁর নাতি মির্জাখান এটা অধিকার করবেন। ড. আর, পি, ত্রিপাঠী কর্তৃক লিখিত মুসলিম শাসনের কিছু 'দৃষ্টিকোনো' পৃষ্ঠা- ১০৯।

৪৬৯. উইলিয়াম রাশব্রুক কর্তৃক লিখিত 'ষোড়শ শতকের একজন সাম্রাজ্য স্থপতি', পৃষ্ঠা-৩৪

৪৭০. Ibid., pp. 35-36.

৪৭১. বাবর তাঁর নানি সম্পর্কে লিখেন যে যুক্তি ও বিজ্ঞতার ব্যাপারে আমার নানির সমতুল্য মহিলা খুব কমই হতে পারবে: তিনি ছিলেন খুব জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহিলা এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে উপদেশ আমাকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দেয়। বি.এন. দেব, ভলিউম এক, পৃষ্ঠা- ৪৩।

৪৭২. বাবর তাঁর সম্বন্ধে লিখেন, 'তিনি অধিকাংশ যুদ্ধ অভিযানকালে ও আমার সিংহাসন হারানো অবস্থায় সাথে ছিলেন...... তার মতো বিচক্ষণ ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী আর কোনো নারী নেই। B. N. (Bev.) vol. 1.p. 21.

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর শিয়া ধর্মাবলম্বী পত্নী মাহিম বেগম আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তিনি ছিলেন সুলতান হোসেন বাঈকারার আত্মীয় এবং ১৫০৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তাঁর স্বামীর সাথে বাদাখশানে ও ট্রান্স-অক্সিয়ানাতে গমন করেন এবং সকল অবস্থাতেই তাঁর পাশে থাকেন।[৪৭৩] তিনি বাবরের আমলে উচ্চমর্যাদা লাভ করেন এবং তিনিই একমাত্র রানি যিনি দিল্লিতে সম্রাটের পাশে সিংহাসনে বসার অনুমতি পান।[৪৭৪] তাঁর স্বামীর মৃত্যুর আড়াই বছর পরেও তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা অব্যাহত রাখেন। বাবরকে কয়েকটি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে যে অন্য একজন পত্নী তাঁকে সাহায্য করেন তিনি হলেন বিবি মুবারিকা যাঁকে তিনি ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে বিবাহ করেন।[৪৭৫]

মালিক সুলাইমান শাহের কন্যা বিবি মুবারিকা ছিলেন আফগনিস্তানের সবচেয়ে বিপজ্জনক ইউসুফজাই গোত্রভুক্ত। তিনি বাবরকে বিশেষ করে ইউসুফজাই গোত্রের লোক ও গোত্রপতি মালিক শাহ মনসুর এবং সাধারণভাবে

---

৪৭৩. B. N.(Bev.), vol. I.p. 358.

৪৭৪. A. N. p. 114; এস, কে, ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুন বাদশা' প্রথম ভলিউম, পৃষ্ঠা ৬০.

৪৭৫. এস, কে ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত হুমায়ুন বাদশা, দ্বিতীয় ভলিউম, পৃষ্ঠা- ৩১৪. টীকা: কিন্তু অধ্যাপক আর উইলিয়ামের মতে, মাহিম বেগম ঐ সময় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং মেহেদি খাজাকে সিংহাসনে বসানোর ক্ষেত্রে নিজামুদ্দিন খলিফার সৃষ্ট ষড়যন্ত্রে তিনি হুমায়ুনকে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন এবং হুমায়ুনের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে, হুমায়ুন ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দে বাদাখশানে খলিফার কর্মকাণ্ডের খবর সম্বন্ধে অবহিত হন। যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, তাঁর মাতা মাহিম সেই সময় বিলাসবহুল ভ্রমণে কাবুল হতে তাঁর স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আগ্রাতে গমন করেন; তিনি তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং স্বভাবত মনে হয় যে, তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ঐ রকম করেছিলেন কারণ তিনি কিছুটা কূটকৌশলের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর উইলিয়ামের পৃষ্ঠাগুলো ১৭১-১৭২। কিন্তু ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে তিনি কূটকৌশলের জ্ঞান অর্জন করলেও ইতাওয়ার জেলার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করার এই মতো মেনে নেওয়া দুষ্কর। মনে হয় হুমায়ুন যখন বাদাখশানে ছিলেন না তখন থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এটা মনে হয় না যে মাহিমকে ইতাওয়া জেলার ব্যাপারে জানানো হয়েছিল। 'বাবরনামা' অনুসারে তিনি নিশ্চিতভাবে ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন মাসের পূর্বে ইতাওয়া পৌঁছেন। যদি এই সময় তিনি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে না পারতেন তাহলে সুদূর বাদাখশান থেকে হুমায়ুনকে খলিফার পরিকল্পনার খবর ৭ই জুলাই ১৫২৯ খ্রিষ্টাব্দের পরে বা পূর্বে তাঁকে আগ্রাতে পৌঁছানো সম্ভব হতো না। মাহিমের অবদানে হুমায়ুনকে ৭ই জুলাই আগ্রাতে সম্রাটের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এভাবে এটা স্পষ্ট হয় যে, মাহিমের তত্ত্বাবধানে মাত্র ১৩/১৪ দিনের ব্যবধানে তিনি একেবারে বাদাখশান থেকে রাজধানীতে হুমায়ুনকে আসার জন্য খবর পাঠান। পনেরো দিন বা খুব কম সময়ের একটি সফরে ইতাওয়া থেকে বাদাখশান ও আগ্রায় ফিরেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুনের জীবন ও সময়', পৃষ্ঠাগুলো ৩৩-৩৪।

www.pathagar.com

আফগানিস্তানবাসীদের সাথে আপসের মাধ্যমে সাহায্য করেন। তিনি আফগানিস্তানে বাবরের ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেন।[৪৭৬] হুমায়ুনের রাজত্বকালে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলা হেরেমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা অধিকার করেন তিনি হলেন বাবরের বড় বোন খানজাদা বেগম। বাবরের শিয়া ধর্মাবলম্বী পত্নী মাহিম বেগম ১৫৩২-১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মারা যাওয়ার পরে তাঁকে রাজপ্রাসাদের প্রধান সম্মানিত মহিলার মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তাঁকে অর্পণ করা হয় বাদশা বেগম উপাধি।[৪৭৭] তাঁর প্রতি হুমায়ুনের ছিল বিপুল বিশ্বাস এবং পরিবারের জটিল সমস্যা নিরসনে তিনি তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগম তাঁকে সবচেয়ে প্রিয় মহিলা হিসেবে সম্ভাষণ করতেন।[৪৭৮] ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন থাট্টা অভিমুখে যাচ্ছিলেন তখন তিনি জানতে পারেন যে, কান্দাহারের শাসনকর্তা কারাচা খানের দৃষ্টান্ত অনুসারে হিন্দাল কান্দাহার দখল করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কামরান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তিনি এই ভ্রাতৃঘাতী বিবাদের সংবাদে অত্যন্ত বিব্রত হন এবং তাঁর ফুপু খানজাদা বেগমকে কান্দাহারে গিয়ে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এবং দুই ভাইয়ের পুনর্মিলন সাধনের জন্য অনুরোধ করেন। খানজাদা বেগম সেখানে যান কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।[৪৭৯] ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন ইরান থেকে ফিরে আসেন এবং কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেন তখন কামরান নিজেই সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি কান্দাহার দুর্গের ভারপ্রাপ্ত আশকারির কাছে প্রেরণ করেন খানজাদাকে কামরানের আগমনের পূর্বে দুর্গটি রক্ষা করার গোপন পরামর্শ দিয়ে। কিন্তু আশকারি হুমায়ুনের সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। দুর্গটির পতন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এভাবে কামরানের নির্দেশ মোতাবেক আশকারি খানজাদা বেগমকে শান্তি চুক্তির জন্য হুমায়ুনের কাছে পাঠান। যদিও খানজাদা বেগম আশকারি ও কামরানের প্রতি নম্র ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান তথাপি হুমায়ুন তিক্ততার কারণে তাঁর কথা রাখতে পারেননি। যখন খানজাদা গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখনও বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হতে পারেনি এবং ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে

---

৪৭৬. B. N.(Bev.) vol. 1.p. 375: এস. কে. ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত 'হুমায়ূন বাদশা', দ্বিতীয় ভলিউম, পৃষ্ঠা ৩২২.

৪৭৭. Ibid., pp. 314-15.

৪৭৮. J. H. N. (Bev.), p. 103

৪৭৯. Ibid., pp. 160-61; ড. ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুনের জীবন ও সময়', পৃষ্ঠা ২২২।

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের শেষ বারোটি বছর হেরেমের শীর্ষস্থানীয় মহিলা হিসেবে খানজাদা বেগম রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ পোষণ করেন এবং হুমায়ুন ও তাঁর ভাইদের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটান। তিনি তাঁর গণ্ডির মধ্যে থেকে দুঃখ-দুর্দশার দিনগুলোতে হুমায়ুনকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। খানজাদা বেগম ছাড়া অন্য কোনো মহিলা হুমায়ুনের রাজত্বকালে সমসাময়িক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু রাজকীয় হেরেমের বাইরে কিছুসংখ্যক মহিলা ছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে আগ্রহী ছিলেন। এমন একজন মহিলা হলেন মীর ওয়াইস বেগের কন্যা[৪৮০] এবং হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের ভাই সোলায়মান মির্জার স্ত্রী হারাম বেগম।[৪৮১] তিনি ওয়ালি নিয়ামত (পরোপকারী মহিলা) উপাধি লাভ করেন।[৪৮২] তিনি একজন উচ্চাভিলাষী মহিলা ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল এবং তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শকারী স্বামী ও তাঁর পুত্র মির্জা ইব্রাহিমের ওপর প্রায়ই আধিপত্য বিস্তার করতেন।[৪৮৩]

হুমায়ুন যখন কাবুল থেকে ১৫৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বলখের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করেন তখন হারাম বেগমের সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকার প্রথম দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। সাহায্যের জন্য হুমায়ুনের আহ্বানের সাড়ায় হারাম বেগম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা একটি শক্তিশালী সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাদেরকে উল্লেখযোগ্য দূরত্বে পরিচালনা করে নিয়ে যান এবং তাদেরকে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে নির্বাসিত সম্রাটের সাথে যোগ দিতে আদেশ করেন এবং তাঁকে তাঁর সামরিক অভিযানে সাহায্য করেন না।[৪৮৪]

১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দে যখন হুমায়ুন ভারতের উদ্দেশে একটি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন তখন তিনি মির্জা হিন্দালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য সশরীরে কাবুলে আসেন[৪৮৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো এক পারিবারিক বিবাদ থেকে দূরে থাকার জন্য কাবুলে আসেন।[৪৮৬] তাঁর স্বামী এবং পুত্রের

---

৪৮০. 'আকবরনামা' ব্যাভারেজ কর্তৃক সম্পাদিত, ভলিউম দ্বিতীয়, পৃষ্ঠা ৪০.

৪৮১. Ibid., p. 212.

৪৮২. Ibid., p. 40.

৪৮৩. ব্যাভারেজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯।

৪৮৪. গুলবদন কর্তৃক লিখিত 'হুমায়ুননামা' (ইংরেজি অনুবাদ), পৃষ্ঠা ১৯৫, ড. ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক লিখিত 'হুমায়ুনের আমলে জীবনযাপন', পৃষ্ঠা ৩০৮।

৪৮৫. বায়েজীদ কর্তৃক রচিত 'তারিখ -ই - হুমায়ুন ওয়া আকবর', পৃষ্ঠা- ২২৩।

৪৮৬. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৪০- ৪১।

www.pathagar.com

সাথে পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করেন এবং তাঁকে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু কাবুলে অবস্থানকালে তিনি যত্ন সহকারে সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ করেন এবং কাবুল অধিকার করার একটি সুযোগ লাভের জন্য তিনি আকৃষ্ট হন। তিনি মির্জা সোলাইমানকে কাবুল বিজয় করতে প্ররোচিত করেন, যা সেই সময়ের অবস্থার পরিস্থিতিতে ছিল একটি সহজ কাজ; কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।[৪৮৭] হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে স্ত্রী হারাম বেগমের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে মির্জা সোলায়মান কাবুল অধিকার করার জন্য উন্মত্তভাবে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাতে সফল হননি।[৪৮৮]

৪৮৭. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৪১ .

৪৮৮. Ibid., p. 41.

www.pathagar.com

দশ বছর পরে ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাবুলের রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক ভূমিকা পালন করেন। কাবুলকে অরক্ষিত অবস্থায় দেখে তিনি তাঁর স্বামী মির্জা সোলাইমানকে চতুর্থবারের মতো কাবুল দখল করতে উৎসাহিত করেন। মির্জা হাকিম কাবুল দুর্গ মাসুমের কাছে ন্যস্ত করে ঘোরবন্দে প্রস্থান করেন। হারাম বেগম তাঁর স্বামীকে কাবুল দুর্গ অবরোধ করতে নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে দূতের মাধ্যমে যুবরাজের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি মিষ্টি কথায় ও প্রতিশ্রুতিতে তাঁকে তোষামোদ করতে চেষ্টা করেন এবং কাবুল থেকে চব্বিশ মাইল দূরে কারাবাগে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করেন। তাঁর একটি গোপন পরিকল্পনা ছিল রাজপুত্রকে প্রলুব্ধ করে কারাবাগে বন্দি করার জন্য। এটি তাঁর জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, তাঁর একজন পরিচারিকা মির্জা হাকিমের সাথে যোগ দেয়। গোপন বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং কারাবাগের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী মির্জা হাকিম খুব দ্রুতগতিতে ফিরে আসেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য।[৪৮৯] এই ঘটনায় হারাম বেগমের চাতুর্য ও ধূর্ততাপূর্ণ কূটনীতি প্রকাশ পায়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রবল বাসনা হারাম বেগমকে তাঁর স্বামীর দায়িত্বে ন্যস্ত বাদাখশানের প্রশাসন ব্যাপারে কৌতূহলী হতে প্রণোদিত করে। তিনি রাজ্যের শাসনকার্যে এবং সেনাবাহিনীর প্রশাসনিক দক্ষতা ও কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি এত বেশি প্রভাব খাটান যে, মির্জা সোলায়মান তাঁকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেন এবং তিনি সেই অধিকারে কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করেন।[৪৯০]

তিনি কুলাবের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করেন কিন্তু তাতে খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেননি।[৪৯১] তিনি ছিলেন পুরুষোচিত ও ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রের একজন মহিলা এবং তিনি শুধু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নয়, এমনকি রাজপুত্রদের মধ্যেও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ের পাত্রী ছিলেন।[৪৯২] হুমায়ুনের রাজত্বকালে মোঘল পরিবারের মহিলারা বাদেও ছিলেন সমকালীন রাজনীতিতে সুপরিচিত অন্য কয়েকজন মহিলা। সিকান্দার লোদী কর্তৃক চুনার দুর্গের শাসকরূপে নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাজখান সারাংখানির স্ত্রী লাড মালিকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী সুন্দরী, শক্তি ও প্রতিভার অধিকারিণী এবং এ কারণে ঈর্ষাবশত তাঁর উপপত্নীরা তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাতে তাজখান নিজেই নিহত হন। লাড

---

৪৮৯. Ibid., pp. 407-9.

৪৯০. ব্যাভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২১২-১৩।

৪৯১. Ibid., p. 215.

৪৯২. গুলবদন কর্তৃক লিখিত 'হুমায়ুননামা' (ব্যাভারিজ অনূদিত), পৃষ্ঠা-১৯৩। ব্যাভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২।

www.pathagar.com

মালিকা চাতুর্যতার সাথে তাঁর মৃত স্বামীর সৈন্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমর্থন লাভে সক্ষম হন এবং রাজ্যে তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শিতা, উদারতা ও পরোপকারিতা দ্বারা তিনি ক্রমান্বয়ে তাঁর পুত্রদেরকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে সফল হন। পরে শেরশাহ তাঁকে বিবাহ করার উপায় উদ্ভাবন করেন এবং লাড মালিকার সংগৃহীত ধনসম্পদসহ চুনার দুর্গ অধিকার করেন।[৪৯৩]

(খ) রাজনীতিতে রানি কর্ণবতীর অবদান

এই সময়ে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারিণী আর একজন মহিলা ছিলেন রানা সংগার পত্নী রানি কর্ণবতী। তিনি তাঁর স্বামীর ওপরে বিশেষ প্রভাব খাটান এবং তাঁর পুত্র বিক্রম ও উদয়ের জন্য বিশাল জায়গির লাভের প্রচেষ্টা চালান এবং মেবারের সিংহাসনে আরোহণের জন্য তাঁদের দাবি তুলে ধরেন। তিনি বাবরের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর পুত্রদেরকে সিংহাসনের দাবি বাস্তবায়নে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে কোনো উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাননি।[৪৯৪] শীঘ্রই ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য মেবারের সিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেন; কিন্তু তিনি অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয় দান করেন এবং শাসনকার্যের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করেন। তিনি রাজপুত অভিজাত ব্যক্তিদের আস্থা ও সহযোগিতা হারান।

কিন্তু তার কৌশল, সামর্থ্য ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মাতা রানি কর্ণবতী এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। যখন গুজরাটের বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করেন তখন সেই রাজনৈতিক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। রানি কর্ণবতী হুমায়ুনের কাছে একটি বালা (রাখী) পাঠিয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য আবেদন জানান; কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে কোনো বাস্তব সাহায্য পাননি।[৪৯৫] পরিশেষে প্রচুর অর্থ, কিছুসংখ্যক ঘোড়া ও হাতিসহ মালওয়া হস্তান্তর করে তিনি বাহাদুর শাহের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।[৪৯৬] আপাতত

৪৯৩. Ferishta, vol. 11, p. 110, Tabaqat, vol. 11,pp. 155-56.

৪৯৪. 'ব্যাভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'বাবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৬১২-১৩.

৪৯৫. মোঘল সম্রাজের 'উত্থান ও পতন', ড. ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত, পৃষ্ঠা-৭২; ড. ঈশ্বরী প্রসাদ কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুনের জীবন ও শাসনকাল', পৃষ্ঠা-৬৫। এস.কে. ব্যানার্জী কর্তৃক বিরচিত 'হুমায়ুন বাদশাহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৭।

৪৯৬. জি, এন, শর্মা কর্তৃক রচিত 'মেবার ও মোঘল সম্রাটগণ', পৃষ্ঠাগুলো-৫১-৫২। ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুন বাদশাহ' দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-৩২৭.

www.pathagar.com

সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল। বিক্রমের শাসনাধীনে মেবারের রাজনৈতিক অবস্থার অবনতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাহাদুর শাহ্ চিতোরে দ্বিতীয়বারের মতো ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আক্রমণ করেন। রানি কর্ণবতী চিতোর দুর্গটি রক্ষা করার জন্য শেষ চেষ্টা করেন, রাজপুত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে একত্রিত করে দৃঢ়ভাবে বাহাদুর শাহের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু রুমি খানের নেতৃত্বে বাহাদুর শাহের পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলা করা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। রাজপুতদের সামনে পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রানি কর্ণবতী জওহর ব্রত গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে বাহাদুর শাহ্ দুর্গটি দখল করেন।[৪৯৭] মেবারের রাজনীতিতে রানি কর্ণবতীর সক্রিয় ভূমিকা ও তাঁর বীরত্বপূর্ণ সমাপ্তি প্রমাণ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সামর্থ্য ও সক্রিয় আগ্রহ।

(গ) মাচুচাক বেগমের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

আকবরের রাজত্বকালের বিদ্রোহপূর্ণ প্রথম বছরগুলোতে কয়েকজন মহিলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আকবরের বিমাতা মাচুচাক বেগম এবং হুমায়ুনের সাথে ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন তাঁর পুত্র মির্জা মুহাম্মদ হাকিমকে কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে মুনিম খানের অভিভাবকত্বে অর্পণ করেন যিনি তাঁকে কাবুল শাসনের ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন। কিন্তু যুবরাজের মা মাচুচাক বেগম ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী মহিলা এবং তিনি কাবুলের রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর ব্যাপক প্রভাব খাটান। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে বৈরাম খানের পতনের পরে যখন মুনিম খানকে রাজদরবারে ডেকে পাঠানো হয় তখন যুবরাজকে সাহায্য করার জন্য তাঁর পুত্র গণি খানকে রেখে যান, কিন্তু গণি খান তাঁর পিতার মতো দক্ষ ছিলেন না। মাচুচাক বেগম এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কাবুলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ক্রমশ আরো শক্তিশালী প্রভাব অর্জন করতে শুরু করেন। তিনি বলপূর্বক গণি খানকে বহিষ্কার করেন এবং এমনকি তাকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করতে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেন।[৪৯৮] এরপরে কাবুল মাচুচাক বেগমের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তিনি শাসনকার্য দেখাশোনার জন্য ফাজিল বেগমকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে

---

৪৯৭. জি.এন. শর্মা কর্তৃক রচিত 'মেবার ও মোঘল সম্রাটগণ', পৃষ্ঠাগুলো-৫৫-৫৭.

৪৯৮. এইচ. ব্যাভারেজ কর্তৃক আনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২৮৮-৮৯ ও ৩১৭। বাদাউনি, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা-৫৪ তাবাকাত, দ্বিতীয় খণ্ড- ২৬৯ পৃষ্ঠা, মাসির-ই-আলমগিরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১৩৪-৩৫। ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক লিখিত 'আকবর বিখ্যাত মোঘল', পৃষ্ঠাগুলো ৪৬-৪৭.

www.pathagar.com

অবশেষে তাঁকে খুন করে। তারপরে তিনি কাবুলের মহাব্যবস্থাপক পদে শাহওয়ালি আতকাকে নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় নিজ ক্ষমতা অপপ্রয়োগ শুরু করে বেগমের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুললে বেগম তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৪৯৯] ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে গণি খানের বহিষ্কার ও কাবুলের বিশৃঙ্খল অবস্থার খবর রাজদরবারে পৌঁছলে আকবর প্রদেশটিতে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মুনিম খানকে পাঠান। মুনিম খান নিজ পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাবুলে যেতে আগ্রহী হন এবং আনন্দের সঙ্গে আকবরের আদেশ পালন করতে দ্রুত কাবুলের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু আফগানদের প্রতিরোধ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মুনিম খান পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হন।[৫০০] এই সময়ে তাঁর নিজের মহিমান্বিত সাঈদ পরিবারের দাঙ্গাবাজ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শাহ আব্দুল মালি লাহোরের জেল থেকে পলায়ন করে প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের সন্ধানে উপস্থিত হন বেগমের কাছে। বেগম তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সাথে পরামর্শ করে অবশেষে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর সাথে ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করে তাঁর পরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর কন্যা ফখরুন নিসা বেগমকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু শাহ আবুল মালির মাচুচক বেগমের মুরুব্বিয়ানা পছন্দ হয়নি এবং তিনি তাঁর অবস্থানকে দৃঢ় করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, তিনি কাবুলের রাজনীতিতে তাঁর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করতে শুরু করেন এবং অবশেষে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।[৫০১] সৌভাগ্যবশত মির্জা হাকিমকে বাদাখশানের মির্জা সোলায়মান উদ্ধার করতে আসেন এবং কিছু সময়ের জন্য আবুল মালিকে পরাজিত করে কাবুলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সাহায্য করেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি কাবুলের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হন এবং পরবর্তী আট বছর যাবৎ রাজনৈতিক দৃশ্যপট নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর পুত্র মির্জা হাকিমের অবস্থান স্থিতিশীল ও মজবুত করার প্রচেষ্টাতে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর জীবন হারান। এটা স্পষ্ট যে, আকবরের রাজত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর কার্যকলাপ ছিল রাজনৈতিক ঝামেলার অতিরিক্ত উৎসস্বরূপ।

---

৪৯৯. এইচ. ব্যাভারেজ কর্তৃক রচিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২৮৮-৮৯

৫০০. Ibid., pp. 289-93.

৫০১. আকবর নামা (বেভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩১৭-১৯: বায়েজীদ কর্তৃক লিখিত 'তারিখ-ই-হুমায়ুন ওয়া আকবর', পৃষ্ঠা-২৮৪: তাবকাত-ই-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭.

www.pathagar.com

(ঘ) মাহাম আনাগার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

আকবরের রাজত্বকালের প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালনকারিণী আর একজন মহিলা ছিলেন তাঁর প্রধান সেবিকা মাহাম আনাগা।[৫০২] তিনি ছিলেন নাদিম কোকার স্ত্রী এবং বাকি ও আদম কোকার জননী। তিনি আকবরকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে, ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কামরান যখন আকবরকে কামানের গোলার মুখে নিক্ষেপ করার ভীতি প্রদর্শন করেন তখন তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে অঙ্গীকার করেন।[৫০৩] তার ফলে আকবর তাঁর প্রতি বিপুল আস্থা পোষণ করতেন। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে আকবরের রাজপ্রতিনিধি হন বৈরাম খান। কিন্তু ক্রমশ রাজপ্রতিনিধিত্বের ধারণাটি আকবরের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে ওঠে। তাঁর বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং তিনি আমোদ-প্রমোদপূর্ণ জীবন যাপনে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।[৫০৪] তিনি বৈরাম খানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিজ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁর সামনে ছিল তাঁর পিতামহ ও পিতার দৃষ্টান্ত যাঁরা তাঁদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আরো বেশি অগ্রসর হতে সমস্যার সম্মুখীর হন।[৫০৫] অত্যন্ত সৌভাগ্যবশত আকবর মাহাম আনাগার মধ্যে অনুকূল সাড়া পান[৫০৬] যখন তিনি বৈরাম খানের প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মাহাম আনাগা এ বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা প্রদান করেন সানন্দে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মাহামের আত্মীয়রা গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তার ফলে মাহামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শাহাবুদ্দিন দিল্লির এবং বাকি খান ছিলেন আলীগড়ের শাসনকর্তা।[৫০৭] ১৫৬০

---

৫০২. মাহাম আনাগার প্রভাব কালটি প্রায়ই নারী শাসিত সময় বলে পরিচিত ছিল। ভন নোয়ারের মতে ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দ আদম খানের মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রভাব কার্যকর ছিল (সম্রাট আকবর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৪)। কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথের মতে এই প্রভাব ১৫৬০ থেকে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (মহান মোঘল আকবর, পৃ: ৩৬)। কিন্তু উভয়েই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মাহাম ছিলেন একজন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী মহিলা এবং তিনি আকবরকে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের হাতিয়াররূপে কাজে লাগান। তিনি কী রকম প্রভাব খাটান তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু মনে হয় যে, আকবর কখনো মহিলাদের প্রভাবের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাই তিনি নারী শাসিত সরকারের অধীন ছিলেন এই মন্তব্যটি যথার্থ বলে মনে হয় না। মাহাম আনাগা এবং আকবর রচয়িতা ড. আর. পি ত্রিপাঠী (g. H. I. vol. 1) পৃষ্ঠা-৩২৬

৫০৩. Tabaqat, vol. 11,p 112.

৫০৪. ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক লিখিত 'মহান মোঘল আকবর', পৃষ্ঠা-৩২.

৫০৫. ড. আর, পি, ত্রিপাঠী কর্তৃক লিখিত 'মাহাম আনাগা ও আকবর' (ভারতীয় ইতিহাসের নিবন্ধ, প্রথম পর্ব, নং ১), পৃষ্ঠা-৩৪৪.

৫০৬. Ibid., p. 342.

৫০৭. Ibid.

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন আগ্রা থেকে একটি শিকার অভিযানে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে দিল্লিতে পুত্রের স্মৃতিবিজড়িত অসুস্থ মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে আহ্বান জানান মাহাম আনাগা।[৫০৮] তিনি দিল্লিতে আকবরকে অভ্যর্থনাকারী শাহাবুদ্দিনের সাথে আলাপ আলোচনা করেন।[৫০৯] শাহাবুদ্দিনের সম্মতিক্রমে মাহাম আনাগা সম্রাটের সাথে এমন কথাবার্তা বলেন যার ফলে সম্রাটের মনোভাবে পরিবর্তন আসে। তাঁরা সম্রাটকে বুঝিয়ে বলেন যে, বৈরাম খান যতদিন থাকবেন ততদিন তিনি আকবরকে কোনো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দেবেন না। এর ফলে আকবরের মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে।[৫১০] বৈরাম খানের মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে শাহাবুদ্দিন ও মাহাম আনাগা সম্রাটের কাছে হজ্বযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আকবর মাহাম আনাগাকে ভালোবাসেন বলে তাঁর সান্নিধ্য থেকে আলাদা হওয়ার ধারণাটি পছন্দ করেননি। তিনি বৈরাম খানকে লিখেন যে, তাঁর সাথে পরামর্শ না করে আগ্রা ত্যাগ করায় তাঁর কয়েকজন সেবক তাঁর আচরণ সম্বন্ধে শঙ্কিত।[৫১১] ইতোমধ্যে মাহাম এবং শাহাবুদ্দিন আকবরের মনোভাব পরিবর্তনের সংবাদ ছড়াতে শুরু করেন।[৫১২] তাঁরা সম্রাটের সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে জায়গির ও খেতার প্রদানের আশ্বাস দেন।[৫১৩]

মাহাম আনাগার উৎসাহ লাভ করে এবং বৈরাম খানের ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে সম্রাট তাঁর কয়েকজন সংবাদ বাহককে আটক করেন[৫১৪] এবং তার ফলে দুইজনের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আকবরের ব্যবহারে নিরাশ হয়ে বৈরাম খান হজ্ব যাত্রার ইচ্ছায় সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নেন।[৫১৫] আকবরের সমর্থকরা তাঁকে আবার অবহিত করেন যে, বৈরাম খান পাঞ্জাব জয়ের লক্ষ্যে যাত্রা করেছেন। তাই আকবর মীর আব্দুল লতিফকে পাঠান তাঁকে হজ্বযাত্রায়

---

৫০৮. Tabaqat. vol. 11. p. 237; Ferista. vol. 11. p. 195; Maasir, vol. II, p. 346.

৫০৯. Tabaqat, vol, 11, p. 237.

৫১০. Tabaqat. vol. 11, p. 238. A. N.(Bev.). vol.11. p. 141.
উল্লেখ ছিল যে, সম্রাট আকবরই বিস্ময়কর 'বোধশক্তি' সম্পন্ন ও আনুগত্যের অধিকারিণী মাহাম, আদম, এম. শরফুদ্দিন হোসেন এবং অন্য কিছুসংখ্যক সভাসদের সাথে কথা বলেন এবং তাঁদেরকে জানান তিনি তাঁর বিশ্বনন্দিত কয়েকজন সুন্দরীর ঘোমটা উন্মোচিত করবেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং বৈরাম খানকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

৫১১. Tabaqat. vol. 11.p 238.

৫১২. Ibid.

৫১৩. ভারতের কেমব্রীজ ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭.

৫১৪. তাবকাত-ই-আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪০; বাদাউনি: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১.

৫১৫. ভারতের কেমব্রীজ ইতিহাস: চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৭৭.

www.pathagar.com

অনুপ্রাণিত করতে।[৫১৬] সম্রাট আগেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে খান-ই-খানানের কাছে রাজনৈতিক অবস্থাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও পীর মোহাম্মদ শারওয়ানি তাঁকে তাড়া করেন এবং তাঁকে পরাজিত করেন। বৈরাম খান আত্মসমর্পণ করেন এবং অবশেষে ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে হজ্বযাত্রা করেন।[৫১৭]

বৈরাম খানের পতনের পরে আকবরের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় রাজবাহাদুর কর্তৃক শাসিত মালওয়ার দিকে। মাহাম আনাগার পুত্র আদম খানকে মালওয়ার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়[৫১৮] এবং ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজবাহাদুর পরাজিত হন। আদম খান সমস্ত সম্পত্তি, কোষাগার এবং নর্তকী ও গায়িকাসহ রাজপ্রাসাদের দখল লাভ করেন।[৫১৯] এই সাফল্য আদম খানকে অহংকারী করে তোলে এবং তিনি সম্রাটকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি না পাঠিয়ে শুধু অল্পসংখ্যক হাতি পাঠান এবং তাঁর নিজের জন্য বন্দি মহিলা ও অধিকৃত সামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিসগুলো রেখে দেন।[৫২০] আকবর আদম খানের আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হন। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গোপনে আগ্রা ত্যাগ করেন হঠাৎ আদম খানকে আক্রমণ করতে।[৫২১] মাহাম আনাগা তাঁর পুত্রকে সতর্ক করার জন্য দুইজন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন সংবাদ বাহককে পাঠান; কিন্তু আকবর তাদের আগেই সেখানে পৌঁছেন এবং আকস্মিকভাবে আদমকে আক্রমণ করেন।[৫২২] তিনি আকবরের উপস্থিতিতে অবাক হন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু তিনি সম্রাটের ক্রোধ উপশম করতে সফল হননি। তারপরে শীঘ্রই ঘটনাস্থলে মাহাম আনাগা ছুটে আসেন। তিনি সব কিছু গুছিয়ে নেন এবং অবশেষে আদম খান সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্রাটের কাছে হাজির করেন।[৫২৩] তাঁর আত্মসমর্পণ অবশেষে গৃহীত হয়।[৫২৪] আদম খান তাঁর ধূর্ত আচরণ অব্যাহত রাখেন। তিনি রাজবাহাদুরের হেরেমের দুইজন সুন্দরীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আটকে রাখেন। আকবর যখন তা শুনতে পান তখন তিনি আদেশ দেন সেই

---

৫১৬. তাবাকাত-ই আকবরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪০; ভন নোয়ার কর্তৃক লিখিত সম্রাট আকবর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৪.

৫১৭. Ibid., p. 84. Tabaqat, vol. 11, p. 241.

৫১৮. Ibid., pp. 242-43; ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক লিখিত 'মহান মোঘল আকবর' পৃষ্ঠা-৩৪.

৫১৯. আকবরনামা (বেভারেজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৮.

৫২০. Ibid.,p. 213; ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক লিখিত 'মহান মোঘল আকবর' পৃষ্ঠা-৩৭.

৫২১. আকবরনামা, (বেভারেজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২১৪.

৫২২. Ibid., p. 218

৫২৩. Ibid., p.219.

৫২৪. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১.

www.pathagar.com

দুইজন সুন্দরীকে খুঁজে বের করার জন্য।[৫২৫] মাহাম আনাগা বুঝতে পারেন যে এই দুইজন মহিলাকে সম্রাটের আদেশে খুঁজে বের করা হলে তাঁর কর্মকাণ্ডের রহস্য এবং তাঁর পুত্রের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে। তাই তিনি এই নিষ্পাপ মহিলা দ্বয়ের মৃত্যু কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। মাহাম আনাগার সংবেদনশীলতার প্রতি আকবরের ছিল যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং তাই কোনো কিছু বলে তাঁর মনে আঘাত দেননি। সেবিকার প্রতি আকবরের ছিল কৃতজ্ঞতাবোধ; কিন্তু মাহাম আনাগা তাঁকে বিস্ময়কর অবস্থার দিকে ঠেলে দেন। শুধু তাই নয়, মাহাম আনাগা তাঁর আনুগত্য ও বিচক্ষণতা দ্বারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫২৬] তিনি সম্রাটের প্রধান বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি শাহাবুদ্দিন ও খাজা জাহানের আস্থা অর্জন করেন এবং আলি কুলি খানের ভাই বাহাদুর খানকে ভাকিল পদে নিয়োগের বিষয়টি নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগান। যদিও বাহাদুর খান ভাকিল ছিলেন তথাপি আসল কাজ মাহাম আনাগার দ্বারা সম্পন্ন হতো।[৫২৭] এই সময় সব কিছুই ঠিকমতো চলছিল। কিন্তু এই সাফল্য মাহাম আনাগাকে তাঁর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।[৫২৮] তিনি এই অভিপ্রায় পোষণ করতেন যে, তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে বা আত্মীয়দের সহযোগিতায় ফিরিয়ে আনবেন।[৫২৯] আকবর তা পছন্দ করেননি। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে আকবর শামসুদ্দিন আতকা খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।[৫৩০] যখন শামসুদ্দিন আতকা খান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন মাহাম আনাগা যিনি তাঁর চমৎকার কার্যকলাপ, পর্যাপ্ত বিচক্ষণতা ও সীমাহীন রাজভক্তি প্রসূত নিজেকে প্রকৃত প্রধানমন্ত্রী বলে মনে করতেন, এতে অসন্তুষ্ট হন।[৫৩১] মুনিম খানও মাহাম আনাগার প্রভাব বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট হন। এটা ছিল সমস্যার চূড়ান্ত রূপ। সম্রাট এবং তাঁর সেবিকার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়

---

৫২৫. Ibid.

৫২৬. Ibid.

৫২৭. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০; ভন নোয়ার কর্তৃক রচিত সম্রাট আকবর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯০.

৫২৮. Ibid.

৫২৯. আবুল ফজল বলেন, 'এই মহৎ কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল জ্ঞান ও সাহসের এবং সত্যিকার অর্থে এই দুটি গুণের উৎকর্ষ ছিল মাহাম আনাগার।' আকবরনামা (বেভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫১; মাসির-উল-ওমরাহ, দ্বিতীয় খণ্ড-পৃষ্ঠা-৮৪৭.

৫৩০. ড. পি. আর, ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত মাহাম আনাগা ও আকবর (J. I. H; vol. I. No. I) p. 343.
৭. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা -২৩০.

৫৩১. ভন নোয়ার কর্তৃক লিখিত সম্রাট আকবর, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫.

www.pathagar.com

যে, আকবর সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রভাবাধীন ছিলেন না এবং তিনি তাঁকে তাঁর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন।[৫৩২] দুই মাস সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রভাব তিরোহিত হয়। মালওয়াতে পীর মোহাম্মদের স্থানান্তর ও সেখান থেকে আদম খানকে সম্রাট কর্তৃক ডেকে পাঠানোর ঘটনাতে একথা স্পষ্ট হয় যে, মাহাম আনাগা সম্রাটের ওপরে তাঁর যতটুকু প্রভাব ছিল তা হারিয়েছিলেন।[৫৩৩] একথা প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য নেই যে, তিনি তাঁর আত্মীয়দেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করেছিলেন।[৫৩৪] শুধু আদম খানকে মালওয়া বিজয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা কোনো বড় ধরনের অনুগ্রহ নয়।[৫৩৫] একথা প্রায়ই বলা হয় যে, তাঁর লক্ষ্য ছিল বৈরাম খানের পতন ঘটানো এবং তাঁর পুত্রের স্বার্থ সম্প্রসারণ করা। কিন্তু বস্তুত ঘটনাবলি এই মতামতকে সমর্থন করে না। বৈরাম খানকে শায়েস্তা করা হয়নি এবং আদম খানও কোনো আনুকূল্য লাভ করেননি। শুধু তাই নয়, আদম খান যখন নিছক ঈর্ষাবশত শামসুদ্দিন আতকা খানকে খুন করেন তখন আকবর তাঁকে রেহাই দেননি। তিনি তাঁকে সমতলভূমিতে ছুড়ে দেওয়ার হুকুম প্রদানের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন। এটা একথাই প্রমাণ করে যে, আকবর তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে মাহাম আনাগা পুত্রশোকে মারা যান।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মাহাম আনাগার নেতৃত্বে নারী শাসিত সরকারের তাত্ত্বিক আবেদন খুব বেশি ছিল না। মনে হয় যে, আকবর মাহাম আনাগার পদমর্যাদা ও প্রতিভার সুযোগ নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিজেকে হেরেমের মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেননি।

(ঙ) রাজনীতিতে রানি দুর্গাবতীর অবদান

মোঘল হেরেমের বাইরে এই সময়ে যে হিন্দু মহিলা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন সাধারণভাবে রানি বলে পরিচিতা দুর্গাবতী।[৫৩৬] তিনি ছিলেন রাথা ও মাহবাব রাজা শাল বাহনের কন্যা এবং তাঁর বিবাহ হয় অমর

---

৫৩২. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০, ভন নোয়ার কর্তৃক রচিত সম্রাট আকবর, প্রথম খণ্ড: পৃষ্ঠা-৯৫.

৫৩৩. ড. আর, পি ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত 'আকবর ও মাহাম আনাগা' (J. I. H. vol. I. No. 1), p.343

৫৩৪. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৫.

৫৩৫. ভন নোয়ার কর্তৃক রচিত 'সম্রাট আকবর', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৮৯.

৫৩৬. আর পি, ত্রিপাঠি কর্তৃক রচিত 'আকবর ও মাহাম আনাগা (J. I. H. vol. I. No. 1), p.338.

www.pathagar.com

দাসের পুত্র দালপতের সাথে।[৫৩৭] ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর পুত্র বীর নারায়ণের রাজপ্রতিনিধি হন এবং গারাতে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজত্ব করেন।[৫৩৮] তিনি তাঁর সাহসিকতা, পরামর্শ দান ও দানশীলতার জন্য বিশেষ ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং তিনি এসব গুণ দ্বারা তাঁর রাজ্যে তাঁর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় কোনো বিদ্রোহ বা গণ-অভ্যুত্থান ঘটেনি।[৫৩৯] তাঁর দখলে ছিল ২৩,০০০ গ্রাম। এগুলোর মধ্যে ১২,০০০ গ্রামের জন্য তিনি আবাসিক শাসনকর্তা (শিকদার) নিযুক্ত করেন এবং অবশিষ্ট গ্রামগুলোতে তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং এই গ্রামগুলোর মোড়লেরা তাঁর অধীন ছিল।[৫৪০] আবুল ফজল মন্তব্য করেন, 'তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্যতা দ্বারা অনেক মহৎ কর্ম সাধন করেন। রাজবাহাদুর ও মিঞাদের সাথে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল[৫৪১] এবং এ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা বিজয় লাভ করেন।' তিনি তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য আগ্রহী ছিলেন এবং অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করে তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।[৫৪২] তিনি ছিলেন একজন রূপসী ও সুন্দরী মহিলা।[৫৪৩] এসব কারণে দুর্গাবতী তাঁর সাহস ও শক্তি সম্বন্ধে আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। তিনি সম্রাট আকবরের কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি আসফখান যখন পানা জয় করেন তখনও তিনি অবিচলিত থাকেন। আসফখান তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থায় তাঁর রাজস্ব ও তাঁর ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হন। অবশেষে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর তাঁকে গারা আক্রমণ করার আদেশ দেন।[৫৪৪] দুর্গাবতীকে তাঁর অগোচরে আক্রমণ করা হয়। তিনি তাঁর মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের একটি সভার আয়োজন করেন এবং শত্রুকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি এই জরুরি অবস্থায় তাঁর সংগৃহীত অল্পসংখ্যক সেনাদল নিয়ে শারমান নামক একটি উঁচু হাতির পিঠে আরোহণ

---

৫৩৭. বেভারেজ কর্তৃক রচিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪: তাবাকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮০.

৫৩৮. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪.

৫৩৯. ভারতের কেমব্রীজ ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৭, বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬.

৫৪০. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবর নামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬; ভারতের কেমব্রীজ ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা-৮৭.

৫৪১. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৪: তাবাকাত (E&D.) পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৮: মাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৭-৩৮.

৫৪২. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা ' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৭.

৫৪৩. ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক রচিত 'আকবর বিখ্যাত মোঘল' পৃষ্ঠা-৫০.

৫৪৪. বাদাউনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫; তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২৮০.

www.pathagar.com

করে সমর ক্ষেত্রে আসেন।[৫৪৫] তিনি সম্রাটের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর শরীরে দুটি তীর বিদ্ধ হয় কিন্তু তিনি সেগুলো তুলে ফেলেন।[৫৪৬] অবশেষে যুদ্ধে আহত অবস্থায় ভাবেন যে, অসম্মানজনক অবস্থায় বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুই শ্রেয়। তাঁর হাতির সামনে উপবিষ্ট তাঁর অন্যতম অনুগামী অধরকে তিনি আদেশ করেন তাকে ছুরিকাঘাত করতে।[৫৪৭] অধর তা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে[৫৪৮] রানি নিজেই নিজেকে ছুরিকাঘাত করে বলেন,[৫৪৯] 'আমি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি, ঈশ্বর না করুন, আমি যাতে সুনাম ও সম্মানের ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হই।'[৫৫০] এভাবে চান্দলের রানি দুর্গাবতী মৃত্যুবরণ করেন।

(চ) বখতুন নিসা বেগমের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

এই সময়ের আর একজন কৌতূহল উদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন বখতুন নিসা বেগম। তিনি ছিলেন আকবরের বৈমাত্রেয় বোন এবং বাদাখশানের খাজা হাসানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলের শাসনকর্তা মোহাম্মদ হাকিম ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উজির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে আকবরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শাহ মনসুর কর্তৃক ক্ষিপ্ত হয়ে কাবুলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং লাহোর অভিমুখে আগ্রসর হন, কিন্তু ঐ প্রদেশের তৎকালীন শাসনকর্তা মানসিং কর্তৃক প্রতিহত হন। আকবর মোহাম্মদ হাকিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মোহাম্মদ হাকিম পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেন।[৫৫১] সম্রাট স্বয়ং কাবুলে গমন করেন। মোহাম্মদ হাকিমকে ক্ষমা করা হয় কিন্তু তাঁর বোন বখতুন নিসাকে কাবুলের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে অপমান করা হয়।[৫৫২] আকবর বখতুন নিসাকে জানান যে, মোহাম্মদ হাকিমের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই এবং তিনি পুনরায় অসদাচরণ করলে তাঁর প্রতি কোনো করুণা প্রদর্শন করা হবে

---

৫৪৫. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৭; তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮০.

৫৪৬. A. N. (Bev.), vol. II. p. 329; Tabaqat, vol.II.p. 280; Badauni, vol. II. p. 65.

৫৪৭. বেভারিজ কর্তৃক রচিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড , পৃষ্ঠা-৩৩০; তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১.

৫৪৮. তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮১.

৫৪৯. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৩০; ফেরেস্তা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -২১৮.

৫৫০. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৩০; মাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩৮.

৫৫১. বেভারিজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা ' তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৬.

৫৫২. মুনসিরেট, পৃষ্ঠা-১৫৩.

www.pathagar.com

না।[৫৫৩] কাবুল থেকে সম্রাটের প্রস্থানের পরে যদিও মোহাম্মদ হাকিম তাঁর সাবেক পদে কাজ শুরু করেন তথাপি সকল দাপ্তরিক আদেশ তাঁর বোনের নামে জারি করা হতো।[৫৫৪] বখতুন নিসাকে কাবুলের শাসনকর্ত্রীর পদে নিয়োগের মাধ্যমে আকবর সেখানকার পরিস্থিতি সামলাতে সফল হন। সম্রাট একদিকে আব্দুল্লাহ খান উজবেকের কার্যকলাপ এবং অন্যদিকে মোহাম্মদ হকিমের অসদাচরণের ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি কৌশলে তাঁদের সংঘাত এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বখতুন নিসা তাঁকে দক্ষতার সাথে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। তাঁর পিতা হুমায়ুনের শাসন আমলে খানজাদা বেগম যেমন রাজনৈতিক সমঝোতা সাধন করেছিলেন তেমনি আকবরের শাসন আমলে তাঁর মা মরিয়ম মাকানি এবং তাঁর স্ত্রী সলিমা সুলতান বেগম রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করছিলেন তখন কিছু সময়ের জন্য অত্যধিক মদ্যপান অভ্যাসের কারণে রাজদর্শন থেকে বঞ্চিত রাজপুত্র সেলিমকে মরিয়ম মাকানির আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্রাটের হৃদয় কোমল হওয়াতে সম্রাটের প্রতি কুর্নিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়।[৫৫৫] আর একবার সেলিম একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেন। তাঁর পিতার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বেশি শাসনে বিরক্ত ও সিংহাসন দখলের জন্য অধৈর্য হয়ে তিনি সংকল্প করেন বলপূর্বক সিংহাসন দখল করতে। তিনি ১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং এলাহাবাদে রাজকীয় খেতাব ধারণ করেন। এতে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে এবং সম্রাট তাতে খুব অসুখী হন। কেউই যুবরাজের জন্য আবেদন করতে সাহস করেননি। শেষে মরিয়ম মাকানি ও তাঁর ফুপু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সম্রাট তাঁদের অভিলাষ মঞ্জুর করেন। সম্রাট শাহজাদাকে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেন। তিনি সেলিমা সুলতান বেগমকে নির্দেশ দেন এই ক্ষমার সংবাদ শাহজাদার কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি ফাতলস্কর নামক একটি হাতি, একটি বিশেষ ঘোড়া এবং একটি সম্মানসূচক লম্বা ঢিলা বহির্বাস নিয়ে শাহজাদার কাছে যান।[৫৫৬] এভাবে তাঁদের প্রচেষ্টায় অবশেষে তাঁকে ক্ষমা করা হয় ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে।[৫৫৭]

---

৫৫৩. আর, পি. ত্রিপাঠি রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা -২৭১.

৫৫৪. ভিনসেন্ট স্মিথ কর্তৃক সম্পাদিত 'বিখ্যাত মোঘল আকবর' পৃষ্ঠা-১৪৩: ভারতের কেমব্রীজ ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৮.

৫৫৫. বেভারেজ কর্তৃক অনূদিত 'আকবরনামা', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৪০.

৫৫৬. Ibid., pp. 1222-23.

৫৫৭. Ibid., p. 1230.

www.pathagar.com

(ছ) সেলিমা সুলতান বেগমের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম বছরে তাঁর বিমাতা সেলিমা সুলতান বেগম হেরেমের অন্য কয়েকজন বেগমের সাহচর্যে সমসাময়িক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খশরু শামসুদ্দিন আতকার পুত্র খান আজম নামে সবচেয়ে পরিচিত মির্জা আজিজ কোকার প্ররোচনায় বিদ্রোহ করেন।[৫৫৮] কথিত আছে যে, খান আজম দেহে বস্ত্রাবৃত করে রাজদরবারে যেতেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেন যেকোনো দিন তাঁকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তাঁর জবানের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এক রাতে প্রধান উজির আমির-উল-ওমরাহ শরিফ খানের সাথে তাঁর কোনো বাক্য বিনিময় হলো না। একটি গোপন বৈঠকে সম্রাট অভিজাত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে পরামর্শ নিলেন। এই বৈঠকে আমির-উল-ওমরাহ ও মহব্বত খান পরামর্শ দেন যে, খান আজমকে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।[৫৫৯] কিন্তু খান-ই-জাহান লোদী এর বিরোধিতা করেন। এ সময়ে সেলিমা সুলতান বেগম পর্দার আড়াল থেকে বলে ওঠেন, 'মহামহিম সম্রাট, সকল বেগম জেনানাতে সমবেত হয়েছেন মির্জা আজিজ কোকার জন্য মধ্যস্থতা করতে। আপনি সেখানে এলেই বেশি ভালো হতো; অন্যথায় তাঁরাই আপনার কাছে আসবেন। এভাবে জাহাঙ্গীরকে মহিলাদের বাসভবনে যেতে বাধ্য করা হয় এবং অবশেষে তিনি বেগমদের চাপে তাঁকে ক্ষমা করেন।[৫৬০] ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে খশরুর বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করার পরে অন্য এক সময়ে তাঁর মায়েরা ও বোনেরা সম্রাটকে বারবার অনুরোধ করেন যেহেতু শাহজাদা তাঁর অতীত ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা করেছেন সেহেতু তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া ও সম্রাটের সম্মুখে হাজির হতে অনুমতি দেওয়া উচিত। হেরেমের মহিলাদের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর অবশেষে খশরুকে রাজদর্শনের অনুমতি দেন এবং সম্রাটকে প্রতিদিন শ্রদ্ধা জানাতে অনুমতি দেন।[৫৬১]

(জ) সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের রাজনৈতিক অবদান

এই সময়ের সবচেয়ে অন্যতম আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন ইতিমাদ-উদ-দৌলার কন্যা নূরজাহান বেগম। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয় জাহাঙ্গীরের সাথে।

---

৫৫৮. তুযুক (R&B). প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১.

৫৫৯. মাসির প্রথম, খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২৮.

৫৬০. মাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -৩২৮.

৫৬১. তুযুক (R&B) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫২.

www.pathagar.com

তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরম যত্ন ও প্রীতির সঙ্গে জাহাঙ্গীরকে দেখাশোনা করতেন এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাহসী মহিলা এবং রাজনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি করতে ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সক্রিয় আগ্রহ পোষণের গুণাবলিতে ভূষিত। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর একজন সঠিক পরামর্শদাত্রী। সম্রাট তাঁর প্রতি গভীর আস্থা রাখতেন। স্বভাবতই তিনি তাঁর স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব খাটাতেন। ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা খুররুম তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাট বাহিনীর চাপ কমানোর জন্য সম্রাটের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে রাজা বাসুর পুত্র জগৎ সিংকে পাহাড়ি এলাকায় পশ্চাদধাবন করেন এবং পাঞ্জাবে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য প্ররোচিত করেন। চরম অবস্থায় জগৎ সিংয়ের রসদ ফুরিয়ে গেলে তিনি নূরজাহানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং নূরজাহানের মধ্যস্থতায় সম্রাটের ক্ষমা লাভ করেন।[৫৬২] সম্রাট এবং সাম্রাজ্যের সমকালীন রাজনীতিতে নূরজাহানের প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী মহিলা এবং তিনি নিজ হাতে শাসনক্ষমতা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলা, মাতা আসমত বানু বেগম এবং তাঁর ভাই আসফখানসহ নিকট আত্মীয়দের নিয়ে একটি জান্তা গঠন করেন।[৫৬৩] এই গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করার জন্য আসফখানের কন্যার সাথে বিবাহ দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র খুররুমকে এবং এই গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।[৫৬৪] এই জান্তার সহায়তায় নূরজাহান তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ প্রদান করেন।[৫৬৫] এতে এই রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনীতির প্রতি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঈর্ষা বোধ জেগে ওঠে।[৫৬৬] খুররুমের শাহজাহান উপাধি গ্রহণ ও সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ে ধীরে ধীরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার পরে তাঁর ও নূরজাহানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং তা চরম পর্যায়ে খুররুমকে এই স্বার্থান্বেষী থেকে পৃথক করে দেয়।[৫৬৭] সম্ভবত তাঁদের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয় এবং তাতে সম্রাটকে বাধ্য করেন খুররুমকে কান্দাহারের মতো দূরবর্তী স্থানে পাঠিয়ে

৫৬২. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৯.

৫৬৩. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-১৬০.

৫৬৪. Ibid., pp. 163-193.

৫৬৫. ইকবালনামা, পৃষ্ঠাগুলো-৫৬-৫৭ মুহাম্মদ হাদি কর্তৃক সম্পাদিত তাতিমা-ই-ওয়াকিত-ই-জাহাঙ্গীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪; মাসির-ই-আলমগীরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১০৭-৭৮.

৫৬৬. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠাগুলো-১৬৭-৬৮.

৫৬৭. Ibid., p. 274.

www.pathagar.com

দিতে। শুধু তাই নয়, তাঁকে তাঁর জায়গিরসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৫৬৮] স্পষ্টত এটা ছিল খুররুমের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তিনি নূরজাহানের অনুরোধে তাঁকে পাঠানোর আদেশ মানতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অবশেষে এটা খুররুমের বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে[৫৬৯] এবং সঠিকভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। তাঁর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব চরম পর্যায়ে কিছুসংখ্যক অভিজাতের মনে ঘৃণা জাগায় এবং কথিত আছে যে, এটা সাম্রাজ্যের অন্যতম ব্যক্তি মহব্বত খানের বিদ্রোহের জন্য দায়ী।[৫৭০] যদিও এই অভিমতটি একেবারেই সাময়িক তথাপি এটা জোর দিয়ে বলা কঠিন কারণ এটা সমকালীন বা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়নি। এই তত্ত্বের সমর্থনে প্রদত্ত সকল যুক্তিতর্ক অনুমানভিত্তিক এবং সত্য ঘটনাবলির দ্বারা সমর্থিত নয়। এই অবস্থায় এটা খুব বেশি প্রমাণ সিদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়।[৫৭১] বিদেশি পর্যটকগণ যাঁরা ঐ সময়ে ভারতে সফর করেছেন তাঁরা বিশেষভাবে নূরজাহান কর্তৃক সংগঠিত জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের একটি জান্তার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সম্বন্ধে টমাস রো (১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে), ডিলেট, পিলসার্ট (১৬২০–২৭ খ্রিষ্টাব্দ) টেরি (১৬২২ খ্রিষ্টাব্দ), পেট্রো ডেলা ভেলি (১৬২৩-২৪ খ্রিষ্টাব্দ), এবং পিটার মানডি (১৬২৮-৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) এর বিবরণে উল্লেখ আছে।[৫৭২] তাঁদের বিবরণ প্রায়শ লোকমুখে প্রচলিত গল্পভিত্তিক এবং সেই কারণে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। সমসাময়িক পারস্য লেখকদের মধ্যে ওয়ালি সরহিন্দ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের চতুর্দশতম বছরে লেখা তারিখ-ই-জাহাঙ্গীর শাহীতে সমকালীন রাজনীতিতে নূরজাহানের এ রকম প্রভাব সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উল্লখ করেননি। ১৬২৫-২৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত কামী সিবাজীর 'ফাত-নামা-ই-নূরজাহান' গ্রন্থেও জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে এ ধরনের কোনো জান্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। এ ছাড়া এটা খুব বিস্ময়কর যে, তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এ রকমের জান্তা সম্বন্ধে চূড়ান্ত কোনো উল্লেখ নেই। সমসাময়িক রাজনীতিতে নূরজাহানের প্রভাব সম্বন্ধে মাত্র দুটি ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ আছে। ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরী গ্রন্থের রচয়িতা মুতামিদ খানের লিখনী এই দুটি ঐতিহাসিক বিবরণের অন্যতম এবং তিনি নূরজাহান ও

---

৫৬৮. Ibid., pp . 298-301.

৫৬৯. Ibid., p. 307; peter Mundy. Vol. 11. p. 106.

৫৭০. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠাগুলো -৩৪২-৪৫; ডিলেট, পৃষ্ঠা-২২৬.

৫৭১. আর, পি, ত্রিপাঠি কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন', পৃষ্ঠা-৪২৩.

৫৭২. The Embassy of Sir Thomas Roe to the court of the great Mughal. vol, I, p.118; Delect, pp. 201-2; Pelsaert, p. 50; Fryer. p. 57; Terry (Early Travels), p. 329; Peter Mundy, vol. 11, pp. 205-6.

www.pathagar.com

খুররুমের মধ্যকার বিদ্বেষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তাই তাঁর মতামত স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী গ্রন্থের রচয়িতা সম্ভবত মুতামিদ খানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। এমতাবস্থায় এই দুইজন গ্রন্থাকারের মতামত খুব নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রাসঙ্গিক উৎসগুলো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নূরজাহান জাহাঙ্গীরের ওপরে যে রকম প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভবত জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর আবেগ ও অনুরাগভিত্তিক ব্যক্তিগত স্বভাবমূলক।[৫৭৩] রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপমূলক কার্যকলাপ বা তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতি নিছক রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আরোপ করা অশোভন। তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিতে সক্রিয় আগ্রহ এবং জনপ্রসিদ্ধির একমাত্র দৃষ্টান্ত হলো মহব্বত খানের বিদ্রোহ দমনের সময় তাঁর অংশগ্রহণ। শাহজাদা পারভেজ ও মহব্বত খানকে শাহজাহানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হয়। ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত বিদ্রোহ দমনের পরে যখন শাহজাদা পারভেজ ও মহব্বত খান শ্রীনগরের কাছে তাঁবুতে বাস করছিলেন তখন মহব্বত খানকে বাংলাতে বদলি করার আদেশ জারি করা হয়।[৫৭৪] কিছুটা অনীহার সাথে হলেও উভয়েই সম্রাটের আদেশে সম্মত হন। মহব্বত খানকে আরো বলা হয় হাতিগুলোকে পাঠিয়ে দিতে এবং শাহজাহানের বিদ্রোহের সময়ে প্রাপ্ত অর্থের হিসাব দিতে।[৫৭৫] অধিকন্তু সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই তাঁর কন্যার বাগদান ও বিবাহ দেওয়ার মাধ্যমে রাজকীয় শিষ্টাচার ভঙ্গের দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়।[৫৭৬] মহব্বত খান এই কঠোর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁর অনুভূতি জাগে যে, এই আদেশগুলো আসফখানের অনুরোধে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আসফখান ছিলেন সর্বদা তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং তিনি তাঁর পদাবনতি চেয়েছিলেন।[৫৭৭] তাই তিনি সম্রাটকে তাঁর দুষ্ট প্রতিভাবান্ন ব্যক্তি আসফখান থেকে আলাদা করতে পরিকল্পনা করেন। মনে মনে এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি চার বা পাঁচ হাজার রাজপুত সৈনিকসহ রাজদরবার অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় জাহাঙ্গীর

---

৫৭৩. ড. আর, পি, ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন', পৃষ্ঠা-৪২২.

৫৭৪. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৩৯: ভিনেট, পৃষ্ঠা-২২৪.

৫৭৫. ইকবালনামা (E&D) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪০: বেণী প্রসাদ পৃষ্ঠা-৩৪০: ড. আর. পি. ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল সম্রোজ্যের উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা-৪০৫.

৫৭৬. ইকবালনামা (E&D) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২০: বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৪১.

৫৭৭. ড. আর, পি. ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল সাম্রাজ্যর উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা-৪০৬.

www.pathagar.com

কাবুলের পথে ঝিলাম নদীর তীরে শিবিরবাস করছিলেন।[৫৭৮] একটি সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। যখন সম্রাট ঝিলাম নদীর অপর তীরে গমন করেন এবং সম্রাট ঝিলাম নদীর এপারেই ছিলেন তখন মহব্বত খান তাঁর গতিপথ সম্রাটের অভিমুখে নিয়ন্ত্রণ করতে শক্তি প্রয়োগ করেন। তিনি আকস্মিকভাবে আক্রমণের শিকার হন এবং দেখতে পান যে, তাঁর শিবির মহব্বত খানের লোকজনদের দখলে এবং অবশেষে তাঁকে নেওয়া হয় মহব্বত খানের শিবিরে[৫৭৯] মহব্বত খান সাহসিকতাপূর্ণ কাজের উত্তেজনায় নূরজাহানকে বন্দি করার কাজটি অবহেলা করেন। যখন তিনি তাঁর এই ভুল বুঝতে পারেন তখন তিনি সম্রাটের শিবিরে ফিরে এসে দেখতে পান যে নূরজাহান ছদ্মবেশে পালিয়ে গেছেন নদীর অপর তীরে।[৫৮০] তিনি তাঁর ভাই আসফখানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে তিরস্কার করেন। তিনি কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর একটি সভা ডাকেন এবং তাঁদের ভর্ৎসনা করার সময় বলেন, 'এ সব কিছুই আপনাদের অবহেলা ও আহম্মকিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে হয়েছে। যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি তা-ই বাস্তবে ঘটেছে এবং এখন আপনারা খোদা ও সাধারণ মানুষের সামনে দণ্ডায়মান আপনাদের আচরণের জন্য লজ্জায় সংকুচিত হয়ে। আপনারা অবশ্যই এই দুস্কৃতি সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে তার পরামর্শ দিবেন।'[৫৮১] তাঁরা সর্বসম্মতভাবে মহব্বত খানের সামরিক দলের বিরুদ্ধে তাঁদের অস্ত্র ধারণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫৮২] যখন এই সংবাদ জাহাঙ্গীরের কাছে পৌঁছে তখন তিনি এই ধরনের প্রচেষ্টার বোকামি বুঝতে পারেন কারণ সম্রাটের অনুসারীদের পক্ষে মহব্বত খানের অত্যন্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা কঠিন।[৫৮৩] জাহাঙ্গীর নূরজাহানের কাছে বারবার সংবাদ পাঠান মহব্বত খানের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে। তিনি তাঁর পত্রের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নূরজাহানের মনে বিশ্বাস

---

৫৭৮. ইকবাল নামা (E&D.) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২১; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৪২; ড. পি, আর. ত্রিপাঠী কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা -৪০৬.

৫৭৯. সিরাজী কর্তৃক রচিত 'ফাতনামা-ই-নূরজাহান বেগম' পৃষ্ঠাগুলো ১৩-১৪; ড. আর, পি, ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা-৪০৭; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৪৫.

৫৮০. ইকবালনামা (E&D.) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৩; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৪৫.

৫৮১. ইকবালনামা (E&D.) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৪; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠাগুলো-৩৪৫-৪৬.

৫৮২. Ibid., p. 346; ইকবালনামা (E&D.), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা -৪২৪.

৫৮৩. ইকবালনামা (E&D.) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৪.

www.pathagar.com

সৃষ্টি করতে প্রেরণ করেন তাঁর নিদর্শন অঙ্গুরীয়।[৫৮৪] কিন্তু তাঁর পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয় এবং সম্রাটের সমর্থনকারীগণ সামরিক শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাত্রিকালে সম্রাটকে উদ্ধার করতে ফেদাইখান চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।[৫৮৫]

নূরজাহান সম্রাটের বাহিনীকে মহব্বত খানের বিরুদ্ধে পরিচালনা করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি শাহরিয়ার কন্যাকে হাতির পিঠে নিয়ে নিজেই হাতির উপরে উপবেশন করেন।[৫৮৬] সম্রাট বাহিনী নদী অতিক্রম করতে চেষ্টা করে কিন্তু সম্রাট বাহিনীর সেনাপতি গাজি খান নদী হেঁটে পার হওয়ার জন্য যে পথটি বেছে নেন তা ছিল অনেক ক্ষুদ্র জলাশয় দ্বারা পূর্ণ এবং তার ফলে তাঁদের জন্য গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। নদী স্রোতের মাঝামাঝি পৌঁছার আগেই সেনাবাহিনীতে প্রচণ্ড ভুল বোঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।[৫৮৭] খাজা আবুল হাসান, আসফখান ও মতামিদ খানের মতো বিখ্যাত সেনাপতিগণ নূরজাহানের কাছ থেকে বার্তা পান সাহসী হওয়ার সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও নদী অতিক্রম করার।[৫৮৮] যাহোক সম্রাট বাহিনী নদী অতিক্রম করলে অবিলম্বে যুদ্ধ শুরু হয় এবং নূরজাহান সেই যুদ্ধের তদারকি করেন ব্যক্তিগতভাবে।[৫৮৯] যুদ্ধ চলাকালে তাঁর নাতনির বাহুতে শরবিদ্ধ হয়। তাঁর হাতিটির শুঁড় কিছুটা কেটে যাওয়ায় এবং বর্শার আঘাতে আহত হওয়ার পরে পেছন দিকে ছুটে যায়, নদী সাঁতরে নূরজাহানকে নিরাপদ অবস্থায় রেখে অপর তীরে পৌঁছে।[৫৯০] নূরজাহান তাঁর নাতনির ক্ষতস্থানের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফিদাই খান আক্রমণ অব্যাহত রাখেন কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[৫৯১] সম্রাট বাহিনী তাদের চেষ্টাতে সফল হতে পারেনি। আসফখান কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন; তিনি ইতিমধ্যে মহব্বত খানের বৈরিতায় জড়িয়ে

---

৫৮৪. Ibid..

৫৮৫. Ibid., p. 425: বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৪৭.

৫৮৬. শিরাজী কর্তৃক সম্পাদিত 'ফাতনামা -ই-নূরজাহান বেগম' পৃষ্ঠা-১৯

৫৮৭. ইকবালনামা (E&D.) ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫; শিরাজী কর্তৃক রচিত 'ফাতনামা-ই-নূরজাহান বেগম' পৃষ্ঠা-১৯.

৫৮৮. টীকা : নাদিম নামক একজন নপুংসকের মাধ্যমে পাঠানো নূরজাহানের একটি সংবাদ ছিল এ রকম, 'বেগম সাহেব জানতে চান এটা বিলম্ব করা বা সংকল্পহীন হওয়ার সময় কিনা। আঘাত হানো, সাহসিকতার সাথে সমনে অগ্রসর হও যাতে তোমাদের অগ্রযাত্রায় শত্রু প্রতিহত হতে পারে ও পালিয়ে যায়।' ইকবালনামা (ই অ্যান্ড ডি), চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬.

৫৮৯. Ibid., p. 426: শিরাজী কর্তৃক রচিত 'ফাতনামা-ই-নূরজাহান বেগম' পৃষ্ঠা-১৯.

৫৯০. Ibid., p. 436: শিরাজী কর্তৃক সম্পাদিত 'ফাতনামা-ই-নূরজাহান বেগম' পৃষ্ঠা -১৯

৫৯১. ইলিয়ট ও ডাউসন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৭.

www.pathagar.com

পড়েছিলেন এবং তিনি নূরজাহানের আস্থাও হারিয়ে ফেলেন। নির্ভেজাল কাপুরুষতা ও ভয়ে তিনি তাঁর জায়গির আটকে পালিয়ে যান।[৫৯২] মহব্বত খানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ফিদাই খান রোটাসে তাঁর পুত্রের কাছে যান। চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্যরাও মহব্বত খানের পক্ষে চলে যান।[৫৯৩] নূরজাহান দীর্ঘসময় যাবৎ তাঁর স্বামীর বিচ্ছেদ সইতে পারছিলেন না।

জাহাঙ্গীরকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মুক্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে পরিশেষে তিনি মহব্বত খানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং স্বামীর সঙ্গে বন্দিত্ব বরণ করেন।[৫৯৪] এ সময় মহব্বত খান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকারীতে পরিণত হন। নূরজাহানের পক্ষে বন্দিত্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। তিনি নীরবে তাঁর ও তাঁর স্বামীর মুক্তির পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। তাঁর ছিল একটি দুই স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা। মহব্বত খানের সন্দেহ পরিপূর্ণ করে তোলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে তাঁর দলে টানা।[৫৯৫] এই পরিকল্পনার প্রথম অংশ জাহাঙ্গীর কর্তৃক বাস্তবায়ন ও দ্বিতীয় অংশ স্বয়ং নূরজাহান কর্তৃক গৃহীত হবে বলে স্থির করা হয়।[৫৯৬] তিনি ইতিমধ্যে মহব্বত খানের প্রতি বিতৃষ্ণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে উত্তেজিত করতে তাঁর সমুদয় সম্পদ নিয়োগ করেন। তিনি অনিচ্ছুকদেরকে তোষামোদ করেন। তিনি লোভীদেরকে ঘুষ দেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্তদেরকে শক্তিশালী করে তোলেন। তিনি সকলকে প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি অনেক দীনহীন ব্যক্তিরও তালিকা প্রস্তুত করেন এবং এক বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে তোলেন।[৫৯৭] এইভাবে নূরজাহান শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী অর্জন করেন। তিনি তাঁর নপুংসক হুসিয়ার খানকে লাহোরে ২০০০ লোক সংগ্রহ করতে এবং রাজদরবারের দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন।[৫৯৮] পরিকল্পনাটি সফল হয়। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের সংগঠিত সৈন্যদলগুলো পরখ করে দেখেন এবং এ সম্বন্ধে মহব্বত খানকে অবহিত করেন। মহব্বত খান কোনো সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি; সম্রাটকে মান্য করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি জানান এবং অবশেষে তিনি পালিয়ে যান।[৫৯৯] তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আসফখান,

---

৫৯২. Ibid., pp. 427-28.
৫৯৩. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা -৩৫০.
৫৯৪. Ibid.
৫৯৫. Ibid.
৫৯৬. Ibid., pp. 353-54.
৫৯৭. Ibid., pp. 354-55.
৫৯৮. Ibid., p. 355.
ইলিয়ট ও ডাউশন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা' ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০: বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা -৩৫৬.
৫৯৯. Ibid..

www.pathagar.com

তাঁর পুত্র আবু তালিব এবং দানিয়ালের পুত্রকেও তার সঙ্গে নেন। সম্রাট বাহিনী তাঁকে পেছন থেকে ধাওয়া করে কিন্তু তাঁর নাগাল ধরতে পারেনি।[৬০০]

সম্রাট মহব্বত খানের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে রোটাসে পৌঁছেন সেখানে নিয়মিত দরবার অনুষ্ঠিত হয়।[৬০১] সম্রাটের সমর্থকদের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল মহব্বত খানকে দমন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্তি। নূরজাহান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য আফজাল খানের মাধ্যমে মহব্বত খানকে পাঠান একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ হুকুম। মহব্বত খান দানিয়ালের পুত্রকে মুক্তি দেন কিন্তু নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত ও লাহোরে না পৌঁছা পর্যন্ত আসফখানকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। নূরজাহান আবার তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে আসফখানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ভয় দেখান। তখন মহব্বত খান আনুগত্যের শপথ আদায় করে তাঁকে মুক্তি দেন কিন্তু তারপরও আসফখানের পুত্রকে জামিনস্বরূপ আটক রাখেন এবং তাঁকে কিছুদিন পর মুক্তি দেন।[৬০২] এরপরে সম্রাটের শিবির লাহোরে পৌঁছে এবং আসফখান ভাকিল নিযুক্ত হন।[৬০৩] মহব্বত খান আবার শাহজাহানের সাথে মৈত্রীবদ্ধ হন এবং নূরজাহান তাতে শঙ্কিত হন। নূরজাহান খানজাহানকে সম্রাটের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে তাঁকে পাঠান তাঁদেরকে দমন করতে।[৬০৪] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতিতে ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর থেকে লাহোরে ফিরতি পথে রাজৌরিতে জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাটের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নূরজাহান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে পরামর্শের জন্য ডাকেন কিন্তু আসফখান মনে মনে জামাতা শাহজাহানের পক্ষ নেওয়ায় এতে অশুভ ঘটনার পূর্বাভাস পান এবং তিনি এই পরামর্শ সভা ভেঙ্গে দেন।[৬০৫] তিনি নূরজাহানকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে কারারুদ্ধ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে শাহজাহানকে ডেকে পাঠান এবং আপাতত খশরুর পুত্র দাওয়ার বখ্শকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।[৬০৬]

---

৬০০. বেণীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৫৬.

৬০১. Ibid.

৬০২. ইলিয়ট ও ডাউসন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা' ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩১; বেণী প্রসাদ পৃষ্ঠা-৩৫৭.

৬০৩. Ibid.

৬০৪. Ibid., p 365.

৬০৫. বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৬৮.

৬০৬. ইলিয়ট ও ডাউশন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা' ষ'খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৫-৩৬; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা -৩৭০.

www.pathagar.com

নূরজাহান চেয়েছিলেন শাহরিয়ার সম্রাট হবেন, যদিও তিনি প্রহরাধীন ছিলেন তবুও তিনি যতবেশি সম্ভব লেকজন সংগ্রহ করে দ্রুত তাঁর কাছে আসার উপদেশ দিয়ে শাহরিয়ারের কাছে সংবাদ পাঠান।[৬০৭] শাহরিয়ার লাহোরে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। নূরজাহান অপেক্ষা একদিনের পথচলায় অগ্রগামী আসফখানও দাওয়ার বখশ লাহোরে পৌঁছে শাহরিয়ারকে পরাজিত করে কারাবন্দি ও অন্ধ করেন।[৬০৮] তারপরে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহানকে দিল্লিতে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়।[৬০৯] শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পরে তৎক্ষণাৎ নূরজাহান রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। শাহজাহান তাঁকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকার অবসর ভাতা মঞ্জুর করেন এবং নূরজাহান তা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু সাদা পোশাক পরিধান করতেন, নির্জনে থাকতেন এবং কোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানাতেন।[৬১০] রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নূরজাহানের সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যে, যদি তাঁর কোনো কামনা থাকত হবে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। তিনি ইতোমধ্যে রাজনৈতিক সমস্যবলি বোঝা ও মূল্যায়ন করার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন পুরাপুরি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল শুধু জাহাঙ্গীরের প্রতি। তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অপেক্ষা নির্জন জীবনযাপন শ্রেয় বলে মনে করেন। এভাবে যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে যে, শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পরে তিনি তাঁর আগের ক্ষমতা ও প্রভাব হারিয়ে ফেলেন এবং তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার মতো অবস্থায় তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর যোগ্যতা, রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অন্তরঙ্গ জ্ঞান ও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সম্ভ্রান্ত বক্তির সাথে যোগাযোগ নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি বা ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক অপকর্মে জড়িত হওয়ার জন্য ছিল যথেষ্ট সহায়ক। এ ধরনের কোনোকিছু সংঘটিত না হওয়ার কারণ তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে নূরজাহান সম্পূর্ণভাবে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা, স্বামীর প্রতিই নিবদ্ধ ছিল তাঁর সকল আগ্রহ ও স্বার্থবুদ্ধি।

---

৬০৭. ইলিয়ট ও ডাউসন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা' ষ'খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো -৪৩৫-৩৬; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৭০.

৬০৮. ইলিয়ট ও ডাউসন কর্তৃক সম্পাদিত 'ইকবালনামা' ষ'খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৬.

৬০৯. Ibid., pp. 436-37.

৬১০. Ibid., pp. 438; বেণী প্রসাদ, পৃষ্ঠা-৩৭১. বেনী প্রাসাদ পৃষ্ঠা-৩৭৩.

www.pathagar.com

(ঝ) সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের রাজনৈতিক অবদান

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম বছরগুলোতে তাঁর প্রিয় স্ত্রী মমতাজ মহল রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু চাপ প্রয়োগ করতেন। এমনকি শাহজাহান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের আগে তিনি সানন্দে ভ্রাম্যমাণ ও নির্বাসিত সম্রাটের সাথে তেলিঙ্গানা, বাংলা, মেবার ও দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে জীবনের দুঃখ ক্লেশ ধৈর্যের সাথে সহ্য করে জীবন যাপন করেন।[৬১১] ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি হেরেমে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং সম্রাট তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আলোচনা করতেন।[৬১২] রাষ্ট্রীয় সিলমোহরটি তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় কাগজপত্র চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করার পরে সেগুলো রাজকীয় হেরেমে পাঠানো হতো এবং সেগুলোতে তার সিল মোহর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল।[৬১৩] এর ফলে চলমান বিষয় সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে জানতে পারতেন এবং এগুলোর কয়েকটিতে তিনি নিজেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ১৬২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান যখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে সিংহাসন দখলের জন্য ভ্রমণ করেন তখন গুজরাটের শাসনকর্তা সাইফ খানের সন্দেহপূর্ণ মনোভাব সম্বন্ধে খবর শুনতে পান। তিনি সাইফখানকে রাজদরবারে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। সাইফখান মমতাজ মহলের বোনের স্বামী ছিলেন; মমতাজ মহল তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ায় পরাস্টার খানকে আহম্মদাবাদে পাঠান যাতে তাঁর কোনো বিপদ না হয়। তাঁর সুপারিশে সম্রাট সাইফখানের কারাজীবনের কঠোরতা হ্রাস করেন এবং হুকুম দেন তাঁকে যেন মানসিক বা শারীরিকভাবে উৎপীড়ন করা না হয়।[৬১৪]

মানুচীর মতে, পর্তুগিজদের প্রতি বৈরী মনোভাব সৃষ্টি ও হুগলিতে পর্তুগিজদের আধিপত্য নষ্ট করার জন্য মমতাজ মহল দায়ী ছিল।[৬১৫] তিনি পুরোপুরি তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, কারণ তারা তাঁর দুইজন দাসীকে ধরে নিয়ে

---

৬১১. পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২১২-১৩.

৬১২. জে. এন. চৌধুরি কর্তৃক সম্পাদিত 'ইসলামিক সংস্কৃতি' একাদশ অধ্যায়ে মমতাজ মহল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, পৃষ্ঠা-৩৭৩.

৬১৩. যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল ভারতের অধ্যায়ন' পৃষ্ঠা-৯: জি ইয়াজদানী কর্তৃক পাঞ্জাব ঐতিহাসিক সমাজ পত্রিকায় আলোচিত, পৃষ্ঠা -১৫৩.

৬১৪. কাজউইনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো -২২৭, ২৭৭: কে. খান কর্তৃক রচিত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৩; ড. বি, পি, সাকসিনা কর্তৃক সম্পাদিত 'দিল্লিতে শাহজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠা -৬১.

৬১৫. ড. বি. পি সাকসেনা কর্তৃক সম্পাদিত 'দিল্লিতে শাহজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠা- ৬১.

www.pathagar.com

গিয়েছিল।[৬১৬] কথিত আছে যে, তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়নি।[৬১৭] পুর্তুগিজদের প্রতি তাঁর সঞ্চিত বৈরিতা বৃদ্ধি করে তাদের প্রতি শাহজাহানের ক্রোধ। মমতাজ মহলের কর্মজীবন ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

(ঞ) জাহানারা বেগমের রাজনৈতিক অবদান

তাঁর মৃত্যুর পরে হেরেমের শ্রেষ্ঠ মহিলার সম্মান অর্পিত হয় শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা বেগমের ওপর। তিনি রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার প্রিয় কন্যা হিসেবে তিনি যা পেতে চাইতেন তাই পেতেন[৬১৮] এবং হেরেমের সকল মহিলার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিতা।[৬১৯] রাজদরবারে তাঁর প্রভাব ছিল অসীম।[৬২০] একজন আগন্তুক, একজন সভাসদ বা একজন শাসনকর্তা যে কেউ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের কামনায় তাঁর সমর্থন নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করতেন। তিনি মূল্যবান উপহারও লাভ করতেন।[৬২১] জাহানারা বেগম মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী রাজকীয় পরিবারের মনোমালিন্য দূর করতেন।[৬২২] ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কয়েকজন নির্বোধ উপদেষ্টার পরামর্শ ও তাঁদের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি শাহজাহানের বিরাগভাজন হন এবং তাঁদের জায়গির ও পদমর্যাদা বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৬২৩]

জাহানারা বেগমের অনুরোধে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেন এবং তাঁকে পূর্বের পদমর্যাদা ফেরত দেন।[৬২৪] ১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান শ্রীনগরের

---

৬১৬. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২.

৬১৭. ড. বি. পি. সাকসেনা কর্তৃক সম্পাদিত 'দিল্লিতে শাহজাহানের ইতিহাস' পৃষ্ঠা ১০৬-৭.

৬১৮. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা - ১৮২.

৬১৯. বার্নিয়রের ন্যায় কিছু বিদেশি পর্যটক পিতা ও কন্যার সম্বন্ধে গুজব ছড়ায়। বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো, ১১, ১২, : কিন্তু তাদের উক্তি মোটেই সত্য নয়। মানুচী বলেন যে, বার্নিয়ারের বর্ণনা নিম্ন শ্রেণির লোকদের মুখে শোনা গুজব ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২১৭-২০: ড. বি, পি. সাকসেনা কর্তৃক সম্পাদিত 'দিল্লিতে শাহাজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠাগুলো ৩৩৮-৪৩

৬২০. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১.

৬২১. বার্নিয়ার , পৃষ্ঠা-১১.

৬২২. পাঞ্জাবের ইতিহাস সমাজের পত্রিকা দ্বিতীয় খণ্ড (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে), পৃষ্ঠা ১৫৫.

৬২৩. ঐতিহাসিকদের অস্পষ্ট যুক্তির দ্বারা শাহজাহানের অসন্তুষ্টি বার্তায়, যদুনাথ সরকার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬; পাঞ্জাবের ইতিহাস সমাজের পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪.

৬২৪. Ibid.

www.pathagar.com

রাজা পৃথিবী চাঁদকে আক্রমণ করেন। সম্রাটের বাহিনীকে সহায়তা করেন সিরমুরের রাজা সৌভাগ্য প্রকাশ। এই যুদ্ধ চলে দুই বৎসর যাবৎ। ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা পৃথিবী চাঁদ সাফল্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে জাহানারা বেগমের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং তাঁকে তাঁর আনুগত্য ও সততার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি এই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, দারাশিকো মধ্যস্থতা করলে তিনি আনুগত্য স্বীকার করবেন। জাহানারা বেগমের মধ্যস্থতায় তিনি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর পুত্র মেদিনী সিংকে দারাশিকোর কাছে প্রেরণ করেন এবং দারা তাকে রাজদরবারে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৬২৫] ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি হন তখন তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন এবং তা অবরুদ্ধ করেন। তিনি গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা আব্দুল্লা কুতুব শাহের প্রতি বাকি নজরানা অনাদায় এবং উজির মীর জুমলার পরিবারকে কারারুদ্ধ করার জন্য অসন্তুষ্ট হন।[৬২৬] আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডার সমৃদ্ধ রাজত্ব লাভে লালায়িত হয়ে শাহজাহানকে তা অধিকার করতে আহ্বান জানান।[৬২৭] সেই সময় কুতুব শাহ পত্র লিখেন জাহানারা বেগম ও দারাশিকোর কাছে। আওরঙ্গজেবের কাছে কুতুব শাহের অধিকৃত রাজ্য হস্তান্তর ও আপস করার কোনো ইচ্ছা নেই।[৬২৮] তাঁরা দু'জনই এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন এবং তাঁদের মধ্যস্থতায় কুতুব শাহ ক্ষমা লাভ করেন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে লাভ করেন রাজনৈতিক শান্তি।[৬২৯]

১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দিল্লির সিংহাসন লাভের জন্য উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদানের লক্ষ্যে যখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করেন তখন তিনি কুতুব শাহকে তাঁর উপরে আরোপিত যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে বলেন। কিন্তু কুতুব শাহ এই ক্ষতিপূরণের আংশিক অর্থ মওকুফ করার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।[৬৩০] আওরঙ্গজেব তাঁকে বলেন জাহানারা বেগম ও দারাশিকোর কাছে আবেদন করতে।[৬৩১] এই পরামর্শটি ছিল শুধু একটি ব্যঙ্গ মাত্র; কিন্তু এটি জাহানারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কতটা প্রভাব খাটাতে পারতেন সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করে। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসন লাভের জন্য যখন

---

৬২৫. কানুনগো কর্তৃক সম্পাদিত 'দারাশিকো', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো, ১৩৬-৩৭.

৬২৬. যদুনাথ সরকার কর্তৃক লিখিত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো, ২১২-৩৫.

৬২৭. Ibid., pp. 235, 36.

৬২৮. কে. আর. কানুনগো কর্তৃক সম্পাদিত 'দারাশিকো', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১৩৭-৩৮.

৬২৯. Ibid, যদুনাথ সরকার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৯.

৬৩০. যদুনাথ সরকার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪.

৬৩১. যদুনাথ সরকার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৪.

www.pathagar.com

তাঁর ভাইদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় জাহানারা তখন দারাশিকোকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেন এবং তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেন।[৬৩২] তিনি তাঁর ভাইদের জন্য যেকোনো সংঘাত এড়িয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন। আওরঙ্গজেব চম্বল অতিক্রম করে সামুগড়ে উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে দারাশিকো চম্বল দখলে রাখতে ব্যর্থ হন এবং আওরঙ্গজেব চম্বল অতিক্রম করে ঢোলপুরের চল্লিশ মাইল পূর্বদিকে ভাদরুরে পৌঁছেন। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ মে সামুগড়ের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে জাহানারা বেগম আওরঙ্গজেবের কাছে একটি পত্র পাঠান এই দুষ্ট পরিকল্পনা ত্যাগ করতে ও তাঁর পিতার প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য।[৬৩৩] তিনি যে দারার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন তা যথেষ্ট স্পষ্ট। তিনি আওরঙ্গজেবকে তাঁর অবলম্বিত পথের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়ে দেন এবং তাঁর নেওয়া ঝুঁকি থেকে এবং সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের বিপদ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে।[৬৩৪] কিন্তু জাহানারার এই চিঠিতে কোনো ফল হয়নি। দারা ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ মে সংঘটিত সামুগড় যুদ্ধে পরাজিত হন দারা। তিনি খুব হতাশ হয়ে আগ্রাতে পৌঁছেন। জাহানারা বেগম ও শাহজাহান উভয়েই অত্যন্ত দুঃখ বোধ করেন। কয়েক ঘণ্টা পরে দারা পালিয়ে যান দিল্লিতে। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আগ্রাতে পৌঁছেন এবং সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সেনাবাহিনী তাঁর সাথে যোগ দেন। তারপরে তিনি আগ্রা দখল করেন এবং তাঁর পিতা শাহজাহানকে দুর্গের মধ্যে অবরোধ করেন। তিনি রসদপত্রের সরবরাহ বন্ধ করে দেন। সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবের কাছে করুণা প্রার্থনা করেন কিন্তু আওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গের সামগ্রিক আত্মসমর্পণ দাবি করেন। অবশেষে ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ৮ জুন শাহজাহান বশ্যতা স্বীকার করেন এবং আগ্রা দুর্গ খুলে দেন এবং আওরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দি হন।[৬৩৫] ১৬৫৮

---

৬৩২. যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫: মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮: বার্নিয়ার পৃষ্ঠা-১২: মানুচী লিখেন যে, তিন দারাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা -২২১)। বার্নিয়ার লিখেন যে, তাঁকে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়নি এই আশঙ্কাতে যে, তাঁর স্বামী ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন (বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-১২)। কিন্তু এটা কোনো নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমর্থিত হয়নি।

৬৩৩. অকিল খান রাযী কর্তৃক লিখিত 'ওয়াকিত-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠাগুলো ১৬, ১৭: যদুনাথ সরকার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩.

৬৩৪. অকিল খান রাযী কর্তৃক লিখিত 'ওয়াকিত-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠাগুলো ১৬, ১৭.

৬৩৫. যদুনাথ সরকার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৬৬-৮২.

www.pathagar.com

খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন জাহানারা আওরঙ্গজেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁর প্রভাব ও উদ্দীপনা জাগাতে। তিনি সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণের প্রস্তাব করেন।

তিনি আওরঙ্গজেবকে পরামর্শ দেন পাঞ্জাব ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলো দারাকে, গুজরাট মুরাদকে, বাংলা সুজাকে, দাক্ষিণাত্য সুলতান মোহাম্মদকে অর্পণ করতে এবং ভাবী উত্তরাধিকারী ও ইকবাল-ই-বুলন্দ খেতারসহ অবশিষ্ট সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবকে প্রদান করার জন্য।[৬৩৬] তিনি তাঁকে শাহজাহানের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যও অনুরোধ করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং তার ফলে জাহানারা দুঃখ বোধ করেন।[৬৩৭] তাঁর ভাইয়ের ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে তিনি তাঁর পিতার পাশে আসেন এবং ভাইয়ের সাথে বিজয়ের সম্মানে অংশীদারিত্ব লাভ অপেক্ষা কারাবাস শ্রেয়তর বলে মনে করেন। অবশেষে তিনি তৎকালীন অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন এবং তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পিতার পাশে থাকেন।[৬৩৮] জাহানারা বেগমের কাছে লেখা অনেক চিঠি রয়েছে যা নিয়োগ, বিবাদ নিষ্পত্তি ও দরবারের অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রভাবের সীমা নির্দেশক। এ পত্রগুলো থেকে এটাও বোঝা যায় যে, এ ধরনের অনুরোধ করা হয়েছিল কারণ তা ছিল কোনো বিষয়ে রাজদরবারে দৃষ্টি আকর্ষণের দ্রুততম উপায় বা জাহানারা বেগমের সমর্থন ছিল কোনো কাজ সমাধানের নিশ্চিত পন্থা।

কয়েকজন প্রশাসনিক প্রধান স্থানীয় শাসনকর্তাও তাঁর কাছে হাজির হতেন তাঁদের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য চেয়ে। একবার সিরমুরের রাজা বুধ প্রকাশ তাঁর কাছে উপহার পাঠান এবং তাঁকে অনুরোধ করেন গারোয়ালের রাজার সাথে তাঁর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সম্রাটের কাছে তাঁর পক্ষে সুপারিশ করতে।[৬৩৯] তিনি সন্ধ্যার জমিদার ও তহবিলদারকে তাদের

---

৬৩৬. আকিল খানের রচনা 'ওয়াকিত-ই-আলমগিরিতে' পৃষ্ঠা ২৮৯: যদুনাথ সরকার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা গুলো ৮৩, ৮৪.

৬৩৭. Ibid.

৬৩৮. টীকা: বর্ণিত আছে যে, শাহজাহানের মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব তাঁকে একটি পত্র মারফতে সান্ত্বনা দেন এবং তার জবাবে তিনি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্র লিখেন। ভারতীয় ঐতিহাসিক নথিপত্র কমিশন, তৃতীয় খণ্ড (১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ) পৃষ্ঠা ২৩। কিন্তু তাঁর পত্রের প্রমাণ সম্বন্ধে যদুনাথ সরকার সংশয় প্রকাশ করেছেন।

৬৩৯. টীকা: রুকিয়াত-ই আলমগিরি ও আদব-ই আলমগিরিতে কিছুসংখ্যক পত্র সংগৃহীত আছে যাতে এমন বিষয়গুলো সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এসব পত্রের একটিতে আওরঙ্গজেব হিশাম উদ্দিনের পুত্র মুর্তজা কুলি খানের নিয়োগ সম্বন্ধে জাহানারা সুপারিশ করেন। রুকিয়াত, F. 200a; আদব F. 197a. b. অন্য একটি পত্রে আওরঙ্গজেব জাহানারাকে আসিরগড় দুর্গ ফিরে পাবার জন্য তাঁকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন, যা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে মুরাদকে

www.pathagar.com

অসদাচরণের জন্য কারাবন্দি করার ফরমান জারি করতেও অনুরোধ জানান। কিন্তু এ ধরনের গুরুতর বিষয়ে মহিলারা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না এবং জাহানারা বেগম তাকে বলেন এ ব্যাপারে সরাসরি সম্রাটের কাছে প্রতিনিধি পাঠাতে।[৬৪০] এমনকি বিদেশি বণিকরা ও রাজদরবারে জাহানারা বেগমের প্রভাব সম্বন্ধে উপলব্ধি করতেন। যখন ওলন্দাজ দূতগণ বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি লাভে ব্যর্থ হন তখন তাঁরা রাজদরবারের প্রধান সদস্যগণ বিশেষত পিতার ওপর অপরিসীম প্রভাবের অধিকারিণী জাহানারা বেগমের অনুগ্রহ লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।[৬৪১] এ ব্যাপারে জাহানারার স্বার্থ এই যে, সুরাটের রাজস্ব ছিল তাঁর ব্যক্তিগত তহবিলের অংশবিশেষ। কিছু আলাপ আলোচনার পরে ওলন্দাজ ব্যবসায়ীদের সাথে একটি সন্তোষজনক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সুরাট ও ব্রচ বন্দরে ওলন্দাজগণের শুল্ক মওকুফের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু এই মর্মে সমঝোতা হয় যে তাঁরা তাঁদের সকল বকেয়ার পরিবর্তে ভবিষ্যতে বার্ষিক পঞ্চান্ন হাজার টাকার নির্ধারিত অংক প্রদান করবেন। বাংলা প্রদেশে পথ চলাচলের সময় শুল্ক থেকে অব্যাহতি মঞ্জুর করে একটি ফরমান জারি করা হয়। সুরাটে একটি অট্টালিকা নির্মাণ ও নৌকা মেরামতের অনুমতি দিয়ে আর একটি ফরমান জারি করা হয়।[৬৪২] জাহানারা বেগমের বিপুল প্রভাব উপলব্ধি করে কখনো কখনো বিদেশি বণিকগণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন।[৬৪৩] কিন্তু একথা খুব স্পষ্ট নয় যে, জাহানারা বেগম তাঁদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করতেন বা তাঁদের সমস্যা সাধারণভাবে আলোচিত হতো কিনা। ওলন্দাজ বণিকগণ প্রায়ই জাহানারা বেগমের কাছে হাজির হতেন তাঁর দিওয়ান ও পরিচালিকাবৃন্দের মাধ্যমে সহজেই ঋণ আদায় ইত্যাদির জন্য নিশান লাভ করতে।[৬৪৪]

দেওয়া হয়েছিল : রুকিয়াত FF. 200b. 201 b. জাহানারা বেগম আওরঙ্গজেবকে মুলতাফিত খানের বদলে মীর নিসারের নিয়োগের জন্য একটি পত্র লিখেন যা বাস্তবায়ন করার জন্য আওরঙ্গজেব কথা দেন। রুকিয়াত F. 198b অন্য একটি পত্রে জাহানারা মুহাম্মদ নাক্বিকে বুরহানপুর ও মছলিপত্তমে একটি কারখানা খুলতে সুপারিশ করেন। রুকিয়াত F. 200a, b; আদব F 200a. b একটি পত্রে জাহানারা আওরঙ্গজেবকে আতিশ খানের দাবি সম্বন্ধে লিখেন। আওরঙ্গজেব তার উত্তরে বলেন যে জাহানারার ইচ্ছানুসারে কাজ করা হবে। রুকিয়াত, F.199a.

৬৪০. মিস্টার এইচ. এ. রোজ কর্তৃক লিখিত সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩.

৬৪১. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৪৫৩-৫৪.

৬৪২. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৫১-৫৪ খ্রিষ্টাব্দ). পৃষ্ঠা ১১.

৬৪৩. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১১-১২.

৬৪৪. জাহানারা বেগমকে শ্রদ্ধা জানাতে ডেভিড তাঁর কাছে হাজির হন। (ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৫১-৫৪ খ্রিষ্টাব্দ). পৃষ্ঠা-৫০.

www.pathagar.com

(ট) রওশন আরা বেগমের রাজনৈতিক অবদান

শাহজাহানের দ্বিতীয় কন্যা রওশন আরা বেগমের সাথে জাহানারা বেগমের খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। রওশন আরা ছিলেন আওরঙ্গজেবের সমর্থক। যেহেতু তিন প্রতিশোধপরায়ণ ও বিবেকহীন ছিলেন সেহেতু তিনি আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করেন তাঁর পিতার কম্পিত হস্ত থেকে রাজমুকুট ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনায় সাহায্য করতে। রাজকীয় অন্দরমহলের বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় তিনি তাঁর ভাইকে সকল ঘটনা সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করতেন।[৬৪৫] যখন তিনি এই সংবাদ শুনতে পান যে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করার জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করেছেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত সোনা ও রুপা আওরঙ্গজেবের প্রযত্নে জমা রাখেন।[৬৪৬] আওরঙ্গজেব তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন শাহ বেগম খেতাব প্রদানের এবং ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ রুপি নগদ পুরস্কারসহ এই খেতাবটি প্রদান করেন।[৬৪৭] আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও সক্রিয়, সতর্ক ও উচ্চাভিলাষী মহিলারা ছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর পত্নীদেরকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর অন্যতম পত্নী দিলরাস বানু বেগম ছিলেন একজন অহংকারী ও জেদি মহিলা এবং সম্রাট তাঁর ভয়ে কিছুটা ভীত ছিলেন।[৬৪৮] আর একজন মহিলা উদয়পুরি মহলের সাথে যৌবনকালে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তাঁকে অনবরত প্রভাবিত করতেন তাঁর (সম্রাটের) মৃত্যু পর্যন্ত এবং তাঁর প্রভাবের ফলেই তিনি তাঁর পুত্র কাম বখশের অনেক অপরাধ ক্ষমা করেন।[৬৪৯] আওরঙ্গজেবের ভগ্নিরাও তাঁর শাসনকালে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধে তাঁকে সহায়তাকারী রওশন আরা বেগম ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আওরঙ্গজেব

---

৬৪৫. টীকা : একটি বিমার ব্যাপারে ওলন্দাজরা বেগম সাহেবের দিওয়ানের কাছ থেকে চিঠিপত্র লাভ করেন কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে লাগেনি। তাই তারা তার সেবিকা হুরি খানমের কাছে হাজির হয় জাহানারা বেগমের নাগাল পেতে, তার সাহায্য পেতে এবং এভাবে বিমার অর্থ আদায় করে; ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৫৫-৮০), পৃষ্ঠাগুলো ৭৩, ৭৪. অন্য সময়ে হকিকত খান তাদেরকে আশ্বাস দেন চাত্তারশালের ঋণের অর্থ আদায়ে বেগম সাহেবের কাছ থেকে একটি নিশান সংগ্রহের কাজে সাহায্য পেতে ; পৃষ্ঠা-২১০-২০.

৬৪৬. যদুনাথ সরকার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৪ তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫৮-৫৯; হ্যামিল্টন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১ (ভুলক্রমে তিনি তাঁকে নূরমহল বলে আখ্যায়িত করেন)

৬৪৭. টাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৭৬-৭৭.আলমগীরনামা, পৃষ্ঠা ৩৮৮; টাভার নিয়ার প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠাগুলো ৩৭৬-৭৭.

৬৪৮. আলমগীর নামা, পৃষ্ঠা ৩৮৮; টাভার নিয়ার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৭৬-৭৭.

৬৪৯. যদুনাথ সরকার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১. Ibid.. পৃষ্ঠা ৬৪.

www.pathagar.com

যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি তখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হতে শুরু করেন। শাহজাহানের অসুস্থতার সময় দারা যেমন করেছিলেন তেমনিভাবে রওশন আরা স্থগিত করে রাখেন তাঁর ভাইয়ের অসুস্থতার খবর প্রচার।[৬৫০] তিনি রাষ্ট্রীয় সিলমোহর নিজের কাছে নেন এবং নয় বছর বয়সের সুলতান আজমের পক্ষে অনেক রাজা ও সেনাপতিদের কাছে পত্র লিখেন।[৬৫১] তিনি কাউকে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিতেন না এবং একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সম্রাট মারা গেছেন। তিনি হিন্দু শাহজাদাদেরকে আজমকে সমর্থন করতে প্ররোচিত করেন। শাহজাদা মোয়াজ্জেম এতে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেন। রওশন আরা তাঁর প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রতি উদ্ধত আচরণ করেন। সম্রাট যখন তাঁর বোনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারলেন তখন তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি বহুলাংশে তাঁর প্রতি তাঁর ভাইয়ের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হারান।[৬৫২]

১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা বিজয়ী শিবাজি যখন আগ্রাতে আসেন তখন আওরঙ্গজেবের আর একজন বোন জাহানারা বেগমও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের সুবিধার্থে অম্বর রাজ্যের কাচ্চওয়ার শাসনকর্তা জয় সিং বুঝতে পারেন শিবাজিকে বশে আনার প্রয়োজনীয়তা। তিনি সম্রাটের অনুমতি লাভের পরে শিবাজিকে আগ্রা ভ্রমণ করতে প্ররোচিত করেন। শিবাজি তাতে অনিচ্ছুক ছিলেন তারপরও জয় সিং তাঁকে বড় বড় পুরস্কারের আশ্বাস দেন এবং পরিশেষে এতে মারাঠা নায়ক রাজি হন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মে সম্রাটের সাথে শিবাজির সাক্ষাতের দিন ধার্য করা হয়।[৬৫৩] ঐ দিন আগ্রাতে বিপুল জাঁকজমক ও সমারোহের সাথে রাজকীয় আমোদ-প্রমোদ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কারণ পিতা শাহজাহানের মৃত্যুর পরে এটা ছিল সম্রাটের রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম আগ্রা সফর এবং চান্দ্র বৎসর গণনামতে তাঁর ৫০তম জন্মদিন। শিবাজিকে পরামর্শ দেওয়া হয় একদিন আগে আগ্রাতে পৌঁছতে যাতে তিনি জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিবাজি ১২ মে প্রায় দুপুর বেলায় আগ্রাতে পৌছেন। রাজদরবারের শিষ্টাচার সম্বন্ধে শিবাজিকে প্রশিক্ষণ না দিয়ে দ্রুত গতিতে তাঁকে হাজির করা হয় রাজদরবারে। এ থেকেই সব সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি

৬৫০. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ১২৩.

৬৫১. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫৪-৫৬; সরকার তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯.

৬৫২. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫৪-৫৬.

৬৫৩. সরকার, শিবাজি, পৃষ্ঠাগুলো ১৩১-৩৩.

www.pathagar.com

আগ্রাতে পৌঁছার সময়েও তাঁকে যথার্থভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি।[৬৫৪] যখন তিনি রাজদরবারে পৌঁছেন তখন দিওয়ান-ই-আমের অভ্যর্থনা শেষ হয়ে যায় এবং সম্রাট সেই সময় দিওয়ান-ই-খাসমহলে অবস্থান করছিলেন। শিবাজি নিসার হিসাবে ৫০০০ রুপি প্রদান করা ছাড়াও আওরঙ্গজেবকে ১০০০ মোহর ও ২০০০ রুপি নজরানা প্রদান করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে অভ্যর্থনামূলক বা প্রদত্ত উপহারের স্বীকৃতিমূলক কোনো কথা বললেন না। শিবাজিকে সিংহাসনের কাছ থেকে পেছনে সরিয়ে এনে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তৃতীয় সারিতে অর্থাৎ পাঁচ হাজারি মনসবদারদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। রাজদরবারের কাজ চলতে থাকল এবং মনে হয় শিবাজির কথা সবাই ভুলে গেছেন।[৬৫৫] তিনি সম্রাটের তরফ থেকে এ ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করেননি। তিনি কোনো উপহার বা সম্মান সূচক পদবি এমনকি কোনো সহানুভূতিপূর্ণ সম্ভাষণও পেলেন না। এতে শিবাজি বিরক্ত হলেন। তিনি খুব রাগান্বিত হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাজদরবার থেকে বের হয়ে গেলেন।[৬৫৬] জয়সিংয়ের বড় ছেলে রামসিং শিবাজিকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। জয়সিংয়ের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন দল এবং শিবাজির দ্বারা বিড়ম্বনা পোহানো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও আত্মীয়স্বজন প্রতিশোধ নিতে জোটবদ্ধ হলেন। তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ ও অবাধ্যতার জন্য তাঁকে শাস্তি দিতে সম্রাটকে আহ্বান জানান।[৬৫৭] একই সাথে হেরেমের অভ্যন্তর থেকেও কিছুটা চাপ প্রয়োগ করা হলো। দীর্ঘদিন যাবৎ জাহানারা বেগম সুরাট থেকে যে রাজস্ব পেয়ে আসছিলেন তা থেকে শিবাজি কর্তৃক ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বঞ্চিত হন। তাই তিনি ছিলেন শিবাজির প্রতি রাজকীয় সাদরে অভ্যর্থনা প্রদর্শনের প্রবল বিরোধী এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সম্রাটকে এরূপ উক্তি শোনান যে, 'কে এই শিবাজি যিনি সম্রাটের উপস্থিতিতে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অবাধ্য আচরণ করতে পারেন? সম্রাটকে তাঁর আচরণে উপেক্ষা করলেন কেন? যদি এমনটি ঘটতে থাকে তবে অনেক ভুঁইঞা (সামান্য ভূস্বামী) এখানে এসে উদ্ধত আচরণ করলেন। তাহলে সরকারি প্রশাসন চলবে কীভাবে? তাহলে এই সংবাদ প্রত্যেক পল্লীতে ছড়িয়ে পড়বে যে একজন হিন্দু এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেছেন এবং

---

৬৫৪. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১৩৮-৩৯.

৬৫৫. সরকার, শিবাজি, পৃষ্ঠা ১৪০.

৬৫৬. Ibid., পৃষ্ঠা ১৪১.

৬৫৭. Ibid., পৃষ্ঠা ১৪৩; ভ. সি. বি ত্রিপাঠি কর্তৃক সম্পাদিত মির্জা রাজা জয় সিংয়ের জীবন ও আমল, পৃষ্ঠা ২৩৪.

www.pathagar.com

অন্যান্য প্রত্যেকে উদ্ধত হতে শুরু করবে।[৬৫৮] আর একজন মহিলাও যিনি জাফর খানের স্ত্রী এবং শায়েস্তা খানের ভগ্নি তাঁর স্বামীর কাছে আবেদন জানান পুনাতে তাঁর ভাইয়ের ওপরে প্রাণঘাতী আক্রমণের জন্য শিবাজির ওপর প্রতিশোধ নিতে।[৬৫৯] সম্রাট আওরঙ্গজেব হেরেমের চিৎকার শ্রবণ করেন ধৈর্যের সাথে, এই সমস্যাটি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করেন এবং প্রিভি কাউন্সিলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শিবাজিকে হত্যা অথবা বন্দি করতে হবে।[৬৬০] এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন আওরঙ্গজেব হেরেমের মহিলাদের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাকে এত কঠোর মনে করা হয় যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তিনি হেরেমের মহিলাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মতো নন। নিশ্চয়ই অন্য কিছু বাস্তব ঘটনা ও বিবেচনা আছে, যা তাঁকে এ রকম চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তার পরও একথা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না যে, মহিলাদের ঘটানো প্রভাব তাঁর ওপর কিছুটা কার্যকর হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের কন্যারা রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে আগ্রহ পোষণ করতেন এবং তাঁরা সাক্ষীগোপাল মাত্র ছিলেন না।[৬৬১]

(ঠ) জীবন নিসা বেগমের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা

১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের ভাইদের মধ্যে যখন সিংহাসনের উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলছিল তাঁর শ্বশুর শাহ নাওয়াজ খান তাঁকে তখন কোনো সাহায্য করেননি। দারার পরাজয়ের পরে আওরঙ্গজেব তাঁর শ্বশুরকে বন্দি করেন। পরিশেষে জীবন নিসা বেগমের পীড়াপীড়িতে তাঁর মাতৃপক্ষের মাতামহ শাহ নাওয়াজ খানকে মুক্তি দেওয়া হয়।[৬৬২] একইভাবে শাহজাদা আজমকে হেরেমের তত্ত্বাবধায়িকার সাথে ঝগড়া করার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়

---

৬৫৮. জয়পুর নথিপত্র (হিন্দি), চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠাগুলো ১৪, ১৭ : (অনুবাদ) পৃষ্ঠা ১৬৩; ড. সি. বি. ত্রিপাঠি কর্তৃক সম্পাদিত মির্জা রাজা জয় সিংয়ের জীবন ও আমল, পৃষ্ঠা ২৩৫; সরকার, শিবাজি, পৃষ্ঠা ১৪৩.

৬৫৯. Ibid., পৃষ্ঠা ১৪৩; ড. সি বি ত্রিপাঠি কর্তৃক সম্পাদিত মির্জা রাজা জয় সিংয়ের জীবন ও আমল, পৃষ্ঠা ২৩৫.

৬৬০. Ibid., p. 235.

৬৬১. টীকা: এটা দেখা গেছে যে, আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে বড় মেয়ে জীবন নিসা তাঁর মুখমণ্ডলে ঘোমটা দিয়ে শাহী দরবারে আসতেন এবং তাঁর পিতাকে তাঁর আলোচনায় সাহায্য করতেন। মাগন লাল কর্তৃক সম্পাদিত 'দেওয়ান-ই-জীবন নিসা', পৃষ্ঠা-১৩.

৬৬২. আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা, ৪৯.

www.pathagar.com

(১৭০১-৫ খ্রিষ্টাব্দে)।[৬৬৩] তিনি ক্ষমালাভের দরখাস্ত তাঁর বোন পাদশাহ বেগমের মাধ্যমে প্রেরণ করেন।[৬৬৪] মনে হয় যে নিয়োগের ব্যাপারেও ছিল তাঁর ফলপ্রসূ মতামত। আওরঙ্গজেব একবার তাঁর কাছে একটি পদের জন্য কোনো একটি নাম সুপারিশ করে পত্র লিখেন এবং একথা ও উল্লেখ করেন যে তিনি অনুমোদন না করলে নিয়োগটি কার্যকর হবে না।[৬৬৫] জীবন নিসা ছিলেন তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মদ আকবরের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিদ্রোহের সময় তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। ১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় সম্রাটের অগ্রগামী সৈনিক দলের প্রধান সঙ্গী ছিলেন এবং পরবর্তী বছরে তাঁর আদেশে একটি সেনাবাহিনী পুরোপুরি চলেছিল। তারপরে তিনি দুষ্ট উপদেষ্টাদের সাথে যোগ দেন তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। তিনি তাঁর পিতাকে একটি ইশতেহারে ইসলামী আইনের লঙ্ঘনকারী হিসেবে সাব্যস্ত করে প্রকাশ করেন এবং এমনকি ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিদ্রোহ চলাকালে শাহজাদি তাঁর সাথে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তাঁর পরিত্যক্ত শিবিরে সম্রাট বাহিনী অবরোধ করে এবং শাহজাদার কাছে লেখা তাঁর পত্রগুলো খুঁজে বের করা হয় এবং তাঁকে তাঁর পিতার ক্রোধের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর সম্পত্তি ও বার্ষিক চার লক্ষ রুপির অবসরভাতা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তাঁকে অবশিষ্ট জীবনের জন্য সেলিমগড়ের দুর্গে বন্দি করে রাখা হয় এবং সেখানে তিনি ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬৬]

---

৬৬৩. টীকা: মহলদার নূরুন নিসার প্রতি শাহজাদা আজম এত খারাপ ব্যবহার করেন যে, তিনি তাঁকে আহম্মদাবাদে রাজকীয় উদ্যানে ভ্রমণের সময় সঙ্গে নিয়ে যাননি। মহলদার শাহজাদার ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে হেরেমের বাইরে আমার কাছে একটি পত্র পাঠান। তাই এই দাস (লেখক) এসে সম্রাটের আদেশ ব্যতীত শাহজাদার বহিঃগমন বন্ধ করে দেয়। শাহজাদা তাঁর দরবার থেকে মহলদারকে বের করে দেন, সম্রাট যখন একথা শুনতে পান তখন তিনি শাহজাদাকে শাস্তি প্রদান করেন। আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠাগুলো ৭১, ৭২.

৬৬৪. Ibid.,p 72.

৬৬৫. রোকেয়াত FF.313;, 313b. এরকম আরো দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। একদা তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের কাছে একটি পত্র লিখেন। এর জবাবে আওরঙ্গজেব লিখেন যে তিনি করণিককে উক্ত পত্র অনুসারে অবহিত করেছেন। রোকেয়াত F.312b. অন্য একটি ব্যাপারে আওরঙ্গজেব তাঁকে লিখেন যে যদি হাকিম আব্দুল্লাহ বিশ্বাসযোগ্য না হন তবে তাঁকে অপসারণ করতে হবে এবং কোকাজাদাকে পদোন্নতি দিতে হবে। রোকেয়াত F. 312b.

৬৬৬. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা -১২৬: যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫২,৫৪.

www.pathagar.com

(ড) জিনাত-উন-নিসার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

আওরঙ্গজেবের আর একজন কন্যা হলেন জিনাত উন নিসা। তিনি বিশ্বাস করে তার ওপরে মারাঠা বন্দিদেরকে ন্যস্ত করেন, শম্ভুজীর বিধবা পত্নী ও তাঁর পুত্র স্যাহুর দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে।[৬৬৭] শাহজাদা আকবরের মতো বেগম সাহেব একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং আকবরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মারাঠাদের প্রতি তাঁর ছিল দয়ালু মনোভাব। ইয়েসুবাঈ ও তার পুত্রের জন্য ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি।[৬৬৮] তিনি তাঁদেরকে তাঁর পিতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করেন। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে সাহু যখন নর্মদা নদী থেকে দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন তাঁর ভ্রমণকে সুবিধাপূর্ণ করতে জীনাত-উন-নিসা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।[৬৬৯] ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ যখন মোঘলদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন তখন তিনি সাহায্য করেন সাহু এবং তাঁর মায়ের মুক্তি ব্যাপারে।[৬৭০] কথিত আছে যে বালাজীর সাথে ছিল তাঁর গোপন যোগাযোগ এবং তাঁর সহায়তায় তিনি সাহুর স্বার্থরক্ষা করেন।[৬৭১] জীনাত-উন-নিসা কখনো কখনো সম্রাট ও শাহজাদাদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন। ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে আসাদ খানের তত্ত্বাবধানে তাঁর পুত্র নুসরত জংয়ের জিন্‌জি অবরোধ করতে শুরু করেন। ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সবচেয়ে কনিষ্ঠ পুত্র কাম বখশকে দুইজন সেনাপতির বিরোধিতা করার জন্য ও শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করার জন্য তাঁকে বন্দি করা হয়। তিনি যখন রাজদরবারে পৌঁছেন (১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) জীনাত-উন-নিসার মধ্যস্থতায় তখন তাঁকে সম্রাটের হেরেমের সাথে সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করা হয়।[৬৭২]

(ঢ) রাজনীতিতে অন্যান্য মহিলাদের অবদান

আওরঙ্গজেবের সময় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী আর একজন মহিলা ছিলেন আমির খানের স্ত্রী সাহেব জী, ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাবুলের শাসনকর্ত্রী নিযুক্ত হন।[৬৭৩] তিনি ছিলেন বিশেষভাবে গুণান্বিতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ মহিলা

---

৬৬৭. জি, এস, সারদেশাই কর্তৃক সম্পাদিত 'মারাঠাদের নতুন ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫০.
৬৬৮. Ibid.
৬৬৯. Ibid.
৬৭০. Ibid.
৬৭১. জি.এস. সারদেশী কর্তৃক সম্পাদিত 'মারাঠাদের নতুন ইতিহাস': প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৫.
৬৭২. মাসির- ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা, ২১৭: আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা-৭৯.
৬৭৩. যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩.

www.pathagar.com

এবং চলমান রাজনীতিতে তাঁর ভালো দখল ছিল।[৬৭৪] তাঁকে প্রদেশটির প্রকৃত শাসনকর্তা মনে করা হতো।[৬৭৫] ১৬৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্বামী কাবুল উপত্যকায় সেনাবাহিনী নিয়ে বাইরে বের হলে হঠাৎ মারা যান। তিনি এতে তাঁর মনের বল হারাননি এবং সেই সময়ের জন্য তাঁর দুঃখ চেপে রাখেন। তিনি আমির খানের পোশাক পরিধান করায় তাঁকে আমির খান দেখাচ্ছিল; তিনি পালকিতে উপবেশন করে সেনাদলের যাত্রা পুনরায় শুরু করেন। তিনি নিজে সেনাদল পরিদর্শন করেন এবং পথের মধ্যে অভিবাদন গ্রহণ করেন। কাবুলে উপস্থিত হওয়ার পরে তিনি বিয়োগান্ত ঘটনার সংবাদ প্রকাশ করেন।[৬৭৬] এবং তাঁর স্বামীর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। আফগানরা যদি আগে এটা জানতে পারত তবে তারা মৃত রাজার অনুসরণকারীদের একজনকেও জীবিত অবস্থায় রেহাই দিত না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে সেই সম্বন্ধে যখন জানতে পারলেন তখন তাঁরা মহিলাটির সাহস ও সদগুণাবলির জন্য তাঁর প্রতি তাঁদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠল এবং পরিশেষে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইচ্ছা বিসর্জন দিলেন। আওরঙ্গজেব যখন আমির খানের মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে পারলেন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হলেন, তখন একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি মন্তব্য করলেন, 'মহাত্মন, হয়তো তিনি মারা গেছেন কিন্তু সাহেব জী বেঁচে আছেন এবং তাঁর স্বামীর হাতে সেখানকার সরকারি ব্যবস্থাপনা যেমন নিরাপদ ছিল তাঁর হাতেও এখন তা তেমনি নিরাপদ রয়েছে।[৬৭৭] তিনি সত্য সত্যই তাঁর পিতা কর্তৃক কাবুলের সুবেদার পদে নিযুক্ত শাহআলম না পৌঁছা পর্যন্ত সেই এলাকার সংকটময় পরিস্থিতি দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ফলে তিনি যখন সম্রাটের শিবিরে পৌঁছেন তখন সম্রাট সদয় ব্যবহার দ্বারা তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুমতি দেন।

এভাবে আওরঙ্গজেবের মতো কঠোর শাসনকর্তার শাসনকালেও মহিলারা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব খাটান। যদিও মনে হয় যে, আওরঙ্গজেব হেরেমের মহিলাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ধারণা পছন্দ করতেন না তবুও তাঁর বোনেরা ও কন্যারা কখনো কখনো কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতেন, যা তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বাহাদুর শাহের আমলে রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো

---

৬৭৪. মাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫০; যদুনাথ সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪.

৬৭৫. যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠাগুলো ১১৪-১১৫.

৬৭৬. Ibid., p 115; মাসির, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫১.

৬৭৭. যদুনাথ সরকারের 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠাগুলো- ১১৪-১১৭; মাসির-ই-আলমগিরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১.

www.pathagar.com

মহিলা সক্রিয় আগ্রহ পোষণ করতে পারতেন বলে মনে হয় না। জাহান্দার শাহের আমলে সম্রাটের প্রিয় উপপত্নী লাল কনওয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ছিলেন একজন নর্তকী এবং তাঁর কোনো মর্যাদাপূর্ণ পরিচয় ছিল না। সম্রাটের প্রিয় পাত্রী হিসেবে সম্রাটের দেওয়া কিছু সুযোগ-সুবিধা তিনি ভোগ করতেন।[৬৭৮] তিনি অনুমতি লাভ করেছিলেন ড্রাম বাজিয়ে সামরিক কায়দায় পদযাত্রা করে রাষ্ট্রীয় কুচকাওয়াজ প্রদর্শনে তিনি যেন নিজেই ছিলেন সম্রাটের প্রতিচ্ছবি। পাঁচশ সম্ভ্রান্ত সেনানায়ক তাঁর দলবলকে অনুসরণ করত।[৬৭৯] স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে অনেক গুজব ছড়িয়ে পড়ে। রাজদরবারে লাল কুনওয়ারের আচরণ শহরের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয় কিন্তু সম্ভবত এ গুলোর কয়েকটি অতিরঞ্জিত।[৬৮০] কথিত আছে যে, লাল কুনওয়ারের সান্নিধ্যে সম্রাট মদ্যপানে, গান শুনে এবং তাঁর অধিকাংশ সময় আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করতেন।[৬৮১] তার মোহবিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করতেন এবং তিনি তাঁর শিষ্টাচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলেন এবং এর ফলে সম্রাটের মর্যাদা অবনমিত ও বিনষ্ট হয়।[৬৮২] তৎকালীন প্রথা হিসেবে রানির আত্মীয়স্বজনরা মনসব ও উপাধি লাভ করতেন। লাল কুনওয়ারের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন সম্মনিত হন এবং মনসব, ঘোড়া, হাতি,

---

৬৭৮. সিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৮৫: ফারুকি, F 37 a.

৬৭৯. সতীশ চন্দ্র কর্তৃক রচিত 'মোঘল দরবারে দল ও রাজনীতি' পৃষ্ঠাগুলো ৭০, ৭১.

৬৮০. কাফি খান পৃষ্ঠা, ৬৯০. একদা রাতে যখন সম্রাট ও তাঁর প্রেমিকা একটি দুচাকার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বাইরে যান তখন তাঁরা মদে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং দরজার কাছে এসে লাল কুনওয়ার সম্রাটের কথা না ভেবে তার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘুমাতে যান। সম্রাট এতটা নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে, তিনি ঘুম থেকে উঠতে পারেননি এবং ঘোড়ার গাড়িতেই থেকে যান। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়, তখন জনসাধারণ ছুটে আসে এবং সম্রাটকে ঘোড়ার গাড়িতে দেখতে পায়। অন্য অনেকেই এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছেন। আরভাইনও এ ধরনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, ১৯৫-৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আর একটি কাহিনীতে উল্লেখ আছে লাল কুনওয়ারের মর্জিমতো একটি নৌকা পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে (আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২)। নূরুদ্দিন ফারুকি বলেন যে, রাতে সংগীত শিল্পীরা সমবেত হতো প্রাসাদে। তাঁরা স্বাধীনভাবে মদ পান করত এবং তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করত ও সম্রাটকে লাথি মারত। এমনকি লালকুনওয়ারও মাঝে মাঝে ঐ রকম করত এবং তাতে সম্রাট একটি শব্দও উচ্চারণ করতেন না। ফারুকি, আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৬. আশাহারও একই বর্ণনা দিয়েছেন। লাল কুনওয়ারের আত্মীয়স্বজনরা সব ধরনের অভদ্র আচরণ করতেন। তারিখ-ই-মুহাম্মদ শাহী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫.

৬৮১. ফারুকি F 37 b; মাসির-ই আলমগিরি দ্বিতীয় খণ্ড, প্রষ্ঠা ১০৪০: ভীর ভিনোদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩২; ভারতের কেম্ব্রীজ ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬.

৬৮২. সতীশ চন্দ্রের, পৃষ্ঠা ৭১.

www.pathagar.com

বাদ্যযন্ত্র ও মণিরত্ন উপহার হিসেবে লাভ করেন।[৬৮৩] তাঁর ভাইদের মধ্যে তিনজন নিয়ামত খান, নামদার খান ও নিয়মত খান, খানজাদ খান উপাধি লাভ করেন।[৬৮৪] তার অন্যতম ভাই খুশাল খান সাত হাজারের মনসব লাভ করেন, নামদার খান ও নিয়াতম খান পাঁচ হাজারের মনসব লাভ করেন এবং শেষোক্ত ভাইটিও মুলতানের সুবেদারি লাভ করেন।[৬৮৫] অন্য অনেকে শিল্পী ও সংগীতজ্ঞও (কলাকারের) পদমর্যাদা ও পুরস্কার লাভ করেন।[৬৮৬] স্বভাবতই নীচ বংশোদ্ভূত একজন মহিলার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদেরকে তাঁদের সমমর্যাদায় উন্নীতকরণে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা অপমানিত বোধ করতেন। ফলে লাল কুনওয়ার ও তাঁর আত্মীয়দের সাথে উজির জুলফিকার খানের বিরোধ দেখা দেয়। জুলফিকার খান লাল কুনওয়ারের আত্মীয়স্বজন দ্বারা ঈর্ষান্বিত পদসমূহ পূরণ করার ধারণা অপছন্দ করতেন।[৬৮৭] তিনি তাঁর ভাইকে মুলতানের সুবাদার পদে নিয়োগের বিরোধিতা করেন এবং এমনকি তাঁর একজন ভাই খুশালখানকে একজন মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার জন্য গ্রেফতার করেন।[৬৮৮] তাছাড়া উজির ও লাল কুনওয়ারের মধ্যে শত্রুতার আর একটি কারণ ছিল। আগে সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশাকারীদেরকে। উজিরের কাছ থেকে যে সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করতে হতো তা ছিল উজিরের উপার্জনের একটি ভালো উৎস।[৬৮৯] কিন্তু এখন তাও লাল কুনওয়ারের দ্বারা আত্মসাৎ হতে থাকে।[৬৯০] লাল কুনওয়ার ও জাহান্দার শাহের সম্বন্ধে সকল ঘটনা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সম্রাটের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। সম্রাটের ওপর তাঁর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য বলে মনে হয় এবং সেই মোহবশত তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনকে কিছু সুবিধা ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিলেন। এটা বলা কঠিন ব্যাপার যে, তাঁর প্রভাবাধীনে এ ধরনের নিয়োগ কার্য দ্বারা সমসাময়িক রাজনীতি গুরুতরভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল

---

৬৮৩. কাফি খান ইলিয়ট ওভাউসন, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২; কামওয়ার., F337 b; ফারুকি F. 37 a: ৩৭ কাফিখান পৃষ্ঠা ৬৮৯; ভীরভিনোদ, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৩২; সতীশ চন্দ্র পৃষ্ঠা ৭২.

৬৮৪. ডসয়ার পৃষ্ঠা ৩৮৫; ফারুকি, F37 a: কামওয়ার. F 337 b; আরভাইন প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৩.

৬৮৫. ফারুকি F37 a ; সিয়ার পৃষ্ঠা ৩৮৫: ভিরভিনোদ, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৩২.

৬৮৬. ফারুকি, F37b . সিয়ার পৃষ্ঠা ৩৮৬, আরভাইন প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৪.

৬৮৭. সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭১.

৬৮৮. কাফিখান পৃষ্ঠা ৬৮৯.

৬৮৯. সিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৮৬: আসহুব, প্রথম খণ্ড, F 35 a.

৬৯০. সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ৭৩.

www.pathagar.com

কিনা। যদি তিনি এ ধরনের ইচ্ছা পোষণ করতেন তবে সাম্রাজ্যের রাজনীতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ লাভে সফল হতে পারতেন; কিন্তু মনে হয় যে, তাঁর এ ধরনের সামর্থ্য বা বুদ্ধিমত্তা বা এ ধরনের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। এভাবে তাঁর প্রভাব প্রিয়জনদের জন্য কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর বেশি কিছু নয়। ১৭১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফারুখ শিয়ারের মা রাজনীতি ক্ষেত্রে [illegible]ষ্টিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর দুঃসাহসী পুত্রকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করেন। তাঁর পুত্রকে প্রত্যেক মহল থেকে সহযোগিতা করতে অসম্মতি জানানো হয়। অন্যতম ভ্রাতা সাঈদ হোসেন আলী খান সেই সময়ে বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিও তাঁকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। অবশেষে ফারুখ শিয়ারের মা তাঁর পুত্রের স্বার্থ সমর্থন করার জন্য হোসেন আলীর ওপরে চাপ সৃষ্টি করেন।[৬৯১] তিনি তাঁকে এ কথা বুঝিয়ে তাঁর পুত্রকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন যে, পরিণামে হোসেন আলী লাভবান হবেন।[৬৯২] শুধু তাই নয়, তিনি হোসেন আলীর মায়ের কাছে যান; হোসেন আলীর মা ফারুখ শিয়ারকে ডেকে পাঠান এবং আলীকে অনুপ্রাণিত করেন। ফলে হোসেন আলী ফারুখ শিয়ারের সাথে যোগ দিতে সম্মত হন।[৬৯৩] পরবর্তীকালে তাঁর মায়ের সুপারিশে তাঁর মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত ও দীর্ঘকাল যাবৎ শাহী চাকরিরত মোহাম্মদ মুরাদ কাশ্মিরিকে ফারুখ শিয়ার তাঁর সহযোগীরূপে বহাল করেন এবং এক হাজার মনসবসহ খিলাত খান উপাধি তাঁকে অর্পণ করেন।[৬৯৪]

মুহাম্মদ শাহের শাসন আমলে তাঁর মা নওয়াব কুদসিয়া বেগম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়গুলো এমন দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন যে, সেই সময়ের প্রভাবশালী ব্যক্তি সাঈদ ভ্রাতারা তাঁর কার্যাবলির প্রতি সন্দেহ পোষণ করতে পারেননি।[৬৯৫] যে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী তাঁর পুত্রকে নিতে আসেন তাঁদেরকে তিনি সম্মানজনক পোশাক প্রদান করেন।[৬৯৬] এবং অন্য যাঁরা তাঁর স্বামীর সমর্থক তাঁদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ

---

৬৯১. ibid., পৃষ্ঠা ৯১.

৬৯২. ibid.

৬৯৩. আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৬: সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ৯১.

৬৯৪. কাফি খান, পৃষ্ঠা ৭৯১.

৬৯৫. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩.

৬৯৬. Ibid., পৃষ্ঠা-৪.

www.pathagar.com

না করতে সতর্ক করে দেন। এভাবে তিনি সাঈদ ভ্রাতাদের সন্দেহ এড়িয়ে যান।[৬৯৭] তিনি সাঈদের অধীনতা থেকে তাঁর পুত্রকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন[৬৯৮] এবং বড় অভিজাত ব্যক্তি নিজাম-উল-মুলকের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন তাঁদেরকে (মা ও ছেলে) সাঈদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে।[৬৯৯] মুহাম্মদ শাহের রাজত্বের প্রথমার্ধে যে দ্বিতীয় মহিলা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন কোকি জাউ। তিনি তৎকালীন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন জান মুহাম্মদের কন্যা।[৭০০] তাঁর আসল নাম ছিল রহমাতুন্নিসা কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কোকি জাউ নামে পরিচিত হন, কারণ তিনি এবং সম্রাট শৈশবে একই মায়ের স্তন্য পান করেছিলেন।[৭০১] তিনি তাড়াতাড়ি পড়তে ও লিখতে শিখেন এবং হেরেমের মহিলা সমাজে বিচরণ করে হেরেমের শিষ্টাচার সম্পর্কে পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন।[৭০২] রাজপ্রাসাদে তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি ভবিষ্য দ্বানীও করতে পারতেন। সম্রাটের মা নওয়াব কুদশিয়া তাঁর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন।[৭০৩] নিঃসন্দেহে তিনি একজন চতুর মহিলা ছিলেন এবং আলাপচারিতায় পারদর্শিনী ছিলেন। মুহাম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি শীঘ্রই সম্মান লাভ করেন। সম্রাট তাঁর প্রতি আস্থাশীল হন এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য তাঁর সেবাকর্মকে কাজে লাগান।[৭০৪] কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রথম দুই বছরে সাঈদ ভ্রাতারা যখন সাম্রাজ্যের মন্ত্রিসভায় কর্তৃত্ব করেন এবং উজির আমিন খান তখনও বেঁচে ছিলেন এবং কোকি জাউ নেপথ্যে ছিলেন। সাঈদ ভ্রাতাদের পতন ও মুহাম্মদ আমির খানের মৃত্যুর পরে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৭০৫] কথিত আছে যে, সম্রাট তাঁর প্রতি এত বেশি আস্থাশীল ছিলেন যে, রাজকীয় সিলমোহরটি তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে তাঁকে মুদ্রিত করার অনুমতি দান করেন।[৭০৬]

---

৬৯৭. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৩-৪.
৬৯৮. Ibid., পৃষ্ঠা ৬০.
৬৯৯. সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৫৭.
৭০০. আসহাব, প্রথম খণ্ড, F 45 a.
৭০১. Ibid., F46a.
৭০২. Ibid., F.45a.
৭০৩. Ibid.
৭০৪. কাফি খান, পৃষ্ঠা ৯৪০: মাসির, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬.
৭০৫. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৪.
৭০৬. Ibid., পৃষ্ঠা ২৬৫.

www.pathagar.com

অনেক লোক তাঁর কাছে আসত এবং তাঁর মাধ্যমে উন্নতি লাভ করত।[৭০৭] এ জন্য কোকি জাউ তাদেরকে উপহার ও ঘুষ দিতেন, যা পেশকাস নামে পরিচিত ছিল।[৭০৮] এই কাজে তাঁর অন্যতম বন্ধু রোশান-উদ-দৌলার আনুগত্য সম্বন্ধে আস্থাভাজন করে তোলেন এবং রোশন-উদ -দৌলাই সাত হাজার মনসবপ্রাপ্ত হন। এবং আহাদিম বা বাখশি পদ লাভ করেন।[৭০৯] তাঁর সহযোগিতায় পেশকাস ও উপহারাদি সংগ্রহ করা হতো। আর একজন ব্যক্তি কোকি জাউকে সমর্থন করেন। তিনি হলেন নাজিরি হেরেমের খাজা খিদমতগার।[৭১০] কিন্তু কথিত আছে যে, তিনি উৎকোচ বিরোধী ছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর দল থেকে বেরিয়ে আসেন।[৭১১]

শাহ আব্দুল গাফফার নামে একজন দরবেশ ও কোকি জাউকে সমর্থন করতেন এবং দরবেশ তাঁর ইন্দ্রজাল করার ক্ষমতার মাধ্যমে হেরেমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হন।[৭১২] কোকি জাউ এর সাথে তিনিও পেশকাস হিসেবে বড় অঙ্কের অর্থ লাভ করেন। এই তিনজন ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন এবং সমস্যার সৃষ্টি করতেন।[৭১৩] সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব হতো এই তিনজন প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দ্বারা। মনে হয় তাঁদের দ্বারা সংগ্রহকৃত পেশকাসের কিছু অংশ সম্রাটকেও দেওয়া হতো।[৭১৪] শীঘ্রই কোকি জাউ ও উজির নিজাম-উল-মুলকের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত দেখা যায়। নিজাম-উল-মুলক প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তাঁর যোগ্যতা ও সম্রাটের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা প্রমাণ করতে উৎসাহী হন।[৭১৫] উৎকোচ প্রথা বিলোপের মাধ্যমে তিনি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, কারণ তা স্বার্থান্বেষী মহল, বিশেষ করে কোকি জাউ এবং তাঁর প্রিয় লোকজনদেরকে অবৈধ স্বার্থ হাসিলের মূলোচ্ছেদ করে।[৭১৬] তাই তিনি যখন দেখতে পান যে সম্রাট রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোকি জাউয়ের হস্তক্ষেপ বন্ধ করবেন

---

৭০৭. কাফি খান (ইলিয়ট ও ডাওসন) অষ্টম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫২৩: আসহাব. প্রথম অধ্যায়, F46 a: মাসির-ই-আলমগিরি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৬: আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১.

৭০৮. আসহাব, প্রথম খণ্ড, F.479. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫.

৭০৯. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড.

৭১০. আসহাব, প্রথম খণ্ড F. 48 b

৭১১. সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ২১৩.

৭১২. আসহাব, প্রথম খণ্ড, F 65 b.

৭১৩. Ibid., 66.

৭১৪. Ibid., F 48a: আরভাইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫.

৭১৫. কাফিখান (ইলিয়ট ও ডাউসন), অষ্টম অধ্যায়. পৃষ্ঠা ৫২৩.

৭১৬. সতীশ চন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৭৪.

www.pathagar.com

না তখন তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দান বন্ধ করেন।[৭১৭] তাই ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে কোকি জাউ তাঁর প্রভাব হারাতে শুরু করেন। খিদমতগার ঐ একই বছরে মারা যান এবং তাঁর দলের অন্য সদস্যরা আবার অসম্মানের সম্মুখীন হন। রওশন-উদ-দৌলা হতবিল আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং কোকি জাউয়ের অন্যতম ভাই আলীমর্দান খানের অসদাচরণ দৃষ্টি গোচর হয়। এভাবে কোকি জাউ সম্রাটের ওপর থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারান।[৭১৮] আওরঙ্গজেব পরবর্তীকালীন আমরা একদল মহিলার সাক্ষাৎ পাই। তাঁরা আওরঙ্গজেবের আমলের মহিলাদের থেকে ভিন্ন রকমের ছিলেন। রানি, শাহজাদি, খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের সাথে মোঘল বা রাজপুত পরিবারের সম্পর্কযুক্ত পত্নীরা ছাড়াও নীচ বংশজাত উপপত্নীরা সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, ষড়যন্ত্রপরায়ণ, আত্মকেন্দ্রিক, নির্লজ্জভাবে আত্মস্বার্থ অন্বেষণকারী, রাজনৈতিক সমস্যা সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবনতির সুযোগগ্রহণকারী ক্ষমতা ও অর্থ লাভের জন্য তাঁদের অসৎ কার্যক্রম বিস্তারকারী। তাঁরা তাঁদের কর্মকাণ্ড দ্বারা যে সামান্য পরিমাণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অবশিষ্ট ছিল তা সংস্কারের সকল সম্ভাবনা রহিত করে গোপনে গোপনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। তাও মনে হয় যে কয়েকজন মহিলা সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে উদ্বিগ্ন ছিলেন। যেহেতু প্রকাশ্যে তাঁরা তা করতে পারছিলেন না সেহেতু তারা তা গোপনে করছিলেন।

---

৭১৭. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫.
৭১৮. ২৫৫. আরভাইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০.

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
মোঘল হেরেমে বসবাসরত নারীগণ এবং তাঁদের বাসস্থান

মোঘল হেরেম শব্দটি একটি স্বতন্ত্র নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত সুন্দর রহস্যময় ঐশ্বর্যপূর্ণ নারী সংগঠনের দৃশ্যকে তুলে ধরে। এটাকে আসলে এ রকমভাবে গড়ে তোলেন মহান মোঘল সম্রাট আকবর তাঁর অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫)। এটাকে সাজানোর জন্য তিনি হেরেমে নিয়ে আসেন বিপুলসংখ্যক সহনিবাসীকে। তিনি তাদেরকে সরবরাহ করতেন সকল প্রকারের বিলাসদ্রব্য এবং তাঁদের নির্জনতা নিরাপত্তার জন্য বিশাল আয়োজন করতেন। তাঁর উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর (১৬০৬-১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ), শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ও আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এর আমলে মোঘল হেরেম সৌন্দর্যের চূড়ায় পৌঁছে।

১. বাবর ও হুমায়ুনের হেরেম

আকবরের পূর্বপুরুষ তাঁর পিতামহ বাবর ও পিতা হুমায়ুনের হেরেম ছিল আকৃতিতে সীমিত। বাবর তাঁর কয়েকজন স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন; তাঁর কন্যা গুলবদন একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করেছেন। বিবাহের বছরের ঘটনাক্রমিক পর্যায়ে বাবরের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী হলেন আয়েশা সুলতান বেগম, জয়নাব সুলতান বেগম, মাহাম বেগম, (হুমায়ুনের মা), মাসুমা সুলতান বেগম, গুলরুখ বেগম, (কামরান ও আশকারির মা), দিলদার বেগম, (গুলরাখ, হিন্দাল ও গুলবদনের মা) এবং বিবি মুবারিকা[৫১৯]। তাঁর কয়েকজন উপপত্নীও ছিলেন। বাবরের প্রসিদ্ধ উপপত্নীরা হলেন পারস্যের শাহ তাহসাম কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত সার্কাসিয় ক্রীতদাসী গুলনার আগাচা ও নারগুল আগাচা। মাহাম ছিলেন রাজকীয় পরিবারের প্রধান নারী ও বাবরের জ্যেষ্ঠ

---

৫১৯. এ,এস, বেভারিজ কর্তৃক তুর্কি থেকে অনূদিত 'বাবর নামা' অনুবাদকের টীকা, পৃষ্ঠাগুলো ৭১১-৭১২.

www.pathagar.com

পুত্রের মাতা; তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা এবং হেরেমের অন্যান্য অধিবাসীর ওপরে তাঁর ছিল সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা।[৭২০]

হুমায়ুনের হেরেমও খুব বড় ছিল না। বিগা বেগম ছিলেন তাঁর নিকট সম্পর্কের বোন এবং তাঁর যৌবনকালের স্ত্রী। হামিদাবানু বেগম আকবরের মাতা হয়েছিলেন এবং তাকে সম্মান করা হয় মরিয়ম মাকানি (মেরির সাথে বসবাসকারিণী) খেতাবে। গুলবদনের দাসী মেওয়াজান ও নিজাম উদ্দিন খলিফার কন্যা গুলবার্গ ছিলেন তাঁর অন্য দুইজন পত্নী। গুনওয়ার বিবি ও খানিস আগা ছিলেন তাঁর উপপত্নীদের অন্তর্ভুক্ত। বিগা বেগম ও হাজি বেগম যাঁকে শেরশাহ চৌসার যুদ্ধ জয়ের পরে হুমায়ুনের কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন- তিনি ছিলেন রাজকীয় অন্দর মহলের প্রধান। সকলের ধারণামতে বাবর ও হুমায়ুনের হেরেমের প্রত্যেকটিতে দুইশ জনের অধিক সদস্য ছিল না।

৭২০. গুলবদন বেগম কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুননামা' পৃষ্ঠাগুলো ৮-৯.

www.pathagar.com

তাঁদের হেরেম বড় না হওয়ার কারণ ছিল। বাবরের জীবন ছিল সংগ্রামপূর্ণ সমানভাবে ব্যর্থতা ও সাফল্যে পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জীবন। তিনি সর্বদা শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে পলায়নরত বা পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে রত থাকতেন। হুমায়ুনের জীবনও তদাপেক্ষা কম উত্তেজনাপূর্ণ ছিল না। তিনি প্রায় দশ বছর রাজত্ব পরিচালনা করে শেরশাহের কাছে রাজত্ব হারান। তাঁর হেরেমের অনেক বাসিন্দা চৌসার যুদ্ধের সময় পানিতে ডুবে মারা যায় বা নিখোঁজ হয়। তিনি প্রায় পনেরো বছর যাবৎ পলায়নপর ও নির্বাসনে ছিলেন। হিন্দুস্তানে তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পরে তিনি এক বছরের বেশি সময় জীবিত ছিলেন না এবং তাঁর জীবনপ্রণালি দ্বারাই তাঁর হেরেমের আয়তন নির্ধারিত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে বাবর ও হুমায়ুনের কর্মজীবন প্রত্যেকটি অভিযানের পরে এক ঝাঁক সুন্দরী সংগ্রহের উপযুক্ত ছিল না। যাহোক, তাঁদের মধ্যে প্রেমের উত্তেজনা ও অনুভূতির অভাব ছিল না। সুলতান আহম্মদ মির্জার কন্যা মাসুমা সুলতান বেগম ছিলেন বাবরের প্রথম নিকট সম্পর্কের বোন। তিনি ১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাবরকে বিবাহ করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই বিবাহ ছিল পারস্পরিক প্রেমের মিলন।[৭২১] বিবি মুবারিকার জন্য বাবরের ভালোবাসা ও কামনা রোমান্টিক গল্পের মতো।[৭২২] হুমায়ুন হামিদা বানুর প্রেমে আপ্লুত হন এবং এমনকি হিন্দুস্তান থেকে পলায়নের সময় তাঁকে বিবাহ করেন। আব্দুল্লাহ তাঁর তারিক-ই-দাউদিতে হুমায়ুনের আর একটি পলায়নের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, একদা এক অতিশয় সুন্দরী মেয়েকে শেরশাহের সৈন্যরা বন্দি করে শেরশাহের নিকট হাজির করে। শের আফগান মেয়েটিকে শত্রু হুমায়ুনের শিবিরে পাঠানোর হুকুম দেন। কারণ তিনি যদি এমন সুন্দরী কুমারী মেয়েকে তাঁর সঙ্গে রাখেন তবে তিনি নিজেকে বিপদগামী করা ছাড়া আর কিছু করবেন না এবং তার ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, যখন মেয়েটিকে হুমায়ুনের কাছে নেওয়া হলো তখন তিনি তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েন এবং তার ফলে তিনি তাঁর সিংহাসন হারান।[৭২৩] গল্পটি যদি সত্য হয় তবে একটি বিষয় নিশ্চিত যে, প্রথম দুইজন মোঘল সম্রাট নারী সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না।

৭২১. Ibid., P.262.

৭২২. 'বাবর নামা' (ইংরেজি অনুবাদ) পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠাগুলো ৩৬, ৬১।

৭২৩. ড. মূর ফোল্স কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-দাউদি' পৃষ্ঠাগুলো ১৯৭, ৭৫; আশরাফ খান রচিত 'হিন্দুস্তানে জনগণের জীবন ও পরিবেশ' পৃষ্ঠা ২৪১।

www.pathagar.com

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি ইব্রাহিম লোদীর সমগ্র হেরেমের দখল নিতে পারতেন। তার পরিবর্তে তিনি বন্দি মহিলাদেরকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজপুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দেন; এমনকি কয়েকজন নাচনেওয়ালি মেয়েকে পাঠিয়ে দেন কাবুলে তাঁর বেগমদের কাছে।[৭২৪] সাধারণত তিনি নিজেকে বৈধ চারজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

১. (ক) চারজন স্ত্রী

আমরা এখানে একজন মুসলমান কতজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে সেই সম্বন্ধে একটি কথা বলার জন্য আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকে একটু দূরে সরে আসব ; কারণ এই প্রশ্নটি একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং তা ছিল মোঘল আমলের সম্রাট, পরিষদবর্গ ও উলেমাদের মধ্যে একটা আলোচনার বিষয়। 'মুসলমানরা কোরান ও প্রচলিত ঐতিহ্য দ্বারা চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত।'[৭২৫] এই চার সংখ্যাটি ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং অল্প গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো : 'একজন স্ত্রী থাকলে সে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে, দুইজন স্ত্রী থাকলে তারা নিশ্চয়ই তোমাকে তাদের কলহে জড়াবে। যখন তোমার তিনজন স্ত্রী থাকবে তখন যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাস তার বিরুদ্ধে দল পাকানো শুরু হবে। কিন্তু চারজন স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে সমাজ ও তারা পরস্পরকে নিয়ে মগ্ন থাকবে এবং তখন স্বামী থাকবে শান্তিতে।'[৭২৬] খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোকা তাঁর ব্যাখ্যাতে বলেন, ' একজন ব্যক্তির চারজন স্ত্রীকে বিবাহ করা উচিত : গল্প করার জন্য একজন পারস্য দেশীয়কে, গৃহকর্মের জন্য একজন খোরাসানি মহিলাকে, ছেলেমেয়েদের পরিচর্যার জন্য একজন হিন্দু মহিলাকে, অন্য তিনজনকে চাবুক মেরে সাবধান করার জন্য মেওয়ার-উন-নাহার বা ট্রান্স অক্সিয়ানা থেকে একজন মহিলাকে।'[৭২৭] তৃতীয় ব্যাখ্যাটি প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব-বিজ্ঞানভিত্তিক। একজন মহিলা বিবাহের পর তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী হবে বলে আশা করা হয়। যেহেতু একজন গর্ভবতী মহিলার সহবাস করা স্বাস্থ্যসম্মত নয় সেহেতু পরবর্তী তিন মাস সেবা করার জন্য

---

৭২৪. 'বাবর নামা' (ইংরেজি অনুবাদ) পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠাগুলো-৬৩৩-৩৪।

৭২৫. জাফর শরীফের 'কানুন-ই-ইসলাম' ভারতে ইসলাম পুনস্থাপন, উইলিয়াম ক্রুকের কোরআনের উদ্ধৃতি তৃতীয়, চতুর্থ সংস্করণ।

৭২৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৮৫-৮৬, পরিদর্শন বর্তনের উদ্ধৃতি, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩৪

৭২৭. 'আইন-ই-আকবরি', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৬।

www.pathagar.com

প্রয়োজন একজন দ্বিতীয় স্ত্রী। তৃতীয় স্ত্রী তার তিন মাস সময়ে প্রথম মহিলার গর্ভধারণের নয় মাস সময়কে সম্পূর্ণ করবে। চতুর্থ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হবে যখন প্রথম স্ত্রীর সন্তান প্রসব সম্পন্ন হবে এবং তিন মাস বিশ্রাম লাভ করবে ও তারপরে আবার যৌন সুখের জন্য উপযুক্ত হবে। তাই তিনজন বা পাঁচজন নয়, দরকার চারজন স্ত্রী। যখন পঞ্চম স্ত্রীর জন্য আকাঙ্ক্ষা হবে তখন চারজন স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনকে তালাক দেওয়া যেতে পারে।

কারণ চারজন স্ত্রীই অব্যাহত যৌন সুখের জন্য যথেষ্ট। এটাকে আইনগত ও প্রথাগত অবস্থা বলে বিবেচনা করা হয়। আকবরের রাজত্বকালে তাঁর বিপুলসংখ্যক মহিলা এমনকি বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের জন্যও বিরক্তিকর প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়।[৭২৮] ইবাদতখানাতে এই বিতর্কিত বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। আকবর সমস্যাটি উলেমাদের কাছে তুলে ধরেন। সদর-উস-সুদুর অর্থাৎ ধর্মীয় বিভাগের প্রধান শেখ আব্দুন নবীকে এ বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। আকবর তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন যে, শেখ সাহেব একদা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে বলেন যে, এমনকি চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা অনুমোদিত। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি চাতুরিপূর্ণ জবাব দেন। এটা সম্রাটকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি বলেন, 'তিনি আগে যা বলেছিলেন এখন তা থেকে ভিন্ন ধরনের কথা বলছেন।' তিনি এটা কখনো ভুলে যাননি।[৭২৯] উলেমাদের সম্বন্ধে আকবরের নীরস মতামত ও তাঁদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মূলে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ছিল এ ধরনের দ্বৈত আলোচনা ও দ্বিমুখী চিন্তাধারা। মোঘল শাসকদের কাছে এক বিবাহ ছিল অপ্রাসঙ্গিক; জাহাঙ্গীর এক বিবাহের সমর্থনকারী খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের সাথে একমত হতে পারেননি।[৭৩০] এমনকি আকবরের আমলেও প্রশ্নটি নিয়ে বিতর্ক হয় প্রচণ্ডভাবে।

ইবাদতখানাতে জনসাধারণের যে মতৈক্য হয় তা হল একজন ব্যক্তি মুতা বা অস্থায়ী বিবাহ দ্বারা যেকোনো সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নিকাহর মাধ্যমে বিবাহ করতে পারে মাত্র চারজন স্ত্রীকে।[৭৩১] বাস্তবিক ক্ষেত্রে বিশেষত রাজা ও সম্ভ্রান্তদের জন্য উপপত্নী গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না। কারণ রাজা

---

৭২৮. Ibid.. পৃষ্ঠা ৪৫.

৭২৯. Ibid.. পৃষ্ঠা ১৮২. বাদাউনি দ্বিতীয় খণ্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্লকম্যানের মতামত. পৃষ্ঠা ২০৭।

৭৩০. পাইনী কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীর ও ধর্মযাজকগণ', পৃষ্ঠাগুলো ৬৯.৬৯.

৭৩১. 'আইন-ই-আকবরি', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১৮২-৮৩: বাদাউনি দ্বিতীয় খণ্ড. পৃষ্ঠাগুলো ২০৭-১০.

www.pathagar.com

ছিলেন নিজেই নিজের আইনস্বরূপ।[৭৩২] তা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত বহু বিবাহ প্রথাকে এড়িয়ে বাবর ও হুমায়ুন উভয়েই তাদের উত্তরাধিকারী আকবরকে সীমিত হেরেমের ধারণা দিয়ে যান।

১. (খ) বাবর ও হুমায়ুনের উইলপত্র

আরো দুটি ঐতিহ্যগত বিষয় প্রথম দুইজন মোঘল সম্রাট দিয়ে যান আকবরকে। তন্মধ্যে একটি হলো মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্য প্রবীণ মহিলাদের প্রতি সম্মান। বাবর কত গভীরভাবে আইসান দৌলত বেগম, কুতলুখ নিগার বেগম ও খানজাদা বেগম, তাঁর পিতামহী, মা ও বড় বোনকে ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁরা সর্বদা কীভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াতেন এবং কীভাবে তাঁর স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিষয়ে দেখাশোনা করতেন এই সুবিদিত বিষয়টি পুনরায় উল্লেখযোগ্য।

বৃদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্বন্ধে বেভারিজ লিখেছেন, 'প্রায়ই উল্লেখিত চাচি-ফুপুদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় যে, বাবর ও হায়দার উভয়েই এই মতামত প্রদান করেন যে,[৭৩৩] বৃদ্ধ মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা করা তাঁদের সময়ের বা রীতিনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ছিল।'[৭৩৪] দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, হিন্দুস্তানে বাবরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে তিনি তাঁর ফুপু-চাচি-খালা, বেগম ও খানমদেরকে আমন্ত্রণ জানান কাবুল থেকে আগ্রাতে আসতে। তাঁরা ৯৬ জন আগ্রাতে পৌঁছলে সকলেই পরম তৃপ্তিতে লাভ করেন বাড়িঘর, জমি ও উপহার।[৭৩৫] এছাড়া সম্রাট তাঁর স্থপতি খাজা কাসিমকে এই আদেশ দেন যে, 'আমাদের ফুপু-খালা-চাচিদের দ্বারা আদিষ্ট তাঁদের প্রাসাদের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য কাজ বড় পরিমাণের হলেও তা গুরুত্বসহকারে শক্তি ও সাধ্যমতো বাস্তবায়িত করবেন।'[৭৩৬] মির্জা হায়দার দৌলত ১৫০৬-০৭ খ্রিষ্টাব্দে কাবুলে বাবর ও তাঁর মায়ের বড় বোন অর্থাৎ খালাম্মা মেহের নিগার খানমের মধ্যে সাক্ষাৎকারের একটি চমকপ্রদ বিবরণ দিয়ে বলেন, 'সম্রাট লাফিয়ে উঠে

৭৩২. ভ্রমণ আরম্ভের পূর্বেই টেরি, পৃষ্ঠা ৩২৬.

৭৩৩. 'তারিখ-ই-রাশিদি'র লেখক মীর্জা হাইদার দাখলাত।

৭৩৪. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা'র ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২০.

৭৩৫. Ibid., মূল পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১৪; অনুবাদ পৃষ্ঠা ২৭., অনেক নামের তালিকা, পৃষ্ঠাগুলো ২০৩, ২৯৭

৭৩৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৯৭., ৯৮.

www.pathagar.com

তাঁর স্নেহময়ী খালাম্মাকে সকল প্রকার প্রীতির বহিঃপ্রকাশের মধ্যে আলিঙ্গন করলেন।[৭৩৭] তারপরে এলেন বোনেরা।

হুমায়ুননামাতে যখন হেরেম সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে তখনই বোনদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।[৭৩৮] যখন হুমায়ুনকে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দেখা যায় জনশ্রুতি অনুসারে বাবর তাঁকে বাঁচাবার জন্য তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তখন তিনি (হুমায়ুন) সবচেয়ে বেশি স্মরণ করেন তাঁর বোনদেরকে। গুলবদন লিখেছেন, 'যখনই তিনি জ্ঞান ফিরে পান তখনই তাঁর মুক্তাবর্ষণকারী জিহ্বার সাহায্যে তিনি আমাদেরকে দেখতে চেয়েছেন এবং বলেছেন 'ভগিনীরা স্বাগতম! এসো আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।' সম্ভবত তিনি তিনবার মাথা তুলেছেন এবং তাঁর রত্নবর্ষণকারী জিহ্বা থেকে এই আবেগপূর্ণ শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছে।[৭৩৯] রাজকীয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতিও ছিল একই রকমের প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ। এরূপ স্নেহ ছিল পারস্পরিক। সম্রাট হুমায়ুনের স্ত্রী বিগা বেগমকে হাজি বেগমও বলা হতো। তিনি তাঁর প্রতি এতো অনুরাগী ছিলেন যে তাঁর সামান্যতম অবহেলাতেও তিনি অভিমান করতেন।[৭৪০] তাঁর মৃত্যুতে তিনি দিল্লিতে তাঁর স্বামীর কবরে বিখ্যাত হুমায়ুন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন এবং তিনি ইহার বিশ্বস্ত খাদেমা হয়ে যান।[৭৪১] বাবরের স্ত্রী দিলদার বেগম, শাহজাদি গুলবদন, গুলরুখ, গুলচেরা ও শাহজাদা হিন্দালের মা ছিলেন একজন শান্ত ও দায়ীত্ববান মহিলা এবং শুধু তাঁর কন্যা গুলবদনই নয়, বরং অন্য ঐতিহাসিকরাও তাঁর কথা সম্মানের সাথে আলোচনা করতেন,[৭৪২] পক্ষান্তরে তাঁর (বাবরের) প্রধান পত্নী ও হুমায়ুনের মা মাহাম বেগম তাঁর মর্যাদার জন্য পুরোপুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন।[৭৪৩] প্রথম দুইজন মোঘল সম্রাটের হেরেমের মধ্যে পর্দা সম্বন্ধে কোনো বাধা বা অর্থহীন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অ্যানেট বেভারিজ লিখেছেন, 'এটা সম্ভবত মনে হয় যে, তুর্কি মহিলারা বহির্জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। হয়তো মহিলারা

---

৭৩৭. Ibid., মহিলাদের নামের তালিকা, পৃষ্ঠাগুলো ২৬৪-৬৫.

৭৩৮. Ibid., ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৭, অনুবাদ পৃষ্ঠা ৯৫, আরো পৃষ্ঠাগুলো ১০২, ১৩০,১১০, ১৮৭, ১৯৭.

৭৩৯. Ibid., পৃষ্ঠা ১০৪.

৭৪০. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৪৮, ৪৯.

৭৪১. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো, ২১৮, ২২০.

৭৪২. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ২২৫, ২২৬.

৭৪৩. Ibid., পৃষ্ঠা ২২৫; অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলো ২৫৬, ২৫৮.

www.pathagar.com

ঘোমটা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু প্রায়ই তাঁরা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করেছেন।[৭৪৪] বাবরের প্রবীণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা কাবুল হেরেমের বাসিন্দাদেরকে হিন্দুস্তান সম্বন্ধে আকর্ষণীয় গল্প শোনাতেন।[৭৪৫] আমরা গুলবদন বেগমের কাছ থেকে জানতে পাই যে, হুমায়ুনের হেরেমের রাজকীয় মহিলারা তাঁদের পুরুষ বন্ধু ও আগন্তুকদের সাথে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে পুরুষের পোশাক পরিধান করে বাইরে যেতেন, পোলো খেলতেন ও সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করতেন।

তাঁরা বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারেও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁরা সকলেই বিবাহ করতেন এবং কেউ কেউ তালাকের পর আবার বিবাহ করতেন। বাবরের প্রথম স্ত্রী আয়েশা সুলতান বেগম বিবাহের তিন বছর পরেই তাঁকে ছেড়ে চলে যান।[৭৪৬] বাবরের বোন খানজাদা বেগমের কমপক্ষে তিনবার বিয়ে হয়।[৭৪৭] তাঁকে ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সায়বাণী খানের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। আর যখন সায়বাণী তাঁকে তালাক দেন তখন বাবর তাঁকে সাঈদ হুদা নামক একজন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে ১৫১১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয় মেহেদি খাজার সাথে।[৭৪৮] ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে সায়বাণীর সাথে তাঁকে বলপূর্বক বিবাহ দেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর এবং মিসেস বেভারিজ মনে করেন যে, তাঁকে আগে নিশ্চয়ই বিবাহ দেওয়া হয়েছিল।[৭৪৯] অনুরূপভাবে নিজাম উদ্দিন খলিফার কন্যা গুলবার্গ বেগম প্রথমে মিরশাহ হোসেন অর্জুনকে বিবাহ করেন। ১৫২৪ খ্রিষ্টাব্দে ও বিচ্ছেদের পর তিনি ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে সম্রাট হুমায়ুনকে বিবাহ করেন।[৭৫০]

তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা প্রথম পর্যায়ের মোঘল মহিলাদেরকে দিয়েছিল অধিকতর আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মাবোধ।[৭৫১] তাঁর ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দৃঢ়সংকল্প প্রকাশের কৃতিত্বপূর্ণ প্রবল প্রাণশক্তি সম্পন্ন মহিলাতে পরিণত হন। সম্রাট হুমায়ুনের সাথে হামিদা

---

৭৪৪. Ibid., বেভারিজের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৭: অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলো ৩১, ৩২.
৭৪৫. Loc. cit.
৭৪৬. 'বাবরনামা', পৃষ্ঠাগুলো ৩৫, ৩৬, ১২০: গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা'র মহিলাদের নামের তালিকা, পৃষ্ঠা ২০৯.
৭৪৭. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১৭, ১৮.
৭৪৮. Ibid., পৃষ্ঠা ৩৫২.
৭৪৯. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা'য় মহিলাদের নামের তালিকা, পৃষ্ঠা ২৫০.
৭৫০. Ibid., পৃষ্ঠা ২৩০.
৭৫১. আশরাফ, op. cit., পৃষ্ঠা ২৪৩.

www.pathagar.com

বানু বেগমের বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে একজন মোঘল মহিলা ইচ্ছা করলে কতটা স্বাধীন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে পারেন। মীর বাবা দোস্ত নামেও পরিচিত আলী[৭৫২] আকবরের কন্যা যখন মির্জা হিন্দালের শিবিরে ছিলেন তখন হুমায়ুনের দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপরে এবং হুমায়ুন গভীরভাবে নিমগ্ন হন তাঁর প্রেমে।

যখন হুমায়ুন তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন তখন তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। হুমায়ুন বারবার তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান কিন্তু তিনি কড়া জবাব দেন যে, সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করা আইনসংগত; কিন্তু দ্বিতীয়বারে সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ। আমি আসব না।[৭৫৩] তাঁকে একরোখা প্রকৃতির মহিলা হিসেবে দেখতে পেয়ে হুমায়ুন হামিদা বানুকে রাজি করানোর জন্য অনুরোধ করেন তাঁর বিমাতা দিলদার বেগমকে। দিলদার বেগম তাঁকে এভাবে উপদেশ দেন, 'মোট কথা, তুমি তো একজনকে বিয়ে করবে। সম্রাটের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে?' হামিদা বানু উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তো একজনকে বিয়ে করব বটে; কিন্তু তিনি হবেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর গলাবন্ধনীকে আমার হাত স্পর্শ করতে পারে এবং এমন কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করব না যাঁর জামার প্রান্তদেশ পর্যন্ত আমার হাত পৌছবে না।'[৭৫৪] তিনি দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ সম্রাটের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশেষে চল্লিশ দিন ধরে আলোচনা ও উদ্বুদ্ধকরণের পরে হুমায়ুন তাঁকে বিবাহ করতে সমর্থ হলেন যাঁকে তিনি খুব গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন।

২. আকবর কর্তৃক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত

আকবর তাঁর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য সকল বিষয়ে না হলেও অনেক বিষয়ে অনুসরণ করেন। পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহের ব্যাপারে আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা তথা বাবর ও হুমায়ুনের রীতিনীতি অব্যাহত রাখেন। সম্রাটের মা ছিলেন একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি।

---

৭৫২. ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ শে সেপ্টেম্বরে হামিদা বানু বেগমের হুকুমে আলী আকবরকে তিনি তার পিতা হিসেবে নাম উল্লেখ করেন কিন্তু গুলবদন বেগম, আবুল ফজল এবং গওহার তা উল্লেখ করেননি এস.এ তীরমিজির 'মোঘল হেরেম' থেকে তুলে ধরা হয়েছে, পৃষ্ঠা ২২, অন্যান্য পৃষ্ঠা ৪-১০

৭৫৩. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা', পৃষ্ঠাগুলো ১৫০, ১৫১.

৭৫৪. Ibid., পৃষ্ঠা ১৫১.

www.pathagar.com

এমনকি তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রধান পত্নী অপেক্ষা বেশি সম্মানিত।[৭৫৫] আসলে মোঘল আমলে সম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় মহিলা ছিলেন না (নূরজাহান ও মমতাজ মহলের প্রসঙ্গ বাদে); সম্রাটের মাতা ও ভগ্নি ছিলেন সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় মহিলা।[৭৫৬] আকবরের প্রধান পত্নী সুলতান সেলিমা বেগম সম্রাটের পরিবারে বিপুল প্রভাবযুক্ত পদমর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন এবং আকবরের মাতা মরিয়ম মাকানিও একই রকম পদমর্যাদার অধিকারিণী। এই দুইজন মহিলাকেই আকবর ও জাহাঙ্গীর অত্যন্ত সম্মান করতেন।[৭৫৭] করয়াট লিখেছেন যে, একদা যখন আকবরের মাকে পালকিতে করে লাহোর থেকে আগ্রাতে নেওয়া হয় তখন মায়ের সাথে ভ্রমণরত সম্রাট পালকিটি নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে এভাবে পালকিটি বহনের আদেশ দেন এবং এভাবে তাঁকে বহন করে নেওয়া হয় নদীর এপার থেকে ওপারে।[৭৫৮] যখন মরিয়ম মাকানি বাইরে থেকে ভ্রমণ করে প্রাসাদে এসে পৌঁছতেন তখন আকবর নগর থেকে বাইরে যেতেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে।[৭৫৯] জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে অনেক জায়গাতে আবেগপূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর মা মরিয়ম-উজ-জামানি সম্বন্ধে।[৭৬০]

তাঁর বাসভবনেই চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষ অনুসারে সম্রাটের ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো এবং রাজকুমারদের বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো।[৭৬১] হকিন্স আরো বলেন যে, তাঁর প্রাসাদে নওরোজ উৎসবের সময় অনেক খেলাধুলা ও বিনোদনের পরে সম্রাট তাঁর উৎকৃষ্টতর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁর মায়ের বাসভবনে এবং প্রত্যেকেই তাঁর ভূ-সম্পত্তি অনুসারে তাঁর মাকে উপহার দিতেন একটি করে রত্ন।[৭৬২] পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবাকার্য সাধারণভাবে অনুশীলন ও বিশ্বজনীনভাবে প্রচার করা হতো।[৭৬৩]

---

৭৫৫. ড. স্মিথ কর্তৃক রচিত 'বিখ্যাত মোঘল আকবর', পৃষ্ঠা ৮৯.

৭৫৬. যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 'আওরঙ্গজেবের ইতিহাস', তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৭.

৭৫৭. ড. স্মিথ কর্তৃক রচিত op. cit., পৃষ্ঠাগুলো ৪২, ২২৪, ২২৫.

৭৫৮. ভ্রমণ আরম্ভের পূর্বেই করয়াট, পৃষ্ঠা- ২৭৮.

৭৫৯. 'আকবরনামা' তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৮.

৭৬০. তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৭৬, ৭৮, ১৪৫, ৪০১; তুযুক ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৬৪, ৬৮, ২০২.

৭৬১. Ibid., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১, ১৪৫.

৭৬২. ভ্রমণের শুরুতে, হাউকিন্স, পৃষ্ঠা-১১৮.

৭৬৩. বদাউনি কর্তৃক সম্পাদিত 'নিজাত-উল-রশীদ', পৃষ্ঠা-৩৪.

www.pathagar.com

বহুবিবাহভিত্তিক মোঘল পরিবারে প্রকৃত মা ছাড়াও কয়েকজন পালকমাতা থাকতেন। হুমায়ুনের ভাগ্যের উত্থান-পতনের জন্য আকবরকে শৈশবে তাঁর মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং তাঁর ফলে তিনি অন্য অনেক মহিলার স্তন্য পান করেন। এই সেবিকা বা পালক মাতারা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের নারী এবং তাঁদেরকে ডাকা হতো আনাগা বলে। তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজন হলেন হুমায়ুনের উপপত্নী দয়া ভাওয়াল বা ভাওয়াল আনাগা,[৭৬৪] নাদিম কোকার স্ত্রী ফকির-উন-নিসা, শামসুদ্দিনের স্ত্রী জি জি আনাগা, তোগ বেগির স্ত্রী কোকি আনাগা, বিবি রূপা, খিলদার (অর্থাৎ তিল দ্বারা চিহ্নিত) আনাগা, সাদত ইয়ার কোকার মা পিজাজান আনাগা, জৈন খান কোকার মা, হাকিমা নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাহাম আনাগা।[৭৬৫] আকবরের রাজত্বকালের প্রথম পর্যায়ে মাহাম আনাগার দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল তাঁর হেরেম। তিনি ছিলেন ওয়ালিদা বা মাতারূপিনী[৭৬৬] এবং তিনি নবীন সম্রাটের ওপর ব্যাপক প্রভাব খাটাতেন।[৭৬৭] শুধু আনাগারা নন এমনকি কোকা নামে পরিচিত তাঁর পুত্রগণ ও আতকাস নামে পরিচিত তাঁদের পতিগণ[৭৬৮] রাজপ্রাসাদ ও রাজদরবারে ভিড় জমান এবং তাঁদের পদমর্যাদা থেকে অনুচিত সুবিধা পেতে চেষ্টা করেন। মাহাম আনাগার পুত্র আদম খান আকবরের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেন। পালকমাতারাও মাঝে মাঝে তাঁদের ঈর্ষা ও বিরুদ্ধাচরণবশত প্রাসাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতেন।[৭৬৯]

তথাপি সকল সম্রাট আনাগাদেরকে সম্মান করতেন নিজের মায়ের মতো।[৭৭০] অনুরূপভাবে মোঘলরা তাঁদের বোনদেরকে ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর বোনদের সম্বন্ধে আবেগপূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বোন শুকুরুন্নেছা বেগমের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল মায়ের জন্য শিশুর অনুভূতির সমতুল্য।[৭৭১] তাঁর স্মৃতিকথায় প্রকাশ পেয়েছে হেরেমের অন্য সম্ভ্রান্ত

---

৭৬৪. 'আকবরনামা', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১০৯,১১০.

৭৬৫. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ১৩০, ১৩১.

৭৬৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ১৮৩, ২৩০: এনএনল কর্তৃক অনুবাদ, বাদাউনি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯.

৭৬৭. শাহ নেওয়াজ খানের সম্পাদনা 'মাসির-উল-ওমরাহ' পৃষ্ঠাগুলো-১৪৫, ১৬৬: 'আকবরনামা' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩০.

৭৬৮. হিন্দু শাহের অনুবাদ 'তারিখ-ই-ফেরেস্তায়' আতকাসের ব্যাখ্যা উপকারী ফেরেস্তায় সুন্দরীদের ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২১১.

৭৬৯. 'আকবরনামা' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৮৪-৮৫.

৭৭০. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৮৫, ৩০৭.

৭৭১. Ibid., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬.

www.pathagar.com

মহিলাদের তুলনায় তাঁর বোনদের প্রতি অগ্রাধিকারমূলক মর্যাদা।[৭৭২] এমনকি সন্দেহপ্রবণ আওরঙ্গজেব তাঁর বড় বোন জাহানারাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, যদিও জাহানারা তাঁর প্রিয় ভাই দারাশিকোর প্রতি সর্বদা পক্ষপাতী ছিলেন।

২ (ক) আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের হেরেম

হেরেমের আয়তন ও সংগঠনের ব্যাপারে আকবর তাঁর পিতা ও পিতামহের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখেননি। তার পরিবর্তে তিনি দিল্লির পূর্ববর্তী সুলতানদেরকে অনুসরণ করেন। সুলতানি আমলে এ রকম বিশ্বাস ছিল যে, হেরেমের আয়তন নির্ধারণ করে শাসকের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব। কাজী মুগিস উদ্দিন সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) উপদেশ দিয়েছিলেন যে, হেরেমের খরচ দশগুণ বৃদ্ধি করতে হবে কারণ একটি বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ হেরেম জনসাধারণের মনে সম্রাটের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করবে ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করবে।[৭৭৩] এ ধরনের ধারণা সম্রাটকে প্রায় বাধ্য করত তাঁর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বা প্রতিবেশী স্বাধীন শাসনকর্তাদের তুলনায় বৃহত্তম হেরেম নির্মাণে। দিল্লির সুলতানদের ছিল সংশ্লিষ্ট পদার্থ ও আসবাবপত্র সমেত বিশাল অন্দর মহল। এমনকি খান-ই-জাহান মকবুলের মতো একজন উজির গর্ব করতে পারতেন তাঁর হেরেমের দুই হাজার মহিলাকে নিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে মালওয়ার সুলতান গিয়াস উদ্দিনের ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (১৪৬৯-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)। গিয়াস উদ্দিন হেরেমের ব্যবস্থাপনায় তাঁর নিজের জন্য প্রধান আনন্দ পেতেন এবং হেরেমকে ক্ষুদ্রাকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি রাজ্য হিসেবে সংগঠিত করতে ছিল তাঁর আনন্দ। এর সেনাবাহিনীতে থাকত প্রত্যেকটিতে ৫০০ জন করে দুই দল পুরুষভাবাপন্ন নারী– একটি আফ্রিকার এবং অন্যটি তুর্কিস্তানের ক্রীতদাসীদের নিয়ে গঠিত। তাদেরকে জনসমাগমে শ্রোতাদের সামনে সিংহাসনের পাশে আনা হতো। এ ছাড়াও হেরেমে ১৬০০ জন মহিলা থাকত এবং তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো বিভিন্ন শিল্পকলা ও বৃত্তিমূলক কাজ এবং তাদেরকে সংগঠিত করা হতো বিভিন্ন বিভাগে। এ ছাড়াও হেরেমে ছিল সংগীতজ্ঞ, গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী। এসব মহিলাকে অনেক কষ্টে ও অনেক খরচে নিয়োগ করা হতো ভারতের সকল অঞ্চল থেকে। কোনো বৃদ্ধ বা

---

৭৭২. Ibid., ১ম খণ্ড, দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃষ্ঠা-১৩০.

৭৭৩. জিয়াউদ্দিন বারানি কর্তৃক সম্পাদনা 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' মূল বই ফার্সি ভাষায়, পৃষ্ঠা-২৯৪.

www.pathagar.com

কুৎসিত মহিলা কখনো রাজার সামনে উপস্থিত হতো না। সুলতান নিজেই অত্যন্ত যত্নসহকারে সূক্ষ্ম পরিচালনায় সকলের বেতন ও ভাতা নিয়ন্ত্রণ এবং ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করতেন। যখন এ ধরনের দায়িত্ব ও কাজে নিয়োজিত থাকতেন না তখন তিনি তাঁর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করতেন, যা একজন ভক্তিপরায়ণ মুসলমানের জীবনের সাথে জড়িত।[৭৭৪] তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন তাঁর চেয়ে এদিক থেকে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন না।

এভাবে মোঘল শাসনের পূর্ববর্তী হিন্দুস্তানে হেরেমের বিশালত্ব ছিল কালের বৈশিষ্ট্য এবং সম্রাট আকবর ছিলেন এই রীতির অনুসারী। আকবরের আমলে ও তারপরে মোঘল হেরেমের বিশালত্বের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের অবদান রয়েছে। আকবর ছিলেন ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট। তিনি ছিলেন অতুলনীয়, তিনি ছিলেন মহাবলবান। তিনি বেশকিছু সামরিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন যা তাঁর জীবনব্যাপী এমনকি তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলেও স্থায়ী ছিল। প্রত্যেকটি সমর অভিযানের শেষে মোঘল সম্রাট বা যুবরাজ ও পরাজিত শাসক পরিবারের কন্যার মধ্যে একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং নব পরিণীতা বধূ ও তাঁর পরিচারিকাগণ রাজকীয় অন্দর মহলে নিয়ে আসে বিপুলসংখ্যক হেরেমবাসী।

বিশেষত রাজপুত বংশীয় রাজকুমারীরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন শত শত দাসী ও নাচনেওয়ালি মেয়ে।[৭৭৫] যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত শত্রুর যুবতী মহিলাদেরকে নিয়ে আসা হতো সম্রাট ও অভিজাতদের হেরেমে। এসব হেরেমের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হতো বিপুলসংখ্যক নপুংসক। এই উদ্দেশ্যে শত শত ব্যক্তিকে খোজা বানানো হয় এবং তাঁদের স্ত্রীদেরকে প্রত্যেক পদমর্যাদার সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় ব্যক্তির অন্দর মহলে নেওয়া হয়। মধ্যযুগে অঙ্গহানিকরণ ও খোজাকরণ ছিল যুদ্ধ ও শান্তিকালে পুরুষ ব্যক্তিদেরকে শাস্তিদানের সাধারণ উপায় এবং তাদের সুন্দরী স্ত্রীদেরকে অভিজাত ব্যক্তিদের হেরেমে সংযোজন করা হতো। এছাড়া ভারত ও বিদেশি দাস-দাসীর বাজারে ক্রয় করা হতো রুপালি দেহের কস্তুরী গন্ধযুক্ত কেশের অধিকারিণী অবিবাহিত তরুণীদেরকে।

---

৭৭৪. ভারতীয় ইতিহাস সংঘ', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬২; হিন্দু শাহীর লেখা বই মূল ফার্সি ভাষায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৫.

৭৭৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চিঠিপত্র বিভাগ কলাম ১৯২৭, পৃষ্ঠা-২ ও ৩; হিন্দুস্তানের জনসাধারণের জীবন ও পরিবেশ, পৃষ্ঠা-২৫৩n.

www.pathagar.com

এটা বিভিন্ন দেশ ও জাতির বাছাইকৃত সুন্দরীদের দ্বারা হেরেম পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করত; এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলারা পেত প্রাধান্য। তারা সৌন্দর্য, কমনীয়তা ও নারীসুলভ গুণাবলির জন্য ছিল পরিচিত। আমির খসরুর সময় থেকে মধ্যযুগীয় ভারতের অনেক কবি প্রশংসা করেছেন তাঁদের রূপ ও মোহনীয়তার। ইউরোপীয়রাও তাদের প্রশংসা করেছেন। অন্য আরো অনেকের সাথে ওরমি (orme) দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, অন্যান্য অধিকাংশ দেশের তুলনায় বিশ্বপ্রকৃতি মনে হয় হিন্দুস্তানের মেয়েদেরকে অধিকতর মুক্ত হস্তে দান করেছে রূপ ও সৌন্দর্য।[৭৭৬] তাদের বিশ্বস্ততা ও অনুরাগ ছিল তাদের সৌন্দর্যের সমতুল্য।[৭৭৭] হেরেমে এসব বশমানা প্রাণীরা ছিল সম্পদস্বরূপ এবং আরো বেশি সংখ্যায় তাদের আগমনকে স্বাগত জানানো হতো সবসময়। মোঘল হেরেমে ছিল শুধু প্রবেশপথ, কোনো বহির্গমন পথ ছিল না। তাই আকবর ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের হেরেম হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বিশাল।

২. (খ) আকবরের স্ত্রীদের সংখ্যা

হেনরি ব্লকম্যান আকবরের মাত্র সাতজন পত্নীর নাম উল্লেখ করেছেন।[৭৭৮] এর কারণ হলো অধিকাংশ রানি বা রাজকুমারীর রাজনীতি, সমাজ ও হেরেমসংক্রান্ত বিষয়ে অবদান ছিল অতি সামান্য। গুণবতী মহিলারা বা খ্যাতি অর্জনকারী মহিলারা বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মহিলারাই শুধু ঐতিহাসিকদের লেখনীতে স্থান পেয়েছেন। আকবরের প্রথম স্ত্রী (জান-ই-কালান) সুলতানা রুকাইয়া বেগম ছিলেন মির্জা হিন্দালের কন্যা। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর নাতি শাহজাহানকে লালন-পালন করেছিলেন।[৭৭৯] শের আফগানের বিধবা পত্নী মেহের-উন-নিসা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে এবং জাহাঙ্গীর তাঁকে বিবাহ করার আগে রুকাইয়া বেগমের সাথে ছিলেন। রুকাইয়া বেগম পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ৮৪ বছর বয়সে।[৭৮০] আকবরের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন বৈরাম খানের বিধবা পত্নী সুলতান সেলিমা বেগম। তিনি ছিলেন

---

৭৭৬. উর্মীর অসম্পূর্ণ অংশ' পৃষ্ঠা-৪৩৮, পায়রার্দ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩২, ৩৮০.

৭৭৭. 'আকবরনামা', ইংরেজি অনুবাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭২, তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫০.

৭৭৮. 'আইন-ই-আকবরি', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩২১-৩২২.

৭৭৯. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮.

৭৮০. গুলবদন বেগম কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুন নামা', পৃষ্ঠাগুলো ২৭৪-২৭৫.

www.pathagar.com

গুলরুখ বেগমের কন্যা এবং বাবরের নাতনি[৭৮১] এবং তিনি ছিলেন আকবরের চেয়ে সম্ভবত কয়েক বছরের বড়। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং তিনি লিখতেন মাখফি ছদ্মনামে। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রশংসা করেছেন তাঁর স্বভাবজাত গুণাবলি ও কৃতিত্বের জন্য। তিনি একজন আকর্ষণীয় ও সংস্কৃতিমনা নারী হিসেবে নিজের সম্পর্কে রেখাপাত করেছেন মানুষের মনে।[৭৮২] আকবর আম্বরের রাজা ভীরমলের কন্যা হারকাকে বিবাহ করেন ১৫৬২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।[৭৮৩]

তিনি জাহাঙ্গীরের জননী এবং তাঁকে মরিয়ম-উজ-জামানি উপাধি দেওয়া হয়। আকবরের আদেশে যখন ওয়াসি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দেন তখন আকবর তাঁকে বিবাহ করেন।[৭৮৪] তিনি আব্দুল্লাহ খান মুবারকের কন্যা (১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও মীরন মুবারক শাহের কন্যাকেও (১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে) বিবাহ করেন। বিবি দৌলত শাদ ছিলেন তাঁর আর একজন স্ত্রী। ব্লকম্যানের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। বিকানীরের রাজা রায় কল্যাণ মলের ভাই হানকানের কন্যা,[৭৮৫] জয়সালমারের হারবায়ের কন্যা[৭৮৬] এবং মারোয়ারের রানা উদয় সিংয়ের বোন[৭৮৭] মারাঠা এবং ডংগারপুরের শাহজাদি দ্বয়[৭৮৮] এবং আরো অনেকের মতো স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করতে তিনি ব্যর্থ হন।[৭৮৯] আকবরের হেরেমটি ছিল আসলেই বিশাল এবং তাঁর ছিল অনেক স্ত্রী, সাত বা দশজনের বেশি।

২. (গ) জাহাঙ্গীরের সংখ্যা নির্ধারণে অভিমত

অনুরূপভাবে ব্লকম্যান উল্লেখ করেছেন জাহাঙ্গীরের কুড়িজন স্ত্রী সম্বন্ধে।[৭৯০] এক্সিভিয়ারও বর্ণনা করেছেন যে, ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাদা সেলিমের কুড়িজন বৈধ স্ত্রী ছিল।[৭৯১] কিন্তু অবশ্যই তাঁর আরো অনেক স্ত্রী ছিল।

---

৭৮১. 'আইন-ই-আকবরি', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২১.

৭৮২. বেভারিজ কর্তৃক গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা'র অনুবাদ, পৃষ্ঠাগুলো-২৭৬, ২৭৯, ২৮০.

৭৮৩. ভি. এস. ভারগাবা কর্তৃক সম্পাদিত 'মারোয়ার ও মোঘল সম্রাটেরা' পৃষ্ঠা-১৯৬: 'আইন-ই-আকবরি' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ২৪২,২৪৩. তার মহলের নাম ছিল ওয়ালী নিসাত বেগম। ভারতীয় ইতিহাস সংগ্রহশালা, ৮ম অধ্যায়, কলিকাতা, ১৯২৬, পৃষ্ঠা-১৬৮.

৭৮৪. মুন্তাখাব-উত-তারিখ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১.

৭৮৫. 'আকবরনামা' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৮.

৭৮৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-৫১৮-১৯; সিয়ামাল দাসের ভীরভিন্দ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৪.

৭৮৭. সিয়ামাল দাসের ভীরভিন্দ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৪; রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ও পুরাকীর্তি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬.

৭৮৮. মারওয়ার রি ফারগানা রিভিগাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৬৯-৭০.

৭৮৯. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২৭৪, ২৯৫.

৭৯০. 'আইন-ই-আকবরী', ১য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩২৩, ৫৩৩.

www.pathagar.com

ব্লকম্যানের হিসাবটি এ রকম–

১. রাজা ভগবান দাসের কন্যা মানবাঈ ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রথম স্ত্রী এবং ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে জাহাঙ্গীরের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়। তিনি হলেন শাহজাদা খশরুর জননী এবং শাহ বেগম খেতাব লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুব আবেগপ্রবণ এবং যখন খশরু জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন তিনি আত্মহত্যা করেন।[৭৯২]

২. বিকানীরের রয় রাই সিংয়ের কন্যা ও রায় কল্যাণ মলের নাতনির সাথে ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ হয় শাহজাদা সেলিমের ১৭ বছর বয়সে।[৭৯৩] তাঁর রাজপুত নামটি জানা যায়নি।

৩. একই বছরের জুন মাসে জাহাঙ্গীরের সাথে বিবাহ হয় জগৎ গোসাইন যোধবাঈ এর।[৭৯৪] মোতা রাজা উদয় সিংয়ের কন্যা ও মারওয়ারের রাজা মালদেবের নাতনি মানবাঈ বা মীরা বাঈয়ের। যোধবাঈ তাঁর বুদ্ধিমত্তা, মধুর কণ্ঠ ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন এবং জাহাঙ্গীর তাঁকে 'বিলকিস মাকানি' মরণোত্তর খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন শাহজাহানের মা।[৭৯৫] আমল-ই-সালেহ বর্ণনা করেছেন যে, শিশু সন্তানটির দায়িত্ব নেন আকবরের নিঃসন্তান স্ত্রী রুকাইয়া বেগম এবং শৈশবকালে তিনিই তাঁকে লালন-পালন করেন।

৪. কেশবদাস রাঠোরের কন্যা কারামসি ছিলেন জাহাঙ্গীরের আর একজন স্ত্রী।[৭৯৬]

---

৭৯১. ম্যাকলাগানের লিখা 'আকবরের দরবারে যাযকগণ', পৃষ্ঠা-৭৫.

৭৯২. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১৫, ৫৫, ৫৬. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৬৭৭-৭৭.

৭৯৩. 'আকবর নামা', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৭৪৮-৪৯; জাহাঙ্গীর তার আত্মজীবনীতে তার কথা উল্লেখ করেননি।

৭৯৪. যদুনাথ সরকার জয়পুরের ইতিহাসে মীরাবাঈ নামটি উল্লেখ করেন: পৃষ্ঠা-৪১; জাহাঙ্গীর ও আবুল ফজল তার সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত বর্ণনা দেন কিন্তু তার নামটি উল্লেখ করেননি; তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১৫, ৫৫, ৫৬; 'আকবরনামা' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৬৭৭-৭৮, ১২৩৯.

৭৯৫. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯; 'আকবরনামা' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৯; রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ও পুরাকীর্তি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩২; ভুলক্রমে বলা যে তিনি অম্বরের একজন শাহজাদার পুত্র ছিলেন।

৭৯৬. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ১৮, ১৯.

www.pathagar.com

৫. জয়েন খান কোকার অতি নিকট সম্পর্কের ভাই খাজা হাসানের সুন্দরী কন্যা সাহেব-ই-জামাল। জয়েন খান ছিলেন আকবরের অন্যতম ধাত্রী পিজা জান আনাগার পুত্র।[৭৯৭]

৬. এবং ৭ নং জাহান্দার ও শাহরিয়ার দুজনের মা ছিলেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

৮. বালুচিস্তান বা ছোট তিব্বতের শাসনকর্তা আলী রায়ের কন্যা।[৭৯৮]

৯. এবং ১০ নং অন্য দুইজন স্ত্রীর মধ্যে একজন হলেন রাজা মানসিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংয়ের কন্যা এবং জয় সালমার রাই কল্যাণ মলের ভাই রাওয়াল ভীমের কন্যা।

তাঁদের দু'জনের নাম জানা যায়নি, কিন্তু জাহাঙ্গীর দ্বিতীয় জনকে 'মালিকা-ই-জাহান' খেতাবে ভূষিত করেন।[৭৯৯]

১১-১৮ নং তাঁর অন্য পত্নীরা হলেন মোজাফফর হোসেনের বোন নূরুন্নেসা বেগম, কাসিম খানের কন্যা সালিহা বানু, কাশ্মীরের মুবারক চকের কন্যা, কাশ্মীরের হুসেন চকের কন্যা এবং খান্দেশের রাজার একজন কন্যা। অন্য কয়েকজন হলেন খাজা জাহান কাবুলির কন্যা, খিজির খান হাজরার পুত্র, মির্জা সঞ্জয়ের একজন কন্যা এবং দৌলত নিসার মা।

১৯-২০ নং ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর রামচন্দ্র বুন্দেলার কন্যা[৮০০] ও ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত রানি নূরজাহানকে বিবাহ করেন।

নূরজাহান এবং তাজমহলের সাথে জড়িত, শাহজাহানের রানি মমতাজ মহলের সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রানি ও শাহজাদির সম্বন্ধে যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাই জাহাঙ্গীর ও পরবর্তী মোঘল সম্রাটদের পত্নীদের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৩. স্ত্রীদের শ্রেণিকরণ

এই মোঘল সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদিরা তিনটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত– ১. স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণকারী পত্নীরা, ২. মধ্যম শ্রেণিভুক্ত পত্নীরা এবং ৩. উপপত্নীরা।

৩. (ক) প্রথম শ্রেণিভুক্ত পত্নীরা

প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সুলতান রুকাইয়া বেগম, সুলতান সেলিমা বেগম, নূরজাহান ও মমতাজ মহলের মতো রানিদেরকে।

---

৭৯৭. বেণী প্রসাদের জাহাঙ্গীরের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২৬.

৭৯৮. 'আকবর নামা' ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১১৭, ৬৪৭, ৯২১.

৭৯৯. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি (ইংরেজী অনুবাদ), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ১৪৪, ১৪৫, ৩২৫, ৩২৬.

৮০০. Ibid., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬০.

www.pathagar.com

(খ) মধ্যম শ্রেণির পত্নীরা ঃ মধ্যম শ্রেণির পত্নীরা হলেন সাধারণত ভারতীয় রাজাদের কন্যা বা আত্মীয়া যাঁরা যুদ্ধে তাঁদের পরাজয়, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মোঘল শাসনকর্তা বা শাহজাদাদের সাথে বিবাহ দেন তাঁদের কন্যা ও ভগিনীদেরকে। এ ধরনের সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে এ. বেভারিজ নিকৃষ্টতর স্ত্রী[৮০১] এবং যদুনাথ সরকার মধ্যম শ্রেণির স্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮০২] আকবর কর্তৃক সূচিত বিজয় প্রক্রিয়া ও যুদ্ধ জয়ের পরে বৈবাহিক মিত্রতার চুক্তি সম্পাদন আকবরের উত্তরাধিকারীরাও অব্যাহত রাখেন এবং কাশ্মীর থেকে গোলকুণ্ডা ও রাজস্থান থেকে আসাম পর্যন্ত রাজকুমারীদেরকে অর্জন করা হয় মোঘল হেরেমের জন্য।[৮০৩] সকল মুসলিম শাসনকর্তা ভারতীয় নারীদেরকে বিবাহ করেন, কিন্তু আকবরের সময়ে এটা পরিণত হয় কিছুটা সভ্য রাজনৈতিক কৌশলে।

আবুল ফজল লিখেছেন যে, 'সম্রাট এভাবে হিন্দুস্তানের ও অন্যান্য দেশের রাজকুমারীদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা ঐক্যবন্ধনের মাধ্যমে পার্থিব শান্তি অর্জন করেন।'[৮০৪] সম্ভবত এ ধরনের বিবাহ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় যখন অম্বরের রাজা বিহারীমল বা ভীরমল আকবরের কাছে তাঁর আনুগত্যের শপথ দেন এবং কয়েক বছর পরে তাঁর কন্যা হারকাকে সম্রাটের সাথে বিবাহ দিয়ে এই আনুগত্যকে আত্মীয়তার বন্ধনে জোরদার করেন।

কিন্তু যে উপায়ে ভারতীয় রাজকুমারীদের সাথে এসব বিবাহ সম্পন্ন হয় তা তাঁদেরকে হামিদা বানু বেগম বা মমতাজ মহলের মতো সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তুলনায় নিম্নতর মর্যাদা দিয়েছে। আকবর নামাতে বিহারী মলের কন্যার বিবাহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এভাবে :

রাজা বিবেচনা করলেন যে, রাজদরবারে তাঁকে একজন বিখ্যাত কবি হতে হবে। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের মৈত্রী বন্ধন স্থাপনের কথা ভাবলেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে গৌরবময় শিবিরে প্রবর্তন করার জন্য রাজা বিহারীমল তাঁর কন্যাকে এই আড্ডায় নিয়ে আসেন এবং তাঁকে হেরেমের সম্ভ্রান্ত নারীদের মধ্যে স্থান করে দেন।[৮০৫] অনুরূপভাবে

---

৮০১. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা'য় নারীদের জীবনী উল্লেখ, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা-২৬৩.

৮০২. যদুনাথ সরকার কর্তৃক লিখিত মোঘল সাম্রাজ্যের পতন, ৩য় সংস্করণ ১৯৬৪, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৪. নিম্ন শ্রেণির পত্নীদের দোলা বলা হতো। হারকতলের লেখা 'ভারতে ইসলাম' পৃষ্ঠা-৮৭.

৮০৩. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২৬৮-৬৯: 'আকবরনামা' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৫.

৮০৪. 'আইন-ই-আকবরি', পৃষ্ঠা-৪৫.

৮০৫. 'আকবর নামা', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২৪২-৪৩.

www.pathagar.com

বিকানীরের রায় কল্যাণ মল রাই সম্রাটের দরবারে যাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল তাঁদের মাধ্যমে নিবেদন করেন যে, তাঁর ইচ্ছা তাঁর ভাই কাহানের কন্যা যেন সম্রাটের হেরেমের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হন। খিদিব বা খতিব তাঁর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।[৮০৬] এছাড়া জয়সালমারের শাসনকর্তা রাওয়াল হার বাইয়ের এই অভিপ্রায় পোষণ করেছিলেন যে, তাঁর কন্যা যেন সম্রাটের দাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মর্যাদার অধিকারিণী হতে পারেন এবং সেই পুণবতী ও সৌভাগ্যবতী নারী মহিলাদের বাসভবনে প্রবেশের মাধ্যমে শাশ্বত গৌরব অর্জন করেন।[৮০৭] খান দেশের শাসনকর্তা মীরন মুবারক শাহ সম্রাট আকবরের হেরেমবাসীদের মাধ্যমে আরজি পেশ করেছিলেন যে, তাঁর বড় ইচ্ছা তাঁর কন্যা যেন সম্রাটের অন্দর মহলের নারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। মীরনের অনুরোধের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি তাঁর শুদ্ধাচারিণী কন্যাকে যথার্থ উপায়ে হেরেমে পাঠান।[৮০৮] জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় তাঁর ভাষা আরো স্পষ্ট, এমনকি একেবারে খোলামেলা। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের তিন বছর পরে তিনি লিখেছেন, 'আমি রাজা মানসিংয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংয়ের কন্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম।'[৮০৯] রাজা রামচন্দ্র বুন্দেলা পরাজিত ও বন্দি হন এবং পরে জাহাঙ্গীর তাকে মুক্তি দেন।[৮১০] পরে তাঁর পিতার অনুরোধে আমি রামচন্দ্র বান্ডেলার কন্যাকে আমার সেবার জন্য গ্রহণ করি (অর্থাৎ বিবাহ করি)।[৮১১]

এ ধরনের মধ্যম শ্রেণিভুক্ত পত্নীরা সেবার জন্য গৃহীত হয়েছেন বা মোঘল হেরেমে প্রবেশ করে গৌরব অর্জন করেছেন বলে সর্বদা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের ভাষারীতি রুকাইয়া বেগম, সেলিমা সুলতান বেগম, নূরজাহান বা মমতাজ মহলের বিবাহের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়নি। মধ্যম শ্রেণিভুক্ত পত্নীরা তাঁদের নিম্নতর মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কয়েকজন কুমারী কার্যত চেষ্টা করেন এ ধরনের বলপ্রয়োগমূলক বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, বিজাপুরের রাজকুমারী যুবরাজ দানিয়ালের সাথে তাঁর বিবাহে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁকে যখন প্রহরা দিয়ে বিয়ের জন্য আহম্মদ নগরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি এক ঝড়ের সময় তাঁর বান্ধবীদের সাথে

---

৮০৬. Ibid., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৮.
৮০৭. Ibid., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৫১৮-১৯.
৮০৮. Ibid., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৩৫১-৫২.
৮০৯. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪৪.
৮১০. Ibid., ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৮২, ৮৩, ৮৭..
৮১১. Ibid., পৃষ্ঠা-১৬০.

www.pathagar.com

পালিয়ে যান। কিন্তু তাঁকে ও তাঁর সহচারীকে আটক করে ফিরিয়ে আনা হয় এবং বিবাহটি সম্পন্ন করা হয়।[৮১২] যাহোক, রাজপুত রাজকুমারীদেরকে এই শ্রেণভুক্ত অধিকাংশ মহিলার চেয়ে বেশি ভালো স্থান করে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মরিয়ম-উজ-জামানি, শাহ বেগম ও মালিকা-ই-জাহানের মতো খেতাব লাভ করেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ এই যে, মোঘল হেরেমে রাজপুত মহিলাদের প্রবেশ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন যুগের প্রভাতের প্রতীক ; এর ফলে এই দেশে কতিপয় উল্লেখযোগ্য শাসনকর্তা পাওয়া গেছে। এর ফলে মধ্যযুগীয় ভারতে মোঘল সম্রাটদের শাসনে চার পুরুষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিকের সেবাকার্য পাওয়া গেছে।[৮১৩]

এছাড়া মোঘল হেরেমে রাজপুত বংশীয় রাজকুমারীদের উপস্থিতির ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং সেই সম্বন্ধে পরবর্তী একটি পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

৩. (গ) উপপত্নীরা

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মতো রাজকীয় হেরেমেও উপপত্নীদের মর্যাদা ছিল অসাধারণ। উপপত্নী পোষণের উৎস সন্ধানে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রথম পর্যায়ে ইসলামী আমলে যুদ্ধবন্দিদের মধ্য থেকে মহিলা ও শিশুগণকে খরিদ করে ও হঠাৎ আক্রমন করে দাসদেরকে সংগ্রহ করা হতো। মনিব ও দাসীর মধ্যে বিবাহ ছাড়া সহবাস ছিল অনুমোদনযোগ্য কিন্তু তাদের মধ্যে আইনসম্মত বিবাহ অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই ধরনের যৌনমিলনের ফলে জাত ছেলেমেয়েরা মনিবের মালিকানাধীন হতো এবং এভাবে তারা দাসত্ব মুক্ত হতো। কিন্তু উপপত্নীদের মর্যাদা শুধু সন্তানের জন্মদাত্রী পর্যন্ত উন্নীত হতো।[৮১৪]

এই প্রথাটি ছিল অব্যাহত এবং আকবর তাঁর স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণকারী স্ত্রী ও দাসীদের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।[৮১৫] মোঘলদের উপপত্নীদেরকে উপর্যুক্ত বিভিন্ন উপায়ে লাভ করা হতো। তাদেরকে আখ্যায়িত করা হতো কানিজ, সারার ও পারিস্তার বলে। সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের উপপত্নী সম্বন্ধে অবাধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। প্রকৃতপক্ষে মাঝে মাঝে

---

৮১২. আসাদ বেগের ওয়াকিয়া অনুযায়ী ইলিয়ট ও ডাউসনের ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৫৩.

৮১৩. বেণী প্রসাদের লেখা 'জাহাঙ্গীরের ইতিহাস' পৃষ্ঠা-২

৮১৪. পি.কে. হিট্টি কর্তৃক লিখিত 'আরবদের ইতিহাস' (লন্ডন-১৯৪৮), পৃষ্ঠা-৭৬.

৮১৫. 'আইন-ই-আকবরি', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮২; মুন্তাখাব-উত-তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৭.

www.pathagar.com

একজন উপপত্নী ছিলেন স্ত্রী অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দ্বিতীয় মহিলাটি ছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী ; উপপত্নী উপভোগ করতেন পুরুষটির প্রকৃত ভালোবাসা।[৮১৬] মোঘল রাজকীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপপত্নীর সংসর্গ লাভ ছিল অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।[৮১৭]

বাবরের দু'জন বিখ্যাত উপপত্নী ছিলেন গুলনার আগাচা ও নারগুল আগাচা। যদিও তারা ছিলেন আগাচা[৮১৮] তবুও তাঁরা মোঘল পরিবারে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মহিলাতে পরিণত হন। গুলবদন হুমায়ুনের নিয়ন্ত্রণাধীন উৎসবাদিতে ও পারিবারিক সম্মেলনে তাঁদের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন কয়েকবার।[৮১৯] আবুল ফজল বলেন যে, গুলনার (৯৮৩ হিজরিতে) ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে গুলবদনের সাথে হজ্বে যান। এছাড়া বাবরের সরলবর্গীয় গাছের মতো সুন্দরী গৃহপরিচারিকা বা উপপত্নীও ছিল।[৮২০] হুমায়ুনেরও উপপত্নী ছিল।[৮২১] আকবরের কয়েকজন ধাত্রীমাতা– যেমন বাহাওয়াল আনাগা হুমায়ুনের উপপত্নী ছিলেন। আকবরের আরও অনেক উপপত্নী ছিল। বিবি সেলিমা (সুলতান সেলিমা বেগম বলে তাঁকে মনে করা ভুল হবে)[৮২২] ছিলেন শাহজাদি খানমের মা। সামান্যতম দ্বিধা না করে জাহাঙ্গীর লিখেছেন, 'আমার জন্মের তিন মাস পরে সম্রাটের অন্যতম উপপত্নীর (কানিজান) গর্ভে জন্ম নেয় আমার বোন শাহজাদা খানম; তাঁরা তাকে হস্তান্তর করেন আকবরের মা মরিয়ম মাকানির কাছে।[৮২৩] শাহজাদা মুরাদ ও দানিয়ালের মায়েরাও ছিলেন উপপত্নী ও উপপত্নী বিবি দৌলত সাদ ছিলেন শাহজাদি শুকুরুন্নেসা বেগমের মা।[৮২৪] শুকুরুন্নেসা বেগম জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও জীবিত ছিলেন এবং তিনি মোঘল হেরেমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আকবরের আর একজন কন্যা আরাম বানু বেগম যিনি কুমারী অবস্থায় মারা যান তিনিও ছিলেন উপপত্নীর গর্ভজাত।[৮২৫] জাহাঙ্গীরের স্ত্রী ছাড়াও ছিল

---

৮১৬. টেরির op. cit.. পৃষ্ঠাগুলো- ২৮৬-৮৭.

৮১৭. জর্জ ওভিংটন রচিত ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সুরাটে একটি সমুদ্র যাত্রা। পৃষ্ঠা-২৩৪.

৮১৮. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা', পৃষ্ঠা-২২৫.

৮১৯. 'বাবরনামা', পৃষ্ঠা-৭১২.

৮২০. 'আকবর নামা', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৮৫ ও n I.

৮২১. গওহার, পৃষ্ঠা-১৪.

৮২২. 'আকবরনামা', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১১৩০,১১৩১.

৮২৩. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪.

৮২৪. Ibid.. পৃষ্ঠাগুলো ৩৪-৩৬.

৮২৫. Ibid.. ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪.

www.pathagar.com

অনেক উপপত্নী।[৮২৬] তাঁর দুজন পুত্র জাহান্দার ও শাহরিয়ার ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে এক মাস সময়ের মধ্যে তাঁর উপপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৮২৭] শাহজাহানের অনেক উপপত্নীর মধ্যে ওয়ারিস প্রধান দু'জন উপপত্নীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন আকবরাবাদি মহল ও ফতেপুরি মহল।[৮২৮]

আওরঙ্গজেবের একজন উপপত্নীর নাম রাখা হয়েছিল আওরঙ্গাবাদি মহল, কারণ তিনি আওরঙ্গাবাদে যুবরাজের হেরেমে প্রবেশ করেছিলেন। ওয়ারিসের পাদশাহনামা থেকে উল্লেখ করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন যে, আকবর একটি নিয়ম চালু করেন– মোঘল সম্রাটদের উপপত্নীদের নামকরণ তাঁদের জন্মস্থান অনুসারে করতে হবে বা যে শহরে তাঁদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে হেরেমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার নাম অনুসারে করতে হবে। তাই আমরা আকবরাবাদি, ফতেপুরি, আওরঙ্গাবাদি, জৈনাবাদি,[৮২৯] উদয়পুরি,[৮৩০] ইত্যাদি নামের মহিলাদের সাক্ষাৎ পাই। আগেই বলা হয়েছে যে, একজন স্ত্রী ও উপপত্নীর মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য ছিল। প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী স্বামীর প্রতি চিরবিশ্বস্ত হবেন বলে প্রত্যাশা করা হলেও উপপত্নীদের ক্ষেত্রে তা প্রত্যাশা করা যেত না। অবশ্য এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিল এবং উল্লেখযোগ্য আনুগত্যপরায়ণা উপপত্নীর নামও রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বিখ্যাত রূপমতির কথা বলা যায় যিনি তাঁর উপপতি প্রভুতুল্য রাজবাহাদুরের উত্তরাধিকারিণী হিসেবে কারও আত্মপ্রকাশের চেয়ে আত্মহত্যা করাই বেশি শ্রেয় মনে করেন।[৮৩১]

আকবরাবাদি মহল ও ফতেপুরি মহল আগ্রা দুর্গে শাহজাহানের বন্দি জীবনের অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি যখন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁরা তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলেন। শাহজাদা দারার উপপত্নী হওয়ার আগে রানা-ই-দিল ছিলেন মূলত একজন নাচনেওয়ালি। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের পরে আওরঙ্গজেব তাঁকে লাভ করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রানা-ই-দিল তাতে অস্বীকৃতি জানান। পক্ষান্তরে দারার আর একজন উপপত্নী উদয়পুরি মহল ইচ্ছাকৃতভাবে আওরঙ্গজেবের কাছে চলে

---

৮২৬. হাউকিন্স এর সমুদ্র যাত্রা, পৃষ্ঠা-৪২১.

৮২৭. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০.

৮২৮. বি.পি. সাক্সেনার 'শাহজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠা-৩৩৭.

৮২৯. তাপতা নদীর বিপরীতে বুরহানপুর শহরতলীর নামে জয়নাবাদী নামটি।

৮৩০. যদুনাথ সরকার হামিদউদ্দিন খান বাহাদুরেরর আহকাম-ই-আলমগীরী অনুবাদ করেন (কলিকাতা সংস্করণ ১৯৪৯), পৃষ্ঠা-৪১.

৮৩১. 'আকবরনামা', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২১৩-২১৪.

www.pathagar.com

যান।[৮৩২] তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার হলো যে, আওরঙ্গজেব তাঁর একজন উপপত্নীর সক্রিয় সহযোগিতায় শাহজাদা মুরাদকে বন্দি করতে সমর্থ হন।[৮৩৩]

এ সমস্ত দোষ-গুণ সত্ত্বেও উপপত্নীদের ছিল নিজস্ব আকর্ষণ এবং তাই তারা তাঁদের মনিবের হৃদয়ে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিলেন। শাহজাহান তাঁর প্রেমিকা উপপত্নী ফতেপুরি মহলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিল্লির বিখ্যাত ফতেপুরি মসজিদ নির্মাণ করেন। এমনকি কঠোর নীতিপরায়ণ আওরঙ্গজেব জর্জিয়া প্রদেশের দাসী মেয়ে উদয়পুরি মহলের প্রতি খুব আসক্ত ছিলেন ; উদয়পুরি মহল তাঁর প্রথম মনিব দারা শিকোর পতনের পরে তাঁর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে চলে যান।

তিনি ছিলেন কাম বখশের মা এবং অধিকাংশ সময় মাতাল অবস্থায় থাকতেন।

তিনি আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ওপর আকর্ষণ ও প্রভাব বজায় রাখেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের প্রেয়সী। পক্ষান্তরে জৈনাবাদি উপনামযুক্ত হীরাবাঈ তাঁর যৌবনকালের প্রেয়সী ছিলেন।[৮৩৪] এ ব্যাপারে কয়েকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। মোঘলদের দ্বারা পালিত শত শত উপপত্নী ছিলেন যাঁদেরকে তাঁরা তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক সুন্দর ও আকর্ষণীয় নামে আখ্যায়িত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোঘল অন্দর মহলের কয়েকজন উপপত্নী হলেন বাদাম চশম (বাদামের মতো চক্ষুবিশিষ্ট), নাজুক বদন (সুন্দর শরীর বিশিষ্ট), সুখদায়িন (শান্তিদাত্রী), কুতুবাল (হর্ষময়ী), সিঙ্গার (অলংকৃত), পিয়ার (প্রীতিময়ী), মহান (গর্বিত) ইত্যাদি।[৮৩৫]

৪. কাঞ্চনী ও বান্দীরা

হেরেমের মধ্যে সেবাকর্মে রত ও বসবাসরত মহিলারা ছিল দুটি শ্রেণিভুক্ত বিনোদন কারিণী ও সেবিকা। বিনোদনকারিণীদের মধ্যে ছিল নর্তকী বালিকা ও তাদের ঐক্যতান সঙ্গীত দল। এরা আকবর প্রদত্ত কাঞ্চনী গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল।[৮৩৬] বাবর ইব্রাহিম লোদির হেরেমের নর্তকী বালিকাদের অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতায় এতই মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বেগমদের

---

৮৩২. ইন্দ্রা বুতেন সেন কর্তৃক রচিত 'মোঘল রাজকন্যাদের জীবন', পৃষ্ঠাগুলো-৩৯, ১৯৪-৯৫.

৮৩৩. 'ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ', ৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২১৫.

৮৩৪. যদুনাথ সরকারের 'আওরঙ্গজেবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', পৃষ্ঠাগুলো-১৫, ১৬.

৮৩৫. মানুচী সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৪.

৮৩৬. 'আইন-ই-আকবরি', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-২৫৬-৫৭.

www.pathagar.com

প্রত্যেককে একজন করে নর্তকী বালিকাকে উপহার হিসেবে দেন। তারপর থেকে অনেক মোঘল মহিলা বিনোদনের জন্য তাদের নিজস্ব নৃত্যশিল্পী দল লাভের চেষ্টা শুরু করেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিল শ্রদ্ধেয় এবং নৃত্য ও সঙ্গীত ছাড়া তাদের অন্য কোনো পেশা ছিল না।[৮৩৭] অনেকে অন্দর মহলের সীমারেখার মধ্যে বাস করতেন। বিনোদনকারিণীদের মধ্যে ছিল বিভিন্ন আকর্ষণীয় পোশাকে আবির্ভূত বহুরূপীরা, বাজিকররা এবং ভাঁড়ামির দ্বারা আনন্দ বিতরণকারী অভিনয় শিল্পী ও দড়াবাজিকররা অন্তর্ভুক্ত। যাহোক, কাঞ্চনীরা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

মানুচী এই শিল্পীদের তত্ত্বাবধানকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের নামের শেষে যুক্ত হয়েছে 'বাঈ' শব্দটি, যেমন : সুন্দর বাঈ, নয়নজোট বাঈ, চঞ্চল বাঈ, গুলরুখ বাঈ, হিরা বাঈ, মুরাদ বাঈ, অপ্সরা বাঈ, খুশলাল বাঈ, কেশর বাঈ, কস্তুরী বাঈ, রাস বাঈ, মৃগনয়ন বাঈ ইত্যাদি।[৮৩৮] তালিকার শেষে ছিল খাওয়াজ বা পারিস্তার নামে পরিচিত ক্রীতদাসী বা বন্দিরা। হেরেমের অভিজাত তান্ত্রিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় ক্রীতদাসী বা চাকরানিদের প্রতি খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাদের কর্তব্য ছিল সেবা করা, কঠোর পরিশ্রম করা এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনে যৌন সংসর্গ দেওয়া। এই বিষয়ে দুটি বাস্তব বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত তৎকালীন নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অভাবে তখন ধনীদের সুখের জন্য বহুসংখ্যক মানুষের কায়িক শ্রম প্রয়োজন হতো এবং নারীদেরকে সঙ্গী ও বন্ধু হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া হতো।[৮৩৯] এই গৃহবাসিনীরা স্বেচ্ছাচারী মনিব ও মনিব পত্নীদের লাম্পট্যপূর্ণ ব্যবহারের সম্মুখীন হতো– যদিও তাঁরা তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করতেন। এই পরিচারিকাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক পরিচারিকা ভালো ভালো পরিবারের অধীন বাস করত এবং তারা বেশ সংস্কৃতিমনা ছিল।[৮৪০]

বিজয়ী ও শাসকশ্রেণি মোঘলদের এ রকম কোনো নারীর অভাব হতো না। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মহিলার সাথে দশ থেকে বারো জন দাসী থাকত। কিছুসংখ্যক শাহজাদির একশ জনের মতো দাসী থাকত।[৮৪১] তারা সকলেই

৮৩৭. থিভিনট, পৃষ্ঠা-৭১: বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-২৭৩: ওভিংটন, পৃষ্ঠা-২৫৭.

৮৩৮. মানুচী প্রদত্ত তালিকা লম্বা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৩৫-৩৬.

৮৩৯. কে.এস লাল কর্তৃক সম্পাদিত 'সুদীর্ঘ অতীতের সালতানাত', পৃষ্ঠা-২৬১.

৮৪০. বি.পি. সাক্সসিনার 'শাহজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠাগুলো-৮৯, ১১২-১৩। বান্দেলার নারী কয়েদি ও হুগলির বন্দিনী পর্তুগিজদের জন্য শাসক পরিবার

৮৪১. তারিখ-ই-সেলিম শাহী, পৃষ্ঠা-৫১.

www.pathagar.com

ছিল সুন্দরী ও উৎকৃষ্ট পোশাকে সজ্জিত। তাদের নামও ছিল সমানভাবে আকর্ষণীয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছুসংখ্যক ক্রীতদাসীর নাম ছিল গুলাপ (গোলাপ), চামেলি (জেসমিন), নার্গিস (টিউলিপ), কেশর (কুমকুম), কস্তুরী (মৃগনাভি), গুল-ই-বাদাম (বাদাম ফুল), সোসান (লিলি), ইয়াসমিন (উৎসব), চম্পা (এক ধরনের ফুল), রানা-ই-গুল (ভালো ফুল), গুল আনদম (ফুলের আকৃতি), গুল আনার (ডালিমের ফুল), সালোনি (মধুর), মধুমতি, সুগন্ধারা (সুবাসিত), কোয়েল (একটি পাখি), গুলরাং (ফুলের রং বিশিষ্ট), মেহেদি (হেনা), দিল আফরোজ (হৃদয় উৎফুল্লকারী), কেতকী (হরিদ্রাভ ফুল), মতি (মুক্তা), মৃগনয়ন (হরিণের মতো চক্ষু যার), কমল নয়ন (পদ্ম ফুলের মতো চক্ষুবিশিষ্ট), বাসন্তী (বসন্ত উৎসব), হীরা (ডায়মন্ড), কিসমিস (রইসিন), পেস্ত ার মতনাম।[৮৪২] এই ধরনের সুন্দর নাম বিশিষ্ট সুন্দরী মেয়েরা তাদের মনিবদের মনোযোগ আকর্ষণে বা তাদেরকে আনন্দ দিতে ব্যর্থ হতো না। আমরা আবার তাদের সাথে সাক্ষাৎ করব।

৫. সম্রাট

হেরেমের বাসিন্দাদের মধ্যে সম্রাট ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্যই রাজকীয় অন্দরমহল টিকে থাকত। রানিগণ, উপপত্নীগন, নর্তকীগণ ও পরিচারিকাগণ তাঁকে আরাম ও সুখ দিত। সম্রাটের সময় বিভক্ত ছিল রাজদরবারে রাজকীয় কাজকর্মে এবং অন্দর মহলে বিশ্রাম ও বিনোদনে। বাবর ছিলেন একজন ব্যস্ত যোদ্ধা। হুমায়ুন তাঁর প্রচুর সময় কাটাতেন বাংলার শাহী অন্দর মহলে, অন্য কোনোভাবে নয়।[৮৪৩] আকবর ঘুমাতেন মাত্র তিন ঘণ্টা।[৮৪৪] তাঁর বিরতিহীন বিজয় অভিযান, পরম সত্যের জন্য তাঁর ধর্মীয় অন্বেষা এবং সাম্রাজ্যের বিপুল পরিমাণ কাজকর্ম তাঁকে হেরেমে বেশি সময় থাকতে দিত না। তা সত্ত্বেও সম্রাট শুক্রবার দিনগুলোতে হেরেমে কাটাতেন।[৮৪৫]

জাহাঙ্গীরের কর্মতালিকা ছিল ভিন্ন ধরনের। উইলিয়াম হকিন্সের মতে, তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন, প্রার্থনা করতেন এবং মালা জপ করতেন। তারপর জনসম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পরে তিনি দুই ঘণ্টা ঘুমাতেন, আহার করতেন এবং সময় কাটাতেন হেরেমে। দুপুর থেকে বেলা তিন ঘটিকা

---

৮৪২. মানুচী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৩৬-৩৮.

৮৪৩. গাওহার পৃষ্ঠা-১৩.

৮৪৪. ভিনসেন্ট স্মিথের 'বিখ্যাত মোঘল আকবর', পৃষ্ঠা-২৪৩.

৮৪৫. 'আইন-ই-আকবরি', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৬.

www.pathagar.com

পর্যন্ত তিনি জনসাধারণের মধ্যে থাকতেন। বেলা তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তিনি রাজদরবারে থাকতেন।

তারপরে তিনি হেরেমে বিশ্রামের জন্য যেতেন, পানাহার করতেন ও দুই ঘণ্টা ঘুমাতেন। তারপরে তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তারপর তিনি আবার আহার করতেন এবং ঘুমাতেন সকাল পর্যন্ত।[৮৪৬] আব্দুল হামিদ লাহোরি, কাজউইনি ও চন্দ্রবর্ধন বর্ণনা দিয়েছেন শাহজাহানের প্রাত্যহিক কর্মতালিকার। অনেক ইউরোপীয় পর্যটক সাধারণ ভাষায় শাহজাহানের দৈনিক কর্মতালিকা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি রাতে দুই প্রহর অবশিষ্ট থাকতে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠতেন, প্রার্থনা করতেন, এক ঘণ্টার জন্য ঝরোকা দর্শনে যেতেন এবং তারপরে সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে দিওয়ান-ই-আমে রাজকীয় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন।[৮৪৭] দুপুরে তিনি হেরেমে ফিরতেন। তিনি দুপুরের আহার সেরে ঘুমাতেন। তারপরে তিনি মনোনিবেশ করতেন মমতাজ মহলের দাখিল করা দান সংক্রান্ত উপযুক্ত আবেদনপত্রগুলোর প্রতি। বেলা তিন ঘটিকা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তিনি আবার দিওয়ান-ই-আমে অবস্থান করতেন। রাত আটটায় তিনি হেরেমে গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে কাঞ্চনীদের সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করতেন। তারপরে তিনি রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে শয্যাগ্রহণ করতেন।[৮৪৮] আওরঙ্গজেবও এমনি করতেন। সকল মোঘল সম্রাট দিনের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন এবং ঘুম থেকে উঠে পড়তেন ভোরের সময়। তাঁরা গড় হিসাবে অর্ধেক সময় হেরেমে কাটাতেন এবং অর্ধেক সময় রাজকীয় কাজকর্মে ব্যয় করতেন। আকবর গড় হিসাবে অর্ধেকের কম সময় হেরেমে কাটাতেন এবং জাহাঙ্গীর গড় হিসাবে বেশি সময় হেরেমের মধ্যে কাটাতেন। কিন্তু এই সাধারণ কর্মতালিকা রাজপ্রাসাদ ও শিবিরবাস উভয় ক্ষেত্রে মেনে চলা হতো। সম্রাট হেরেমে ঘুমাতেন, আহার করতেন ও বিশ্রাম করতেন। হেরেমে তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক ও অতিথি। মহিলারা অবশ্যই হেরেমের সার্বক্ষণিক বাসিন্দা ছিলেন।

৬. হেরেমে বাসস্থান

হেরেমের মহিলাদের বাসস্থানকে বলা হতো মহল। আবুল ফজল বলেন, 'সম্রাট আকবর মহলের ভেতর চমৎকার অট্টালিকাসমূহ দ্বারা তৈরি করেন এক

---

৮৪৬. হকিন্সের 'ফস্টারের ভ্রমণের শুরুতেই', পৃষ্ঠাগুলো ১১৪-১৫.

৮৪৭. আব্দুল হামিদ লাহোরির সম্পাদনায় 'বাদশাহনামা', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২০.

৮৪৮. বি.পি. সাক্সিনার 'শাহজাহানের ইতিহাস', পৃষ্ঠাগুলো-২৩৮-৪৩.

www.pathagar.com

বিশাল আবেষ্টনী যেখানে তিনি বিশ্রাম করতেন। রাজকীয় মহলে পাঁচ হাজার মহিলা থাকলেও তিনি প্রত্যেককে দিয়েছিলেন একটি করে স্বতন্ত্র বাসগৃহ।[৮৪৯] ঘেরা স্থানটি আগ্রা বা ফতেপুর সিক্রি, আজমির বা লাহোর নাকি এই সবকটি দুর্গের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেননি। তিনি (আবুল ফজল) একথাও নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি পাঁচ হাজারের বেশি এসব মহিলা একটি ঘেরা স্থানের মধ্যে থাকত অথবা তাঁদেরকে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কিনা। তাই হেরেমের বাসিন্দাদের সংখ্যাও তাঁরা যে ঘেরা স্থানে বাস করতেন সেই সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ সমালোচকের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

৬. (ক) হেরেমের বাসিন্দাদের সংখ্যা

প্রথমে হেরেমের বাসিন্দাদের সংখ্যার কথায় আসা যাক। যখন আকবরের অন্দর মহলের জনবল সম্বন্ধে আবুল ফজল পাঁচ হাজারের বেশি বলে উল্লেখ করেন তখন তিনি তা উল্লেখ করেন সম্রাটের মহত্ত্ব সম্বন্ধে জোর দেওয়ার জন্য। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে ব্লকম্যান উল্লেখ করেছেন আকবরের মাত্র সাতজন স্ত্রী সম্বন্ধে। কিন্তু এই সংখ্যাটি খুব কম। বেভারিজ মনে করেন যে, আকবরের তিনশ জনের বেশি স্ত্রী ছিল।[৮৫০] এর সাথে তাঁদের পরিচারিকা, দাসী ও অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজকীয় পরিবারের সদস্যকে যোগ করলে হেরেমের বাসিন্দাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। একইভাবে ব্লকম্যান জাহাঙ্গীরের কুড়িজন স্ত্রীর তালিকা প্রস্তুত করেছেন যদিও তাঁর হেরেম ছিল খুব বড়। বেণীপ্রসাদের মতে, একজন শাহজাদা থাকাকালেও জাহাঙ্গীরের হেরেমে ছিল ৩০০ জন মহিলা।[৮৫১] যেহেতু সকল সম্রাট ও শাহজাদাদের ছিল বিশাল হেরেম সেহেতু তাঁদের দীর্ঘ কাহিনীকে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ আলমের হেরেমে ছিল দুই হাজার মহিলা।[৮৫২] জাহান্দার শাহের অন্দর মহলটি (১৭১২ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল এক মাইল দীর্ঘ।

এই সংখ্যাগুলো সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে মহান মোঘল শাসকদের ক্ষমতা ও সম্পদ সম্বন্ধে, কিন্তু তা এটাও প্রমাণ করে যে, হেরেমের মহিলাদের

---

৮৪৯. আইন-ই-আকবরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৬.

৮৫০. আকবরনামা, ৩য় খণ্ডের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-২১.

৮৫১. বেণী প্রাসাদ কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ইতিহাস', পৃষ্ঠা-২৬; হকিন্সের কর্তৃত্বে সমুদ্র যাত্রার উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা-৪২১.

৮৫২. মানুচী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩.

www.pathagar.com

কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। হেরেমের মহিলাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে তারতম্য হতো সম্রাটের রুচি ও সম্পদ অনুসারে। আবুল ফজলের মতে, আকবরের সময়ে হেরেমের মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের বেশি বা কম। তাঁর আইন-ই-আকবরিতে মূলবান ধাতুসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে শুরু করে সুগন্ধি দ্রব্যের মূল্যসহ সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলি প্রদান করে। হেরেমের মহিলাদের সংখ্যা সম্বন্ধেও হয়তো আবুল ফজল ভুল করেননি। কিন্তু তাঁর উল্লেখিত সংখ্যার মধ্যে খুব সম্ভব রানিমাতা, সকল খালা-মামি-ফুফু, পালক মাতা, সম্রাটের বোন ও কন্যারা, সম্রাটের প্রধান রানি, মধ্যম শ্রেণির পত্নীগণ, উপপত্নীগণ, সকল ক্রীতদাসী ও নর্তকী বালিকারা, হেরেমের সকল উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মচারী, হেরেমের কর্মচারীবৃন্দ, শাহী অন্দর মহলে বেড়াতে আসা বা স্বল্পকালীন থাকতে আসা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মহিলারাও সম্রাটের সকল আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজকীয় অন্দর মহলের সাথে এককভাবে বা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কিত উপরোক্ত প্রত্যেক মহিলা। এসব মহিলার অনেকেই আসলে হেরেমের মধ্যে থাকতেন না। দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্রাট আকবর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শাহীমহল পরিদর্শনের জন্য দারোগা, মহলদার ও তহবিলদারের মতো উচ্চপদস্থ মহিলা সরকারি কর্মচারীর কথা উল্লেখযোগ্য। মানুচীর মতে, এই উচ্চপদস্থ মহিলা সরকারি কর্মচারীরা শাহী মহলে কাজ করতেন।[৮৫৩] রাজকীয় সচিবালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মতো বেতনভোগী সাধারণভাবে উচ্চ মর্যাদার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্ত্রী ও আত্মীয়রা তাদের কর্তব্য পালনের পরে বাড়ি যেতেন, মহলে থাকতেন না।[৮৫৪] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মহিলারা খোশরোজ, নওরোজ, বিবাহ অনুষ্ঠান ও অন্য অনেক উৎসব উপলক্ষে আসতেন মহলে। তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মহিলাকে অল্প কয়েকদিনের জন্য এবং খুব কমসংখ্যক মহিলাকে অনুমতি দেওয়া হতো গোটা এক মাস থাকার।[৮৫৫] কিন্তু তাঁরা হেরেমের বাসিন্দা ছিলেন না। হেরেমের অন্যান্য সর্বাধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের ব্যাপারেও ছিল একই কথা। রাজপ্রাসাদে অনেক নর্তকী দল আসত, কিন্তু নাচের পরে তারা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেত। দাসীরাও একইভাবে কাজ করত। কিন্তু আবুল ফজল আকবরের সেনাবাহিনীর সদস্য

---

৮৫৩. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-৩৩০-৩১.

৮৫৪. আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৩৫-৩৬; শাহ নেওয়াজ খান কর্তৃক লিখিত 'মাসির-উল-ওমরাহ', পৃষ্ঠাগুলো-২৬০-৬১.

৮৫৫. 'আইন-ই-আকবরি' পৃষ্ঠা-৪৭; মানুচী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৩৫০-৫১.

www.pathagar.com

গণনার পদ্ধতিতে তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন হেরেমের বাসিন্দাদের মধ্যে। এভাবে তত্ত্বগতভাবে রাজদরবারের সাথে জড়িত মহিলার সর্বোচ্চ সংখ্যা পাঁচ হাজার বা তার বেশি হতে পারে, কিন্তু তারা কোনো সময়ই একযোগে মিলিত হতেন না। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল খুব কম।[৮৫৬]

৬. (খ) রাজপ্রাসাদে বসবাসের ব্যবস্থা

হেরেমের মহিলাদের বসবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন যে, হেরেমে পাঁচ হাজারের বেশি বাসিন্দা থাকলেও তিনি (আকবর) একটি বিশাল ইমারত ঘেরা জায়গার মধ্যে প্রত্যেককে একটি করে স্বতন্ত্র বাসগৃহ দিয়েছেন এবং সেই ঘেরা স্থানটিতে তিনি বিশ্রাম করতেন।[৮৫৭] প্রায় একশ বছর পরে নপুংসকগণ মানুচীকে অন্দর মহলের সুন্দর বাসগৃহগুলো সম্বন্ধে বলেন। হেরেমের মহিলাদেরকে বরাদ্দকৃত বাসস্থানগুলো ছিল আলাদ আলাদা, কম-বেশি প্রশস্ত ও চমৎকার। এই অত্যুক্তি অনেক আধুনিক পণ্ডিতকে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে বিভ্রান্তি করে যে, হেরেমের প্রত্যেক মহিলাকে একটি স্বতন্ত্র,

---

৮৫৬. আইন-ই-আকবরির ২য় খণ্ডে আবুল ফজল প্রদত্ত সংখ্যার ওপর নির্ভর করে যদি আধুনিক পণ্ডিতগণ আকবরের সেনাবাহিনীর সংখ্যা নিরূপণ করেন তাহলে রাজকীয় হেরেমের জনসংখ্যার চেয়ে মোট সৈন্যবল সংখ্যা চল্লিশ লাখের বেশি। (ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রতিবেদন তথ্য সংস্থা, পঞ্চম অধ্যায়, ১৯২৩, পৃষ্ঠা ৫৮ FF; মাউন্ট স্টুয়াট আলপিন স্টোন, এর 'ভারতের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৪; সারান পি কর্তৃক রচিত 'মোঘলের আঞ্চলিক সরকার' পৃষ্ঠাগুলো ২৫৮-৬৮; আর, পি. ত্রিপঠী কর্তৃক রচিত 'মোঘল সম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' পৃষ্ঠা-২৩৪)।

এই সেনাবাহিনীকে কোটা পদ্ধতিতে গঠিত করা হতো, প্রত্যেক পদস্থ কর্মকর্তা বা স্বশাসিত শাসক চাহিদা মতো একটি নির্দিষ্ট সৈন্যদলের গঠন প্রত্যাশা করত; কিন্তু এসব সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য কখনো একসাথে আহ্বান করা হতো না। কে.এস.লাল কর্তৃক রচিত 'মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি' পৃষ্ঠাগুলো- ৬৫-৬৮। মনে হয় আকবরের সেনাবাহিনীর প্রকৃত লোকবল যেকোনো সময়ে ২৫,০০০ পুরুষের বেশি হতো না। উইলিয়াম আরভাইনের 'মোঘলদের ভারতীয় সেনাবাহিনী' পৃষ্ঠাগুলো-৫৮-৬১। পরিশেষে আরভাইন এতে পৌছেতে পারেন কারণ আবুল ফজল নিজে খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন (ব্লকম্যান আইন-আকবরির ১ম ও ২য় খণ্ডের ২৪১-৪৭ পৃষ্ঠা তুলে ধরেন।

কিন্তু আবুল ফজল হেরেম অধিবাসীদের কারণে এরূপ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে সরে যাননি, যার ফলে ভিনসেন্ট স্মিথ সহ আধুনিক সমস্ত পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে হেরেমের প্রকৃত সদস্য পাঁচ হাজার হতে পারে। স্মিথ কর্তৃক রচিত 'মোঘল সম্রাটগণের সামাজিক জীবন' পৃষ্ঠা-৬৫। সম্ভবত সময়ে সময়ে এই সংখ্যা কমা বাড়া হতো। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিদেশি পর্যটক হেরেম অধিবাসীদের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করেননি। এমনকি কেউ সাহসের সাথে মনেও করেননি।

৮৫৭. 'আইন-ই-আকবরি', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬.

www.pathagar.com

প্রশস্ত ও চমৎকার বাসস্থান দেওয়া হয়েছিল।[৮৫৮] প্রকৃতপক্ষে অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এমন অতিরঞ্জিত উক্তি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে[৮৫৯] যেমন হেরেমে প্রত্যেক মহিলাকে জাঁকজমকপূর্ণ, পৃথক ও প্রশস্ত বাসস্থান দেওয়া হয়েছিল।

ব্যাপারটি এ রকম ছিল না, কারণ এটা করা সম্ভব নয়। ঘেরা স্থানটি মোট কথা প্রাসাদের এক অংশ ব্যাপী মহল বা হেরেম সাবা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। এটা ছিল দুর্গেরই একটি অংশ। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, আগ্রার দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল বড় বড় সড়ক ও দোকানপাট বিশিষ্ট একটি নগরীর ওপরে[৮৬০] এবং এটা চারদিকে ছিল বৃত্তাকার বৃহৎ দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর মধ্যে রাজপ্রাসাদের ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, কাছারি ও অন্যান্য সরকারি অফিস, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শিবির ও প্রহরীদের ছাউনি। রাজপ্রাসাদের এক পাশে ছিল রাজকীয় মহিলাদের মহল নামক বাসস্থান বা আবুল ফজলের জন্য ঘেরা স্থান যা এখনো আগ্রাতে দেখা যায় এবং আরো ছিল অনেক মোঘল দুর্গ। তাই সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও ইউরোপীয় পর্যটকবৃন্দ দ্বারা অভিহিত মহল ছিল দুর্গের মধ্যে অবস্থিত রাজকীয় দালান কোঠাগুলোর একটি ক্ষুদ্র অংশ। তাই স্পষ্টত হেরেমের সকল বাসিন্দাকে আলাদা, জমকালো ও প্রশস্ত বাসস্থান দেওয়া সম্ভব ছিল না।

আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির দুর্গ, দিল্লির লাল কেল্লা ও আজমিরের দুর্গ পরীক্ষা করে এই মন্তব্যকে জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়। মোঘল আমলে আগ্রা, দিল্লি ও লাহোর ছিল হেরেমবাসীদের স্বাগতিক প্রধান দুর্গ। আজমিরের দুর্গটি আকবরের আমলে মেরামত করা ও সম্প্রসারিত একটি ছোট দুর্গ।[৮৬১] কিন্তু এমনকি প্রথম দৃষ্টিতেই এটা সহজবোধ্য যে, অনেক লোকের জন্য এটাতে আলাদা আলাদা বাসস্থান দেওয়া সম্ভব নয়। আগ্রা সম্বন্ধে পার্সি ব্রাউন বলেন, 'আইন-ই-আকবরিতে বর্ণিত হয়েছে যে, আগ্রা দুর্গের বেষ্টনীর মধ্যে আকবর উপরের দিকে লাল বেলেপাথর দ্বারা পাঁচ হাজার অট্টালিকা নির্মাণ করেন।'[৮৬২] এসব নির্মাণ কাঠামোর মধ্যে অনেকগুলো পরবর্তীকালে

---

৮৫৮. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠাগুলো- ২৬৭-৬৮.

৮৫৯. ভিনসেন্ট স্মিথ এর সম্পাদনায় 'বিখ্যাত মোঘল আকবর' পৃষ্ঠাগুলো ২৬০-৬১: আনসারী এম.এ কর্তৃক রচিত 'মোঘল সম্রাটদের সামাজিক জীবন', পৃষ্ঠা-৬৫: রেখা মিশ্র'র 'মোঘল ভারতে নারীগণ', পৃষ্ঠা-৭৬.

৮৬০. পিলসার্ট কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত', পৃষ্ঠা-৪.

৮৬১. আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৫১৬-১৭.

৮৬২. পার্সী ব্রাউন কর্তৃক সম্পাদিত 'ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প (ইসলামী আমল)' পৃষ্ঠা-১০০.

www.pathagar.com

শাহজাহানের শ্বেতপাথরের শিবিরে কক্ষ তৈরির জন্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়ের মোঘল রাজপ্রাসাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক অনেক কিছুই অবশিষ্ট রয়েছে।

এখন তার মধ্যে রয়েছে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কতকগুলো দালানকোঠার সমষ্টি।[৮৬৩] এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আগে নির্মিত হয় আকবরি মহল। পরবর্তীকালে সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারী উত্তরাধিকারী ও তাঁর পরিবারের বাসভবনরূপে পরিকল্পিত জাহাঙ্গিরী মহলটি সংযোজিত হয়।[৮৬৪] এর বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। লাহোরের প্রাসাদগুলো নির্মিত হয়েছিল আগ্রার প্রসাদগুলোর নির্মাণশৈলী অনুসারে। লাহোর দুর্গে ছিল একটি জেনানা মসজিদ। এটা এ কথাই বোঝায় যে, সকল প্রাসাদেই মহিলাদের জন্য এ রকম মসজিদ ছিল।

এলাহাবাদ দুর্গে মহিলাদের প্রাসাদটি একটি অত্যন্ত চমৎকার বারান্দাসহ সংযুক্ত অবস্থায় এখনও রয়েছে।[৮৬৫]

এ ব্যাপারে আমাদের শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক ফতেপুর সিক্রি। ফতেপুর সিক্রিতেই আকবর তাঁর বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ দালানগুলো নির্মাণ করেছিলেন। আবাসিক ভবনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ দ্বিতল বিশিষ্ট যোধবাঈ প্রাসাদ। এর এক পাশে সংযুক্ত আছে স্নান ও মলমূত্র ত্যাগের স্থান এবং বিপরীত পাশে দ্বিতল বিশিষ্ট হাওয়া মহল বা বায়ু সেবন ভবন। এই মহলে রয়েছে প্রশস্ত বাসগৃহসমূহ। এখানে রয়েছে আরো দুটি বাসভবন। একটি মরিয়মের বাসভবন এবং অন্যটি তুর্কি সুলতানার বাসভবন নামে পরিচিত।[৮৬৬] সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক আর. সি. গৌরের নেতৃত্বে সামোসা মহলের কাছে ফতেপুর সিক্রিতে পরিচালিত একটি খনন কর্মসূচিতে রাজকীয় হেরেম সারার আর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় অংশ দেখতে পাওয়া গেছে।

বিশাল স্থাপনাটিতে (১২৭.১০×৬৫.৮ মিটার) রয়েছে অলংকৃত বাগানসমূহ, জলাধার, বায়ু চলাচলের বুরুজ, ভূগর্ভস্থ কক্ষ ও মাটির নিচে পানি নির্গমনের নালাসহ মধ্যযুগীয় গ্রাম্য জীবনধারার সকল বিলাসিতার বস্তু। গরম আবহাওয়ার তীব্রতা দূরীকরণের জন্য কক্ষগুলোর সামনে রয়েছে গভীর

---

৮৬৩. পার্সী ব্রাউন কর্তৃক লিখিত 'ভারতের কেমব্রিজ ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৭.

৮৬৪. ঐতিহাসিক সমাজে পাঞ্জাবের পত্রিকা ১ম খণ্ড, নং-১, পৃষ্ঠা-৫.

৮৬৫. পার্সী ব্রাউন কর্তৃক লিখিত 'ভারতের কেমব্রিজ ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৮.

৮৬৬. ফার্সি ব্রাউন কর্তৃক লিখিত 'ভারতের কেমব্রিজ ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪১-৪২.

www.pathagar.com

বারান্দা। এর সাথে রয়েছে হাম্মাম ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া তৈরি ও তাপ উপশমের সহায়ক ভূগর্ভস্থ কক্ষসমূহ।

ভবনগুলোর মধ্যে দৃষ্টিপাতের যেকোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য প্রবেশদ্বার ও দেউরিতে প্রত্যেকটি বাঁকে রয়েছে ঘোরানো পথ। কিছুসংখ্যক শয়ন কক্ষ ব্যতীত এতে রয়েছে প্রান্তদেশে লাল রেখাযুক্ত কালো বর্ণের দাদু চিত্রাঙ্কন শোভিত আধাবৃত দুটি শিবির।

দেওয়াল চিত্রাঙ্কনে অত্যন্ত সমৃদ্ধ আর একটি কক্ষের সাথে এটা হয়তো সামাজিক মেলামেশা ও বাসভবনের উৎসবাদির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। দুটি প্রবেশপথ ও কিছুসংখ্যক স্কাইহোল (skyhole) বিশিষ্ট তহখানা (ভূগর্ভস্থ কক্ষ) ছিল পছন্দনীয় গ্রীষ্মকালীন আশ্রয়স্থল। এই কক্ষটিতেও প্রাচীরের গায়ে সুন্দর চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। এর সামনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে অগভীর জলাশয় থেকে সঠিকভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থাসহ একটি প্রবাহমান নালা। এর পূর্বদিকে দুটি স্তরে দুটি পানির নালা ও ছোট জলাশয় প্রধান আবাসিক অংশকে যুক্ত করেছে উদ্যান ও হাওয়া মহলের সাথে। আবাসিক মহলের অংশের সামনে পূর্বপার্শ্বে রয়েছে টুকরো টুকরো আলগা পাথরের তৈরি পায়ে হাঁটা পথসহ ছয় ভাগে বিভক্ত অলংকরণযুক্ত উদ্যান এবং একটি অষ্টভুজাকার জলাশয় দ্বারা সমগ্র উদ্যানটিকে একটি মাত্র সাদৃশ্যপূর্ণ অখণ্ড বস্তুতে রূপদান করা হয়েছে।

আর. সি. গৌর আরো লিখেছেন : 'আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, আকবরের হেরেমে ছিল বিভিন্ন জাতির পাঁচ হাজার মহিলা এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য সম্রাট ব্যবস্থা করেছিলেন একটি করে আলাদা বাসস্থান। স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে অস্তিত্বশীল হেরেম সারার ভবনগুলো তাদের একটি ভগ্নাংশের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে এবং আরো কিছু আশা করা যায় যে, সম্ভবত উপরোক্ত ভুবনসমূহ ও রংমহলের মধ্যে আবার খননকাজ চালালে রাজকীয় হেরেমের সাথে সংযুক্ত আরও কিছু নির্মাণকাজ উন্মোচিত হবে।[৮৬৭] 'লাহোরের অন্দর মহল সম্বন্ধে ঠেস দেওয়া সুশোভিত ভাষায় উইলিয়াম ফিন্সের বিবরণের সাথে আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির নির্মাণশৈলীর মিল রয়েছে। সবচেয়ে বড় মহলের আছে দুইশ মহিলার ধারণক্ষমতা এবং সবচেয়ে জমকালো মহলে (কিন্তু আকৃতিতে ছোট) ষোলটি

৮৬৭. অধ্যাপক আর.সি গৌড় ২৪.৪.১৯৮৬ তারিখের পূর্বে লেখকদের কাছে টীকায় উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

বৃহদাকার বাসস্থান পরিচালনা করা সম্ভব। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত মহিলার ছিল ইট বা পাথর বসানো নিজস্ব উঠান, জলাশয় এবং তিনি সামান্য আনন্দ উপভোগ করতেন এবং তিনি নিজে ছিলেন জমিজমার অধিকারিণী।[৮৬৮]

পিলসার্ট জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রায় অবস্থিত দুর্গগুলো সম্বন্ধে বলেছেন– এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাহাঙ্গীরের মায়ের প্রাসাদ এবং যথাক্রমে ইতওয়ার (রবিবার), মঙ্গল (মঙ্গলবার) ও শনিচার (শনিবার) নামক তিনটি মহল যেখানে উল্লেখিত দিনগুলোতে সম্রাট ঘুমাতেন। পঞ্চম মহলটি ছিল বিভিন্ন জাতির মহিলাদের দ্বারা অধিকৃত।[৮৬৯]

শাহজাহান আগ্রা ও লাহোর দুর্গগুলোতে তাঁর পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত লাল বেলেপাথরে তৈরি অনেক ইমারত ভেঙ্গে ফেলেন এবং সেই স্থানে রাজকীয় মহিলাদের জন্য নির্মাণ করেন মর্মর পাথরের প্রাসাদ। আগ্রাতে তিনি খাসমহল, শীষমহল, মুসাম্মান বুরুজ ও আঙ্গুরিবাগের মতো অট্টালিকা নির্মাণ করেন। লাহোরেও নির্মিত হয় মুসাম্মান বুরুজ এবং তার সাথে শীষমহল, নৌলাখা এবং খোয়াব গাহ্। মনে হয় যে, শাহজাহানের তত্ত্বাবধানে মহলের বাসস্থানে কিছুটা চাপ হ্রাস পায়। কিন্তু খুব সম্ভব তা হয়নি, কারণ শাহজাহানের প্রিয় কন্যা জাহানারার কক্ষটি অবস্থিত ছিল আগ্রার শাহ বুরুজ ও সম্রাট শাহজাহানের শয়নকক্ষের মাঝখানে।

১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহান শাহজাহানাবাদ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজধানী শহর নির্মাণ শুরু করেন। সম্রাট দৌলত খান-ই-ওয়ালার ব্যবহার্য মহলগুলো, শাহজাদি জাহানারার ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ এবং অন্যান্য রাজকীয় মহিলার বাসস্থান ছিল পরস্পর সংযুক্ত এবং প্রত্যেকটির ছিল বিশিষ্ট নাম; যেমন– মতি মহল বা মুক্তার প্রাসাদ, হীরামহল বা হীরক প্রাসাদ এবং রংমহল বা চিত্রাঙ্কিত প্রাসাদ। এইগুলো নিয়ে গঠিত হয় রাজকীয় অন্দরমহল এবং সবগুলো কক্ষ ও মহল দুর্গের সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর এক সারিতে অবস্থিত ছিল।[৮৭০] এই নির্মাণ কাজগুলো এখনও বিদ্যমান আছে এবং সকলে তা দেখতে পাবেন এবং এগুলো আগ্রা বা লাহোর বা ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিত ইমারতগুলো কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ রানি ও শাহজাদি ব্যতীত শত শত ও হাজার হাজার মহিলাকে স্বতন্ত্র ও প্রশস্ত বাসস্থান দেওয়া সম্ভব নয়। বার্নিয়ার

---

৮৬৮. 'ভ্রমণ আরম্ভের পূর্বে' উইলিয়াম ফিন্স, পৃষ্ঠাগুলো-১৬২-৬৫, আমি সহজ করে পড়ার জন্য প্রয়োজনে তাহার মধ্যে কিছু বানান পরিবর্তন করেছি।

৮৬৯. পিলসার্ট কর্তৃক সম্পাদিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত', পৃষ্ঠা-৩, ৪.

৮৭০. ওয়ারিশ কর্তৃক রচিত 'বাদশাহনামা', পৃষ্ঠা-৪২: সালেহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩.

www.pathagar.com

পরিষ্কারভাবে এ ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নপুংসকদের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, রাজকীয় অন্দরমহলে ছিল নারীদের পদমর্যাদা অনুসারে স্বতন্ত্র এবং কম-বেশি প্রশস্ত ও চমৎকার বাসস্থান। প্রায় প্রত্যেকটি কক্ষের রয়েছে দরজার কাছে চৌবাচ্চা ও প্রবাহমান জলধারা, প্রত্যেক পাশে বাগান আর রয়েছে গভীর পরিখা যা দিনের বেলা সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করে উঁচু মন্ত্রণা গৃহ ও রাতে আরামে ঘুমানোর মতো চত্বর।[৮৭১] নদীর মুখোমুখি অবস্থিত সোনার পাত দ্বারা আবৃত খাশমহল সম্বন্ধে নপুংসকগণ মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসামূলক বর্ণনা করেছে এবং এর বাসস্থানগুলো সোনা ও চমৎকার আকাশি নীল রং ও জমকালো আয়না দ্বারা সজ্জিত। উইলিয়াম ফিন্স ও লাহোর দুর্গের প্রাচীরের গায়ে অঙ্কিত কতকগুলো চিত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করেন।[৮৭২]

বার্নিয়ার নিজে স্বচক্ষে প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ দর্শন করেননি। তাঁকে চোখবাঁধা অবস্থায় মহলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই নপুংসকরা তাঁকে যা বলেছিল তিনি শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। নপুংসকদের বর্ণনা ছিল অতিরঞ্জিত।[৮৭৩] প্রকৃতপক্ষে ফতেপুর সিক্রির যোধবাঈ প্রাসাদের কাছে মরিয়ম বাসস্থানটিকে যদি মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে আকবরের আমলে রানিদের ব্যক্তিগত কক্ষগুলো ছিল কিছুটা ছোট, বায়ু চলাচলের অনুপযোগী ও সংখ্যায় কম যদিও সব কক্ষ ছিল যথেষ্ট শোভিত। শাহজাহানের আমলে হেরেমে বসবাসের ব্যবস্থা সম্ভবত বেশি সংকোচনশীল ছিল না। তথাপি নারীদের পদমর্যাদা ও উপার্জন অনুসারে প্রাসাদের মধ্যে খুব কম গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের জন্য প্রশস্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. (গ) অনেক বিছানা বিশিষ্ট শয়ন কক্ষসমূহ, শামিয়ানা ও কুঠির

যাহোক, পদমর্যাদাসম্পন্ন এসব রানি ও শাহজাদি যাঁরা জমকালো বাসস্থান বরাদ্দ পেয়েছিলেন তাঁরা সেগুলোতে একাকী বাস করতেন না। তাঁদেরকে সর্বদা ঘিরে রাখত ডজন ডজন এমনকি কখনো শত শত পরিচারিকা, সঙ্গিনী, সংগীতজ্ঞ, নর্তকী, দাসী ও ক্রীতদাসী। তাঁদের জীবনের কর্মতালিকা ছিল আমোদ-প্রমোদ মূলক। প্রতিটি সন্ধ্যাই হতো ঐক্যতান সংগীত, নাচ জলসা বা উৎসব ও প্রমোদমুখর সন্ধ্যা। গুলবদন বেগম এই পরিবেশের একটি দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, সম্রাট হুমায়ুন প্রতি সন্ধ্যায় একজন বেগমের

---

৮৭১. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠাগুলো- ২৬৭-৬৮.

৮৭২. ফিন্স, পৃষ্ঠাগুলো-১৬২, ১৬৫.

৮৭৩. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠা-২৬৪.

www.pathagar.com

সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন এবং তাঁর এই সাক্ষাৎকার আনন্দপূর্ণ করার জন্য তিনি চেষ্টার কোনো ক্রটি করতেন না। তিনি এভাবে স্মৃতিচারণ করেন যে, একদিন তিনি (সম্রাট) এই তুচ্ছ ব্যক্তির শিবিরে (বাসস্থান) আসেন এবং রাতের তিন প্রহর পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ চলতে থাকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অনেক বেগম, তাঁর বোনেরা, পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা, অন্য মহিলারা, সংগীতজ্ঞ ও আবৃতিকারগণ।

রাতের তিন প্রহর পরে সম্রাট বিশ্রামের আদেশ প্রদানে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর বোনেরা ও বেগমেরা তাঁর উপস্থিতিতে বিশ্রামের জায়গা (তাকিয়া) তৈরি করলেন।[৮৭৪] গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা'র অনুবাদক মিসেস বেভারিজ একটি টীকায় উল্লেখ করেছেন, 'মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ের মতো তাঁরা যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন তোষকের উপরে এবং তাঁদেরকে বালিশ সরবরাহ করা হয়।[৮৭৫] এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অন্দরমহলের বাসিন্দারা আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন এবং এটা ছিল এক স্থান বা অন্য স্থানের প্রতিটি রাতের ব্যাপারে। আজও যেমন ভারতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে ঘটে তেমনিভাবে তাঁরা প্রমোদ অনুষ্ঠানের সময় যেখানে অবস্থান করতেন বা যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। যদিও গুলবদনের বর্ণনাটি হুমায়ুনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তথাপি তা ছিল সকল মোঘল সম্রাটের দৈনিক কর্মসূচির বিষয়। এতে নিম্নতর শ্রেণির নারীরা কোথায় থাকতেন তারও ইঙ্গিত বহন করে। শীত ও বর্ষাকালে খোলাস্থানে আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হতো না বা অন্দরমহলের বাসিন্দারা খোলা জায়গায় ঘুমাতেন না। তাঁরা ঘুমাতেন বারান্দায়, তাঁবুতে বা শামিয়ানার নিচে, কিন্তু একই কায়দায়। তাঁরা এক ধরনের ছোট ছোট ঘর ও অনেক বিছানা বিশিষ্ট শয়নকক্ষ তৈরি করতেন এবং সেখানে কাপড়, গহনার মতো তাঁদের মূল্যবান সামগ্রী ও পান পাত্র, ধাতু বা গজদণ্ড নির্মিত বাক্সের মধ্যে রাখতেন।[৮৭৬]

তাঁরা সকল পরিমাপের আয়না ও কাচের বাক্সের মতো বিশেষ ধরনের বস্তু সংগ্রহ করতেন যাতে ভেতরে রাখা যেকোনো বস্তু বাইরে থেকে দেখা

---

৮৭৪. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' পৃষ্ঠা-১৩০: মূল পাঠ্য বইয়ে খানা আক্ষরিকভাবে বাড়ি যাকে মিস্টার বেভারিজ তাঁবু হিসেবে গণ্য করেন। তারা কখনো কখনো তাঁবুতেও একস্থানে একত্রে জড়সড় হয়ে ঘুমাত। Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-১৮৯-১৯০.

৮৭৫. Loc. cit.

৮৭৬. তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১৬৩, ২০০.

www.pathagar.com

যায়।[৮৭৭] এ ধরনের জিনিস ইউরোপ থেকে খেলনার দোকানে তারা পেতেন এবং মোঘলরা এটা খুব পছন্দ করতেন এবং মহিলারা তার জন্য ছিলেন অতিরিক্ত আগ্রহান্বিত।[৮৭৮]

এই বহু বিছানা বিশিষ্ট শয়নকক্ষে তাঁরা দিনের বেলাতেও বিশ্রাম করতেন। যেহেতু হলঘরগুলোতে কোনো দরজা বা জানালা ছিল না সেহেতু হলঘরগুলোর উষ্ণতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা হতো স্তম্ভগুলোর মধ্যে রাখার উপযুক্তঘনভাবে বুননকৃত পর্দার দ্বারা। এর সাথে যুক্ত করা হতো বাঁশের সরু ফালি বা নলখাগড়া একত্রে বুনন করা রঙিন রশি দ্বারা বাঁধা জাফরিযুক্ত আবরণ যেগুলোকে বলা হতো ঝিলমিল, চিলমান বা চিকিস। পর্দা বা বাঁশের পাতলা ফালির আবরণ দ্বারা অবগুণ্ঠিত জানালার পেছনে নারীরা কষ্টে নিরূপণযোগ্য রহস্যের প্রহরারত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতেন। এ রকম একটি বিভজনকারী আবরণের মধ্য দিয়ে স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে) দুইজন রানির ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁদের পরনের হীরাগুলো চকচক করছিল এবং তাঁরা কৌতূহলবশত তাঁকে দেখার জন্য সামনে ঝুলন্ত একটি নলখাগড়ার জাফরিতে সামান্য ছিদ্র তৈরি করেছিলেন।[৮৭৯] অনুরূপভাবে সম্ভ্রান্ত মহিলারা নওরোজ, খোশরোজ ও ঈদের মতো উৎসব উপলক্ষে যখন রাজপ্রাসাদে আসতেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকতেন তখন তাঁরা একইভাবে ঘুমাতেন। সেই দিনগুলোতে কেউ স্নানাগার যুক্ত আলাদা কক্ষে বাস করতে পারতেন না। স্বাধীন বাসস্থানে বসবাসরত রানি বা শাহজাদিদের সংখ্যা ছিল খুব কম। অন্য অধিকাংশ মহিলাই বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ, ছোট ঘর বা বারান্দায় বিরতিহীনভাবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের প্রেরণায় দলবদ্ধ ও একতায় তাঁদের গল্প বিনিময়, কৌতূহল ও আবেগে দিন কাটাতেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের গোপনীয় বিষয় সর্বদা বলতেন না। এভাবে অন্যান্য দুর্গের মতো আগ্রা ও দিল্লির দুর্গেও হেরেমের বাসিন্দাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল কিছুটা এ রকম :

দুর্গের ঠিক প্রধান দরজা পার হয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে একটি বড় স্থান নির্দিষ্ট ছিল– ভৃত্য, দাসী, নর্তকী, কাঞ্চনী ও রাজগণিকাদের মতো রাজপ্রাসাদের অনুচরবর্গের সাদামাটা বাসস্থানের জন্য। তাদের বাসস্থানের প্রকৃতি অনুসারে

---

৮৭৭. Ibid., পৃষ্ঠা-১৬৫.

৮৭৮. গাওহার, পৃষ্ঠাগুলো-১২৪, ১২৭: আকবরের চেয়ে আওরঙ্গজেবের রাজ্য অধিক বিস্তৃত, পৃষ্ঠাগুলো-৬৮-৭১.

৮৭৯. আনসারী কর্তৃক 'মোঘলদের অধীনে ইউরোপীয় পর্যটকরা', পৃষ্ঠাগুলো-১২, ১৩.

www.pathagar.com

তাদের নগরীর বাইরে ও প্রাসাদের ভেতরে উভয় দিকে ছিল সহজ প্রবেশাধিকার। রাজগণিকা ও নর্তকীদের ঘেরা স্থানটিকে বলা হতো চক[৮৮০] এবং তাতে ছিল বাঁশ খড় ইত্যাদির ছাউনি এবং শক্ত বেত, বাঁশ, কাদামাটি ও সাদা চুনের তৈরি দেওয়াল। এসব বাসস্থান নগরীর একই রকমের অন্যান্য বাসস্থানের মতো বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অগ্নিকাণ্ডের শিকার হতো। এই সরকারি কর্ম এলাকার মধ্য দিয়ে একটি প্রশস্ত খিলানযুক্ত পথ সরাসরি চলে গেছে প্রধান তোরণ থেকে নহবতখানা, নকরখানা বা অর্কেস্ট্রা ভবন হয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তর পর্যন্ত। অর্কেস্ট্রা ভবনের তীক্ষ্ণ ও তেজোদীপ্ত সঙ্গীত প্রবাহ দূর হতে গম্ভীর,[৮৮১] জমকালো ও মধুর সুরে হেরেমের বাসিন্দাদের কানে এসে পৌঁছত। রাজপ্রাসাদের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস ইত্যাদির মতো ইমারতসমূহ। অবশিষ্ট এলাকা সংরক্ষিত থাকত রাজকীয় পরিবারের বসবাস ও তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। দিওয়ান-ই-খাস মহলটি মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্রাটের সাক্ষাতের জন্য এবং প্রধানত রাজকীয় মহিলাদের সাথে সম্রাটের বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হতো। দিওয়ান-ই-খাস এর গায়ে উৎকীর্ণ একটি দ্বিচরণ বিশিষ্ট লিপিতে বর্ণনা করা হয়েছে 'বেহেস্ত' বলে। এই শ্লোকে বলা হয়েছে : 'পৃথিবীতে যদি কোনো বেহেস্ত থেকে থাকে তবে তা এটাই, এটাই, এটাই।'[৮৮২]

এটা ছিল একটি বেহেস্ত কারণ হেরেমের হুরিরা প্রায়ই এখানে সমবেত হতেন। এর প্রত্যেক স্থানে স্তম্ভসমূহ ও ছাদের উপরে ছিল প্রচুর সোনা, রুপা ও মূল্যবান পাথর। মহলের অংশে ছিল মর্মর পাথর, চিত্রাঙ্কন, মোজাইক পাথর ও ভেতরে অন্যান্য অলংকার শোভিত বাসগৃহ, প্রশস্ত বারান্দা, বিশাল তাঁবু, ছোট ছোট ঘর ও প্রশস্ত অঙ্গন। পানির নালা ও চারদিকে পানির ঝর্ণাসহ বাগান দ্বারা এগুলো পরিবেষ্টিত ছিল। এগুলোর মধ্যে বসবাস করতেন প্রিয় পত্নীগন, পছন্দনীয় উপপত্নীগণ ও যুবতি শাহজাদিগণ, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাঁরা ঘুমাতেন মুক্ত স্থান বা বারান্দায়। অনেক মোঘল অনুচিত্রবলি দ্বারা এই সভ্যতা ফুটে উঠেছে।[৮৮৩]

---

৮৮০. 'ভ্রমণের শুরুতে ফিন্স', পৃষ্ঠা-১৮৩.

৮৮১. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠা-২৬০ ও n.

৮৮২. ভারতের কেম্ব্রীজ ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৬. ফার্সি ভাষায় পড়ুন-
আগর ফেরদাউস বদররু জামিন আস্ত,
হামিন আস্ত, হামিন আস্ত ওয়া হামিন আস্ত।

৮৮৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ লোকগীতি, মদ্যপান, আনন্দ উৎসব, হৈহল্লা ও মোঘল ভারতের চিত্রশিল্প হতে, পৃষ্ঠা-৩১.

www.pathagar.com

বার্নিয়ার জোর দিয়ে বলেছেন যে, জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদগুলো ঐশ্বর্যপূর্ণ[৮৮৪] এবং হেরেমের লোকেরা গ্রীষ্মকালে খোলা স্থানে নিদ্রা উপভোগ করতেন।[৮৮৫] বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং মহানগরীগুলোতে কবুতরের খোপের মতো ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণ শুরু হওয়া পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে পর্যাপ্ত মৃদুমন্দ বাতাস ও শীতকালে প্রচুর সূর্যকিরণের ব্যবস্থাসহ নির্মিত হতো ভারতের বিশাল বারান্দা ও অঙ্গনযুক্ত বাড়িঘর। মধ্যযুগের মানুষ পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা ও জলবায়ুর চাহিদা মোতাবেক জীবন যাপন করত।

মোঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষদের মতো মোঘল হেরেমের নারীদের ক্ষেত্রেও ছিল একটি ব্যাপার। বিলাসিতা ও আনন্দময় জীবনের সুবিধা ভোগ করত খুব অল্পসংখ্যক মানুষ; কাজ করে খাওয়া-পরাই ছিল অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যের লিখন। মহলের আকর্ষণীয় ও জমকালো কক্ষগুলো ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ রানি ও শাহজাদিদের জন্য সংরক্ষিত। মোল্লাতান্ত্রিক শাসননীতি অনুসারে নিচুস্তরের মহিলারা বারান্দা, বহু শয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ ও ছোট ঘরে বসবাস করত। শ্রমজীবী মানুষেরা বাস করত বাঁশ-খড়ের ছাউনিযুক্ত কাদামাটি ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত বাড়িঘরে। সকলকেই বসবাসের জায়গা দেওয়া হতো, কিন্তু সকলেই স্বতন্ত্র, প্রশস্ত ও চমৎকার বাসস্থানে বাস করত না।

৬. (ঘ) জনসংখ্যা অধিক ছিল না

মোঘল হেরেম একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত ছিল না : এর বাসিন্দারা বাস করতেন অনেক দুর্গ ও নগরীতে। মোঘল সম্রাটগণ সর্বদা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকতেন। সম্রাটের ভ্রমণের সময় হেরেমের সকল মহিলা তাঁর সঙ্গে যেতেন না। অল্পসংখ্যক নির্বাচিত মহিলা তাঁর সঙ্গে যেতেন। এমনকি সম্রাটের যাত্রাপথে তাদের অনেককে দুর্গ বা প্রাসাদগুলোতে রেখে যাওয়া হতো। আকবর তাঁদের অবস্থানের জন্য নির্মাণ করেন কিছুসংখ্যক ছোট প্রাসাদ। ডিলেট (১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে লিখেন) এর মতে, আকবর আগ্রা থেকে মাত্র কয়েক মাইলের প্রত্যেক ব্যবধানে নির্মাণ করেন মহিলাদের জন্য অনেক বাসস্থান এবং এর প্রতিটিতে ছিল ভৃত্যসহ ষোল জন করে মহিলার থাকবার জায়গা।[৮৮৬] এটা

---

৮৮৪. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠা-২৫৬.

৮৮৫. Ibid., পৃষ্ঠা-২৪০.

৮৮৬. ডিলেট কর্তৃক রচিত 'মহান মোঘলদের সাম্রাজ্য', পৃষ্ঠা-৪৪; ফিঞ্চ ও ফস্টার ভারত ভ্রমণ শুরু করেন (১৫৮৩-১৬১০); পৃষ্ঠা-১৪৯.

www.pathagar.com

হেরেমের বাসিন্দাদের অতিরিক্ত থাকবার ব্যবস্থা এবং সম্রাটকে তাঁর ভ্রমণকালে অনেক বিরতি স্থানে অতিরিক্ত বিনোদন প্রদান করত। তারিখ-ই-সেলিম শাহী বলেন যে, আহম্মেদাবাদে যাওয়ার পথে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে থাকতেন চারশতজন মহিলা।[৮৮৭] এবং এডওয়ার্ড টোরির মতে, জাহাঙ্গীরের তাঁবুতে সকল প্রকার এক হাজার মহিলা থাকতেন।[৮৮৮] যখন আওরঙ্গজেব (১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে) কাশ্মীরে যান তখন ফ্রান্সিস বার্নিয়ার ছিলেন তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে।

দিল্লি থেকে কাশ্মীরে যেতে প্রায়ই তিন মাস সময় লাগত। এবং রাজকীয় হেরেমের অনেক মহিলাকে দিল্লি, লাহোর, ভীমবার ও অন্যান্য স্থানে রেখে যাওয়া হয়। কাশ্মীরের পথে পর্বতময় বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রবেশের ঠিক আগে বার্নিয়ারের বিবরণ মতে আওরঙ্গজেব তাঁর সাথে খুব অল্পসংখ্যক প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলা, রওশন আরা বেগমের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের এবং যে মহিলাদের সেবাকার্য সহজে বর্জন করার মতো নয় তাঁদেরকে সঙ্গে নেন।[৮৮৯] যখন আওরঙ্গজেব দক্ষিণাত্যে ছিলেন তখন জীবন নিসা থাকতেন দিল্লির কারাগারে এবং তাঁকে সেখানে অল্পসংখ্যক মহিলা প্রহরীর প্রহরাধীনে একাকী অবস্থায় রাখা সম্ভব ছিল না। ফরাসি চিকিৎসক আরেকটি প্রসঙ্গে জানান যে, সম্রাট বাইরে থাকাকালে রাজকীয় অন্দরমহলের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা দিল্লিতে থাকতেন, কারণ তাঁর বর্ণনায় 'আমি মাঝে মাঝে রাজকীয় অন্দরমহলের মধ্যে প্রবেশ করেছি আমার পেশাগত পরামর্শ প্রদান করতে যখন সম্রাট দিল্লিতে অনুপস্থিত থাকতেন।'[৮৯০] রাজকীয় ব্যক্তিদের প্রবাস জীবন ও ভ্রমণ হেরেমের ওপরে বাসস্থান বিষয়ক চাপ কমিয়ে দিত।

আর একটি মনে রাখার মতো বিষয় এই যে, কোনো সম্রাটের মৃত্যু হলে তাঁর মহিলারা রাজপ্রাসাদ থেকে স্থানান্তরে যেতেন এবং এভাবে তারা উত্তরাধিকারী সম্রাটের হেরেমনিবাসীদের বসবাসের সুযোগ করে দিতেন। আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা পত্নীদেরকে তাঁর সমাধির পাশে সিকান্দ্রাবাদের কক্ষগুলোতে থাকার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৮৯১]

---

৮৮৭. তারিখ-ই-সেলিমশাহী, প[illegible]৪.

৮৮৮. টেরী ও ফস্টার 'ভা[illegible] শুরুতে' পৃষ্ঠা-৩২৯.

৮৮৯. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত '[illegible] সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠা-৩৯১.

৮৯০. Ibid., পৃষ্ঠা-২৬৭.

৮৯১. 'ভারত ভ্রমণের শুরুতে', ফিঙ্গ, পৃষ্ঠা-১৮৬: পিলসার্টও একটি বড় ঘেরের কথা উল্লেখ করেন, সেখানে ভূতপূর্ব সম্রাট আকবর জানালার দ্বারা আবাসন নির্মাণ করেন। পীলসার্ট, পৃষ্ঠা-৩.

www.pathagar.com

এমনকি জাহাঙ্গীরের মা লাহোরের শহরতলিতে বসবাস করতে শুরু করেন এবং সেই কারণে জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর ভ্রমণকালে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে দহর নামক গ্রামে গিয়েছিলেন।[৮৯২] অনুরূপভাবে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে নূরজাহান লাহোরে অবস্থান করেন এবং তিনি আর কখনো আগ্রায় বেড়াতে যাননি। যখন শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দি করা হয় তখন তাঁর হেরেমের সমস্ত বাসিন্দা ও নর্তকী তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং সেই সময় আওরঙ্গজেব তাঁর হেরেম দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৯৩]

দুর্গ ও মহলের বাইরে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অনেক রানি, শাহজাদা ও শাহজাদির নিজস্ব প্রাসাদ ছিল। আগ্রাতে নদীর সামনে ছিল রোকেয়া সুলতান বেগম ও জাহাঙ্গীরের বোন শাহজাদি বেগমের প্রাসাদ। নূরজাহানের অনুরূপ প্রাসাদ ছিল[৮৯৪] শুধু আগ্রাতে নয়, এমনকি লাহোর ও কাশ্মীরেও। জাহানারা বেগমের বেলাতেও সেই একই কথা। তাঁর লাহোরে অবস্থিত প্রাসাদটি ছিল শ্বেত মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত এবং তাতে ছিল একাধিক খাল, ঝর্ণা ও উদ্যান।[৮৯৫] দিল্লিতে তিনি রাজকীয় দুর্গের বাইরে নিজস্ব প্রাসাদে থাকতেন। যখন শাহজাহানাবাদ দুর্গ ও নগরী স্থাপিত হয় তখন অনেক শাহজাদা ও আমির তাঁদের নিজস্ব ভিলা ও হাভেলি নির্মাণ করেন এবং এগুলোর কয়েকটির নির্মাণ খরচ ছিল লক্ষ লক্ষ রুপি।[৮৯৬] প্রথানুসারে একজন শাহজাদাকে সম্রাটের হেরেম সারা ত্যাগ করতে হতো ষোল বছর বয়সে। যখন শাহজাদা খুররমের বয়স ষোল বছর তখন তাঁকে একটি আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর তাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখতে চাননি। তিনি রাজকীয় বাসস্থানের কাছে অবস্থিত দুর্গের মধ্যে উজির খান নামে অভিহিত মোহাম্মাদ মুকিমের বাসভবনটি অর্পণ করেন পুত্রকে।[৮৯৭] সম্রাট শাহজাদা খশরুকে দুর্গের বাইরে অবস্থিত মুনিম খানের বাসভবনটি নবায়ন করেন ও তার বসবাসের জন্য এক লক্ষ রুপি প্রদান করেন।[৮৯৮] অন্য আর একটি উপলক্ষে জাহাঙ্গীর শাহজাদা পারভেজকে মহব্বত খানের প্রাসাদে একটি

---

৮৯২. জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৬.
৮৯৩. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ, পৃষ্ঠাগুলো-২১, ১৬৬.
৮৯৪. পীলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো- ২, ৩; ডিলেট, পৃষ্ঠাগুলো-৩৭-৩৯.
৮৯৫. লাহোরী কর্তৃক রচিত 'পাদশাহ নামা', ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৫৪১, ৩৩১.
৮৯৬. সালেহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৪৯, ৪৯.
৮৯৭. সাক্সেসিনা, শাহজাহানের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১১.
৮৯৮. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি. ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২.

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা দেওয়ার আয়োজন করেন যখন মহব্বত খান ছিলেন অনুপস্থিত।[৮৯৯] আগ্রা ও দিল্লিতে ছিল মর্মর পাথরের ইমারত ও সুন্দর উদ্যানসহ দীপ্তিমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অসংখ্য জমকালো ভিলা এবং বাজেয়াপ্তকরণের ফলে সার্বভৌম মালিকানাধীন নগর ও নগরের উপকণ্ঠে অনেক রাজকীয় বাসভবন শাহী পরিবারের সদস্যদের দখলের উপযুক্ত হয়। এসব কারণে আবাসিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত চাপ প্রশমিত হয় এবং তার ফলে মোঘল হেরেম হয়ে ওঠে বাস্তবিকই আনন্দময়, উজ্জ্বল ও সুন্দর স্থানে যে কারণে তা যথার্থই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

৭. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মহলসমূহ

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হেরেমও ছিল মহল নামে পরিচিত। খুব অল্পসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মহল সম্রাটদের মহলের মতো পাথর ও মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিজাত বাসভবন ছিল ইট, পানি ছিটিয়ে ভিজানো চুন ও কাঠের দ্বারা নিম্নতর নির্মাণশৈলীতে তৈরি।[৯০০] এই কারণে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লি ও লাহোরের দুর্গগুলোতে অনেক রাজকীয় প্রাসাদ এখনো বিদ্যমান থাকলেও অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মনসবদারগণের অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী উপকরণ দ্বারা নির্মিত বাসস্থানগুলো এবং কিছুসংখ্যক শুধু কাদামাটির দেওয়াল এবং বাঁশ, খড় ইত্যাদির ছাদযুক্ত বাসস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[৯০১] কিন্তু সেগুলোর লিখিত বিবরণ এখনো আছে। সেগুলো দেখতে কেমন ছিল তা উইলিয়াম ফিন্স, এডওয়ার্ড টেরি, পিলসার্ট, বার্নিয়ার ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। টেরি ও পিলসার্ট আগ্রার বাসভবনসমূহ এবং বার্নিয়ার দিল্লির বাসভবনগুলো সম্বন্ধে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাদের বিস্তারিত বিবরণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসভবনে বেড়ানোর মাধ্যমে লব্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা নির্দেশ করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সেই বাসভবনগুলোতে তারা নিয়মিতভাবে নিমন্ত্রণ পেতেন। এটা আমাদেরকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও তাদের পত্নীরা কেমনভাবে জীবনযাপন করতেন সেই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে সাহায্য করে।

---

৮৯৯. তারিখ-ই-সেলিম শাহী, পৃষ্ঠা-২১৫.

৯০০. পীলসার্ট, পৃষ্ঠা-৬৬; টেরী, পৃষ্ঠা-৩৩০; ফিন্সের ভ্রমণের আরম্ভে, পৃষ্ঠা-১৮৫.

৯০১. জন জরদাইন, পৃষ্ঠাগুলো-১৬২-৬৩; বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-২৪৬; উইলিয়াম মুরল্যান্ডের আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত, পৃষ্ঠা-১৯৪.

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীরের আমল সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উইলিয়াম ফিন্স বলেন, 'আগ্রা শহর ও শহরতলি একদিকে সাত মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে তিন মাইল শহরটি অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে অবস্থিত এবং এর উদরের দিকে অবস্থিত আছে স্থলভাগ। যমুনা নদীর তীরে রয়েছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অনেক সুন্দর বাসভবন যেগুলোর ওপর থেকে দেখা যায় রূপসী যমুনাকে।'[৯০২] পিলসার্ট একথাও বলেছেন যে, প্রত্যেকেই নদী তীরের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে নদীর সম্মুখভাগ সকল প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য ব্যক্তির দামি প্রাসাদে ভরে গেছে এবং তাতে নদী তীরবর্তী স্থানটিকে আনন্দময় ও জমকালো বলে মনে হয়।[৯০৩] তিনি আরও বলেছেন যে, আগ্রার চারপাশের বর্ধিষ্ণু কুঞ্জগুলো দেখে একে শহর বলে নয়, বরং রাজকীয় উদ্যান বলে মনে হয়।[৯০৪]

অভিজাত ব্যক্তিদের বাসভবন সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর লিখেন যে, অনেক ব্যক্তি নির্মাণ করেছেন তিন বা চারতলা দালান।[৯০৫] তাঁর আমলের একজন খ্যাতিমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন আসফখান এবং উইলিয়াম ফিন্স তাঁর প্রাসাদের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ' আসফখানের বাসভবনের পূর্ব পার্শ্বে আছে তাঁর ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পায়ে চলা পথ বিশিষ্ট (সরল বর্গীয় গাছ রোপণ করা), বহু রকমের জলাশয় ও প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থাসহ একটি উদ্যান। এর প্রান্তদেশে রয়েছে তার মহিলাদের জন্য সুন্দরভাবে পরিকল্পিত নানাবিধ বাসস্থান যুক্ত একটি মনোরম দিবানখানা এবং এর সাথে রয়েছে দর্শকদের সারিবদ্ধ আসন ও পায়ে চলার পথ।[৯০৬] আসফখানের প্রাসাদটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও মূল্যবান,[৯০৭] কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসভবনগুলোর নির্মাণশৈলী ছিল একই রকমের। ইমারতের এক অংশ জুড়ে ছিল দিওয়ান খানা বা পুরুষদের আবাসিক ব্যবস্থা, যেখানে অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁদের বন্ধু ও অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদেরকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং বৃহত্তর অংশটি ছিল মহিলাদের দখলে এবং তা জেনানা খানা হিসেবে অভিহিত হতো।[৯০৮]

ট্যাভারনিয়ারের মতে, ' সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসস্থানে মহিলাদের থাকার জায়গা এর মধ্যে অবস্থিত এবং সেখানে পৌছানোর জন্য দুই বা তিনটি বৃহৎ

---

৯০২. ফিন্সের ভ্রমণের আরম্ভে, পৃষ্ঠাগুলো-১৮২, ১৮৫; তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩.
৯০৩. পীলসার্ট, পৃষ্ঠা- ২.
৯০৪. Ibid.. পৃষ্ঠা-১.
৯০৫. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩.
৯০৬. ফিন্সের ভ্রমণের আরম্ভে, পৃষ্ঠা-১৬৫.
৯০৭. পীলসার্ট কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত', পৃষ্ঠা- ৩.
৯০৮. ফস্টার ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-৫৬; পীলসার্ট কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত', পৃষ্ঠা- ৬৭.

www.pathagar.com

গৃহ প্রাঙ্গণ এবং দুই একটি উদ্যান আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করতে হয়।[৯০৯] এসব বাসস্থানে দুটি জিনিসের বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন হতো– পর্যাপ্ত টাটকা পানি ও গ্রীষ্মে গরমের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা। নদী থেকে বা প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে খননকৃত কূপ থেকে টাটকা পানি সংগ্রহ করত। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়াতে জলাশয়গুলো প্রতিদিন পরিপূর্ণ করা হতো টাটকা পানি দ্বারা। এ রকম জলবায়ুতে পানি এবং গাছপালার সজীবতা ও বিনোদনস্বরূপ। এই পানি বলদ দ্বারা বহন করে আনা হতো এবং মাঝে মাঝে চাকার সাহায্যে এমন পরিমাণে উত্তোলন করা হতো যাতে তা পানিপূর্ণ নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঝরনার মতো উত্থিত হয়।[৯১০]

দিল্লির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসভবনগুলো সম্বন্ধে বার্নিয়ারের মতামত আগ্রার বাসভবনগুলো সম্বন্ধে পিলসার্টের মতামতের অনুরূপ। এসব গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে একটি বাসভবনকে সুন্দর বলে বিবেচনা করা হয় যদি তা হয় প্রশস্ত এবং যদি আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থা পর্যাপ্ত বায়ুপূর্ণ এবং সকল দিক বিশেষত উত্তরের হাওয়া খোলামেলাভাবে প্রবাহিত হয়।[৯১১] একটি ভালো বাসভবনে থাকে উঠোন, উদ্যান, বৃক্ষ, গোলাকার পানির পাত্র, হলঘরে বা প্রবেশ পথে সংকীর্ণ স্থান হতে বহির্গত ক্ষুদ্র পানির ঝরনা। তিনি বলেছেন যে, সেখানে ছিল ভূগর্ভস্থ বড় বড় পাখা দ্বারা শীতল করা সুন্দর বাসগৃহ। এই বাসগৃহগুলো ছিল দুপুর থেকে বিকাল চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আদর্শস্থানীয়। কোনো ভালো বাসস্থান উচ্চ সমতল স্থানবিহীন ছিল না; উচ্চ সমতল স্থান ছিল পরিবারের লোকজনদের রাতে ঘুমানোর জায়গা।[৯১২]

টেবিল, টুল, বেঞ্চ, তাকযুক্ত আলমারি ইত্যাদি খুব বেশি প্রকার আসবাবপত্র দ্বারা বাসভবনে তালগোল পাকানো হতো না।[৯১৩] ঘরগুলোর পার্শ্ব দেওয়ালে রুচিসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মেঝে হতে পাঁচ-ছয় ফুট উপরে বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতির কুলঙ্গি তৈরি করা হতো এবং সেগুলোতে চীনামাটির বাসনপত্র ও ফুলদানি রাখা হতো। দেওয়ালগুলোতে ছিল সুন্দর রঙের আঁকা চিত্রাবলি। মির্জা আজিজ কোকার প্রাসাদে বৈঠকখানাগুলো সাজানো ও সেগুলোর প্রাচীরের দেওয়ালগুলো রং করা হয়েছিল মোল্লা আব্দুস সামাদ

---

৯০৯. ট্যাভারনিয়ার ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৩.

৯১০. পীলসার্ট কর্তৃক রচিত 'জাহাঙ্গীরের ভারত', পৃষ্ঠা- ৬৬.

৯১১. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ, পৃষ্ঠা-২৪৭.

৯১২. Ibid., পৃষ্ঠা-২৫৭.

৯১৩. মানুচী ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৭.

www.pathagar.com

শিরিন কালামের সমতুল্য চিত্রাশিল্পীর দ্বারা।[৯১৪] ভেতরের ছাদগুলোও ছিল গিলটি করা ও রং মাখানো।[৯১৫] গোটা মেঝেটি ছিল চার ইঞ্চি পুরু তুলার গদি দিয়ে আবৃত ও তার উপরে গ্রীষ্মকালে বিছিয়ে দেওয়া হতো একটি মিহি সাদা কাপড় এবং শীতকালে রেশমের গালিচা। এগুলো ঢেকে রাখা হতো বুটি তোলা রেশমি বস্ত্র, মখমল বা ফুলতোলা রেশমি বস্ত্র দ্বারা।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হেরেমের মহিলারা এমনকি তাদের বাসনপত্র ও খানাপিনার কাজে সোনা ও রুপার ব্যাপক ব্যবহার করতেন।[৯১৬] পিলসার্টের ভাষায়, 'তাঁদের মহলগুলো অতিরিক্ত জাঁকজমক অলংকারপূর্ণ সুদক্ষ রুচিসম্মতভাবে ভেতরে সাজানো এবং তা অন্তঃসারশূন্য গর্বের বিষয়বস্তু নয়।'[৯১৭] এমনকি তাদের খাটগুলো ছিল সোনা ও রুপা দ্বারা অলংকৃত।[৯১৮]

কেউ কেউ মাটি থেকে একটু উপরে চারটি খুঁটির সাথে রশি দ্বারা বেঁধে তাদের বিছানাগুলোকে বিছিয়ে রাখতেন দোলনার মতো করে। তাঁদের ভৃত্যরা এটাকে তাদের ঘুম পাড়াতে আস্তে আস্তে দোলাত।[৯১৯] সম্রাটের হেরেমের তুলনায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হেরেম ছিল আকারে ছোট। বিধান মোতাবেক তাঁদের ছিল তিন বা চারজন স্ত্রী যাঁরা যোগ্য ব্যক্তিদের কন্যা। কিন্তু বয়সে বড় পত্নী সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তারা সকলে উঁচু প্রাচীর ঘেরা স্থানে একত্রে বাস করতেন। প্রত্যেক পত্নীর ছিল আলাদা নিজস্ব বাসস্থান ও ক্রীতদাসী। বেগমের ভাগ্য অনুসারে তাদের সংখ্যা ছিল ১০ জন বা ২০ জন বা ১০০ জন। প্রত্যেক পত্নীর ছিল নিজস্ব খরচের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতা। প্রত্যেক স্বামী তাঁর পত্নীর প্রতি ভালোবাসার পরিমাণ অনুযায়ী প্রদান করত বস্ত্র ও অলংকার। তাঁদের খাদ্য আসত একই রান্নাঘর থেকে, কিন্তু প্রত্যেক পত্নী তার খাদ্য নিজ বাসস্থানে নিয়ে যেতেন কারণ তারা গোপনে পরস্পরকে ঘৃণা করত। যদিও তা তারা খুব কম বা কোনো সময়ই প্রকাশ পেতে দিত না তাদের স্বামীর অনুগ্রহ পাওয়ার বাসনায়। তারা স্বামীকে মানুষ নয় বরং দেবতার মতো ভয়, সম্মান ও ভক্তি করত।[৯২০] অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল

---

৯১৪. সায়েখ ফরিদ বাখারি ও জাকিরুল আল খাওয়ানিন; সম্পাদনায় সৈয়দ মঈনুল হক (করাচী) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮৭ মাসির-উল-ওমরাহ, প্রকাশ ভারত, পৃষ্ঠা-৬২৮.

৯১৫. বার্নিয়ার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠাগুলো-২৪৭-৪৮.

৯১৬. পীলসার্ট, পৃষ্ঠা-৬৭.

৯১৭. Ibid., পৃষ্ঠা-৬৪.

৯১৮. Ibid., পৃষ্ঠা-৬৭; মানুচী ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৮৭.

৯১৯. টেরী, পৃষ্ঠা-৬০.

৯২০. পীলসার্ট, পৃষ্ঠাগুলো-৬৪-৬৫.

www.pathagar.com

রাজকীয় হেরেমের মতোই। সেখানে প্রহরার জন্য নপুংসকগণ এবং বাড়তি প্রমোদের জন্য ছিল উপপত্নী ও ক্রীতদাসীরা।

পিলসার্ট লক্ষ করেন যে, আগ্রাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাসস্থানগুলো গলি ও ঘোনা জায়গাতে লুক্কায়িত ছিল[৯২১] এবং বার্নিয়ার দেখতে পান যে, দিল্লিতে ওমরাহদের বাসস্থানগুলো বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ছিল।[৯২২] মানুচীও এই মতামত প্রকাশ করেন যে, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাদের বাসস্থানকে রাজকীয় প্রাসাদ থেকে দূর হওয়াতে অত্যন্ত তুষ্ট।[৯২৩] এর কারণ ছিল রাজদরবারে বিরাজমান পারস্পরিক ভীতি ও সন্দেহ এবং রাজকীয় হেরেমের ষড়যন্ত্র।[৯২৪] এছাড়া এসব ব্যক্তি অলসতাজনিত আনন্দ ও নারীসঙ্গ উপভোগ করতেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সম্রাটের খুব কাছাকাছি থেকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ ত্যাগ করতেন।

মানুচী এতদূর পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সম্রাট কী কারণে, কখন, কোথায়, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থান করেন সেই সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তাদের কবুতরগুলোকে প্রশিক্ষণ দিতেন এবং সরকারি ও রাজদরবার সংক্রান্ত কর্তব্য পালন ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করত না[৯২৫] যাতে তারা তাদের সুন্দরী ললনাদের বিরামহীন অন্তরঙ্গ মেলামেশা উপভোগ করতে পারে।

---

৯২১. Ibid., পৃষ্ঠা-১.

৯২২. বার্নিয়ার সম্পাদনায় 'মোঘল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ', পৃষ্ঠা-২৪৭.

৯২৩. মানুচী ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৬৭.

৯২৪. ইনফ্রা অধ্যায় অষ্টম দেখুন।

৯২৫. মানুচী, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৬৭.

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
রাজকীয় মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলির কয়েকটি দিক

মোঘল হেরেমের মহিলারা বিভিন্ন কার্যকলাপ, আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনে ব্যস্ত থাকতেন। কঠোর পর্দাপ্রথার কারণে তাঁরা তাঁদের অবসর সময় প্রধানত বাগানে ও শ্বেতপাথরের উঁচু সমতল ছাদে অতিবাহিত করতেন। সমসাময়িক চিত্রকর্মে তাঁদেরকে শান্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বসে থাকতে বা গল্প করতে, কখনো কখনো তাদেরকে পরিচারিকারা পাখার বাতাস করতে বা অঙ্গ মর্দন করতে দেখা যায়।[৯২৬] তারা বাস করতেন ফুলের সারি ও প্রবাহিত ঝরনাসহ প্রশস্ত উঠানবিশিষ্ট প্রাসাদে।[৯২৭] তাঁরা জানালা থেকে তাঁদের বাইরের জগতের দৃশ্যও দেখতে পেতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ধর্মকর্ম ও সাহিত্যকর্মে নিবেদিতপ্রাণ। অন্যরা তাদের সময় অতিবাহিত করতেন সঙ্গীত, নৃত্য ও চারুকলাতে। তাদের অনেকেই পর্যটন ও প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন কিন্তু তাদের অধিকংশই আগ্রহী ছিলেন পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধন সামগ্রী ও অলংকারের প্রতি।

১. বিনোদন

কখানো কখনো ধূমপান ও মদের পেয়ালা তাদের আমোদ-প্রমোদকে বাড়িয়ে দিত এবং তারা প্রায়ই কিছুটা ধূমপান ও মদ্যপান করত আরো প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধূমপান (হুক্কা) খুব জনপ্রিয় হয়ে যায়।[৯২৮] এটা ব্যবহার হতো অতিথি আপ্যায়নেও। মদ্যপান ছিল খুব সাধারণ ব্যাপার।[৯২৯] মানুচী বলেন, 'রাজকীয় মহিলারা রাতে সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও

---

৯২৬. কুমুদি, পৃষ্ঠা ৪৩.

৯২৭. স্টুয়ার্ট রচিত 'বিখ্যাত মোঘলদের উদ্যান ' পৃষ্ঠা ২২০.

৯২৮. কুমুদি, পৃষ্ঠা ৪২.

৯২৯. চিত্রে মহিলাদের সামনে মদ ও মদের পেয়ালা রাখা হচ্ছে এমন দেখা যায়। বিকানীরের চিত্র, পৃষ্ঠাগুলো ১৭৪-৭৫.

www.pathagar.com

অন্যান্য আনন্দপূর্ণ কৌতুকের সময় মদ্যপান করত।[৯৩০] মহিলাদের মদ ব্যবহার সম্বন্ধে সমসাময়িক হিন্দি সাহিত্যে উল্লেখ আছে।[৯৩১] আনন্দের সময় কাটানোর জন্য রাজকীয় মহিলারা দাবা, চৌপার, চাণ্ডাল মাণ্ডাল এবং পাচিসির মতো খেলা খেলত।[৯৩২]

(ক) চৌপার ও চাণ্ডাল মাণ্ডাল খেলা

এই খেলার শুরুতে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তাদের ঘুঁটিগুলোকে একই মধ্যম সারির ৬ষ্ঠ ও ৭ম ক্ষুদ্রাকৃতি বর্গক্ষেত্রের স্থানে রাখতে হতো এবং ৭ম ও ৮ম ঘরে অন্য দুটি ঘুঁটি রাখতে হতো। বাম সারিটি শূন্য অবস্থায় রাখা হতো। প্রত্যেক খেলোয়াড় তার চাল অনুসারে তার ঘুঁটিগুলোকে চাল আরম্ভের আগের অবস্থান থেকে বাম দিকের সারিতে না পৌঁছা পর্যন্ত ঘুঁটিগুলো ক্রমান্বয়ে স্থাপন করত। তারপর তাকে মাঝখানের শূন্য ঘরগুলোতে ঘুঁটির চাল দেওয়া হতো এবং তখন তাকে শূন্য বর্গাকৃতি ঘরে তার প্রত্যেকটি ঘুঁটি পৌঁছানের জন্য অনুরূপ সংখ্যক চাল দেওয়া হতো। তবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতো। যদি চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে যেকোনো একজন তার চারটি ঘুঁটি শূন্য বর্গাকৃতি ঘরে আনতে সক্ষম হতো তবুও তাকে তার চাল দেবার জন্য তার সঙ্গীর খেলা শেষ করার উদ্দেশ্যে ঘুঁটি চালাতে হতো। চাণ্ডাল মাণ্ডাল খেলায় এটা ছিল বিশেষভাবে উন্নত ধরনের চৌপার খেলা যাতে ১৬ জন খেলোয়াড় থাকত তাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টনকৃত মোট ৬৪টি ঘুঁটি নিয়ে খেলা হতো। এই খেলার ঘুঁটিগুলোর চাল চৌপারের মতই দেওয়া হতো। এতে থাকত ২৪টি সমান ছোট আকৃতির ঘরবিশিষ্ট তিনটি সারি ও তিনটি ফাঁকা জায়গাসহ ১৬টি সামান্তরিক ক্ষেত্র। এই সামন্তরিক ক্ষেত্রগুলো একটি কেন্দ্রের চারদিকে বৃত্তাকারে সাজানো হতো। এতে বাজি ধরারও অনুমতি থাকত। জীবন নিসা বেগম বিশেষ করে চৌপার খেলা পছন্দ করতেন।[৯৩৩] আকাশে কবুতর ও ঘুড়ি

---

৯৩০. মানুচীর মতে, জাহানারা বেগম ছিলেন বিশেষ করে মদ পানে আসক্ত। তিনি বলেন, শাহজাদির জন্য পারস্য, কাবুল, কাশ্মীর থেকে আমদানিকৃত মদ তাঁর পছন্দ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো যে মদ তিনি পান করতেন তা পরিস্রুত করা হতো তাঁর নিজ বাসভবনে। এটা ছিল অনেক মসলা, উত্তেজক ঔষধ দ্বারা সুবাসিত মদ ও গোলাপজল থেকে প্রস্তুত সবচেয়ে সুস্বাদু পানীয়।' মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৯.

৯৩১. সাতসী বিহারী, দোহাজ, পৃষ্ঠাগুলো ১২৭-২৮

৯৩২. বিভিন্ন চিত্রে নিন্মোক্ত খেলায় মহিলাদেরকে ব্যস্ত দেখা যায় দাবা, চৌপার। পৃষ্ঠাগুলো ২৬-২৭.

৯৩৩. যদুনাথ সরকারের 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠা ৮২.

www.pathagar.com

ওড়ানো ছিল তাঁদের প্রিয় অবসরকালীন বিনোদন।[৯৩৪] মনে হয় রাজকীয় মহিলারা মাঝে মাঝে পোলো খেলতেন যদিও তাঁদের কঠোর পর্দার কারণে এটা বিশ্বাস করা দুষ্কর।[৯৩৫] রাজকীয় মহিলাদের আরেকটি চিত্তাকর্ষক বিনোদন ছিল আতশবাজি। মানুচী বলেন, ' সাধারণত তাঁদের নৈশকালীন বিনোদন হচ্ছে বড় বড় মশালগুলো প্রজ্জ্বালিত করা এবং এজন্য তাঁরা দেড় লক্ষ রুপি ব্যয় করতেন।'[৯৩৬] শিল্পীর আঁকা কতকগুলো চিত্রে রাজকীয় মহিলাদেরকে আতশবাজি খেলতে দেখা যায়।[৯৩৭]

(খ) ধর্মনুরাগ

কিছুসংখ্যক রাজকীয় মহিলা ছিলেন ধর্মচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ। তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনায় সময় কাটাতেন; নামাজ আদায় করতেন ও কোরআন তেলোয়াত

---

৯৩৪. কামুদী, পৃষ্ঠাগুলো ২৬-২৭.

৯৩৫. বেনিঅনের দ্বারা মোঘলদের জাঁকজমকপূর্ণ রাজদরবারের ৭ম নং চিত্রে একজন শাহজাদিকে পোলো খেলতে দেখা যায়। পৃষ্ঠা ১৮.

৯৩৬. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১.

৯৩৭. কুমুদী , পৃ'৫৫.

www.pathagar.com

করতেন। জাহানারা ধর্মীয় কাজে ঈশ্বরের আরাধনায় যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন।[৯৩৮] তিনি তাঁর রিসালা-ই-শাহীরিয়াতে লিখেন যে, আল্লাহ্ তাঁর মধ্যে সত্য পথ অন্বেষণের প্রবল ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন।[৯৩৯] শাহজাদি জাহানারা চিশতিয়া তরিকার ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ভাই দারাশিকো তাঁকে কাদেরিয়া তরিকায় দাখিল হতে প্রেরণা জুগিয়েছেন।[৯৪০] তিনি মোল্লা শাহকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু (মুর্শিদ) হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯৪১] তিনি লিখেন, 'তৈমূরের সকল উত্তরসূরির মধ্যে আমরা দুই ভাইবোন এই আনন্দ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করি। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউই কখনো আল্লাহর সন্ধানে এই সত্য পথের খোঁজ করেননি...।'[৯৪২] বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব ধর্মের প্রতি আগ্রহী হন এবং তাঁর হেরেমের মহিলারা (কন্যারা) তাঁর নির্দেশে ধর্মতত্ত্বের সকল প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করেন এবং সকলেই আল্লাহ্র ইবাদত, কোরআন চর্চা ও কোরআন নকল, ধর্মীয় গুণাবলি অর্জন ও পরকালের জন্য নিয়োজিত থাকতেন।[৯৪৩] দ্বিতীয় কন্যা জীনাত-উন-নিসাকে আওরঙ্গজেব ধর্মবিশ্বাসের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা শিক্ষা দিয়ে লালন-পালন করেন।[৯৪৪] তাঁর অন্য দু'জন কন্যা জীবন-নিসা ও বদরুন-নিসা কোরআন মুখস্থ করেন এবং পরবর্তীতে ধর্মের ওপরে অধ্যয়ন করেন।[৯৪৫]

(গ) শিক্ষাদীক্ষা

রাজপরিবারের মহিলাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া। তাঁরা পড়া, লিখা ও কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতেন। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা লাভের জন্য রাজপ্রাসাদের বালিকারা প্রায়ই সমবেত হতো।[৯৪৬] কখনো কখনো স্কুল শিক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকার কাজ একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হতো এবং তাঁকে

---

৯৩৮. ইয়াজদানী কর্তৃক পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক সমাজের পত্রিকায় জাহানারা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯১২ পৃষ্ঠা ১৬৩.
৯৩৯. জাহানারা বেগমের রিসালা-ই-শাহীরিয়ার পাণ্ডুলিপি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৪০. বি. হাসরাতর কর্তৃক রচিত দারাশিকোর জীবন ও কাজকর্ম, পৃষ্ঠাগুলো ৮২-৮৩.
৯৪১. Ibid.
৯৪২. Ibid. পৃষ্ঠা ৮৪.
৯৪৩. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৩১৮.
৯৪৪. Ibid. পৃষ্ঠা ৩২৩.
৯৪৫. আওরঙ্গজেবের আরেকজন কন্যা যাবাদাত-উন-নিসা আল্লাহর আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন এবং এভাবে অনেক পুরস্কার লাভ করেন, মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৩২৩.
৯৪৬. এস. কে. ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত বাবরের কয়েকজন মহিলা আত্মীয়া, পৃষ্ঠা ৫৩.

www.pathagar.com

অতুন মামা বলে অভিহিত করা হতো।[৯৪৭] গুলবদন বেগমের মরমি ভোজসভার অতিথিদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে এ রকম একজন অতুন মামার সম্বন্ধে।[৯৪৮] আকবরের শাসনকালে রাজকীয় হেরেমের নারীদের নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণকারী মুনসিরেট নারী শিক্ষার প্রতি সম্রাট আকবরের আগ্রহ সম্বন্ধে বলেন, 'তিনি রাজকন্যাদের শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন এবং খুব যত্ন নেন। তাঁদেরকে পড়তে ও লিখতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তত্ত্বাবধায়িকারা তাঁদের রীতিতে শিক্ষা দেন।'[৯৪৯] আকবর ফতেপুর সিক্রিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৯৫০] মোঘল সম্রাটগণ সচরাচর পারস্যের শিক্ষিত মহিলাদের তাঁদের কন্যাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ করতেন।[৯৫১] শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব তাঁদের কন্যাদের জন্য এ ধরনের শিক্ষিকা রাখেন। তাঁদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফার্সি ও আরবি ভাষা শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি।[৯৫২] কয়েকজন রাজকীয় মহিলা কোরআন মুখস্থ করেন এবং অন্যরা শেখসাদী সিরাজী কর্তৃক রচিত গুলোস্তান ও বোস্তান গ্রন্থ পাঠের প্রতি আগ্রহী হন।[৯৫৩] অভিজাত পরিবারের মহিলারাও তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষা লাভ করতেন।[৯৫৪] মোঘল হেরেমে প্রথম যে মহিলা সক্রিয়ভাবে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন তিনি হলেন বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম। তিনি ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হন কবিসুলভ প্রতিভায় আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং তিনি কবিতা রচনা করতেন।[৯৫৫] তিনি আকবরের অনুরোধে সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলির বিবরণসহ হুমায়ুননামা রচনা করেন। এটা ঐতিহাসিক তথ্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার। সাহিত্যিক কার্যাবলিতে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল ও বিস্তীর্ণ। তিনি ছিলেন গ্রন্থ অনুরাগী। মনে হয় তিনি বই সংগ্রহ করতেন এবং এভাবে তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল।[৯৫৬] বাবরের

---

৯৪৭. Ibid. পৃষ্ঠা ৫৩; মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১.

৯৪৮. গুলবদনের হুমায়ুন নামা (ব্যাভারিজের অনুবাদ), পৃষ্ঠা ১২১.

৯৪৯. মুনসিরেট, পৃষ্ঠা ২০৩.

৯৫০. ল পৃষ্ঠা ২০৩: জাফর , পৃষ্ঠা ১৯০.

৯৫১. সরকারের মোঘল ভারতের অধ্যয়ন , পৃষ্ঠা ৩০১.

৯৫২. Ibid.

৯৫৩. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩১.

৯৫৪. সরকারের মোঘল ভারতের অধ্যয়ন, পৃষ্ঠা ৩০১.

৯৫৫. বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩৬.

৯৫৬. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠা ৭৬. ল পৃষ্ঠাগুলো ২০১-২.

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কন্যা গুলরুখ বেগমেরও ছিল কাব্যপ্রীতি এবং তিনি কিছুসংখ্যক কবিতা রচনা করেন।[৯৫৭] সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে আরেকজন প্রখ্যাত মহিলা হলেন সম্রাট হুমায়ুনের ভাগ্নি সেলিমা সুলতান বেগম। তাঁর স্বামী বৈরাম খানের মৃত্যুর পর তিনি আকবরকে বিবাহ করেন। তিনি ফার্সি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন এবং মাকফি ছদ্মনামে কবিতা লিখে সাহিত্য ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন।[৯৫৮] তিনি একটি নিজস্ব লাইব্রেরি পরিচালনা করতেন।[৯৫৯] আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের কন্যা জান বেগমও একজন গুণবতী মহিলা হয়ে যান। কথিত আছে যে, তিনি কোরআন সম্বন্ধে একটি ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করেন এবং আকবর তাঁকে এই কাজের জন্য ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার দেন।[৯৬০] তিনি তাঁর উদারতা ও বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সুবিদিত হন।[৯৬১] শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন নূরজাহান বেগম। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন ও সংস্কৃতিবান মহিলা এবং তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে তিনি পারস্য কবিতার প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন।[৯৬২] তিনি মূল্যবান বইয়ের একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা করতেন।[৯৬৩] নূরজাহান বেগমের পারিষদবর্গের মধ্যে কয়েকজন যোগ্য মহিলা কবি ছিলেন। শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলও সাহিত্যে রুচিবোধসম্পন্ন হয়ে উঠেন। তিনি ফার্সি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং কবিতাও লিখতে পারতেন।[৯৬৪] তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত কবি বানশিধারা মিশ্রা ছিলেন মমতাজ মহলের প্রিয়পাত্র।[৯৬৫] মমতাজ মহলের নাজির সিত্তিউন নিসা ছিলেন

---

৯৫৭. বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩৯.

৯৫৮. ব্লকম্যানের আইন-ই-আকবরির অনুবাদে এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯। ইকবালনামা, পৃষ্ঠা ৬৮; কাফিখান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৬; বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪০। মাসির-ই-আলমগিরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭১; দুটি লাইন তুলে ধরা হলো।
অনুভবে বলেছিলুম তোমার অলকগুচ্ছকে জীবন সূত্র,
আমি উন্মোদনায় ছিলুম বলেই এমন বলে ছিলুম।

৯৫৯. বাজম,ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪০।

৯৬০. Ibid পৃষ্ঠা ৪৪২; শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৫৮৯; পি. এন চোপরা কর্তৃক লিখিত মোঘল আমলের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১২৪।

৯৬১. বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪২।

৯৬২. ল, পৃষ্ঠা ২০২;জাফর, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৯৬৩. বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪৩।

৯৬৪. বাজম-ই-তাইমুরিয়া, পৃষ্ঠা ৪৪৩।

৯৬৫. ল, পৃষ্ঠা ২০২; জাফর পৃষ্ঠা ১৯৫; বাজম, পৃষ্ঠা ৪৪৭।

www.pathagar.com

একজন বিদুষী মহিলা। ফার্সি ভাষায় তার ভালো জ্ঞান ছিল এবং ইসলামের ধর্মতত্ত্বে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর সাহিত্যিক গুণাবলির জন্য তিনি জাহানারা বেগমের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন।[৯৬৬] সিত্তিউন নিসা একজন ভালো মহিলা কবিও ছিলেন।[৯৬৭]

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা বেগম ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা।[৯৬৮] হাকিমরাখনা কাশির ভাই নাজির তাঁকে কোরান ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেন।[৯৬৯] তাঁর ভাই দারার মতোই তাঁর মধ্যেও ছিল সুফি ভাবধারা এবং তিনি এ বিষয়ে অনেক রিসালা (প্রচারপত্র) রচনা করেন।[৯৭০] তিনি ফার্সি ভাষায়ও অনেক কবিতা রচনা করেন এবং তিনি তাঁর নিজ সমাধি ফলকে বিনয় ও সরলতাপূর্ণ উৎকীর্ণ লিপি রচনা করেন।[৯৭১] ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলমান সুফি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ:) র জীবনী মুনিস-উল-আরওয়া রচনা করেন এবং এতে তাঁর উত্তরসূরিদের নামও রয়েছে।[৯৭২] তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে বৃত্তি ও পুরস্কার দানের মাধ্যমে উৎসাহিত করতেন।[৯৭৩] মুরিদ খান ওরফে মীর মুহাম্মদ আলী মহির জাহানারা বেগমের বন্দনাগীতি মসনবি রচনা করেন এবং উহাতে তিনি তাঁর উদারতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করেন।[৯৭৪] সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জীবন নিসা বেগম। তিনি তাঁর জন্য একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা হাফিজা মরিয়ম ও পারস্যের মহান কবি মোল্লা সাঈদ আশরাফ মাজানদ্রানিকে দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তাঁদের সান্নিধ্যে তাঁকে কবিতা রচনার জন্য রুচিবোধ ও অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়।[৯৭৫] প্রখ্যাত পণ্ডিত শাহ রোস্তম গাজী ও তাঁকে তাঁর সাহিত্যকর্মে উৎসাহিত করেন। তিনি সমগ্র কোরআন মুখস্ত করেন এবং ফলশ্রুতিতে তাঁর পিতা ত্রিশ হাজার

---

৯৬৬. জে,বি, চৌধুরী কর্তৃক রচিত মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত শিক্ষা , প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭।

৯৬৭. আহকাম-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠাগুলো ১৫১, ১৭৩।

৯৬৮. যদুনাথ সরকারের রচিত মোঘল ভারতের অধ্যয়ন, পৃষ্ঠা ২২.

৯৬৯. লাহোরী, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬২৯.

৯৭০. আনন্দ রাম মুখালিসের রচিত মিরাট উল ইসতিলা, পৃষ্ঠা ১২২.

৯৭১. ন, পৃষ্ঠাগুলো ২০৩-৪ জাফর , পৃষ্ঠাগুলো ১৯৫ -৯৬: বাজম, পৃষ্ঠা ৪৪৮.

৯৭২. বাজম, পৃষ্ঠা ৪৪৮.

৯৭৩. ন, পৃষ্ঠা ২০৩: জাফর , পৃষ্ঠা ১৯৬.

৯৭৪. ড: এম, এ আনসারীর সন্দর্ভ পেপার মোগলদের দরবারিক জীবন, পৃষ্ঠা ১১৯.

৯৭৫. এইচ, এস. আহম্মেদ বিরচিত জীবন নিসা বেগম ও দেওয়ান-ই-মাখফি, পৃষ্ঠা ৪২.

www.pathagar.com

স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে পুরস্কার দেন।[৯৭৬] তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন এবং ফার্সি ও আরবিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[৯৭৭] তিনি সুন্দর হস্তাক্ষর বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং সিকাস্ত, নাস্তালিক ও নাশখ সঠিকভাবে লিখতে পারতেন।[৯৭৮] তাঁর পিতা আওরঙ্গজেব তাঁর সুশ্রাব্য সাহিত্যিক ধারায় অক্ষরমালার প্রশংসা করেছেন।[৯৭৯] তিনি সাহিত্যচর্চায় প্রচুর সময় ব্যয় করতেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিগণ তাঁর দরবারে সমবেত হতেন। তাঁর অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন সুবিদিত পণ্ডিত মির্জা খলিল। তাঁর সময়ের কবিদের মধ্যে ছিলেন নাসির আলী সাহেব শামস ওয়ালিউল্লাহ, চন্দ্রবান ব্রাহ্মণ ও বারুজ।[৯৮০] তিনি একটি ভালো পাঠাগারও গড়ে তোলেন। তিনি একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে ধ্রুপদী সাহিত্যের কয়েকটি বই অনূদিত হয়। তাঁর নির্দেশে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির লেখা পবিত্র কোরআনবিষয়ক একটি ধারাবাহিক পত্রিকা আরবি থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন মোল্লা শায়েখ উদ্দিন আর্দবেলি। তাঁর নাম অনুসারে এর নতুন নামকরণ করা হয় জিবুল তাফসির।[৯৮১] কতকগুলো সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে জীবন নিসাকে উল্লেখ করা হয়। জিবুল মুনসাত হলো তাঁর পত্রাবলির একটি সংগ্রহ।[৯৮২] আরেকটি সাহিত্যকর্ম দিওয়ান-ই-মাখফির রচয়িতা হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।[৯৮৩] তাঁর সাহিত্যসংক্রান্ত কার্যাবলি এত শক্তিশালী ও বিস্তৃত ছিল যাতে তিনি সাহিত্য জগতে খ্যাতি লাভ করেন।[৯৮৪] কয়েকজন রাজকীয় মহিলা শিক্ষার উন্নয়নে আগ্রহী হন। তাঁর বহু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৃত্তি প্রদান করেন। হুমায়ুনের পত্নী

---

৯৭৬. মাসির-ই-আলমগিরি , পৃষ্ঠা ৩২২ : যদুনাথ সরকারের মোঘল ভারতের অধ্যয়ন, পৃষ্ঠা ৭৯.

৯৭৭. মাগনলাল কর্তৃক অনুবাদ জীবন নিসার দেওয়ান, পৃষ্ঠা ৮.

৯৭৮. মাসির-ই-আলম গিরি পৃষ্ঠা ৩২২ : যদুনাথ সরকারের মোঘল ভারতের অধ্যয়ন পৃষ্ঠা ৭৯; ল. পৃষ্ঠা ২০৪ জাফর, পৃষ্ঠা ১৯৭; বাজম, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

৯৭৯. এম. এ, আনসারীর মহান মোঘলদের দরবারিক জীবন, পৃষ্ঠা ১১৯.

৯৮০. মাগন লাল কর্তৃক অনূদিত জীবন নিসার দেওয়ান, পৃষ্ঠা -৯.

৯৮১. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৩২২; জাফর, পৃষ্ঠা ১৯৭ ;বাজম; পৃষ্ঠা ৪৫৬.

৯৮২. এইচ. এস. আহম্মেদ এর অনূদিত জীবন নিসা বেগম ও দেওয়ান-ই-মাখফি, পৃষ্ঠা ৪২.

৯৮৩. টীকা : কথিত আছে যে, দিওয়ান-ই-মাখফির রচয়িতা ছিলেন একজন খোরাসানি কবি এবং তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। যদুনাথ সরকারের রচিত 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠা ৮০.

৯৮৪. শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি বহুসংখ্যক প্রতিকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেগুলোতে তাঁকে গ্রন্থ পাঠে উৎসুক অবস্থায়, বসে থাকতে ও কিছু লিখতে, সম্ভবত কবিতা লিখতে দেখা যায়। কামুদি, পৃষ্ঠা ৫৬.

www.pathagar.com

বিগা বেগম তাঁর স্বামীর সমাধির পাশে একটি কলেজ নির্মাণ করেন।[৯৮৫] শিক্ষা ক্ষেত্রে আগ্রহী আরেকজন রাজকীয় মহিলা হলেন আকবরের ধাত্রী মাহাম আনাগা। শিক্ষা প্রদানকে তিনি এক মহান সেবাকার্য বলে মনে করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি দিল্লিতে খায়রুল মঞ্জিল নামক মসজিদের কাছে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৮৬] শিক্ষা ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী মোঘল হেরেমের আরেকজন মহিলা হলেন শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম। তিনি আগ্রাতে জামে মসজিদসংলগ্ন একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৯৮৭] রাজকীয় মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা শুধু রাজধানীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। মনে হয় সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশেও কিছু মহিলা এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হন। জৌনপুরের মাহমুদ শাহের পত্নী বিবি রাজী একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য বৃত্তি প্রদান করতেন।[৯৮৮]

২. শিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলি

রাজকীয় পরিবারের মহিলারা বিভিন্ন প্রকার চারুশিল্পে আগ্রহী হন। তাঁরা প্রায়ই তাঁদের অবসর কাটাতেন চিত্রাঙ্কন, সাজসজ্জা, নাচ, সঙ্গীত ইত্যাদিতে এবং এগুলো তাঁদেরকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত।

(ক) চিত্রাংকন

চিত্রাঙ্কন ছিল মোঘল হেরেমের মহিলাদের অন্যতম প্রিয় অবসর বিনোদন। একথা বলা কঠিন যে, তাঁরা এই শিল্পে কোনো উৎকর্ষ লাভ করতে পেরেছিলেন কিনা যেহেতু কোনো মহিলা চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য রয়েছে যে তাঁরা এই শিল্পে মগ্ন থাকতেন।[৯৮৯] জাহাঙ্গীরের প্রধান রানি নূরজাহান সক্রিয়ভাবে তাঁর স্বামীর সঙ্গে এই শিল্পানুরাগের অংশীদার ছিলেন। মনে হয় নূরজাহান এই শিল্পকর্মে দক্ষ ছিলেন; কিন্তু তাঁর তুলিতে আঁকা কোনো চিত্র পাওয়া যায়নি। কোনো তথ্যের অভাবে রাজকীয় মহিলাদের সাধারণ মনোভাব ও শিল্পকৌশল খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

---

৯৮৫. এস. কে ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুন বাদশাহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭.

৯৮৬. আকবরনামা, (ব্যাভারিজ) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩; ল. পৃষ্ঠা ২০২ ; জাফর, পৃ: ১৯৪.

৯৮৭. ইউসুফ হোসাইন কর্তৃক রচিত 'মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি', পৃষ্ঠা ১১৭.

৯৮৮. ল. পৃষ্ঠা ১০১; জাফর, পৃষ্ঠা ১২৮.

৯৮৯. কমুনী, পৃষ্ঠা ৫৮;

www.pathagar.com

(খ) সাজসজ্জা

রাজকীয় মহিলারা অলংকরণ শিল্পেও আগ্রহী ছিলেন। গুলবদন বেগমের মতে, বাবরের স্ত্রী মাহিম বেগম ব্যাপকভাবে বড় বড় রাস্তার শোভাবৃদ্ধির কাজের সূচনা করেন।[৯৯০] প্রধানত রাজকীয় মহিলাদের কাজকর্ম তাঁদের প্রাসাদে ও উদ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তাই তাঁরা সম্ভাব্য উপায়ে সেগুলোকে সাজাতে চেষ্টা করতেন।[৯৯১] নূরজাহান বেগম সাজসজ্জার কৌশলে অত্যন্ত আগ্রহী হন। তিনি নতুন ধরনের গালিচা, বুটিদার শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির নকশা তৈরি করেন।[৯৯২] তিনি বাসস্থানের সাজসজ্জা ও ভোজ আয়োজনের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পদ্ধতি চালু করেন।[৯৯৩] তাঁর নকশাশিল্প ও পরিধেয় কাপড়ের প্রান্ত বর্তী ফিতা তৈরির কাজ অলংকরণের আকর্ষণ বাড়াত।

(গ) রান্নাবান্না

রান্নাবান্না ছিল সচরাচর হেরেমে নিযুক্ত পেশাদার রাঁধুনিদের ব্যাপার। শুধু কিছু অনুষ্ঠানে কয়েকজন রাজকীয় মহিলা রান্নার কাজে আগ্রহ দেখান। কখনো কখনো জাহানারা বেগম কিছু খাবার তৈরি করতেন। তিনি রিসালা-ই-শাহীরিয়াতে লিখেন যে, তিনি নিজেই শাকসবজি, রুটি ও বিভিন্ন রকম খাবার তৈরি করে সুফি হযরত মিয়ান মীরের কাছে পাঠাতেন।[৯৯৪] এ বিষয়ে আওরঙ্গজেবের পত্নী উদয়পুরী মহলের একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মানুচী জানান যে, একদা তিনি মৃদুতাপে সিদ্ধ গোশত রান্না করে তাঁর বাসস্থানে আওরঙ্গজেবকে আমন্ত্রণ জানান।[৯৯৫]

(ঘ) নৃত্য

মনে হয় সমাজে নৃত্যশিল্পের সম্মানজনক স্থান ছিল না এবং সেই কারণে এই শিল্পের প্রতি উঁচু শ্রেণির মহিলাদের আগ্রহ ছিল এমন ধরনের উল্লেখ দেখা যায় না। ইহা থেকে মনে হয় যে, নাচ শুধু এক শ্রেণির পেশাজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ

---

৯৯০. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠা ১১৪.

৯৯১. আকবরের খতনা অনুষ্ঠানের সময় যখন বিঘা বেগমের উদ্যানের সাজগোজ করা হয় তখন বেগম এবং অভিজাত মহিলারা তাঁদের উদ্যান নতুন ফ্যাশনে চমকপ্রদ রূপ দান করেন। গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠাগুলো ১৭৯-৮০.

৯৯২. আইন-ই-আকবরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১০; কাফি খান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৯.

৯৯৩. Ibid..

৯৯৪. জাহানারার রিসালা-ই-শাহীরিয়া, আলীগড় বিশ্ববিদ্যায় পাণ্ডুলিপি.

৯৯৫. মানুচী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২৫৮-৫৯.

www.pathagar.com

ছিল। সাধারণত নাচ অনুষ্ঠানকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। তারপরও নাচ বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং তা বিবাহ, জন্মদিন ও এ ধরনের অনুষ্ঠানে আনন্দ বৃদ্ধি করত। হেরেমের রাজকীয় মহিলারা প্রায়ই নৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেন।[৯৯৬] যদিও আওরঙ্গজেব দরবারে নাচ ও গান নিষিদ্ধ করেন, তবু তিনি তাঁর রানি ও কন্যাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নাচের অনুমতি দিতেন।[৯৯৭] একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মহিলারা পেশা হিসেবে নাচকে গ্রহণ করে। আকবর তাদেরকে কাঞ্চনী বলে অভিহিত করেন।[৯৯৮] নাচ ব্যতীত তাদের কোনো পেশা ছিল না।[৯৯৯] তারা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের সময় শুধু নাচ পরিবেশন করত। ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সফরকারী পিটার মানডি লিখেন, 'এমন নাচনেওয়ালি মেয়েরাও রয়েছে যাদের মধ্যে আছে লালনি, হারকেনি, কাঞ্চনি ও ডোমনিদের মতো বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ও বহু সাঙ্গীতিক প্রকরণ অনুশীলনকারী শ্রেণি। সাধারণত তাদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভোজসভায় নিয়ে আসা হয় এবং তারা সেখানে খেলাধুলা দেখায়, গান গায় ও নাচ পরিবেশন করে। তাদেরকে বাদ দিয়ে কদাচিৎ কোনো জনসভা হয়ে থাকে।'[১০০০] বার্নিয়ার তাদেরকে নাচনেওয়ালি মেয়ে বলে উল্লেখ করেন।[১০০১] মহিলারা আখরা নামক বিনোদন অনুষ্ঠানেও যোগ দিত এবং এটা এ দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রাতে চালাত। ঐ সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের বাড়িতে ভৃত্যদেরকে নাচতে ও খেলতে শিক্ষা দিতেন। চারজন সুন্দরী মহিলা একটি নাচ পরিচালনা করত এবং তারা সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দেখাত। অন্য চারজন গান গাইতে যোগ দেয় এবং আর চারজন তাদেরকে করতালি দিয়ে সঙ্গ দেয়, অন্য দুইজন পাখোয়াজ বাজায়, অন্য দুইজন উপাঙ্গ বাজায় এবং সেই সময় দাক্ষিণাত্যের রাবাব, বীণা ও যন্ত্র প্রত্যেকটিই এক একজন সঙ্গীত শিল্পীর হাতে

---

৯৯৬. টীকা: অনেক চিত্রে রাজকীয় মহিলাদের নৃত্য ও সঙ্গীত প্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। নওরোজ মাহফিলের সময়ে নূরজাহানের আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখা যায় একজন মহিলা নৃত্য পরিবেশন করছে এবং অন্যরা সঙ্গীত যন্ত্র বাজাচ্ছে। ভারতের ইতিহাস পত্রিকা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৬. জাহাঙ্গীরের আরেকটি চিত্রে দেখা যায় তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। চারদিকে পারিষদবর্গ এবং অনেক নর্তকী নৃত্যরত রয়েছে।

৯৯৭. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৫.

৯৯৮. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২.

৯৯৯. থিভিনট, পৃষ্ঠা ৭১.

১০০০. পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৬.

১০০১. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ২৭৩ ; ওভিংটন, পৃষ্ঠা ২৫৭: ছবিতে দেখা যায় বাঁদি নামক মহিলা সঙ্গীত শিল্পীরা যন্ত্রের সাহায্যে গানের মাধ্যমে সম্রাটের মহিমা প্রচার করছে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

থাকে। সাধারণভাবে আয়োজিত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা ও বিনোদন প্রদীপগুলো ছাড়াও প্রদীপ হাতে দুইজন মহিলা শিল্পী বৃত্তের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কেউ আরো বেশি আলোর ব্যবস্থা করে... ।[১০০২]

(ঙ) সঙ্গীত

রাজকীয় পরিবারের কয়েকজন মহিলা খুব সঙ্গীত অনুরাগী হন এবং তাঁরা নিজেরাও ছিলেন ভালো গায়িকা। পুরান মলের স্ত্রী রত্নাবলি মধুর সুরে হিন্দি গান গাইতেন।[১০০৩] মানসিংয়ের রানি মৃগনয়নী ছিলেন সঙ্গীতে পারদর্শিনী।[১০০৪] মীরাবাঈ ছিলেন একজন সুপরিচিত গায়িকা।[১০০৫] কথিত আছে যে, নূরজাহান ও জীবন নিসা বেগম ভালো গাইতেন এবং এমনকি নূরজাহান নিজে গান রচনা করতেন।[১০০৬] নৃত্যের মতো সঙ্গীত ও জন্মদিন, বিবাহ, অভিষেক ইত্যাদির মতো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আনন্দ বাড়িয়ে দিত। এভাবে অনেক মহিলা সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হতো।[১০০৭] কেউ কেউ সঙ্গীতকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করত। জন্মদিন ও বিবাহ অনুষ্ঠানে সোহলা ও ধ্রুপদ সঙ্গীত গাইতে দাদি মহিলাদের নিযুক্ত করা হতো।[১০০৮] আবুল ফজল সেজদা তাল শ্রেণি বলে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির গায়িকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মহিলারা যখন গান গায় তখন তারা তের জোড়া তাল একসাথে বাজায়- প্রত্যেক কব্জিতে দুইটি, কনুইয়ের সংযোগ স্থলে দুইটি করে, কাঁধের ফলকের সন্ধিস্থলে দুইটি, প্রত্যেকের কাঁধে দুইটি, বুকের মাঝে একটি এবং প্রত্যেকের হাতের আঙ্গুলে দুইটি। এই মহিলাদের অধিকাংশ আসত গুজরাট ও মালোয়া থেকে।[১০০৯] দাদি ব্যতীত সেখানে হুরকিয়া মহিলারাও তাল দিয়ে গান গেত।[১০১০]

১০০২. এগুলোর সবই হলো বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত যন্ত্র।

১০০৩. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩.

১০০৪. ইলিয়ট ও ডাউসন কর্তৃক লিখিত তারিখ-ই- শেরশাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২.

১০০৫. উমেশ জশি কর্তৃক রচিত ভারতীয় সঙ্গীত কা ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২০৪.

১০০৬. Ibid., পৃষ্ঠা ২৪৬.

১০০৭. Ibid., পৃষ্ঠা গুলো ২৬৪,৩৩৪.

১০০৮. বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্র হাতে মহিলাদের চিত্রসমূহ এই সত্য প্রকাশ করে। নূরজাহান কর্তৃক আয়োজিত নওরোজ মাহফিলের একটি ছবিতে দেখা যায় একজন মহিলা দফ ও অন্য একজন মহিলা বানসারি বাজাচ্ছে। বিকানিরের শিল্পকলা, পৃষ্ঠা ১৭৪.

১০০৯. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২.

১০১০. Ibid. পৃষ্ঠা ২৭১.

www.pathagar.com

(চ) অতিথিদের আপ্যায়ন (ভোজ)

অতিথিদের আগমনে ও তাঁদেরকে দেওয়া অভ্যর্থনায় হেরেমের মহিলাদের জীবনের প্রায় একঘেয়েমি কেটে যেত। অভিজাত ব্যক্তিদের পত্নীরা সম্রাটের হেরেমের মহিলাদের কাছে বেড়াতে আসতেন এবং সম্রাটের হেরেমের মহিলারাও অভিজাতদের স্ত্রীদের কাছে বেড়াতে যেতেন।[১০১১] তাঁদেরকে মিষ্টি পানীয় (শরবত) ও পান দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। শরবত ও পান ছিল অভিজাত মহিলাদের প্রিয় বস্তু।[১০১২] ভোজ উৎসব ও ভোজের আয়োজন করে কয়েকজন রাজকীয় মহিলা আনন্দ উপভোগ করতেন। সমসাময়িক দলিলপত্রে কয়েকজন রাজকীয় মহিলা ভোজের আয়োজন করে বাস্তবে আনন্দ পান বলে উল্লেখিত। হুমায়ুনের মা মাহিম বেগম ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভোজের আয়োজন করেন তাঁর পুত্রের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে। তিনি নিজেই এই ভোজটির তদারকি করেন। তিনি সাধারণত আলোকসজ্জার জন্য আদেশ দেন এবং উঁচু শ্রেণির জনগণ ও সৈন্যদের তাঁদের প্রাসাদ ও বাসস্থানকে আকর্ষণীয়ভাবে সাজাতে নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর প্রাসাদের মধ্যে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করেন। তিনি সোনালি সূচিকর্ম শোভিত বালিশ, গদি ও পর্দা দিয়ে রাজকীয় প্রাসাদকে সজ্জিত করেন। ইউরোপীয় বুটিতোলা কাপড় ও পর্তুগিজ বস্ত্র দ্বারা মাহিম বেগম নিজেই রত্ন ও স্বর্ণনির্মিত পাত্র, গোলাপজল ছিটানোর পাত্র ও শামাদানসহ তৈরি করেন কানাট নামক ছোট তাঁবু ও সারি কানাজ (এক ধরনের ঘেরা স্থান)। তাঁর সমস্ত সঞ্চয় দ্বারা তিনি একটি চমৎকার ও আকর্ষণীয় ভোজের আয়োজন করেন।[১০১৩]

৩. সম্রাট হুমায়ুনের মাতৃতুল্য আত্মীয়া

১৫৩২-৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুনের মাতৃতুল্য আত্মীয়া খানজাদা বেগম তাঁকে হিন্দালের বিবাহ ভোজ ও আধ্যাত্মিক আলোচনা সভার আয়োজন করতে পরামর্শ দেন।[১০১৪] খানজাদা বেগম প্রথমে মরমি ভোজ সভার আয়োজন করেন

১০১১. টাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯২: সমসাময়িক চিত্রাবলিতে এই দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। কামুদি, পৃষ্ঠা ৪৩: প্লেট ১৩ তে একজন রাজকীয় মহিলাকে তাঁর দুইজন পরিচারিকাসহ শরবত ইত্যাদি দ্বারা অতিথিদের আপ্যায়ন করতে দেখা যায়।

১০১২. বিভিন্ন চিত্রের সম্মুখভাগে সরবতের ফ্লাস্ক, গোলাপজল ও পানের কৌটা প্রায়ই দেখা যায়: কামুদি, পৃষ্ঠা ৪২.

১০১৩. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠাগুলো ১১৩- ১৪.

১০১৪. সম্রাট খানজাদা বেগমের পরামর্শের সাথে একমত হয়ে বলেন, 'আমার রাজপরিবারের মাতৃসম আত্মীয়টি যা ইচ্ছা করেন তাই করা হোক।' গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ) পৃষ্ঠাগুলো ১১৭-১৮.

www.pathagar.com

এবং পরে হিন্দালের বিবাহ ভোজের আয়োজন করেন। ভোজসভাটি সোনা ও মুক্তার ঝালর যুক্ত পর্দা এবং সোনারুপার পাত্রে জমকালোভাবে অনুষ্ঠিত হয়।[১০১৫] ১৫৪৪ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন পাটে ছিলেন তখন বাবরের আরেকজন স্ত্রী দিলদার বেগম একটি জমকালো ভোজসভার আয়োজন করেন এবং রাজদরবারের সকল মহিলা সেখানে উপস্থিত হন।[১০১৬] ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হামিদা বানুর সাথে হুমায়ুনের বিবাহেরও আয়োজন করেন এবং একটি বিবাহভোজ দেওয়ার পরে তিনি হুমায়ুনের কাছে তরুণী হামিদাকে সমর্পণ করেন।[১০১৭]

আকবরের ধাত্রী মাহাম আনাগাও ভোজের আয়োজন করতে পছন্দ করতেন। ১৫৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর পুত্রের বিবাহের সময় একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেন।[১০১৮] একই বছরে তিনি আরেকটি বড় ভোজের আয়োজন করেন এবং অনেক মহিলা সেখানে অংশগ্রহণ করেন।[১০১৯] চান্দ্র ও সৌর বছর গণনা মতে সম্রাটের ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানগুলোর সময়ে ভোজসভাগুলো প্রায়ই অনুষ্ঠিত হতো সম্রাটের মায়ের বাড়িতে।[১০২০] জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁর স্ত্রী নূরজাহান অনেক ভোজের আয়োজন করেন। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি বড় পুকুরের মধ্যে অবস্থিত একটি বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করেন।[১০২১] একই বছরে মেবারে খুররমের বিজয় উৎসব পালনের জন্য তিনি আরো ভোজসভার আয়োজন করেন।[১০২২] নূর সরাইতে তাঁর বাসভবন ও উদ্যান নির্মাণের পর তিনি একটি বিনোদন ও জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন

১০১৫. গুলবদন বেগম অষ্টভুজ বিশিষ্ট পারস্যের গালিচা বিছানো এবং রত্নখচিত সিংহাসন ও সোনালি সূচিকর্ম শোভিত দিওয়ান সমন্বিত কক্ষের আয়োজনগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ) পৃষ্ঠাগুলো ১১৮- ২৪.

১০১৬. গুলবদন বেগম লিখেন, 'খানজাদা বেগম একটি সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ও জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করেন; আমার সম্রাট পিতার অন্য কোনো সন্তানের জন্য এমন আয়োজন করা হয়নি। তিনি এর সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন।' গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠাগুলো ১২৬-২৭.

১০১৭. তাজকিরাত-উল ওয়াকিত (অনূদিত), পৃষ্ঠা ৩০.

১০১৮. Ibid. পৃষ্ঠা ৩১.

১০১৯. আবুল ফজল লিখেন, 'মাহাম বেগম এর আয়োজন করার জন্য রাজদরবার থেকে ছুটি নেন। তিনি একটি আনন্দদায়ক ভোজের আয়োজন করেন।' আকবরনামা (ব্যাভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো. ১০৪-৫.

১০২০. আকবরনামা (ব্যাভারিজ) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২১ তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০-৫১.

১০২১. Ibid.. পৃষ্ঠা ৫৫৫ তুযুক প্রথম, খণ্ড পৃষ্ঠাগুলো ১৪৫-১৪৮.

১০২২. চারদিকে প্রদীপ জ্বালানো হয়। সমবেত সকল আমির মদ ও দামি খাদ্য গ্রহণ করেন। তুযুক-ই- জাহাঙ্গীরী , প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৮৫-৮৬.

www.pathagar.com

করেন[১০২৩] এবং জাহাঙ্গীরকে অনেক দুষ্প্রাপ্য বস্তু উপহার দেন। ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর অন্যান্য রাজকীয় মহিলাদের সাথে নূরজাহানের মালিকানাধীন নূরআফসান উদ্যানে যান। তাঁর সম্মানে নূরজাহান সেখানে একটি রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করেন।[১০২৪] ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর যখন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন এবং চান্দ্র বর্ষ অনুযায়ী সম্রাটের ওজন পরিমাপ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করা হয় তখন নূরজাহান বেগম তাঁর ভাকিলকে আদেশ করেন কিছু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে।[১০২৫] তিনি নিজে এই সময়ে আগের চেয়ে ব্যাপকতর মনোযোগ দেন। ভোজ শেষে তিনি উপহার প্রদান করেন; এই আপ্যায়নে উপহার বাদ দিয়ে হিসাব করলে খরচ হয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। নূরজাহান বেগমের পরে ভোজসভা ও আপ্যায়নের আয়োজন ব্যাপারে রাজকীয় মহিলাদের আগ্রহ কমতে থাকে। ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে দারার মৃত্যুর পরে তাঁর ছোট বোন রওশন আরা বেগম যিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি প্রীতিবশত অনুরক্ত হন তিনি একটি জামকালো ভোজ প্রদান করেন।[১০২৬] কিন্তু এই রকম ঘটনার উল্লেখ ক্রমশ কমতে থাকে। মনে হয় কখনো কখনো অভিজাত ব্যক্তিদের পত্নীরাও ভোজের আয়োজন করতেন। জাফর খানের স্ত্রী আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্যে ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি জমকালো ভোজের আয়োজন করতে আদেশ করেন।[১০২৭] রাজকীয় মহিলারা শুধু ভোজের আয়োজন করতেন না, এমনকি ভোজসভাতে উপস্থিত থাকতেন যা তাঁদের বিনোদনের আরেকটি উৎস বলে প্রমাণিত হয়। মরমী ভোজসভা ও হিন্দালের বিবাহ ভোজে উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক মহিলা।[১০২৮] দিলদার বেগম ১৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে যখন একটি ভোজ দেন তখন তাতে রাজদরবারের সমস্ত মহিলা উপস্থিত হন।[১০২৯]

শাহজাদা বা শাহজাদির জন্মকাল, জন্মতিথি, খতনা ও বিবাহের মতো অনুষ্ঠানে মহিলারাও আমোদপ্রমোদ ও ভোজসভায় অংশগ্রহণ করতেন।[১০৩০] ১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে হামিদা বানু যখন কান্দাহার থেকে আসেন তখন আকবরের

১০২৩. Ibid., পৃষ্ঠা ৩৯৭.

১০২৪. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২.

১০২৫. Ibid., পৃষ্ঠা গুলো ১৯৯-২০০.

১০২৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ২১৪-১৫: মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩.

১০২৭. Ibid., পৃষ্ঠা ৩৫৯.

১০২৮. ট্যাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৯.

১০২৯. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠাগুলো ১১৮-২৪ টীকা, গুলবদন বেগম এই ভোজসভার বর্ণনা দেওয়ার সময় তথাকার উপস্থিত মহিলাদের একটি তালিকা প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফাক-ই-জাহান, আকা বেগম, সুলতান বখত বেগম, খাদিজা বেগম প্রমুখ।

১০৩০. জাওহার কর্তৃক অনূদিত তাজকিরাত-উল- ওয়াকিত, পৃষ্ঠা ৩০.

www.pathagar.com

খতনা অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় বিপুল জাঁকজমকের সাথে এবং সেই ভোজসভায় সকল বেগম উপস্থিত হন।[১০৩১] শাহরিয়ার বিবাহের সময় ইতিমাদ-উদ-দৌলার বাসভবনে নিকাহ ভোজ অনুষ্ঠিত হয় তখন রাজকীয় মহিলারা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভোজসভায় যোগ দেন।[১০৩২]

৪. মেলা ও উৎসব

নববর্ষ (নওরোজ) উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের সময় রাজকীয় মহিলাদের অন্যতম কাজ ছিল মেলায় যোগদান করা। রাজদরবারের মহিলারা ছাড়াও বড় বড় অভিজাত ওমরাহ, রাজা প্রমুখের পত্নী ও কন্যারাও তাতে যোগ দিতেন। এই সম্ভ্রান্ত মহিলারা বিভিন্ন প্রকার অদ্ভুত ও চমৎকার সামগ্রী এনে দোকান খুলতেন ও দোকানি হিসেবে কাজ করতেন। সম্রাট, শাহজাদা ও শাহজাদিগণ তাঁদের পছন্দ মতো জিনিস কিনতে যেতেন। বিক্রেতাগণ ও দালালের অভিনয়কারী সম্রাট মজাদার ও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য বিনিময়ের মাধ্যমে দরকষাকষি করতেন সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী মহিলারা বেশি প্রশংসিত হতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি দ্বিগুণ মূল্য আদায় করতে সক্ষম হতেন। এসব মহিলাকে ভোজে এবং কাঞ্চনী নামক পেশাদার নর্তকীদেরকে নাচে আপ্যায়ন করা হতো। এই মেলা প্রায় চার বা পাঁচ দিন ধরে চলত এবং সমসাময়িক বিদেশি পর্যটকরা সেকথা উল্লেখ করেন।[১০৩৩] এটাকে মীনা বাজার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। আকবর এর সূচনা করেন এবং মনে হয় এটা সম্রাট শাহজাহানের আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১০৩৪] শাহজাহানের আমলের পরে এগুলো সম্বন্ধে আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মোঘল সম্রাটরা বড় জাঁকজমকের সাথে নওরোজ (নববর্ষ) উৎসব পালন করতেন; এটা রানি ও শাহজাদিরাও পরিদর্শন করতেন। তাঁদের জন্য পৃথক ঘেরাস্থানের ব্যবস্থা করা হতো যাতে তাঁরা সব কিছু দেখতে পেতেন কিন্তু

১০৩১. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠাগুলো ৩৪৩-৪৪.

১০৩২. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠাগুলো ১৭৯-৮০; আবুল ফজল বলেন, 'বেগম সাহেবানরা এই অনুষ্ঠানটিকে শোভামণ্ডিত করতেন।'

১০৩৩. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০২.

১০৩৪. পিটার মানডি বলেন, 'এই সময়ে মহলের মধ্যে একটি বাজার আছে যেথায় সকল শ্রেণির পত্নী ও কন্যারা আছেন। সম্রাট যদি তাদেরকে পেতে ইচ্ছা করেন তবে কেউ তাঁদেরকে পাঠাতে অস্বীকার করার সাহস পায় না পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮; মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫;বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ২৭০;

www.pathagar.com

তাদেরকে কেউ দেখতে পেত না।[১০৩৫] প্রধান অভিজাত মহিলারা এসে রানি ও শাহজাদিগণকে অভিনন্দন জানাতেন। তাঁরাও অভিনন্দিত হতেন এবং সম্মানের পোশাক তাঁদেরকে দেওয়া হতো। তাঁরা ভোজসভা (যা সচরাচর ছয় থেকে নয় দিন স্থায়ী হতো) শেষ হওয়া পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে থাকতেন এবং কিচরি নামক সোনা ও মূল্যবান পাথরে তৈরি উপহার নিয়ে বাড়িতে ফিরতেন।[১০৩৬]

৫. বাসস্থানের বাইরে বিনোদন

(ক) পশু-পাখি শিকার

বাসস্থানের বাইরের বিনোদন হতো রাজকীয় মহিলাদের যথেষ্ট নাগালের মধ্যে। মনে হয় তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিকারে আগ্রহী ছিলেন এবং শিকার অভিযানের সময় সম্রাটের সঙ্গিনী হতেন। তাঁরা কামগড়ের মতো সাধারণ শিকারেও মগ্ন হতেন। এই শিকার অভিযানে বহুসংখ্যক বন্য পশুকে তাড়া করে একটি ঘেরের মধ্যে প্রবেশ করানো হতো। মেরে ফেলতে ও হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে গিরজাকের একটি ঘটনার সময় যখন রাজকীয় মহিলারা উপস্থিত হন তখন ১৫৫টি প্রাণীকে হত্যা করা হয়।[১০৩৭] ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর যখন সোমনগরে শিকারের উদ্দেশে যান সেই সময়ও রাজকীয় মহিলারা তাঁর সঙ্গে যান এবং বেগমদের মধ্যে শিকারকৃত হরিণগুলো বণ্টন করে দেওয়া হয়।[১০৩৮] মনে হয় নূরজাহান বেগমই কেবল রাজকীয় মহিলা ছিলেন যিনি একজন দক্ষ শিকারি এবং শিকারকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কুড়িশা নামক একটি পাখি শিকার করেন যার সাথে আকৃতি ও রঙের সৌন্দর্যে সাদৃশ্যপূর্ণ এ ধরনের কোনো পাখি আর কখনো দেখা যায়নি।[১০৩৯] এ ছাড়া ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর যখন রাজকীয় মহিলাদের সঙ্গে শিকার করতে যান তখন শিকারিদের দ্বারা চিহ্নিত হয় চারটি বাঘ। নূরজাহান জাহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে সব কয়টি বাঘ শিকার করেন।[১০৪০]

১০৩৫. মুনসিরেট, পৃষ্ঠাগুলো ১৭৫-৭৬; ডিলেট, পৃষ্ঠাগুলো ১০০-১০১; পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮.

১০৩৬. তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯-৬০; মানুচী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন কীভাবে হেরেমের মধ্যে নওরোজ উদ্‌যাপিত হতো। মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৪৬.

১০৩৭. তুযুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১২৯-৩০.

১০৩৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ২০৩-৪; ইকবাল নামা, পৃষ্ঠাগুলো ৫৮-৫৯.

১০৩৯. তুযুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৮.

১০৪০. জাহাঙ্গীর লিখেন, 'নূরজাহানের মতো এমন তীর নিক্ষেপ করতে এখন পর্যন্ত কাউকে দেখা যায়নি যিনি হাতির ওপর থেকে এবং হাওদার মধ্য থেকে ছয়টি তীর নিক্ষেপ করেন এবং একটিও লক্ষভ্রষ্ট হয়নি যাতে দৃষ্টিপথে আগত চারটি জন্তু লাফিয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। তুযুক (R&B) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫.

www.pathagar.com

এই সময় জাহাঙ্গীর তাঁর প্রতি খুব সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে উপহার হিসেবে একজোড়া বালা প্রদান করেন এবং এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন। আরেক সময় শিকারিরা একটি বাঘের উপস্থিতি সম্বন্ধে খবর দেন। সম্রাট তাদেরকে পশুটিকে ঘিরে ফেলতে আদেশ করেন। যেহেতু তিনি নিজে কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেহেতু তিনি নূরজাহানকে আদেশ করেন বন্য পশুটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে এবং তার ফলে প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়।[১০৪১] শিকার করা একটি পরিশ্রম সাপেক্ষ বিনোদন হওয়ায় তা রাজকীয় মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে পারেনি। নূরজাহান সাধারণত জাহাঙ্গীরকে তাঁর শিকার অভিযানে সঙ্গ দিতেন এবং তিনি ছাড়া খুব কমসংখ্যক মহিলা এই পুরুষোচিত বিনোদনে আগ্রহী হন। একটি অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য ও অধিকতর আনন্দদায়ক বিনোদন ছিল মাছধরা। নপুংসকদের সান্নিধ্যে কিছুসংখ্যক মহিলা মাছ ধরতে বের হতেন।[১০৪২]

(খ) যুদ্ধ অভিযান

মোঘলদের একটি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল তাঁদের পত্নীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে সঙ্গে নেওয়া; মনে হয় তাঁরা এই প্রথাটি তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন এবং ভারতে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার পরেও তা অব্যাহত রাখেন। রাজকীয় মহিলারা সামরিক অভিযানে রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে থাকতেন।[১০৪৩] ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আক্রমণকারী ক্যারেরি বলেন যে, মোঘলরা স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হতেন এবং তাঁদের মহিলাদের সঙ্গে নিতেন।[১০৪৪] মানুচীও লিখেন যে, শাহজাদিরা ও রাজকীয় মহিলারা সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় যদিও সবশেষে যাত্রা করতেন তবু তাঁরা সর্বদা প্রথমে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতেন।[১০৪৫]

১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবর যখন ধোলপুরে যান তখন মাহিম বেগম ও গুলবদন বেগম সম্রাটের সাথে যান।[১০৪৬] ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দালকে যখন শেরখানের বিরুদ্ধে পাঠানো হয় তখন দিলদার বেগম, গুলচেহারা বেগম, আফগান

১০৪১. তুযুক (রোজারস ও বেভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫; কাফি খান, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৮৯.

১০৪২. কাফি খান, পৃষ্ঠা ৯৯.

১০৪৩. উইলিয়াম আরভাইন রচিত 'মোঘলদের ভারতীয় সৈনিকদলের সংগঠন ও প্রশাসন', পৃষ্ঠাগুলো ২০০, ২০৪-৫.

১০৪৪. কেরারী, পৃষ্ঠা ১৮৪.

১০৪৫. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৪.

১০৪৬. গুলবদনের হুমায়ুননামা (বেভারিজ), পৃষ্ঠা ১০২.

www.pathagar.com

আগাচা ও তাঁর পত্নীরা এবং বিভিন্ন আমিরের পরিবার তাঁর সাথে ছিল।[১০৪৭] তাঁর অগ্রসর হওয়ার সময় গাওয়াররা তাঁর পশ্চাদধাবন করে কিন্তু তিনি তাদেক পরাজিত করে মহিলাদের রক্ষা করেন এবং তাঁদেরকে লাহোরে পাঠিয়ে দেন। ১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দে হুমায়ুন যখন চৌসার যুদ্ধে শেরখানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তখন সম্রাটের হেরেমের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তাঁর সঙ্গিন বেগমদের মধ্যে কয়েকজন নিহত হয় বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিখোঁজ হন।[১০৪৮] হুমায়ুন যখন ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে মালদেও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, তখন তিনি হামিদা বানু বেগমকেও তার সাথে নিয়েছিলেন।[১০৪৯]

১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর তখন পূর্বদিকে যুদ্ধ অভিযানে যান তখন কিছুসংখ্যক মহিলা তাঁর সাথে যান।[১০৫০] তাছাড়া ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে অনেক মহিলা তাঁর সাথে গমন করেন।[১০৫১] পরবর্তী শাসকগণের আমলেও এই ধারাটি অব্যাহত ছিল। মোঘল শাসকদের দ্বারা অনুসৃত রীতিটি ছিল এই যে যুদ্ধের দিনে এসব রাজকীয় মহিলারা হাতির পিঠে চড়তেন এবং সম্রাট ও অন্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন সেই কেন্দ্রস্থল থেকে পেছন দিকে কিছুটা দূরে নিয়োজিত পশ্চাদভাগের রক্ষীরা যত্নসহকারে তাঁদের পাহারা দিত।[১০৫২] যুদ্ধযাত্রায় সম্রাট অশ্বারোহী সেনাদলের পেছনে থাকতেন এবং তাঁকে রানি, শাহজাদি ও হেরেমের অন্যান্য মহিলারা অনুসরণ করতেন। তাঁদেরকে হাতির পিঠে পাতলা মসলিন কাপড়ে ঢাকা কাঠের আবেষ্টনীতে বহন করা হতো এবং সেখান থেকে তারা সব কিছু দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের কেউ দেখতে পেত না। হেরেমের অন্যান্য মহিলা কর্মীরা দীর্ঘ ঢিলা পোশাকে ঢেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁদেরকে অনুসরণ করত।[১০৫৩]

১০৪৭. Ibid., পৃষ্ঠা ১৪৩.

১০৪৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১৩৬-৩৭: যুদ্ধক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুলতান হুসাইন মির্জার কন্যা আয়েশা সুলতান বেগম, কাশিম হোসেন সুলতান আইজবেকের পত্নী বিগাজান কোকা, বাবরের পরিবারের আকিকা বেগম, চাঁদ বিবি। হুমায়ুনের স্ত্রী হাজি বেগম শত্রুর হাতে পড়েন কিন্তু তাঁর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করা হয় এবং তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়। ড. ঈশ্বরী প্রাসাদ কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুনের জীবন ও আমল', পৃষ্ঠাগুলো ১৩৪-৩৫.

১০৪৯. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠা ১৫৪.

১০৫০. আকবরনামা (ব্যাভারিজ), তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১১৬, ১২২.

১০৫১. Ibid., পৃষ্ঠা ১১৪০.

১০৫২. উইলিয়াম আরভাইন কর্তৃক রচিত 'মোঘলদের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, সংগঠন ও প্রশাসন', পৃষ্ঠা ২০০.

১০৫৩. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ২০৪-৫.

www.pathagar.com

(গ) প্রমোদ ভ্রমণ

হেরেমের মহিলাদের প্রমোদ ভ্রমণ, প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন এবং উদ্যান ও অট্টালিকা পরিদর্শন করা ছিল একটি সাধারণ অভ্যাস। বাবরের শাসনকালে তাঁর পুত্র আলোয়ার মৃত্যুতে প্রত্যেকেই খুব ব্যথিত হন, বিশেষ করে দিলদার বেগম। বাবর সেই সময় তাঁর হেরেম ঢোলপুরে নিয়ে যেতে বলেন প্রমোদ ভ্রমণের মাধ্যমে মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য।[১০৫৪] হুমায়ুনের শাসনকালে অনেক রাজকীয় মহিলা রিওয়াজ (একপ্রকার লতাগুল্ম) দেখার জন্য পাহাড়ের উপরে আসতেন এবং সম্রাটের সাথে আনন্দদায়ক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাত কাটাতেন।[১০৫৫] অন্য এক সময়ে মহিলারা আফগানিস্তানে ফারজা ও বলখের ওপর একটি সুন্দর জলপ্রপাত পরিদর্শনের জন্য ভোরবেলায় গিয়েছিলেন।[১০৫৬] হুমায়ুন প্রায়ই কমলালেবুর বাগানে বেড়াতে যান। ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে বিগা বেগম, মাচুচাক বেগম, হামিদা বানু বেগমের মতো কয়েকজন রাজকীয় মহিলা এবং অন্যরাও তাঁর সঙ্গে যান।[১০৫৭]

আকবরের শাসনকালেও রাজকীয় মহিলারা দর্শনীয় স্থান দেখতে সম্রাটের সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে যেতেন। ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে আকবর যখন কাবুল থেকে ফেরেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গের মহিলাদের নিয়ে বাগ-ই-সাফা পরিদর্শন করেন। মহিলারা প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়ার সময় রাজকীয় মহিলাদের সঙ্গে নিতেন এমন দৃষ্টান্তে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালটি পরিপূর্ণ। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর যখন কাবুলে যান তখন হেরেমের মহিলারা তাঁর সঙ্গে যান এবং শাহরারা উদ্যানের ভোজসভায় উপস্থিত হন।[১০৫৮] ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভোজের আয়োজন করা হয় আনাসাগর পুকুরে। জাহাঙ্গীর পাহাড়টিকে বাতি

১০৫৪. গুলবদন বেগম লিখেন, 'যেহেতু তাঁর শোকের সীমা অতিক্রম করেন সেহেতু সম্রাট আমার বান্ধবী ও বেগমদেরকে বলেছিলেন, 'আসুন, আমরা ঢোলপুরে প্রমোদ ভ্রমণে যাই।' গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠাগুলো ১৬৩-৪.

১০৫৫. রেওয়াজ হলো– একটি দুই বা তিন ফুট উঁচু বাঁটের মতো আকৃতি বিশিষ্ট লতাগুল্ম (সালা) এর ফুলটি লাল এবং স্বাদ আধো অম্ল স্বাদ যুক্ত এবং অল্প মিষ্টত্বযুক্ত। গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), পৃষ্ঠা ১৮৮.

১০৫৬. গুলবদন বেগম সেখানে কীভাবে তাঁবু খাটানো হয়েছিল ও বেগমরা পদচারণা করেছিলেন সেই সম্বন্ধে একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তখন ছিল পূর্ণিমা তিথি। আমরা আলাপ করছিলাম ও গল্প বলেছিলাম এবং মীর ও খানিশ আগাচা এবং আবৃত্তিকার জারিফ ও সারা শাহী মাহাম আগা অতিশয় কোমল কণ্ঠে গান ধরেছিলেন। গুলবদনের হুমায়ুননামা, পৃষ্ঠা ১৯০.

১০৫৭. Ibid., পৃষ্ঠা ১৯১.

১০৫৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১৯৫-৯৭.

www.pathagar.com

দ্বারা আলোকিত করার জন্য আদেশ দেন। মহিলারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর মহিলাদের সাথে নিয়ে বাহনে চড়ে শাক্কর পুকুরের তীরে মান্দুতে মালোয়ার ভূতপূর্ব শাসকদের প্রতিষ্ঠিত রাজদরবার ও অট্টালিকাসমূহ পরিদর্শন করেন।[১০৫৯] ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট কয়েকজন রাজকীয় মহিলার সাথে নৌকায় চড়ে নূর আফসান উদ্যানে যান এবং নূরজাহান বেগম তাঁদের সেখানে আপ্যায়ন করেন।[১০৬০] ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি যখন রোগমুক্তি লাভ করেন তখন তিনি কাশ্মীর ও লাহোরে গিয়েছিলেন। রওশন আরা বেগম তাঁর সঙ্গী হন।[১০৬১] পরবর্তীকালেও এই রীতিটি অব্যাহত ছিল। তিনি যখন রওশন-উদ-দৌলাহতে আলোকসজ্জা ও ভোজের আয়োজন করেন তখন নওয়াব কুদসিয়া ও অন্যান্য বেগম সাহেব তা দেখতে ও উপভোগ করতে লাহোর দরওয়াজাতে গিয়েছিলেন। ইতিমাদ-উদ-দৌলাহ, কামারুদ্দিন খান ও নূসরাত খান ও পরিদর্শন করেন সেই আলোকসজ্জায়।[১০৬২]

(ঘ) তীর্থযাত্রা

এ ছাড়া কয়েকজন সম্মানিত মহিলা বিশেষত মক্কা, মদিনা ও তাপসদের সমাধি ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রায় আগ্রহী হন। এ জন্য তাদেরকে দীর্ঘ ভ্রমণ করতে হতো। এ ধরনের একটি সর্বশেষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যখন নিজামুদ্দিন আলী খলিফা বার্লাসের স্ত্রী সুলতানাম বেগমকে গুলবার্গ বেগমের সাথে মক্কায় গমনের অনুমতি দেওয়া হয়।[১০৬৩] হুমায়ুনের স্ত্রী বিগা বেগম যাঁকে পরবর্তীকালে হাজি বেগম নাম দেওয়া হয় তাঁকে পবিত্র স্থানসমূহে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার দরকারি জিনিস দিয়ে সম্রাট আকবর তার আয়োজন করেন ।[১০৬৪] ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে গুলবদন বেগম অন্য অনেক মহিলার সাথে যখন পবিত্র স্থানসমূহে তীর্থযাত্রা করেন তখন সম্রাট আকবরই তার আয়োজন করেন।[১০৬৫] যে সমস্ত মহিলা তাঁর সাথে যান তাঁরা হলেন

১০৫৯. তুযুক (রোজারস ও বেভারিজ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৪.

১০৬০. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯, মোস্তাইদ খান নূরজাহান ও অন্যান্য বেগমের একটি ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন।

১০৬১. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৫১.

১০৬২. আসহাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১-৫২.

১০৬৩. হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-৫৬-৫৭.

১০৬৪. আকবরনামা (ব্যাভারিজ) , পৃষ্ঠা ১৬৯.

১০৬৫. আকবরনামা (ব্যাভারিজ), তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫-৬: তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২.

www.pathagar.com

সেলিমা সুলতান বেগম, হাজি বেগম, কামরানের কন্যা গুলজার বেগম, আসকারীর স্ত্রী সুলতান বেগম, গুলবদনের নাতনি গুলনার আগা, বাবরের স্ত্রী বিবি সাফিয়া, বিবি শারু সাহাইও শাহাম আগা, জিনাত আশিয়ানির ভৃত্যগণ ।[১০৬৬] কয়েকজন রাজকীয় মহিলা কতিপয় প্রসিদ্ধ সুফির সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন । আকবর যখন হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির পবিত্র দরগা আজমীরে গমন করেন তখন হেরেমের অনেক মহিলাও তাঁর সঙ্গে যান ।[১০৬৭] গুলবদন বেগম এবং অন্য মহিলারা যখন পবিত্র মক্কা তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁরা হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ) পবিত্র মাজার পরিদর্শন করেন ।[১০৬৮] ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের আমলে হিন্দালের কন্যা রুকাইয়া সুলতান বেগম তাঁর পিতার সমাধিক্ষেত্র কাবুলে তীর্থযাত্রা করেন । জাহাঙ্গীরের হেরেমের মহিলারাও তাঁর সাথে হুমায়ুন, আকবর ও শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন ।[১০৬৯] ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে জাহানারা বেগম আগুনের পোড়া ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ করলে তিনি হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতির সমাধিক্ষেত্রে আজমীর পরিদর্শন করতে যান ।[১০৭০]

(ঙ) ভ্রমণ প্রণালি

হেরেমের শাহজাদি ও বিখ্যাত মহিলাদের ভ্রমণের জন্য ছিল বিভিন্ন রকমের যানবাহন । সচ্ছল মহিলারা পালকি ব্যবহার করতেন । আটজন লোক কাঁধে করে এই পর্দাবৃত ডুলি বহন করত । এটা লাল মোটা পশমি কাপড়ে আবৃত থাকত এবং ধনী মহিলাদের ক্ষেত্রে মখমল দ্বারা এটা আবৃত থাকত ।[১০৭১] কয়েকজন মহিলা চৌদোলাতে ভ্রমণ করতেন ।[১০৭২] এটা ছিল দুইজন বাহক দ্বারা বহনযোগ্য বাক্সের আকৃতি বিশিষ্ট । এটা ছিল রঙে মাখানো এবং রেশমের জালের মতো ঝালর ও রেশমের থোবাযুক্ত ।[১০৭৩] মহিলারা দুটি উট বা হাতির

১০৬৬. Ibid..

১০৬৭. আকবরনামা (ব্যাভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৪৭৬ -৭৮; তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৭; পিলসার্ট, পৃষ্ঠা ৭০.

১০৬৮. বাদাউনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২০.

১০৬৯. তুযুক (রোজার্স ও বেভারিজ), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০.

১০৭০. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১০১, ১০২.

১০৭১. আমুল-ই-সালেহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২.

১০৭২. বার্নিয়ার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭২; ট্যাভারনিয়ার , পৃষ্ঠা ১; পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯.

১০৭৩. বার্নিয়ার , পৃষ্ঠা ৩৭১ : পিটার মানডি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১৯০-৯১.

www.pathagar.com

মাঝখানে ঝোলানো প্রশস্ত খাজারা নামক ডুলিও ব্যবহার করত।[১০৭৪] চারপাশের ভিত্তির ওপর খুশ স্থাপন করা হতো।

শাহজাদিরা যখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন বিশেষ ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা হতো। সাধারণত পরিচারিকারা এটা টেনে নিয়ে যেত।[১০৭৫] এর চাকা থাকত এবং এতে শুধু একজনের বসার মতো জায়গা থাকত। রাজকীয় মহিলারা পালকি ছেড়ে এটাকে এ ধরনের যানবাহনে পরিবর্তিত করেন, যা তাঁদেরকে শেষ পর্যায়ে ভ্রমণ করা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ নিভৃতবাসে পৌঁছে দিত। হাতির পিঠে চড়েও ভ্রমণ করতেন তাঁরা।[১০৭৬] এই হাতিগুলোর পিঠের পেছনে থাকত আমারিস (অত্যন্ত শোভিত গম্বুজের আচ্ছাদন বিশিষ্ট সিংহাসন) এবং মহিলাদের বসার জন্য থাকত মিকদিম্বার (এক ধরনের হাওদা)।[১০৭৭] ভারবাহী পশুগুলোকে ঘুন্টি ও সূচিকর্মে শোভিত জালের মতো পর্দা দ্বারা সজ্জিত করা হতো। সাধারণত হাতির পিঠে চড়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করা হতো। রাজকীয় মহিলারা ইংরেজি স্টাইলের কোচ গাড়িও ব্যবহার করতেন।[১০৭৮] মনে হয় জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পরে কোচ গাড়ির ব্যবহার অচল হয়ে যায়। হাতি, উট, খচ্চর ও অন্যান্য ভারবাহী পশুও সম্রাট পুষতেন এবং তা শুধু সামরিক উদ্দেশ্যে নয়, তাঁর হেরেমের কাজেও ব্যবহার করা হতো।[১০৭৯] ভ্রমণকালে নপুংসকগণ, মহিলা রক্ষী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ রাজকীয় মহিলাদের সঙ্গে থাকতেন।[১০৮০] সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজকীয় মহিলাদের অনুচরবর্গ বেড়ে যায় এবং একটি শোভাযাত্রার মতো তা দেখাত। কেউই তাঁদের সওয়ারির কাছে আসতে বা তাঁদেরকে এক নজর দেখার সাহস করত না। এমনকি মাহুতকে (হাতির চালক) তার মাথা মোটা কাপড়ে ঢাকতে হতো।[১০৮১] বার্নিয়ার এটা সত্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং লিখেন, 'তাঁরা

১০৭৪. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭১: মানুচী, পৃষ্ঠাগুলো ৭২-৭৩: ট্যাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৯২-৯৩.

১০৭৫. পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১: বার্নিয়ার পৃষ্ঠা ৩৭২.

১০৭৬. ট্যাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯২-৯৩.

১০৭৭. বার্নিয়ার , পৃষ্ঠা ৩৭৩: পেট্রাডেলা ভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২.

১০৭৮. বার্নিয়ার লিখেন, 'মিকদিম্বারের উপরে উপবিষ্ট এই সকল সুশ্রী ও বিশিষ্ট মহিলাকে এভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরে টেনে তোলা হতো যেভাবে উৎকৃষ্টতর জীবদেরকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে বহন করা হয়। বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭২.

১০৭৯. পেট্রা ডেলা ভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১: টমাস রোঁ নূরজাহান বেগমকে একটি কোচ গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন এবং নূরজাহান প্রায়ই এতে চড়ে বেড়াতেন।

১০৮০. ওভিংটনের সুরাট ভ্রমণ, পৃষ্ঠা ১৯১.

১০৮১. মুনসিরেট লিখেন, রানিরা মাদী হাতির পিঠে চড়েন : তাঁরা সুন্দরভাবে সাজানো হাওদার পেছনে গোপনে অবস্থান করেন। তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচশ ব্যক্তি

www.pathagar.com

পুরুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতে পারতেন না।'[১০৮২] নপুংসকগণ ও সৈন্যরা প্রত্যেককে দূরে সরিয়ে রাখত। মোঘল সৈন্যদলে সাধারণত একটি প্রচলিত প্রবাদ ছিল যে, একজন অত্যধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজকীয় মহিলার সওয়ারিরা দূরবর্তী স্থানে থাকতে সতর্ক করিয়ে দিত।[১০৮৩]

মানুচী ও বার্নিয়ার রাজকীয় অন্দরমহলের জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। মানুচী লিখেন, 'যখন বেগম সাহেব তাঁর রাজপ্রাসাদ থেকে দরবারে যান তখন তিনি বিপুল জাঁকজমক, পর্যাপ্ত অশ্বারোহী সৈনিক, পদাতিক বাহিনী ও অনেক খোজা প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হতেন। তারা তাদের সামনে যে ব্যক্তিকেই পান তাকেই ধাক্কা দেন, চিৎকার করতে থাকেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামান্যতম মর্যাদা না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে আঘাত করেন। রাজপরিবারের সকল শাহজাদি বাইরে আসার সময় এই একই ব্যাপার ঘটে।'[১০৮৪] অন্যত্র মানুচী মন্তব্য করেন, 'তাঁরা খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হন, কর্তব্যরত লোকজন তাদের সামনে ধূলি নিবারণের জন্য রাস্তার উপরে পানি ছিটাতে থাকে। উপরে একটি দামি কাপড় বা সোনালি জাল শোভিত, কখনোবা মূল্যবান পাথর বা মূল্যবান আয়না দ্বারা অলংকৃত পালকিতে তাঁদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়।[১০৮৫] বার্নিয়ার আরো লিখেন যে, রওশন আরা বেগম সোনালি ও আকাশি রঙের মখমলে সমুজ্জ্বল হাতির পিঠে চড়তেন এবং তাঁর বাসভবনের সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের দ্বারা পরিপূর্ণ মিকদিম্বারসহ পাঁচ বা ছয়টি হাতি তাঁকে অনুসরণ করত। তাঁর হাতিটিকে ঘিরে রাখত একদল সুন্দর পোশাকে সজ্জিত ও নরম জিনযুক্ত দর্শনীয় ঘোড়ার পিঠে চড়া একদল তাতার ও কাশ্মিরী মহিলা ভৃত্য।[১০৮৬] তাঁদের পেছনে পেছনে আসত শাহজাদির ডানে ও বামে অনেকটা সামনে অগ্রসরমান ও রাস্তা পরিষ্কার করা ও সামনের যেকোনো অনুপ্রবেশকারীকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী বড় আকারের

পাহার' ও নিরাপত্তা দেয়। রানির যাত্রা পথে দৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে দীর্ঘ দূরত্বে তাড়িয়ে দিতে পরম যত্ন নেওয়া হয়। রানির পরিচারিকাগণ উটের পিঠে সর্বদা শামিয়ানার নিচে থাকা মহিলাদেরকে অনুসরণ করেন। মুনসিরেট, পৃষ্ঠা ৭৯.

১০৮২. মানুচী মন্তব্য করেন, শাহজাদি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পত্নীদেরকে এমনভাবে গৃহে আবদ্ধ রাখা হয় যে, তাঁদেরকে কেউ দেখতে পায় না, যদিও তারা পথচারীদের দেখতে পান। মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

১০৮৩. বার্নিয়ার পৃষ্ঠা ৩৭৩: মানুচী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৭২-৭৩.

১০৮৪. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭৪.

১০৮৫. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০.

১০৮৬. Ibid. পৃষ্ঠা ২৩০: বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো ৩৭২-৭৪.

www.pathagar.com

বেত্রাধারী খোজা প্রহরীরা ও পায়ে হাঁটা কর্মচারীগণ। রওশন আরার অনুচরবর্গের পিছনে থাকেন শাহজাদির মতো অনুরূপভাবে হাতির পিঠে চড়া ও ভৃত্য পরিবেষ্টিত রাজপরিবারের শীর্ষস্থানীয় মহিলাগণ। এই রাজকীয় মহিলাকে তৃতীয় একজন মহিলা অনুরসণ করেন, তৃতীয় মহিলাকে একজন চতুর্থ রাজকীয় মহিলা অনুসরণ করেন এবং এভাবে সংখ্যাক্রম অনুসারে ১৫তম বা ১৬তম রাজকীয় মহিলা বেশভূষায় ঐশ্বর্য, সাজসজ্জা ও অনুচরবর্গসহ চলতে থাকেন তাঁদের পদমর্যাদা, বেতন ও পদবির সাথে কম ও বেশি সমানুপাতিকভাবে।[১০৮৭] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পত্নীরাও একই প্রকারে ও মর্যাদায় চলতেন। এ ধরনের একজন দৃষ্টান্তের ব্যক্তি হলেন জাফর খানের স্ত্রী।[১০৮৮]

(৬) দানশীলতা

কয়েকজন দয়াবান, উদার ও পরোপকারী রাজকীয় মহিলা তাঁদের ব্যক্তিগত ভাতার একটি বিশেষ অংশ দানশীলতায় খরচ করতেন। ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে তাঁর স্ত্রী মাহিম বেগম কিছু দান খয়রাত করেন।[১০৮৯] হুমায়ুনের স্ত্রী হাজি বেগম ছিলেন এরকম আরেকজন মহিলা। মক্কার পথে হজ্জযাত্রার সময়ে তিনি এসব স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক অর্থ দান খয়রাত করেন।[১০৯০] তাঁর বৈধব্য জীবনের সমস্ত সময় ধরে তিনি তাঁর জীবনকে ভিক্ষা দানের কাজে উৎসর্গ করেন এবং ভিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি পাঁচশ লোকের ভরণপোষণ করতেন।[১০৯১] ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে হজ্জ থেকে ফিরে এসে গুলবদন বেগম জনসাধারণকে উৎসবের সময় অর্থ সম্পদ দান করেন।[১০৯২] নূরজাহান বেগমের দানশীলতা ছিল অপরিসীম। তিনি গরিব মেয়েদেরকে তাদের বিবাহের সময় যৌতুকের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।[১০৯৩] তিনি রাজপ্রাসাদে অনেক মহিলা ভৃত্য সংগ্রহ করেন এবং তিনি আহামিস নামক শিষ্টাচারী অশ্বারোহী সৈন্যদের সাথে তাদের বিবাহ দেন।

১০৮৭. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো ২৭২-৭৩.

১০৮৮. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০.

১০৮৯. গুলবদন বেগম লিখেন, আমার বান্ধবীরা আমাকে দিনে দুইবার আহারের জন্য একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। গুলবদনের 'হুমায়ুননামা (ব্যাভারিজ)', পৃষ্ঠা ৩.

১০৯০. আকবরনামা (ব্যাভারিজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৪.

১০৯১. মুনসিরেট পৃষ্ঠা ৯৬.

১০৯২. Ibid. পৃষ্ঠা ২০৫.

১০৯৩. মুহাম্মদ হাদীর কর্তৃক অনূদিত তাতিমা-ই-ওয়াকিত-ই জাহাঙ্গীরী (ইলিয়ট ও ডাউসন), ষষ্ঠখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯.

www.pathagar.com

শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলও ছিলেন একজন অত্যন্ত দানশীল মহিলা। তিনি সম্রাটের কাছে অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিদের বিষয়গুলো পেশ করতেন।[১০৯৪] তাঁর সুপারিশে অনেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বৃত্তি ও সাহায্য লাভ করেন। এ ধরনের সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন হাকিম রুখনা কাশি যাঁকে মমতাজ মহলের সুপারিশে চব্বিশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল।[১০৯৫] তাঁর অনুরোধে অনেক মেয়েকে বিয়ের যৌতুকের টাকা দেওয়া হয়েছিল।[১০৯৬] সম্রাটের এসব দানশীল কার্যে তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর নাজির সিত্তি-উন-নিসা।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও পরহিতৈষী মহিলা। শাহজাহান যখন রোগমুক্ত হন তখন জাহানারা হেরেমের অন্য মহিলাদের সাথে গরিবদের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার রুপি বিতরণ করেন।[১০৯৭] সম্রাটের মৃত্যুর পরে তিনি গরিবদেরকে দান করার জন্য দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন।[১০৯৮] আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনাত-উন-নিসা বেগমও দানশীল প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর বদান্যতায় অনেক লোক জীবিকা অর্জন করত।[১০৯৯] ভ্রমণকারীদের কল্যাণে তিনি দূরাগত পর্যটকদের জন্য অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১১০০] পরবর্তীতেও রাজকীয় মহিলাদের পরোপকারী মনোভাব অব্যাহত ছিল। জাহান্দার শাহের প্রেয়সী লাল কুনওয়ার অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির নারী ছিলেন এবং তিনি গরিব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে খাদ্য ও অর্থ মুক্ত হস্তে দান করতেন।[১১০১]

৭. অট্টালিকা নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান

মোঘল শাসনামলে কয়েকজন রাজকীয় মহিলা অট্টালিকা নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের প্রতি প্রবল মনোযোগ দিয়েছেন। যে রাজকীয় মহিলা প্রথমে অট্টালিকা নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হয় তিনি

১০৯৪. যদুনাথ সরকার কর্তৃক রচিত মোঘল ভারতের অধ্যয়ন, পৃষ্ঠা ১১-১২.

১০৯৫. কাজউইনি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৭.

১০৯৬. যদুনাথ সরকার কর্তৃক রচিত মোঘল ভারতের অধ্যয়ন, পৃষ্ঠাগুলো ১১-১২: আমুল-ই-সালেহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯.

১০৯৭. কাজউইন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭২.

১০৯৮. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬.

১০৯৯. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৩২৩.

১১০০. নুরিশ লিখেন শাহজাদি দরিদ্র পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য দানশীলতার প্রেরণায় সড়কের উপরে দূরাগত পর্যটকদের জন্য চৌদ্দটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। নুরিশ, পৃষ্ঠা ২৩৬.

১১০১. আসহাব, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬.

www.pathagar.com

হলেন হুমায়ুনের স্ত্রী হাজি বেগম। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে হাজি বেগমের তত্ত্বাবধানে তাঁর সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। তিনি আরবীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের থাকার জন্য আরব সরাইও নির্মাণ করেন।[১১০২] এছাড়া তিনি আগ্রা থেকে বিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত সড়কে একটি রাজকীয় বাসস্থান ও উদ্যান নির্মাণ করেন।[১১০৩] মনে হয় তাঁর আমলের পরে আকবরের স্ত্রী সেলিমা সুলতান বেগম তাঁর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। তাঁকে তাঁর নিজের তৈরি নকশা অনুযায়ী মান্দাকার উদ্যানে সমাহিত করা হয়।[১১০৪] মরিয়ম উজ জামানি নামে পরিচিত জাহাঙ্গীরের মা জিসাত পরগনাতে একটি বাউলি (সিঁড়িযুক্ত ইন্দিরা) নির্মাণ করেন। এটি একটি বড় স্থাপনা এবং এর জন্য খরচ হয়েছিল কুড়ি হাজার রুপি।[১১০৫] নূরজাহানও প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী হন। তাঁর আদেশে তাঁর ভাকিল নূরসরাইতে একটি বাসস্থান ও উদ্যান নির্মাণ করেন এবং এই নির্মাণকার্য সম্পাদনের পরে তিনি একটি ভোজের আয়োজন করেন।[১১০৬] তাঁর রাজকীয় কর্মচারীরা সেকেন্দ্রাবাদে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১১০৭] নূরজাহান ছাড়াও ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আকা আকায়ান নামক তাঁর অধীন চাকরিরত আরেকজন মহিলা কর্মচারী দিল্লিতে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১১০৮] জনশ্রুতি মতে শাহজাহানের কন্যা পুরহুনার বানু বেগমের অনুমতিতে একজন রাজমিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত সমাধিসৌধে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১১০৯] জাহানারা বেগম ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য স্থপতি। লাহোরে বেগম সাহেবের (যে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন) নির্দেশে একটি বাজার নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তিনিই এর নকশা তৈরি করেছিলেন এবং

১১০২. ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত হুমায়ুন বাদশাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭: মুনসিরেট, পৃষ্ঠা ৯৬.

১১০৩. থিভিনট লিখেছেন, আগ্রা থেকে বিয়ানা পর্যন্ত রাস্তার উপরে রয়েছে আকবরের রাজমাতা (হাজিবেগম) কর্তৃক নির্মিত অত্যন্ত সুন্দরভাবে যত্নসাধিত একটি উদ্যানসহ রাজকীয় বাসস্থান। থিভিনট, পৃষ্ঠা ৫৭.

১১০৪. তুযুক (R&B), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৩ উদ্যানটি সম্ভবত অবস্থিত ছিল আগ্রার কাছে : হিন্দি অনুবাদে উদ্যানের নাম আনন্দকর।

১১০৫. জাহাঙ্গীর বাউলি সম্বন্ধে প্রশংসা করে লিখেছেন, 'নিশ্চয়ই বাউলি ছিল একটি জমকালো অট্টালিকা এবং এটাকে অতিশয় সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল আমি রাজকীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে নিশ্চিতরূপে জেনে ছিলাম এই ইন্দিরাটি নির্মাণ করতে ২০,০০০ টাকা খরচ হয়েছিল। তুযুক (R&B) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪.

১১০৬. Ibid., পৃষ্ঠা ১৯২: পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮.

১১০৭. পিলসার্ট, পৃষ্ঠা ৪.

১১০৮. তুযুক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩.

১১০৯. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৯০.

www.pathagar.com

এটি পরিচিত হয় চকসরাই নামে।[১১১০] তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে চিরস্থায়ী যশ, খ্যাতি ও পুরস্কার পাওয়ার আশায় তাঁর ব্যক্তিগত ভাতার অর্থ দিয়ে আগ্রাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইতঃপূর্বে সম্রাট শাহজাহান এই একই মসজিদ তাঁর ব্যক্তিগত আর্থিক সম্পদে তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরে এটি নির্মাণ করতে জাহানারাকে অনুমতি দেন।[১১১১] জাহানারা বেগমের একটি সুন্দর আশ্রমও নির্মাণের কৃতিত্ব আছে।[১১১২] অ্যাচোলের গ্রামাঞ্চলে তিনি নিজস্ব একটি আবাসগৃহ নির্মাণ করেন।[১১১৩] তিনি কাশ্মীরে কুড়ি হাজার রুপি ব্যয়ে গরিবদের জন্য একটি বাসভবন নির্মাণ করেন।[১১১৪] তিনি দিল্লিতে অতীব সুন্দর একটি উদ্যান ও পুষ্করিণীর সাথে মরুযাত্রীদের একটি পান্থশালাও নির্মাণ করেন।[১১১৫] বেগম সাহেবের বড় মোঘল সরাইতে পারস্যের বণিকদেরও থাকার অনুমতি দেওয়া হতো।[১১১৬] আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনাত-উন-নিসা বেগমকে ভবন নির্মাণে আগ্রহী শেষ মহিলাতে আমরা উল্লেখ করি বলে ধারণা করা হয়। তিনি মরুযাত্রীদের জন্য প্রায় ১৪টির মতো সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১১১৭] দিল্লিতে জিনাত-উল-মসজিদে তাঁকে সমাহিত করা হয়, তা তাঁর অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল।[১১১৮]

৮. উদ্যান নির্মাণ

রাজকীয় মোঘল পরিবারের পুরুষেরাই শুধু উদ্যান স্থাপনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না; কয়েকজন মহিলাও উদ্যান স্থাপনে আগ্রহী হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আকবরের দাদি বিগা বেগম, জাহাঙ্গীরের দাদি মরিয়ম মাকানি এবং মির্জা আবু সাঈদের কন্যা সম্রাট বাবরের ফুপু শাহার বানু বেগম ছিলেন উল্লেখযোগ্য।[১১১৯] জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম-উজ-জামানি একটি উদ্যান স্থাপন করেন জিসাত পরগনাতে যেটি নির্মাণ করতে প্রায় কুড়ি হাজার রুপি ব্যয়

১১১০. আমূল-ই-সালেহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭.
১১১১. লাহোরী, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫২.
১১১২. Ibid.. দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৬৯.
১১১৩. Ibid., প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫১.
১১১৪. কাফি খান, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৭০৬.
১১১৫. ট্যাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯। থিভিনট, পৃষ্ঠাগুলো ৬০, ২৮০-৮১.
১১১৬. মানুচী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২১.
১১১৭. নূরিশ, পৃষ্ঠা ২৩৬.
১১১৮. সরকার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০.
১১১৯. জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে একটি প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা তুলে ধরেন, তুযুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৬-৭

www.pathagar.com

হয়েছিল।[১১২০] নূরজাহান বেগমেরও অনেক সুন্দর বিনোদন স্থান নির্মাণের কৃতিত্ব রয়েছে।[১১২১] তাঁর শাহদারা নামক উদ্যানটি লাহোরে নির্মিত হয়েছিল।[১১২২] তাঁর ভাকিলরা নূর সরাইতে আরেকটি উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন।[১১২৩] জাহাঙ্গীরের অধীন চাকরিরত আকা আকাওয়ানও তাঁর জন্য একটি উদ্যান নির্মাণ করেন দিল্লিতে।[১১২৪]

জাহানারা বেগম ছিলেন অনেক উদ্যানের মালিক। তন্মধ্যে একটি অবস্থিত ছিল আম্বালাতে এবং অপরটি সুরাটে।[১১২৫] মনে হয় তিনি কিছুসংখ্যক উদ্যান উত্তরাধিকারসূত্রে এবং উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পরে জাহানারা বাগ-ই-জাহারার মালিক হন।[১১২৬] পক্ষান্তরে তাঁর পিতা বাগ-ই-শাহারারা তাঁকে অর্পণ করেন।[১১২৭] বিভিন্ন প্রকার গাছ ও খালসহ ব্যাঁচোলে তাঁর একটি উদ্যানও ছিল।[১১২৮] কাশ্মীরে তিনি বাগ-ই-আয়েশাবাদ, বাগ-ই-নূর আফসান ও বাগ-ই-সাফা নামক আরো তিনটি বাগানের মালিক ছিলেন[১১২৯] এবং জাওয়ার খান খাজাসারার তত্ত্বাবধানে এগুলো স্থাপন করা হয়।[১১৩০] রওশন আরা বেগম দিল্লি নগরীর কাছে একটি উদ্যাণ নির্মাণ করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়।[১১৩১] আওরঙ্গজেবের অন্যতম স্ত্রী বিবি আকবরাবাদী মহল কাশ্মীর ও লাহোরের শালিমার উদ্যানের অনুকরণে একটি সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করেন।[১১৩২] এটি তৈরি করতে চার বছর সময় লেগেছিল এবং এর জন্য খরচ হয়েছিল দুই লক্ষ রুপি। জীবন নিসাও উদ্যান তৈরিতে পিছিয়ে ছিলেন না।[১১৩৩]

১১২০. তুযুক (R&B) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪.
১১২১. স্টুয়ার্ট কর্তৃক রচিত 'বিখ্যাত মোঘলদের উদ্যানগুলো', পৃষ্ঠা ১২৬.
১১২২. জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেন। তুযুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬: পিটার মানডি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪.
১১২৩. তুযুক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯২.
১১২৪. Ibid., পৃষ্ঠা ৩.
১১২৫. কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৪: লাহোরি, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭.
১১২৬. থিভিনট, পৃষ্ঠা ৩৫: স্টোভরিনাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮.
১১২৭. লাহোরি, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৯.
১১২৮. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৮৭.
১১২৯. Ibid., পৃষ্ঠা ৪২৮.
১১৩০. Ibid., প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৭.
১১৩১. আমুল-ই সালেহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬.
১১৩২. স্টুয়ার্ট কর্তৃক রচিত 'বিখ্যাত মোঘলদের উদ্যানগুলো', পৃষ্ঠা ১০৮.
১১৩৩. Ibid., পৃষ্ঠা ১০৩.

www.pathagar.com

৯. বিবাহ অনুষ্ঠান

কয়েকজন রাজকীয় মহিলা বিবাহের আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা এভাবে আয়োজিত বিবাহ ব্যবস্থাপনায় দেখাশোনা করতেন। বাবরের রাজত্বকালে তাঁর বোন খানজাদা বেগম, তাঁর খালারা এবং তাঁর স্ত্রী মাহিম বেগম বিবাহের আয়োজনে বিশেষ আনন্দ পেতেন। বাবর যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তিনি তাঁর কন্যা গুলরাঙের সাথে তিমুরের সুলতান ঈশার এবং গুলচেহারার সাথে তুকতা বুঘা সুলতানের বিয়ের জন্য তাঁর পত্নী মাহিম বেগম ও তাঁর খালাদের অনুমতি চান। এই বিবাহটি তাদের সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়।[১১৩৪] হুমায়ুনের মা মাহিম বেগম তাঁর পুত্রকে দেখতে চেয়েছিলেন। যখনই তিনি একজন সুন্দরী ও রূপসী কন্যাকে দেখতেন তখন তিনি তাকে পুত্রের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য তাঁর কাজে লেগে যেতেন। মেওয়াজান নামে একজন মহিলা গুলবদনের অধীন চাকরি করতেন। হুমায়ুন মাহিম বেগমের ইচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করেন।[১১৩৫] বাবরের আরেকজন পত্নী দিলদার বেগমও বিয়ের আয়োজনে কৌতূহলী ছিলেন। হুমায়ুন মীর বাবা দোস্তের কন্যা হামিদা বানু বেগমকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং দিলদার বেগমের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। হিন্দাল তাঁকে তাঁর বোন বলে বিবেচনা করে এই বিয়ের ব্যাপারে বিরোধী ছিলেন। এতে হুমায়ুন বিব্রত হন। কিন্তু দিলদার বেগম এ ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যান। চল্লিশ দিন যাবৎ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। হামিদা বানু বেগম ছিলেন হুমায়ুনকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পরিশেষে দিলদার বেগম যখন কয়েকবার তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন তখন তিনি ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে বিয়েতে রাজি হন। হুমায়ুনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।[১১৩৬] আকবরের রাজত্বকালে মাহাম আনাগা বিয়ের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে আগ্রহ পোষণ করতেন। হুমায়ুনের রাজত্বকালে সেলিমা সুলতান বেগমের সাথে বৈরাম খানের বাগদান সম্পন্ন হয়। তাঁদের বিয়েতে আকবর সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিশেষ করে

১১৩৪. গুলবদন বেগম লিখেছেন, আমার চাচি স্বয়ং বদিউল জামাল বেগম এবং আকা বেগম যাঁরা উভয়েই ছিলেন সম্রাটের ফুপু (খালা) তাঁদেরকে হলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একটি গালিচা বিছিয়ে এবং একটি প্রসন্ন সময় বেছে নিয়ে মাহামের মানাচা উভয় সুলতানকে হাঁটু গেড়ে বসান তাঁদেরকে জামাতা করার জন্য। গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠা ১০৭.

১১৩৫. মাহিম হুমায়ুনের কাছে গিয়ে বলেন, 'হুমায়ুন, মাওয়াজান তো মন্দ নয়। তুমি কেন তাকে তোমার সেবাকর্মে গ্রহণ করছ না?' গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভা:), পৃষ্ঠা ১১২.

১১৩৬. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১৪৯-৫১; তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮.

www.pathagar.com

রাজদরবারের মহিলারা যেমন বিঘা বেগম ও মাহাম আনাগা বিয়ের আয়োজন করতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন[১১৩৭]। তিনি বিগা বেগমের কন্যার সাথে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আদম খানের বিয়ের পরিকল্পনাও তৈরি করেন।[১১৩৮] ভাইদের বিয়ের আয়োজনে জাহানারা বেগমও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি খুব শীঘ্রই মৃত্যুবরণকারী মমতাজমহলের স্থান অধিকার করেন এবং সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মমতাজমহল জীবিতকালে কিছু অসমাপ্ত আয়োজন রেখে যান দারার বিয়ের ব্যাপারে। তিনি সে সবের সকল দায়িত্ব পালন করেন। মমতাজের পরলোকগমনের পরে তিনি এই কাজটি হাতে নেন। তিনি মূল্যবান ধনরত্ন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য উপহারসহ সকল উপহার সংগ্রহ করেন এবং সেগুলো একটি স্থানে জড়ো করে।[১১৩৯] এসব আয়োজনে তাঁকে সাহায্য করেন শাতি উন্নিসা।[১১৪০] সম্রাট শাহজাহান তাঁর আমিরদের সঙ্গে নিয়ে আসেন সেগুলো পরিদর্শন করতে। বলখের রাজদূত ও তাঁর সঙ্গী হন এবং সেগুলো দেখে চমৎকৃত হন।[১১৪১] কনের পক্ষে দারার শাশুড়ি ইফফাত জাহান বানু বেগম এ ব্যাপারে সকল আয়োজন করেন এবং বিয়েতে মূল্যবান উপহার দেন।[১১৪২] জাহানারা বেগম আওরঙ্গজেব ও সুজার বিয়ের আয়োজন করেন।[১১৪৩] ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে যাবদাত-উন-নিসা বেগম (আওরঙ্গজেবের কন্যা) এর সিফির শিকো (দারার ছোট ছেলে) এর সাথে বিবাহ হয় তখন শাহজাহানের কন্যা গওহারা বেগম ও হামিদা বানু বেগম এর আয়োজন করেন।[১১৪৪]

আবার ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ সংক্রান্ত আপ্যায়ন অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন আওরঙ্গজেবের কন্যা জিনাত উন নিসা বেগম।[১১৪৫] রাজকীয় মহিলারা শুধু সক্রিয়ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি, এমনকি বিবাহ অনুষ্ঠানগুলো তাঁদের বাসস্থানে সম্পন্ন করা হয়েছিল। সেলিম,[১১৪৬] মুরাদ ও[১১৪৭] শুকুরুন-

১১৩৭. আকবরনামা (ব্যাভারেজ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৯৭-৮.
১১৩৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ২০৪-৫. তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫১.
১১৩৯. Ibid., কাজউইনি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৮.
১১৪০. Ibid., পৃষ্ঠা ৪৯৯.
১১৪১. Ibid., পৃষ্ঠা ৫০০.
১১৪২. Ibid., পৃষ্ঠা ৪৯১,৫০০.
১১৪৩. Ibid., পৃষ্ঠা ৫০৭.
১১৪৪. লাহোরি, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬৭.
১১৪৫. মাসির ই আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৭৭.
১১৪৬. আকবরনামা (ব্যাভারেজ), তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৯৬৯-৭০.

www.pathagar.com

নিসা বেগমের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট আকবরের মাতা মরিয়ম ম্যাকানির প্রাসাদে।[১১৪৮] একইভাবে জাহাঙ্গীর[১১৪৯] পারভেজ[১১৫০] ও লাডলি বেগমের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম-উজ-জামানির বাসস্থানে। [১১৫১]দারার কন্যা জাহান জেব বেগমের বিয়ে সম্পন্ন হয় জাহানারা বেগমের বাসস্থানে।[১১৫২]

(১০) উপহারাদি

সম্রাট, শাহজাদা ও আমিরদের কাছ থেকে কয়েকজন মহিলা মূল্যবান উপহার ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস লাভ করেন। কিন্তু সিংহাসনে অভিষেক, জন্মদিন ও ওজন পরিমাপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁরাও সম্রাটকে উপহার দিতেন।[১১৫৩] ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করার পরে বাবর হিন্দুস্তানের কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস তাঁর বোন ও হেরেমের জ্যেষ্ঠা মহিলাদের কাছে খাজা কিলান বেগের মাধ্যমে পাঠান।[১১৫৪] হুমায়ুনের রাজত্বকালে মরমি ভোজসভায় বেগমদের আশরাফি ও শাহরুখিজ স্বরূপ উপহার দেওয়া হয়।[১১৫৫] শুধু তাই নয়, সম্রাট সকল মির্জা ও বেগমদের উপহার আনতে আদেশ করেন এবং প্রত্যেকেই তা আনেন।[১১৫৬] সম্রাট আকবরও নওরোজ উৎসবে রাজকীয় মহিলাদের মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। সাধারণত মরিয়ম ম্যাকানি গুলবদন ও অন্য বেগমরা একই রকম উপহার প্রাপ্ত হতেন।[১১৫৭] সম্রাট তাঁর মাতার বাসস্থানে যেতেন সেখানে আমিরগণও রানিমাতাকে উপহার দিতেন।[১১৫৮] উল্লেখ করে যে, ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে খুররমের বিবাহ উপলক্ষে

১১৪৭. Ibid., পৃষ্ঠা ৭৯১.
১১৪৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ৯৯০-১০৫৯.
১১৪৯. তুযুক (R&B) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১৪৪-৪৫.
১১৫০. Ibid., পৃষ্ঠা ৫১.
১১৫১. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০২.
১১৫২. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৪৭: সরকার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪.
১১৫৩. থিভিনট, পৃষ্ঠা ৬৭.
১১৫৪. প্রত্যেক বেগমকে একটি সোনার থালাভর্তি মণিরত্নসহ নর্তকী দেওয়া হয় এবং আশরাফিপূর্ণ দুটি ছোট ঝিনুক ইত্যাদির মধ্যে রঙধনু বর্ণের বারকোষ ও অন্য দুটি বারকোষের উপরে থাকত শাহরুকিস। গুলবদনের হুমায়ুননামা, পৃষ্ঠাগুলো ৯৫-৯৬.
১১৫৫. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো ১২৫-২৬: তাবকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২৫, ৩৬৫.
১১৫৬. গুলবদনের হুমায়ুননামা, পৃষ্ঠা ১২৪.
১১৫৭. তাবকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৫৫৯-৬০.
১১৫৮. ডিলেট, পৃষ্ঠা ১০১.

www.pathagar.com

বেগমদেরও কিছু উপহার দেওয়া হয়।[১১৫৯] ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নূরজাহান বেগমকে দুই লক্ষ রুপি উপহার দেন এবং অন্যান্য বেগমকে ষাট হাজার রুপি দেন।[১১৬০] ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর আতর-ই-জাহাঙ্গীরী আবিষ্কারের জন্য নূরজাহানের মাতা আসমাত বানু বেগমের সম্মানে একটি মুক্তার মালা উপহার দেন।[১১৬১] ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে আইতমাত-উদ-দৌলাহ একটি রাজকীয় ভোজের আয়োজন করে উহাতে জাহাঙ্গীরকে দাওয়াত করেন এবং সেই সঙ্গে রত্নখচিত অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও এক লক্ষ রুপি মূল্যের উপহার বেগম ও হেরেমের অন্যান্য মহিলাদের দেন।[১১৬২] ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্ক থেকে একজন বণিক দুটি বড় আকৃতির মুক্তা নিয়ে আসেন। নূরজাহান বেগম সেগুলো ষাট হাজার রুপি মূল্যে খরিদ করে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে উপহার দেন।[১১৬৩] শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁর ফুপু শুকুরুন নিসা বেগম বলখে তাঁর বিজয় উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে আকবরাবাদ থেকে আসেন এবং তাঁকে চার লক্ষ রুপি মূল্যের লাল পাথর উপহার দেন। সম্রাটও তাকে এক লক্ষ রুপি মূল্যের উপহার দেন।[১১৬৪] সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল সম্রাটকে পেসকাসস্বরূপ অনেক মূল্যবান জিনিস উপহার দেন।[১১৬৫] শাহজাহানের আদরের কন্যা জাহানারা বেগমও তাঁকে উপহার প্রদানে পিছিয়ে ছিলেন না।[১১৬৬] সম্রাটের ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানে তিনি একত্রিশ সারাখ ও চল্লিশ হাজার রুপি মূল্যের একটি মুক্তা উপহার দেন[১১৬৭] এবং নিসার বিতরণের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাঠান।[১১৬৮] বেগম সাহেব ও অন্য রাজকীয় মহিলারা আওরঙ্গজেবের সমর্থনে তাঁকে মূল্যবান মণিরত্ন উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন।[১১৬৯] তাঁর অভিষেকের পরে তিনিও বেগমদের উপহার দেন।[১১৭০] তাঁর ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানের

১১৫৯. তুযুক (R&B) প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২২৪-২৫.

১১৬০. Ibid., পৃষ্ঠা ৪০১.

১১৬১. Ibid., পৃষ্ঠা ২৭১.

১১৬২. Ibid., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০.

১১৬৩. Ibid., পৃষ্ঠা- ২৩৭.

১১৬৪. কাফিখান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪৬.

১১৬৫. ওয়ারিশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২১১, ২৯২, ৩১৭, ৩৭১; কাজউইনি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪.

১১৬৬. লাহোরি, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৪৫.

১১৬৭. আমুল-ই-সালেহ, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৯; ওয়ারিশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮.

১১৬৮. লাহোরি, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৫১; ওয়ারিশ , প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০১.

১১৬৯. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ১৯.

১১৭০. Ibid.,পৃষ্ঠা ১৪; কাফিখান, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৭.

www.pathagar.com

সময় বেগমরা আবার উপহার পাঠান।[১১৭১] কাশগড়ের বহিস্কৃত রাজা আব্দুল্লাহ খান ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লিতে আসেন এবং তিনি জাহানারার কাছ থেকে একটি রত্নখচিত ছুরিকা, একটি পানের বাটা ইত্যাদি সমেত কুড়ি হাজার রুপি মূল্যের উপহার গ্রহণ করেন। এই উপহার সম্রাটের মাধ্যমে তাঁকে দেওয়া হয়।[১১৭২] শাহজাহানের হেরেমের অন্য মহিলাদের মতো তাঁর কন্যারা পুরহুনার বানু বেগম ও গোহারারা বেগম এবং মুহাম্মদ আজমের কন্যারা ইফফাতারা ও গীতিয়ারা বেগম সম্রাটের কাছ থেকে মূল্যবান উপহার লাভ করেন।[১১৭৩] মোঘল আমলের পরেও এই প্রথাটি বিরাজমান ছিল।

১১. বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার

সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের জন্য এই সময়ে ভারত ভ্রমণকারী পর্যটকগণ হেরেমের প্রখ্যাত মহিলাদেক উপহার দিতেন। ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম হকিন্স জাহাঙ্গীরের বোন শুকুরুন নিসা বেগম এবং তাঁর উপপত্নী নূরজাহানকে মণিরত্ন উপহার প্রদান করেন।[১১৭৪] ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে করয়াট নামে আরেকজন পর্যটক ভারতে আসেন এবং আগ্রা থেকে যাওয়ার সময় জাহাঙ্গীরকে একটি মণি বসানো সোনার বাঁশি উপহার দেন এবং পরে তিনি এটি তাঁর এক মহিমান্বিতা নারীকে প্রদান করেন।[১১৭৫] টমাস রো নিজেও তাঁদের পদাঙ্ক অনুরসরণ করেন এবং নূরজাহানকে বিভিন্ন উপহার দেন। তিনি তাঁকে একটি ইংল্যান্ডের চার

১১৭১. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৪৬; ট্যাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০; কাফিখান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৯৬, ৪০০, ৪২৫.

১১৭২. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৪৬.

১১৭৩. ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈদের সময় বেগম সাহেব, পুরহুনার বানু বেগম এবং গাওহারারা বেগম পুরস্কার অর্জন করেন। মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৩৬। ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আজমের বিয়ের সময় বেগম সাহেব একটি হাতি উপহার পান এবং দারার কন্যা জাহান জেব বেগম দুইটি ঘোড়া উপহার পান। মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ৪৯.
১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহজাহানের কন্যা পুরহুনার বানু বেগম এবং গাওহারারা বেগম এই দুইজনের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার মোহর উপহার দেওয়া হয়। কাফিখান পৃষ্ঠা ৭২.

১১৭৪. ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ আজমের কন্যা গীতিয়ারা ও ইফফাত আরা বেগম এই দুইজনের প্রত্যেককে আট থেকে দশ হাজার রুপি মূল্যগত ব্যবধানের অলংকার উপহার দেওয়া হয়। মাসির-ই-আলমগিরি। পৃষ্ঠা ৩০৬.

১১৭৫. ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আগমনকারী পর্যটক হাকিন্স লিখেন, 'উপহার ও উৎকোচ ছাড়া কোনো বিষয়ের অগ্রগতি হবে না বা সম্পন্ন হবে না। মুরদের এই প্রথা সম্মন্ধে জানতে পেরে আমি আমার দালালকে সম্রাটের বোন শুকুরুন নিসা এবং নতুন উপপত্নীকে গহনা দ্বারা সজ্জিত করতে পাঠালাম।' হকিন্সের ভ্রমনের শুরুতে, পৃষ্ঠা ৯৪.

www.pathagar.com

চাকার গাড়ি. একটি আয়নার বাক্স ও বিভিন্ন খেলনা উপহার দেন।[১১৭৬] ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণকারী টাভারনিয়ার সম্রাট ও তাঁর বোন জাহানারাকে উপহার দেন।[১১৭৭] তিনি ইংরেজদের কাছ থেকে তেল, প্রশস্ত কাপড়, আয়না, আসবাবপত্র ও সূচিকর্ম শোভিত বস্ত্র ইত্যাদি উপহার গ্রহণ করেন।[১১৭৮]

১২. পোশাক পরিচ্ছদ

রাজকীয় ও অভিজাত মহিলাদের জীবনে পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নভাবে একটি বিশেষ স্থান দখল করে। তখনকার দিনে উচ্চতর শ্রেণির মহিলারা যখন খুব সীমিত কাজ করতেন এবং তাঁদের দৈহিক আকর্ষণ ছিল রাজকীয় অনুগ্রহ লাভের একমাত্র পাসপোর্ট, তখন তাঁরা অধিকাংশই তাঁদের পোশাকের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দিতে নিয়োজিত হন। রাজকীয় ও অভিজাত মহিলারা সুন্দর ও দামি পোশাক পরতেন যাতে তাঁদেরকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখায়। সাধারণত পোশাক পরিচ্ছদে ব্যবহৃত উপাদানগুলো ছিল সূক্ষ্ম রেশম, (দোরিয়া ডোরাকাটা কাপড়) এবং মালোয়ার মসলিন সিরঞ্জ। মসলিনের এত কদর ছিল যে মোঘল অন্দরমহল বা আমির ওমরাহদের মধ্য থেকে ব্যবসায়ীদেরকে এটা পাঠানোর জন্য আদেশ করা হতো। কখনো কখনো পোশাকগুলো জারারাফত সোনার সুতায় বুনানো কাপড়, তিলাদোজ, মুখেশকার, কিমখাব (সোনার তৈরি বিভিন্ন কাপড়) এবং কলাবতি (সোনার ছোট ছোট অলংকার) ইত্যাদির সমন্বয়ে তৈরি করা হতো।[১১৭৯] সোনা ও রুপার জড়ি দিয়ে পোশাকগুলোকে সূচিকর্মে শোভিত করা হতো। সেগুলোকে আরো সুন্দর করতে জড়ি বসানো হতো। গোলাপের নির্যাস ও অন্য সুরভি দিয়ে সেগুলো সুবাসিত করা হতো।[১১৮০] একবার পরিহিত পোশাক অনেকবার পরিধান করত না।[১১৮১] রাজপরিবার অভিজাত পরিবার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশ পোশাকের মধ্যে গুণগত উপাদানগত ও মূল্যের চেয়ে স্টাইলের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হতো। এটা

১১৭৬. করয়াটের ভ্রমনের শুরুতে, পৃষ্ঠা ৬৭.

১১৭৭. টাভারনিয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১.

১১৭৮. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৫১-১৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) পৃষ্ঠাগুলো ১১, ১২ ২৫৪.

১১৭৯. পেট্রাডেলাভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪: আসহাব, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৩০.

১১৮০. লাহোরি, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠাগুলো ৩৬৩-৬৪: মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০.

১১৮১. কতিপয় বিদেশি পর্যটক তাঁদের পোশাকের অবিশ্বাস্য মূল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বার্নিয়ার শুধু ফিতার দাম ১২ বা ১৫ ক্রাউন ধরেছেন। মানুচী বলেন যে, জড়ি ছাড়াই প্রত্যেকটি পোশাক কিনতে তাদের লাগত চল্লিশ বা পঞ্চাশ রুপি। মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১; বার্নিয়ার পৃষ্ঠা ২৫৮.

www.pathagar.com

অনুমান করা যায় যে, বাবর ও হুমায়ুনের আমলে সাম্রাজ্যের হেরেমে মোঘল মহিলারা পারস্য ও খোরাশানের মতো তাঁদের নিজ দেশের পোশাক পরিধান অব্যাহত রাখেন। রাজকীয় মহিলারা প্রশস্ত ও ঢিলা ফিতা ব্যবহার করতেন। তাঁরা তাঁদের শরীরের উপর অংশ একটি পেছনের বাঁধাজামা দিয়ে ঢেকে দিতেন। ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো একটি গলাবন্ধনীও ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া ইয়ালিক নামক উপরের একটি পোশাকও চালু ছিল। এর সামনে বোতাম লাগানো থাকত, আর একটি ঘাড়ের মধ্যে থাকত এবং এর একটি অর্ধআস্তিন বা পুরা আস্তিন থাকত।[১১৮২] তখনকার দিনে পোস্তান, উলবাগ, বানিচ ও তারহাট নামে আরো কিছু পোশাক ব্যবহার করা হতো।[১১৮৩] যাহোক, ক্রমান্বয়ে আত্মীকরণের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল এবং ভারতীয় শিল্পাদর্শ উচ্চতর মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। এটা হলো একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, বিশেষ করে এই কারণে যে, জলবায়ু সংক্রান্ত কারণে উৎকর্ষ সাধন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে।[১১৮৪] হুমায়ুনের রাজত্বকাল থেকে এই প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছে বলে চিহ্নিত করা যায়। যখন হুমায়ুনের রানি ও শাহজাদিরা তুর্কি মহিলাদের মতো পোশাক পরতেন তখন তাঁরা হিন্দুসুলভ বিশেষ ধারায় তাঁদের কেশ বিন্যাস করতেন।[১১৮৫] তাঁরা আর তাঁদের কেশগুচ্ছ আলগা করতেন না বা বিভক্ত করতেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁদের কেশগুচ্ছকে মুচড়ে পিঠের দিকে একটি সমতল মোলায়েম খোঁপাতে পরিণত করতেন যেখান থেকে কয়েকটি বেণী বের করে আনা হতো। হুমায়ুনের রাজত্বকালের শেষের দিকে তুর্কি মহিলারা সাধারণভাবে হিন্দু মহিলাদের পরিধেয় অলংকার ব্যবহার করতে শুরু করে। মোঘল নারীদের শিরোভূষণ তাজকুল্লাহ যা ছিল পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত রানি ও শাহজাদিদের প্রিয় শিরোভূষণ তার জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে।[১১৮৬] হুমায়ুনের সময় রাজকীয় মহিলারা তাকি নামক একটি উচ্চ শিখাযুক্ত টুপি ব্যবহার করত। এটা অবিবাহিত বালিকারা ব্যবহার করত এবং লাচাক বা কুসাবা নামক ঝুলন্ত ঘোমটাসহ তাকি নামক পোশাক বিবাহিত মহিলারা ব্যবহার করত।[১১৮৭] উচ্চ বংশের মহিলারা তাদের টুপিতে পাখনা

১১৮২. কামুদী, পৃষ্ঠা ৯৮.

১১৮৩. Ibid. কামুনী এটাকে স্টাইলের দিক থেকে ফারাজি কিন্তু আস্তিনের মধ্যস্থ ফালি বলে চিহ্নিত করেন।

১১৮৪. ভারতীয় তথ্য সরবরাহকারী, পৃষ্ঠা ৩.

১১৮৫. কামুদী, পৃষ্ঠা ৯৬.

১১৮৬. Ibid.

১১৮৭. গুলবদনের হুমায়ুননামা (ব্যাভারেজ), পৃষ্ঠা ১৩৮.

www.pathagar.com

যোগ করত।[১১৮৮] আকবরের মৃত্যুর অনেক আগে তাকি এর জনপ্রিয়তা হারায় এবং তা শুধু পরিচারিকা, মহিলারক্ষী প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহার হতো। কতক সময় রাজকীয় মহিলারাও মুক্তা ও পাথরযুক্ত পাগড়ি পরিধান করত।

এটা ছিল সম্রাট কর্তৃক কতিপয় নির্বাচিত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ।[১১৮৯] আকবরের রাজত্বকালে নারীদের পোশাক বিবর্তনের ধারা গুরুত্ব বহন করে। তাঁর হেরেমে রাজপুত শাহজাদিদের আগমনের ফলে এই প্রক্রিয়াটি গতিসঞ্চার করে।[১১৯০] আকবর যেহেতু উদার ও বড় মনের অধিকারী ছিলেন সেহেতু তিনি তাঁদেরকে তাদের পোশাকের শিল্পাদর্শ চালু করতে অনুমতি দেন। এর ফলে ফ্যাশন ও স্টাইলের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে। রাজপুত মহিলাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল আঙ্গিয়া বা আঁটসাঁট বক্ষ আবরণী। এটা অর্ধআস্তিন বা পুরা আস্তিন বিশিষ্ট হতো। এর দৈর্ঘ্য কালক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। হিন্দি সাহিত্যে আমরা পোশাকের এই উপাদান সম্বন্ধে পাই পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি।[১১৯১] আঙ্গিয়ার নিচে লাহাঙ্গা (লম্বা স্কার্ট) পরিধান করা হতো।[১১৯২] ইজারবন্দের দুই পার্শ্বে (বাঁধার ফিতা) পোশাকের রূপসৌন্দর্য বাড়াতে মুক্তার ছড়া বেঁধে দেওয়া হতো। পরিশেষে পোশাকের সেটটি পূর্ণ করতে আধহানি ব্যবহার করা হতো। এটা একটি বড় কাপড়ের টুকরা হতো এবং তা দেহ ও মস্তকের উপরের অংশ আবৃত করতে ব্যবহার করা হতো।[১১৯৩] মুসলমান মহিলাদের পোশাক পেশওয়াজ ও আঁটসাঁট পায়জামাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পেশওয়াজ কোমরের সাথে বাঁধা হতো এবং স্কার্টের মতো হাঁটুর নিচে তা ঝুলে থাকত। এর থাকত একটি ভি আকৃতির গলাবন্ধনী যা সামনের দিকে খোলা যেত। পায়জামাগুলো সোনালি সুতার দ্বারা তৈরি করা হতো এবং তা থেকে ফুলের বা জ্যামিতিক নকশা তৈরি করা হতো।[১১৯৪] হিন্দু মহিলাদের মতো মুসলমান মহিলারাও দোপাট্টা ব্যবহার করত।[১১৯৫] নূরজাহানের হাতে মহিলাদের পোশাকের আকৃতি ও স্টাইল আরো উন্নত হয়। তিনি পোশাকের

১১৮৮. কামুদী, পৃষ্ঠা ৯৬.

১১৮৯. পেট্রাডেলাভেলী ও মানুচী উভয়েই পাগড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা দেন। মানুচী বলেন, 'এটা অত্যন্ত মানানসই এবং পরিধানকারীকে অত্যন্ত সৌন্দর্য মণ্ডিত করে। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪: দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯.

১১৯০. যে সমস্ত রাজপুত মহিলা মোঘল হেরেমে প্রবেশ করেন তাদের নামের তালিকার জন্য সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।

১১৯১. সূর্যাগার, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬২২: নীলি আঙ্গিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২১৯.

১১৯২. জয়শ্রীর পদ্মাভাটে, পৃষ্ঠা ১৭৬.

১১৯৩. সূর্যাগার, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠাগুলো ২০৫, ৭৬০:

১১৯৪. ভারতীয় রীতি, পৃষ্ঠা ১৪১; ফরবিসের প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ২৬২-৬৩.

১১৯৫. Ibid..

www.pathagar.com

শিল্পনৈপুণ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। তিনি বুটিদার পোশাকে ও জড়ি কাপড়ের কাজে বিভিন্ন নতুন নকশা চালু করেন। সেগুলোর মধ্যে নূরমহলি পোশাক (বর ও কনের জন্য) পেশওয়াজের জন্য দোদামি (বহির্বাস) পাঁচতোলিয়া ওড়নার জন্য (ঘোমটা), বাদলা (কিংখাপ), কিনারি (জড়ি) ও ফারস-ই-চান্দনি (চন্দন কাঠের বর্ণ বিশিষ্ট গালিচা) অন্যতম ছিল।[১১৯৬]

পেট্রাডেলাভেলী বলেন, 'কখনো কখনো মহিলারা একটি রংকরা ও সোনায় মোড়ানো পাগড়ি পরিধান করত। মাথায় পাগড়ি পরিহিত একজন মহিলার ছবি দেখা যায়।

এই সময়ে জাম্মু নারী পোশাক নামে একটি সুন্দর মহিলা পোশাকের আবির্ভার ঘটে।[১১৯৭] এটাতে থাকত আঁটসাঁট দৃঢ় আস্তিন এবং বক্ষস্থল পর্যন্ত শক্তভাবে বাঁধা হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত কুর্তি। এটার সম্মুখে থাকত ঝালর দ্বারা শোভিত এবং ছোট আঙ্গিয়াসহ পরিধান করত। নিচের অংশে আঁটসাঁট পায়জামা পরিধান করা হতো। পায়জামার জন্য ব্যবহৃত উপাদান থাকত ফুলের ছাপাযুক্ত রেশম বা ডোরাকাটা দাগ।[১১৯৮] ঘোমটা হিসেবে ব্যবহার করা হতো হালকা পাতলা কাপড়। নর্তকীরা প্রায় একই ধরনের পোশাক পরত, কিন্তু তাদের কুর্তি থাকত দীর্ঘতর। এটা ছিল অত্যন্ত পাতলা সূক্ষ্ম সিরঞ্জ মসলিন নামক উপাদানে তৈরি। শাহজাহানের রাজত্বকালেও এই একই রকমের পোশাক একটি মাত্র পরিবর্তন ছাড়া চালু ছিল। কুর্তিটি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় কিন্তু তা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত হতো। কথিত আছে যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জীবন নিসা আঙ্গিয়াকুর্তি নামে একটি মহিলা পোশাক চালু করেন।[১১৯৯] কিছু কাল যাবৎ কুর্তির সাথে আঙ্গিয়া পরিধান করা হতো না, কিন্তু এটা পুনরায় ফ্যাশনে পরিণত হয়।[১২০০] পোশাকের এই রীতি মোঘল আমলের শেষ পর্যায়েও চালু ছিল। রাজকীয় মহিলারা পাপোশ নামক গোড়ালি বিহীন চপ্পলও পরত। এগুলো ছিল বিভিন্ন আকৃতির এবং মাঝে মাঝে এগুলোকে সজ্জিত করা হতো সোনালি ফল দ্বারা।[১২০১]

১১৯৬. কাফিখান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯; আইন-ই-আকবরি, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১০; বেণীপ্রাসাদ, পৃষ্ঠা ১৮৩; ড. আর.পি ত্রিপাঠির মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, পৃষ্ঠা ৪২২;

১১৯৭. পি. এন চোপড়া কর্তৃক রচিত মোঘল আমলের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ১৩

১১৯৮. কামুদী, পৃষ্ঠা ১০০.

১১৯৯. পেট্রাডেলাভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪.

১২০০. মাগনলাল কর্তৃক অনূদিত 'জীবন নিসার দেওয়ান', পৃষ্ঠা ১৪.

১২০১. কামুদী, পৃষ্ঠা ১০৩.

www.pathagar.com

১৩. প্রসাধন সামগ্রী

পোশাকের পরেই প্রসাধন সামগ্রী রাজকীয় ও অভিজাত নারীদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বিভিন্ন রকম প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের সৌন্দর্য বাড়াতেন। ভারতে গোসল, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের মতো ক্ষেত্রে ষোলটি ব্যক্তিগত সাজসজ্জা প্রচলিত ছিল। মালিক মুহাম্মদ জাইসী তাঁর পদ্মাভাটে এগুলো বর্ণনা করেছেন।[১২০২] আবুল ফজল একথা সমর্থন করে আইন-ই-আকবরিতে মহিলাদের প্রসাধনের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন।[১২০৩] এর মধ্যে ছিল গোসল, সুবাসিতকরণ, পোশাক পরিধান ও অলংকার ধারণ এবং হেনা ও পানের ব্যবহার।[১২০৪] গোসল করার আগে দেহে মালিশ ব্যবহার করা হতো। গোসলের পরে সুগন্ধিযুক্ত অনুলেপন শরীরে মালিশ করা হতো (চন্দন আনরাধাগা) এবং সুবাসিত বস্ত্রাদি পরিধান করা হতো।[১২০৫] লম্বা ঢেউখেলানো কেশগুচ্ছে তেল দেওয়া হতো, চিরুনি দিয়ে সুসজ্জিত ও বেনি গাঁথা হতো।[১২০৬] হিন্দু মহিলারা তাদের চুলে সিঁথি কেটে তা তাদের মাথার নিচে জড়িয়ে রাখত। তারা প্রায়ই চুলে বেণী করে একদিকে সেজে রাখত এবং তা বেঁধে রাখত না বা একক বেণী করত না। মেয়েরা বারো বছর বয়সের পর থেকে তাদের চুল বড় রাখত।[১২০৭] মুসলমান মহিলারা রেশম দ্বারা জড়ানো কেশগুচ্ছ পেছনে ঝুলিয়ে রাখত।[১২০৮] মহিলারা তাদের কেশবিন্যাসের জন্য ফুল ও অলংকার ব্যবহার করত।[১২০৯] বিবাহিত হিন্দু মহিলারা তাদের সিঁথির মাঝখানে সিঁদুর ব্যবহার করত।[১২১০] বিন্দি কপালে আটকানো থাকত।[১২১১] চোখের জন্য কাজল পরা হতো।[১২১২] এমনকি কাজল দ্বারা কৃত্রিম ভ্রু তৈরি করা হতো। কিছুসংখ্যক মহিলা তাঁদের দাঁত কালো করার জন্য মিশি (একর কম গুঁড়া) ব্যবহার করত।[১২১৩] ঠোঁট লাল করার জন্য

১২০২. থিভিনট, পৃষ্ঠা-৩৭.
১২০৩. কামুদী, ১০১ পৃষ্ঠা .
১২০৪. মুহাম্মদ জাইসি রচিত পদ্মাভাট, পৃষ্ঠাগুলো- ২৮৭-৮৮.
১২০৫. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১২.
১২০৬. মানুচী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০.
১২০৭. মানুচী, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪০.
১২০৮. টেরির ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা ৩০৯;
১২০৯. ফ্রাইয়ার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৭.
১২১০. স্টাভোবিনাস, প্রথম খণ্ড. পৃষ্ঠা ৪১৫.
১২১১. সুরসাগর, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২০৫.
১২১২. সুরসাগর, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬৫.
১২১৩. সুরসাগর, প্রথম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬৫.

www.pathagar.com

এবং মুখের মিষ্টি গন্ধের জন্য পান পাতা ব্যবহার করত।[১২১৪] তারা তাদের হাত ও পা রং করার জন্য মেহেদি (হেনা) ব্যবহার করত।[১২১৫]

অলংকার

অন্য সময়ের মতো মোঘল আমলেও মহিলাদের ছিল ব্যাপক অলংকারপ্রীতি। আরো বেশি সুন্দরী হতে ও আকর্ষণীয় রূপ ধারণের জন্য তারা বিভিন্ন প্রকার অলংকারে সজ্জিত হতো। মধ্যযুগে বারোটি অলংকারকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত অলংকার ধারণের আদর্শরূপে বিবেচনা করা হতো। এগুলো হলো নূপুর, কিনকিন, কালাভা, আংটি, চুড়ি, অঙ্গদ, গলার হার, কণ্ঠশ্রী, বেশার, খুট, টিকা ও শিসফুল।[১২১৬] আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অলংকারগুলোর নাম তুলে ধরেন। এগুলো হলো শিসফুল, মাং, কোটবিল্ডার, সেকরা, বিন্দুলি, কুন্তিলা, কর্ণফুল, দূরবাচ্চ, পিপলপট্টি, চম্পাকলি, মোর ভানওয়ার, বিশুর, ফুলি, লং, নথ, গুলুবন্দ, হার, হান্স, কঙ্গন, গজরা, জামি, চুড়, বাহু, চুরিন, বাজুবন্দ, টাড, আঙ্গুতি, চুন্দুর, কান্তিকা, কান্তি মেখলা, জেহার পেইল, ভাংক, বিছোয়া এবং আনোয়ান্ত।[১২১৭] শিসফুলের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। এটা মাথার মুকুটের মতো পরিধান করা হতো।[১২১৮] রাজপুতনাতে এটাকে রাখারি বলা হতো। এটা ছিল গাঁদাফুলের মতো স্ফীতাকৃতি, ঘণ্টাকৃতি বিশিষ্ট এবং ভেতরে ফাঁপা। চুলের সিঁথিতে মাং শোভা পেত। আরেকটি অলংকার হলো কোটবিল্ডার।[১২১৯] এটা পরিধান করা হতো কপালে। এটা হতো মুক্তার ছড়া দ্বারা গঠিত এবং এর কেন্দ্রে ছিল একটি দীর্ঘ বিন্দু।[১২২০] রাজপুতনায় এটা টিকা নামে পরিচিত ছিল। কানে অন্যান্য বিভিন্ন রকম অলংকার পরিধান করা হতো। কানের দুল, কর্ণফুল (ম্যগ্রিল ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট), পিপল পট্টি (অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট), মোর ভানোয়ার (ময়ূরের আকৃতি বিশিষ্ট), এবং বালি (ছোট বৃত্ত) কানে ব্যবহৃত কয়েকটি অলংকার।[১২২১] বিদেশি পর্যটকরাও কানে ব্যবহার্য অলংকার

১২১৪. মাগন লাল কর্তৃক অনূদিত, জীবন নিসার দেওয়ান পৃষ্ঠা ১৪.

১২১৫. সুরসাগর, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৯৯৩.

১২১৬. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১.

১২১৭. মুহাম্মদ জাইসি কর্তৃক রচিত পদ্মাভাট, পৃষ্ঠা ২৮৭, ৯০.

১২১৮. Ibid., পৃষ্ঠা ৩১২.

১২১৯. Ibid.,

১২২০. মানুচী লিখেছেন, তাদের মস্তকের কেন্দ্রস্থল থেকে তারকা, সূর্য বা চন্দ্র বা ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট একগুচ্ছ মূল্যবান পাথরের মুক্তা ঝুলে থাকে। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩৯-৪০.

১২২১. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩১২-১৪.

www.pathagar.com

সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১২২২] নারীরা নাকেও অলংকার পরিধান করত। তারা নাক ফোঁড়াত ও নাকে দুল পরিধান করত।[১২২৩] মহিলারা কাঁধেও অলংকার পরত। টেরি জানান যে, তারা তাদের কাঁধ ও কব্জির চারদিকে অনেক রত্ন দিয়ে শোভিত করত।[১২২৪] কাঁধের চারদিকে শক্তভাবে গুলবন্দ পরিধান করা হতো। এটা পাঁচ বা সাতটি গোলাপ ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট সোনালি সুতা বা রেশম দিয়ে গঠন করা হতো। অন্য অলংকারগুলো ছিল গলার মালা, কণ্ঠহার, হংস ও কান্থা।[১২২৫]

বাহুর চারধারে পরিহিত অলংকারগুলোকে শুভ লক্ষণের প্রতীক বলে মনে করা হতো। বাজুবন্দ কনুইয়ের উপরে পরিধান করা হতো। সচরাচর এটা দুই ইঞ্চি প্রশস্ত ও ঝুলন্ত ছোট মুক্তার ছড়া রত্নখচিত করে এতে বসানো হতো। টোডা ছিল আরেকটি অলংকার, যা বাজুবন্দের ঠিক নিচে পরিধান করা হতো। গাজরা ও বালা কব্জির উপরে পরিধান করা হতো।[১২২৬] কারা ও কাঙ্কনের মতো বিভিন্ন রকমের চুড়ি ব্যবহার করা হতো।[১২২৭] পাহঞ্চি নামে আরেকটি অলংকার কব্জিতে পরিধান করা হতো।[১২২৮] আংটি দিয়ে আঙ্গুলগুলো শোভিত করা হতো। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে আয়না পরিধান করা হতো। এটা ছিল একটি ছোট আয়না বসানো চারদিকে মুক্তাযুক্ত আংটি বিশেষ।[১২২৯]কোমরের চারধারে

১২২২. টেরি বলেন যে, তাদের কানের চারদিকে ব্রেসলেটের সাথে ঝুলে থাকার মতো অলংকার পরিধানের জন্য কয়েকটি ছিদ্র রয়েছে। টেরির ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা ৩০৯। থিভিনট বলেন যে, তারা তাদের কানে একটি চ্যাপ্টা ছোট খোদাই করা দুল পরত। থিভিনট, পৃষ্ঠা ৫৩। পেট্রাডেলাভেলী বলেন যে, তারা পরিপূরক অলংকার দ্বারা বা সোনা-রুপার বৃত্তাকার গোলক পরিধান করে তাদের কানযুগল শোভিত করে। পেট্রডেলাভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫.

১২২৩. ডিলেট বলেন যে, তারা তাদের ছিদ্রকরা নাকের ছিদ্র পথে যখন ইচ্ছা সোনার তৈরি রত্নশোভিত নাকের নথ পরিধান করে। ডিলেট, পৃষ্ঠা ৮১। টেরি বলেন, 'প্রত্যেক মহিলার একটি নাক ফোঁড়ানো থাকত যেখানে তিনি একটি আংটি পরিধান করতেন।' টেরির ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা ৩০৯.

১২২৪. টেরির ভ্রমণের শুরুতে পৃষ্ঠা ৩০৯, মানুচি ও মন্তব্য করেন যে, মহিলারা কাঁধের অলংকার পরত। মানুচী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০.

১২২৫. মাসির-ই-আলমগিরি, পৃষ্ঠা ১১৯. গীতিয়ারা বেগম একটি মুক্তার হার লাভ করেন এবং (মূল্য ১৯,০০০ রুপি)।

১২২৬. পেট্রাডেলাভেলী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫.

১২২৭. তুলসী দাসের কবিতাবলি, পৃষ্ঠা ১৫; আব্দুল আজিজ কর্তৃক লিখিত ভারতীয় মোঘলদের অস্ত্রশস্ত্র ও গহনাপত্র, পৃষ্ঠা ১৩২.

১২২৮. তুযুক, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫;

১২২৯. মানুচী লিখেছেন, তাঁদের মাথার মাঝখান থেকে তারকা, সূর্য বা চাঁদ বা ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট একগুচ্ছ মূল্যবান পাথর বা মুক্তা ঝুলে থাকে। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩৯-৪০.

www.pathagar.com

তারা চান্দর কান্তিকা ছোট ঘণ্টাযুক্ত কোমরবন্ধনী এবং কটি মেঘলা বা কারধানী (কোমরবন্ধনী) পরিধান করত। এগুলো ছিল অলংকৃত সোনার বর্ণের কোমরবন্ধনী।[১২৩০] সাধারণত পায়ে পায়েল নামক গুল্‌ফ বন্ধনী ব্যবহার করা হতো। যখন পরিধানকারী এটা পরিধান করে হাঁটত তখন ঝনঝন করে আওয়াজ হতো। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের জন্য বিছালি ব্যবহার করা হতো এবং আনওয়াত (অন্য এক ধরনের আংটি) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে শোভা পেত।[১২৩১] এই অলংকারগুলো ছিল সোনা ও রুপার তৈরি। সেগুলো ছিল সুন্দর ও মূল্যবান রত্ন ও পাথর খচিত। যে সকল গরিব মহিলার সোন ও রুপা কিনতে অসমর্থ ছিলেন তারা শসাবীজ, মেরুদণ্ডী প্রাণীর খোল ও ফুল দ্বারা তৈরি অলংকার পরিধান করত।[১২৩২] কখনো কখনো তারা তামা ও পিতলের অলংকার ব্যবহার করত।[১২৩৩] রাজকীয় মহিলারা অন্যদের তাঁদের গহনাদি প্রদর্শন করতে পছন্দ করতেন।[১২৩৪] তাঁদের বিভিন্ন মূল্যবান রত্ন পাথর থাকত এবং তাঁদের কাঁধ থেকে তিন বা চার সারি মুক্তা দেহের নিম্নভাগে পাকস্থলী নিচের অংশ পর্যন্ত ঝুঁলে থাকত। মানুচী বলেন, যে তাঁদের ছিল বড় আকৃতির হীরা, চুন্নি, পান্না এবং অন্যান্য অলংকার সেটসহ ছয় থেকে আট সেট গহনা সামগ্রী।[১২৩৫] তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেরাই অলংকারের নকশা তৈরি করতেন।[১২৩৬]

১২৩০. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪.

১২৩১. হ্যামিলটন প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪; মানুচী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪০.

১২৩২. মানুচী দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩৯-৪০; কুমুদি, পৃষ্ঠা ৯৮.

১২৩৩. ফিন্স, পৃষ্ঠা ১০৯; বার্নিয়ার পৃষ্ঠা ২২৪.

১২৩৪. মানুচী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩৩৯-৪০.

১২৩৫. Ibid.,

১২৩৬. আইন-ই-আকবরি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪.

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
মোঘল রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণ

নূরজাহান ও মমতাজমহল, জাহানারা ও রওশন আরা ছিলেন সকল মোঘল রানি, রাজকন্যা ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের আদর্শস্বরূপ। হেরেমের মহিলাদের জীবন যাপন প্রণালি ও মননের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নূরজাহান ও জাহানারা শুধু হেরেমেই নয়, সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারী। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে শুধু মহীয়সী নারীই ছিলেন না, তাঁরা মোঘল নারীদের অবস্থাকেও উৎকর্ষের শীর্ষস্থানে উন্নীত করেছেন। অন্য অধিকাংশ মোঘল নারী অবশ্যই তাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। এই সমস্ত হেরেমবাসিনী নারীদের প্রাত্যহিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা দুটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে : (১) যুবতিদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মতালিকা এবং (২) বৃদ্ধাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মতালিকা। প্রথমটি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীটি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

(ক) রাজকন্যাদের শিক্ষা

মোঘল সমাজে নারীদের মর্যাদা পুরুষদের তুলনায় ছিল নিকৃষ্টতর। যখন একজন রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করত তখন সমগ্র রাজদরবারে আনন্দের প্রকাশ ঘটত। যখন একজন রাজকন্যা জন্মগ্রহণ করত তখন আনন্দ-উল্লাস সীমাবদ্ধ থাকত মহিলা মহলে।[১২৩৭] সম্রাট আকবর যখন শাহজাদা সেলিমের কন্যা ইফফাত বানুর জন্মগ্রহণের সময় আনন্দ অনুষ্ঠানের আদেশ দেন তখন আবুল ফজলের বর্ণনা মতে তা সমসাময়িকদের প্রথাবিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়।[১২৩৮] বয়স বেড়ে ওঠার সাথে সাথে একজন রাজকন্যাকে শিক্ষা দেয়া হতো লিখতে ও পড়তে। প্রাথমিক শিক্ষামূলক উপদেশের জন্য রাজপ্রাসাদে বালিকারা প্রায়ই

১২৩৭. Manucci., II. P. 343

১২৩৮ A.N., III. p. 816.

www.pathagar.com

একত্রে সমবেত হতো। মাঝে মাঝে একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রী ও তত্ত্বাবধানকারিণীর দায়িত্ব মিলিতভাবে আতুন মামা নামক একজন ব্যক্তিকে দেয়া হতো।[১২৩৯]

ধর্মযাজক মুনসিরেটের মতে, আকবর নারী শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং আব্দুল কাদের বাদাউনির মতে, সম্রাট একটি নতুন পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেন। মুনসিরেট লিখেছেন, 'তিনি রাজকন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ও মনোযোগী ছিলেন। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো লিখতে ও পড়তে এবং তত্ত্বাবধায়িকাগণ তাদেরকে অন্যান্য উপায়ে শিক্ষা দিতেন।[১২৪০] আকবর মেয়েদের জন্য ফতেপুর সিক্রিতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিদ্যালয়।[১২৪১] কয়েকজন রাজকীয় মহিলাও শিক্ষার উন্নতিতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাবৃত্তি চালু করেন। হুমায়ুনের পত্নী বিগা বেগম তার স্বামীর সমাধিসৌধের কাছে নির্মাণ করেন একটি কলেজ।[১২৪২] আকবরের পালক মাতা মাহাম আনাগা দিল্লির খায়রুল মঞ্জিল মসজিদের একেবারে সন্নিকটে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বিদ্যালয়।[১২৪৩] এভাবে সম্রাট এবং হেরেমের অনেক মহিলা শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করেন প্রচুর অর্থ।

কিন্তু শিক্ষার উপকরণ ছিল সীমিত। তখন কোনো ছাপানো বই ছিল না; কাগজ ছিল দুষ্প্রাপ্য, তীক্ষ্ণ অগ্রভাগযুক্ত নলখাগড়ার চেয়ে আর কোনো উন্নততর কলম ছিল না এবং প্রদীপের কালি থেকে তৈরি করা হতো কলমের কালি। যখন অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং এমনকি অনেক সম্রাট অশিক্ষিত ছিলেন এবং এমনকি কেউ কেউ তাদের নাম স্বাক্ষর করতে পারতেন না এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি বা হাতের তালুর ছাপ দিয়ে দলিলপত্রে সই দিতেন তখন হেরেমের মহিলাদের শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো না। পর্দা ব্যবস্থা ছিল রাজকন্যাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকস্বরূপ।[১২৪৪] এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও

১২৩৯. এস, কে, ব্যানার্জী কর্তৃক রচিত 'কতিপয় মহিলার সঙ্গে বাবরের আত্মীয়তা', ভারতীয় সংস্কৃতি, ভলিউম ৪, পৃষ্ঠাগুলো-৩৮, ৫৩। বাবরনামাতে একজন আতুন মামাকে উল্লেখ করে সম্ভবত তিনি হলেন কুতলুঘ নিগার খানম; Also Gulbadan, p. 121; Manucci., II, P. 331.

১২৪০. Monserrate, Commentarius, p. 203; Badaoni, II, pp. 306-307.

১২৪১. এন, এন, ল কর্তৃক প্রণীত 'ভারতীয় মুসলিম শাসন আমলে শিক্ষার উন্নতি', পৃষ্ঠা- ২০৩; এস, এম, জাফর কর্তৃক প্রণীত 'মুসলিম ভারতে শিক্ষা', পৃষ্ঠা- ১৯০.

১২৪২. এস, কে, ব্যানার্জি কর্তৃক রচিত 'হুমায়ুন বাদশাহ', ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা-৩১৭.

১২৪৩. আকবরনামা, ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা-৩১৩; মুন্তাখাব-উত-তারিখ, ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা-৬২; ইউসুফ হোসাইন কর্তৃক রচিত 'মধ্যযুগীয় ভারতের সংস্কৃতির আভাস', পৃষ্ঠা-৮৪.

১২৪৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ Herklot 'ভারতে ইসলাম', পৃষ্ঠাগুলো- ২৮৩-৮৪.

www.pathagar.com

কয়েকজন রাজকন্য উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাদের সংখ্যা ছিল কম, কিন্তু মধ্যযুগের যে কোনো সমাজে শিক্ষিত মহিলার সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। মোঘল রাজকন্যাদের মধ্যে গুলবদন বেগম ছিলেন পারস্যদেশীয় ও তুর্কি ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী এবং হেরেমে তার ছিল একটি নিজস্ব পাঠাগার। তিনি ছিলেন কাব্য প্রতিভার অধিকারিণী এবং প্রায়ই তিনি কবিতা রচনা করতেন।[১২৪৫] তিনি তার ভাতিজার অনুরোধে ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'হুমায়ুননামা' লেখেন। সম্রাট আকবর, নূরজাহান, জাহানারা এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও আওরঙ্গজেবের কন্যা জীবন নিসা ছিলেন তাদের যুগের সাহিত্য জগতের ব্যক্তিত্ব। আওরঙ্গজেব তার সকল কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান করেন, বিশেষত ধর্মীয় বিদ্যায়। জীবন নিসা, বদরুন নিসা ও জীবত-উন-নিসা কোরআন মুখস্থ করেন এবং ধর্ম বিষয়ে অনেক বই পড়েন।[১২৪৬] তার দ্বিতীয় কন্যা জীনাত-উন-নিসাকেও মুসলিম ধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া হয়।[১২৪৭]

১২৪৫. গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা', পৃষ্ঠা-৭৬.

১২৪৬. মোস্তায়েদ খান কর্তৃক রচিত 'মাসির-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠা-৩১৮.

১২৪৭. Ibid., P 322.

www.pathagar.com

শাহজাদি জীবন নিসা বেগম ছিলেন সবচেয়ে গুণবতী মহিলা এবং তার শিক্ষাগত কৃতিত্ব থেকে বোঝা যায় যে একজন প্রতিভাবান শাহজাদি মোঘল হেরেমে কীভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি যথাক্রমে হাফিজা মরিয়ম নামক একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ও মোল্লা সাঈদ আশরাফ মাজিনদারানি নামক বিখ্যাত পারস্যদেশীয় কবির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শাহ রোস্তম গাজীও তাকে সাহায্য করেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন একজন মহিলা কবি,[১২৪৮] একজন দক্ষ গণিতজ্ঞ[১২৪৯] এবং তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন এবং তাই তার পিতা তাকে পুরস্কার দেন ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।[১২৫০] কিন্তু তার প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল কাব্য। তার পরিমণ্ডলের কবিরা ছিলেন নাসির আলী সাহিব, শামস্ ওয়ালিউল্লাহ্, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ ও বাহরোজ।[১২৫১] জেব-উল-মুনসার তার চিঠিপত্রের একটি সংকলন এবং এতে প্রতিফলিত হয়েছে পত্র-সাহিত্যে তার অত্যন্ত পরিশীলিত সাহিত্যিক পারঙ্গমতা।[১২৫২] তিনি সুন্দর হস্তাক্ষর শিল্পেও ছিলেন দক্ষ, তিনি সিকাস্ত, নাস্তালিক, ও নাস্ক্য স্টাইলে লিখতে পারতেন।[১২৫৩] কিন্তু এমন প্রতিভাবান শাহজাদির সংখ্যা বেশি ছিল না এবং তাদের কৃতিত্বের সম্পূর্ণ স্বীকৃতিও দেওয়া হয়নি। গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুন নামা'কেও উঁচু দরের সাহিত্যবিষয়ক কৃতিত্ব বলে বিবেচনা করা হতো না।[১২৫৪] গুলবদন বেগম এবং তার বোন গুলরুখ বেগম, সুলতান সেলিমা বেগম, নূরজাহান বেগম এবং জাহানারা বেগমকে তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমকক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়নি। আবুল ফজল আকবরের রাজদরবারের ঊনষাট জন কবি ও বাদাউনি এক শত তিপ্পান্ন জন কবির নাম উল্লেখ করেছেন।[১২৫৫] কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মহিলা কবির নামও নেই। মহিলা কবিরা বাধ্য হন অজ্ঞাত অবস্থায় থাকতে এবং নূরজাহান ও জীবন নিসার মতো উচ্চ মর্যাদার সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদিরা কবিতা লিখেছেন মাখফি বা ছদ্মনামে। স্পষ্টতই পুরুষদের মতো

১২৪৮. Ahmed, H.S. op. cit. p. 42.

১২৪৯. Ahmed, H.S. কর্তৃক রচিত 'জীব-উন-নিসা বেগম এবং দিওয়ান-ই-মাক্ফি; বিহার ও উড়িষ্যার তদন্ত সমাজের পত্রিকা-১৯২৭, পৃষ্ঠা-৪২.

১২৫০. মাগন লাল ও জে. ডি ওয়েস্ট ব্রুক কর্তৃক প্রণীত "দিওয়ান-ই-জীব-উন-নিসা' পৃষ্ঠা-৮.

১২৫১. যদুনাথ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠা- ৭৯.

১২৫২. Westbrook. op. cit., p. 9.

১২৫৩. 'মাসির-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠা- ৩২২: J Sarkar. op. cit., p 79. Law. p. 204. Jafar, p. 197.

১২৫৪. Gulbadan, p. 76.

১২৫৫. Ain., I. pp. 617-680; Badaoni, III. pp. 480-557.

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে কবিতা বা প্রেমের গীতিকবিতা রচনা মহিলাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হতো না। তারা মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের ন্যূনতম অনুমোদনও লাভ করেননি।

সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষা ছাড়াও নারী শিক্ষার অন্তর্গত নাচ, সঙ্গীত, সুন্দর হস্তাক্ষর-শিল্প, চিত্রাঙ্কন এবং রন্ধন বিদ্যায়ও সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় মোঘল মহিলারা ব্যাপকভাবে চর্চা করেননি। এ ধরনের শিল্পকলা ও অবসর যাপন প্রণালি থেকে তারা ধর্ম, সম্পদ ও বিধিনিষেধের কারণে বঞ্চিত ছিলেন। প্রাচীনকালে বিনোদন নয় বরং ধর্মীয় পটভূমিতেই নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় ভারতে। যাই হোক মধ্যযুগে ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে নৃত্য ও সঙ্গীত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখা দেয় এবং তা ছিল নর্তকীদের জন্য সংরক্ষিত বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই হেরেমের অভিজাত ব্যক্তিরা এটির উৎকর্ষ সাধন করতে পারেননি; নৃত্য ও সঙ্গীত নর্তকী, পাতার ও কাঞ্চনীদের হীন পেশা বলে বিবেচনা করা হতো। মুসলিম ধর্মও নৃত্য ও সঙ্গীতকে নিরুৎসাহিত করে।

মোঘলদের শাসন আমলে চিত্রাঙ্কন শিল্পের বিকাশ ঘটে। মোঘল অনুচিত্রাবলি ছিল পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত; কিন্তু এ সমস্ত অনুচিত্রাবলির সবই পুরুষদের কাজ। যে কোনো মর্যাদার মুসলিম নারী চিত্রাঙ্কন শিল্পীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। সাহিত্যবিষয়ক শিল্প ও সুন্দর হস্তাক্ষর শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খুব অল্পসংখ্যক শাহজাদি সুন্দর হস্তাক্ষর শিল্প, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তারা ছিলেন খুব কম ও ব্যতিক্রমধর্মী। সেলাই ও বুটিতোলা শিল্প ছিল অবশ্যই কারিগর ও কারখানার শ্রমিকদের জন্য। রন্ধন কার্য ছিল সম্পূর্ণভাবে ভৃত্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।[১২৫৬] মোঘল হেরেম ছিল আমোদ-প্রমোদে দিনে গল্প করে সময় কাটানো ধনী ও অলস ব্যক্তিদের বাসস্থান।[১২৫৭]

খ) রাজপুত্রদের শিক্ষা

শাহজাদাদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো হেরেমের মধ্যে এবং তাই এখানে এ সম্বন্ধে একটি আলোচনা করা দরকার। একজন শাহজাদার জন্ম হলে সম্রাট

১২৫৬. টীকা : রাজকন্যাদের দায়িত্বের বাইরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকায় তারা কখনো কখনো রান্নাবান্না করতেন। রিসালা-ই-শাহীরিয়াতে জাহানারা বেগম লিখেন যে, তিনি রুটি, শাকসবজি ও অন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য নিজে তৈরি করে সুফি মিয়ান মিরের কাছে পাঠাতেন

১২৫৭. Gulbadan. p. 180.

www.pathagar.com

শিশুপুত্রের নাম রাখতেন এবং তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করতেন। প্রায় পাঁচ বছর বয়সে, শৈশবকালে তাকে শিক্ষা দেওয়া হতো লিখতে ও পড়তে। নিজাম উদ্দিন আহমদ শাহজাদা সেলিমের প্রাথমিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, কুতুব-উদ্দিন আতকা নামক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় শাহজাদা সেলিমের শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষকের এই নিয়োগ উপলক্ষে তিনি একটি জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করেন। তাই প্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি শাহজাদাকে অর্থ ও অলংকার উপহার দেন এবং অভিনন্দনের পরিসর হয়ে ওঠে গগনস্পর্শী।[১২৫৮] শাহজাদা মুরাদকে শৈশবকালে বিরামহীন অসুস্থতার জন্য বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয় আট বছর বয়সে।[১২৫৯]

বয়স বাড়ার সাথে সাথে রাজপুত্রদের ন্যস্ত করা হতো পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে। তাঁদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো গোঁড়ামিপূর্ণ পদ্ধতিতে, কিন্তু আকবরের সময় শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল উদার। খ্রিষ্টান ও হিন্দু শিক্ষকদেরকে অবাধে নিয়োগ করা হতো শাহজাদাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ধর্মযাজক মুনসিরেট একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, আকবরের পুত্রদেরকে শুধু আরবি ও পারস্যদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়নি, ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষকদের দ্বারা তাঁদেরকে হিন্দি ও পর্তুগিজ ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয়।[১২৬০] শাহজাদা মুরাদের শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রথমে মুনসিরেট ও পরে আকোয়াভিবাকে।[১২৬১] কিন্তু হামিদা বানু বেগম এবং হেরেমের অন্যান্য মহিলার প্রতিবাদের কারণে খ্রিষ্টান শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যাপারে অসম্মতি জানানো হয়।[১২৬২] সমকালীন ভট্টাচার্য বলে বিখ্যাত পণ্ডিত শিবদত্ত ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করা হয় জাহাঙ্গীরের পুত্র খশরুকে ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দেওয়ার জন্য।[১২৬৩] উদারনৈতিক শিক্ষার ফলে সেলিম, খশরু এবং দারার মতো শাহজাদারা তৈরি হন; কিন্তু হেরেম ও রাজদরবারের এলাকাতে এ ধরনের উদারনৈতিক শিক্ষার বিরোধিতা করা হতো। এই কারণে সাধারণত শিক্ষার ব্যাপারটি ছিল শিশুশিক্ষাভিত্তিক। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্তরায় স্বরূপ ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের

১২৫৮. Tabqat-i-Akbari. E & D. V, p. 413.
১২৫৯. আকবরনামা, ভলিউম ৩য়, পৃষ্ঠা-৩৮৮.
১২৬০. Payne. Akbar and the Jesuits, p. 36.
১২৬১. Ibid., P. 223 also pp. 24, 25.
১২৬২. Gulbadan, p. 75 and n. 1.
১২৬৩. আকবরনামা, ভলিউম ৩য়, পৃষ্ঠা-৯২২.

www.pathagar.com

কারণে বিপরীত ফলাফল দেখা দেয় এবং এমনকি আওরঙ্গজেবকে প্রাথমিক জীবনে মোল্লারা যে উপদেশ দেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হননি। স্বয়ং মোঘল সম্রাটগণ প্রায়ই শাহজাদাগণকে শিক্ষা দিতেন নির্দেশাবলি বা উপদেশাবলির মাধ্যমে। সম্রাটরূপী পিতার কাছে পুত্র ছিলেন সর্বদা একজন শিশু এবং তার জন্য সবসময় দরকার হতো 'পরিচালনা ও উপদেশাবলির। জাহাঙ্গীর তাঁর পুত্র ও শিষ্যদের জন্য কিছু উপদেশ দেন এবং বলেন যে, মানুষ স্বাধীনভাবে পৃথিবীকে দর্শন করে এবং গ্রীষ্ম ও শীতের প্রভাব পর্যায়ক্রমে উপলব্ধি করে বিচক্ষণতা অর্জন করে।'[১২৬৪] তাঁর প্রবচনগুলো নিম্নলিখিত বিজ্ঞতাপূর্ণ মতামত দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়েছে:

তিনটি বিষয় অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি অর্জিত হয়। '(১) অল্প কথা বলা। (২) অল্প আহার করা। (৩) অল্প ঘুমানো।' এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতা হলেন তাঁর আদর্শ। ' তিনটি জিনিসের একত্র সমাবেশ অসংগত। (১) ক্ষমতা ও হালাল খাবার। (২) দয়া ও ক্রোধ ।(৩) সত্যবাদিতা ও বাচালতা।' 'চারটি জিনিস মানুষকে মোটা করে। (১) নতুন কাপড় পরিধান। (২) গরম জলে স্নান করতে বেশি আসক্তি। (৩) মসৃণ ও মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য। (৪) নিজের পছন্দমত জীবন যাপন।' ছয়টি জিনিস হৃদয়কে কলুষিত ও বিষাদপূর্ণ করে। (১) মলিন বস্ত্র পরিধান এবং কদাচিৎ মাথার চুল কাটা। (২) অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থায় থাকা। (৩) মিথ্যা কথা বলা। (৪) আড়াল থেকে নিন্দা করা। (৫) গালিগালাজ করা। (৬) প্রার্থনায় আলস্য।' তিনি এই মন্তব্য করেন, 'যে কেউ এই উপদেশগুলো মেনে চলবেন তিনি মহৎ ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের কাছে মর্যাদাশীল বলে গণ্য হবেন।'[১২৬৫] আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মোয়াজ্জেমকে তাঁর পনেরো বছর বয়সে প্রাত্যহিক জীবনকে নিয়মিত করার জন্য বিস্তারিত নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি লিখেছেন, 'তুমি নিজস্ব বাসভবনে বা বাইরে কোনো গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রারত অবস্থায় সূর্যোদয়ের ৭২ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠবে। গোসল ও অন্যান্য প্রস্তুতিতে ৪৮ মিনিট সময় ব্যয় করে সকালের প্রার্থনার জন্য তোমার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসবে। নামাজ পড়ার পরে এবং নির্ধারিত আয়াতসমূহ আবৃত্তি করার পরে কোরআনের একটি অংশ পাঠ করবে। তারপরে বাসস্থানে নাস্তা করার পালা। যদি তুমি বাইরের কোনো গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রারত অবস্থায় থাকো

১২৬৪. প্রাইস কর্তৃক অনূদিত 'তারিখ-ই-সেলিমশাহী', পৃষ্ঠা- ৪৪.

১২৬৫. Ibid., E & D. VI. pp. 262-63.

www.pathagar.com

তবে সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট পরে ঘোড়ায় চড়বে। সূর্যাস্তের আগে দুই ঘণ্টার মধ্যে দিনের প্রধান ভোজ সম্পন্ন করবে এবং কিছুটা বিশ্রাম গ্রহণ করবে এবং তার পরেই আসরের নামাজ সেরে নিতে হবে। কিন্তু যদি শুধু আহার্য গ্রহণই তোমার সজীবতা লাভের জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে বিরতির সময়টুকু তোমার লেখালেখি, পত্র রচনা বা গদ্য ও কবিতা পাঠের কাজে ব্যয় করবে। আসরের নামাজের পরে কিছুক্ষণের জন্য আরবি পড়বে এবং সূর্যাস্তের ২৪ মিনিট পূর্বে একটি দর্শক-শ্রোতার সমষ্টিকে বেছে নিয়ে তাদের সম্মুখে রাত হওয়ার পরে আটচল্লিশ মিনিট সময় পর্যন্ত উপবিষ্ট থাকবে। তারপরে সেই সম্মেলন কক্ষ ত্যাগ করে কোরআনের একটি অংশ পাঠ করবে এবং ভেতরে শোবার ঘরে প্রস্থান করে রাত ন'টায় ঘুমাবে।' তিনি শাহজাদাকে এ রকম ভাষায় আরো উপদেশ দেন যে, ধীরে ধীরে নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার অভ্যাসে পারদর্শী করে তুলবে। তোমার গায়ের কুর্তা খোলার আগে শরীরের ঘাম শুকিয়ে নেবে এবং শয়ন করবে যাতে তুমি অসুস্থ হয়ে না পড়। বাইরের কোনো গন্তব্যস্থলে যাত্রারত বা রাজদরবারে কর্তব্যরত অবস্থায় যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কথা বলবে।[১২৬৬] পুত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা আওরঙ্গজেবের ডজন ডজন পত্র রয়েছে যাতে তিনি জনসংযোগমূলক কাগজপত্র লেখার ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত কিছু না করতে শব্দ নির্বাচনে সঠিক মনোযোগ দিতে এবং এমনকি তাঁদের হস্তাক্ষর সুন্দর করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

এ ছাড়া সম্রাট ও বিদ্বান শিক্ষকবৃন্দ, শিষ্টাচারসম্পন্ন নপুংসকগণ ও তত্ত্বাবধায়িকাগণ ও শাহজাদাদেরকে প্রদান করেন উদারনৈতিক শিক্ষা ও সামরিক কলাকৌশল। মানুচীর মতে, তাঁরা অনেক মিলনান্ত নাটকে অভিনয় করেন এবং পরীক্ষামূলক বিচারকার্য সাধন করেন কীভাবে মামলা নিষ্পত্তি এবং বিচারের রায় প্রদান করতে হবে তা প্রদর্শনের জন্য। তাঁরা তাঁদেরকে যুদ্ধ ও অনুরূপ কার্য করে দেখাতেন যাতে তাঁরা শাসনকার্য শিখতে পারেন এবং তাঁরা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ও আবেগতাড়িত না হয়ে বিচার করতে সক্ষম হন।[১২৬৭] শাহজাদাকে সাহসী হতে এবং কোনো প্যানপ্যানানি ছাড়া কষ্ট সহ্য করতেও শিক্ষা দেওয় হতো। হকিন্স একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, একদা জাহাঙ্গীর তাঁর পুত্র শাহরিয়ারকে প্রহার কারেন কিন্তু তাতে বালক রাজকুমার কাঁদলেন না। এতে সম্রাট আরো বেশি ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি রাজকুমারকে বারবার এমন

১২৬৬. যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 'আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠাগুলো- ৩৯-৪২.
১২৬৭. Manucci., II, pp. 346-47.

www.pathagar.com

শোচনীয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন যে তাঁর গাল থেকে রক্ত নির্গত হলো। তখনও রাজকুমারের মুখমণ্ডলে কোনো বেদনার প্রকাশ দেখা গেল না। এ রকম আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে 'তিনি উত্তর দিলেন যে, তাঁর সেবিকারা তাঁকে বলেছেন রাজকুমারদেরকে প্রহার করা হলে তাঁরা যদি কাঁদেন তবে তা পৃথিবীতে সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হবে এবং তাঁরা শিক্ষা প্রদানের শুরু থেকেই এভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। মৃত্যু হলেও আমাকে কোনো কিছুই কাঁদাতে পারবে না।'[১২৬৮] শাহজাদা কামরান যে উদাসীনতায় একটুও আর্তনাদ না করে তাঁর চোখ অন্ধ করে দেবার ঘটনাটি সহ্য করেন তা মোঘল রাজকুমারদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে সমর্থন যোগায়।[১২৬৯] মানুচী একদা শাহ্ আলমের পুত্র মুইজুদ্দিনের ছোট শিশুর চিকিৎসা করেন। মানুচী এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'আমি তাকে এমন হাসিমুখে তার বেদনানুভূতি ভুলতে বললাম যেন সে রাগান্বিত না হয়। সেখানে উপস্থিত নপুংসক ও তত্ত্বাবধায়িকারা আমার উক্তিটি অসাধারণ বলে মনে করলেন এবং আমাকে উত্তরে বললেন যে, মোঘল রাজকুমারগণ কখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন না এবং তাঁরা সব কিছুই আবেগতাড়িত না হয়ে বিচক্ষণতার সাথে করে থাকেন।'[১২৭০]

এভাবে মোঘল শাহ্জাদাদের শিক্ষা ছিল ব্যাপক। তা ছিল ধর্মীয়, সাহিত্যবিষয়ক, সামরিক ও ব্যবহারিক। তৎসত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়িকা ও নপুংসকদের দেওয়া প্রশিক্ষণকে উৎকৃষ্ট বলা চলে না। বার্নিয়ার রাজকীয় অন্দরমহলে রাজকুমারদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হননি। তিনি লিখেছেন, 'রাশিয়া, সার্কাশিয়া, গুর্জিস্তান (জর্জিয়া) বা ইথিওপিয়া থেকে আগত পেশাগত প্রকৃতি অনুসারে দাসোচিত মনোভাবসম্পন্ন এবং ঊর্ধ্বতনদের প্রতি অবনত অথচ নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি উদ্ধত ও অত্যাচারী মহিলা নপুংসক ও ক্রীতদাসদের কাছে শৈশবকাল থেকে ন্যস্ত রাজকুমারগণ রাজকীয় অন্দরমহলের সীমানা থেকে বের হতেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায়। তাঁরা ভান করতেন মর্যাদাসম্পন্ন ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে যদিও তাঁদের চরম মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বলে কিছু ছিল না।'[১২৭১] এমনকি মানুচী ও বার্নিয়ারের মন্তব্যের সাথে একমত কারণ নপুংসকগণ নিজেরাই সৎ ও মহৎ প্রকৃতির ছিলেন না এবং যুবক বয়সের শাহজাদারা খুব বেশি সময় থাকতেন তাঁদের সহচার্য। তিনি

১২৬৮. Hawkins, in Early Travels, p. 117.
১২৬৯. Jauhar, p. 106.
১২৭০. Manucci., II, p. 347.
১২৭১. Bernier, pp. 144-45. Also about education by Mullas, pp. 156-60.

www.pathagar.com

বলেছেন যে এই ধরনের শিক্ষা রাজকুমারদের সাধারণভাবে মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করতে পারেনি। প্রত্যেকের মনে ভয় জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁরা জনসাধারণের সামনে কাল্পনিক গাম্ভীর্য প্রদর্শন করতেন। কিন্তু মহলের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা ছিলেন নীচ প্রকৃতির।[১২৭২] কারণ শাহজাদাদেরকে সম্রাটের অনৈতিক কার্যাবলি শিক্ষা দেওয়া হতো এবং মদ্যপান, মাদকদ্রব্য সেবন ও মেয়েদের সাথে অনর্থক অলসতায় সময় কাটানোর শিক্ষাও তাঁদেরকে দেওয়া হতো বাল্যকাল থেকেই। কখনো কখনো তরুণ রাজকুমারদেরকে কাশি বা সামান্য অসুখ নিরাময়ের জন্য জলমিশ্রিত বা গোলাপজল মিশ্রিত মদ দেওয়া হতো।[১২৭৩] পরে তাঁরা মদ্যপান করতেন সম্রাটের অনুমতিতে। জাহাঙ্গীর শাহজাদা শাহজাহানকে প্রথমবারের মতো মদ পান করতে দেন যখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ বছর এবং একই সাথে শাহজাহানকে চিকিৎসক ইবনে সিনা রচিত কয়েকটি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে সতর্ক করে দেন :

একটি ধ্বংসাত্মক শত্রু আর বিচক্ষণ বন্ধু এই সুরা; সামান্য মাত্রা উপশমকারী কিন্তু সাপের বিষতুল্য এটার অধিক মাত্রা। বেশুমার সুরাপান বহু অনিষ্ট সাধন করে; সামান্য মাত্রাতে হয় প্রভূত উপকার সাধন।[১২৭৪] কিন্তু সদা নেশাগ্রস্ত জাহাঙ্গীরের মুখ থেকে উচ্চারিত এ ধরনের সংকেত বাক্যে তেমন কোনো সুফল হয়নি। শাহজাদাগণ ছিলেন পরিবেশগত প্রভাবে বন্দি। তাঁরা উপকারী বা অপকারী মদ্য পানের আসক্তি দমন করতে সমর্থ হননি। এটা ছিল রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণজনিত পুরস্কার বা অমঙ্গল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁদের অধিকাংশই মদ্যপান শুরু করতেন বিপুল পরিমাণে। এটা প্রায়ই তাঁরা হেরেমে গোপনে করতেন,[১২৭৫] কিন্তু এই ঘটনা ছিল একটি সর্বজনবিদিত বিষয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে শাহজাদাদেরকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে নষ্ট করা হতো। সম্রাট সর্বদা তাঁদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। মানুচী লিখেছেন যে ' সম্রাট যখন শিকার করতে বাইরে যান বা মসজিদে যান তখন তিনি এই শাহজাদাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যান। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত এই নিয়মেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁরা লালিত পালিত হন এবং ষোল বছর বয়সেই তাঁদেরকে বিবাহ দেওয়া হয়। সম্রাট তাদের কনে পছন্দ করতেন। সম্রাটের পছন্দ করা মেয়েকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে শাস্তি পেতে হতো।[১২৭৬]

১২৭২. Manucci., II, p. 401.
১২৭৩. Tuzuk. I. p. 306.
১২৭৪. Ibid., I. p.307.
১২৭৫. Manucci., II, p. 393.
১২৭৬. Ibid., p. 187.

www.pathagar.com

শাহজাদাদেরকে বিবাহ দেওয়ার নিকটবর্তী সময়ে রাজপ্রাসাদের মধ্যে তাঁদেরকে একটি পৃথক বাসভবন ও রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হতো।[১২৭৭] কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও সম্রাট তাঁদের কাছে রাখেন ভালো শিক্ষক ও সজাগ গুপ্তচরদের যারা তাঁকে অবহিত করেন প্রাত্যহিক ঘটনাবলি।[১২৭৮]

(গ) পর্দা বা নিঃসঙ্গতা

একজন শাহজাদাকে ষোল বছর বয়সে বিবাহ দেওয়া হতো। একজন শাহজাদির বিবাহের গড় বয়স ছিল বারো বা তেরো বছর[১২৭৯] এবং প্রায় এই বয়সে বা তাঁর একটু আগে থেকেই তাঁকে পর্দার মধ্যে জীবন যাপনের শিক্ষা দেওয়া হতো। পর্দা বলতে বোঝাত নিঃসঙ্গভাবে বা আবরণের আড়ালে জীবন যাপন করা বা কমপক্ষে ঘোমটা দ্বারা সমগ্র মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা। আকবর বোরখা কথাটি বোঝানোর জন্য একটি অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক হিন্দি শব্দ ব্যবহার করতেন চিত্রাগুপ্তা, যা হয়তো যথোপযুক্ত নাও হতে পারে।[১২৮০] যখন শাহজাদিরা বার্ধক্যে উপনীত হতেন তখন পর্দা পালনের আর প্রয়োজন হতো না, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তা পরিণত হতো অভ্যাসে। হেরেমের মধ্যেও পর্দার প্রয়োজন হতো না। মহল ছিল একটি নিঃসঙ্গতাপূর্ণ স্থান যেখানে শুধুমাত্র মহিলারা বসবাস করত। কিন্তু ভ্রমণে যাওয়ার সময় মহিলাদেরকে তা মেনে চলতে হতো। প্রয়োজনের সময়ে চিকিৎসক, স্বর্ণকার, গহনাশিল্পী, কারিগর ও রাজমিস্ত্রীরা মহলে আসত এবং মহিলারা তখন তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করত। খানাজাদ, সালাতিন এবং অন্যান্য না মাহারুম আত্মীয়দের সাথে বিবাহ করা ছিল অনুমোদনযোগ্য এবং তাই পর্দাপ্রথা পালনের মাধ্যমে তাদের সংশ্রবে আসতে নিরুৎসাহিত করা হতো। পর্দা হচ্ছে বিস্তৃত ও পরিচিত অর্থ অনুসারে একটি মুসলিম বিধান মোঘল হেরেমে তা পালিত হতো বিবেক বিবেচনার সাথে।[১২৮১] যদি সম্রাট কোনো ব্যক্তির সাথে

১২৭৭. শাহজাহান ১৬ বছরে ইহা পান, তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী, ১ম ভলিউম, পৃষ্ঠা-৮৭. কাজেই আওরঙ্গজেব, হামিদ উদ্দিন বাহাদুরও সেটিই করেন- যদুনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত আহকাম-ই-আলমগীরী, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৪৯, পৃষ্ঠা- ১.

১২৭৮. Manucci., II. p. 347.

১২৭৯. Herklots. Islam in India. p. 58. Terry in Early Travels, pp. 320-21.

১২৮০. Ain, I, p. 96.

১২৮১. এমনকি আকবরের মতো একজন উদার রাজাও অধ্যাদেশ অনুমোদন করেন যে, যদি একজন যুবতি মহিলা পর্দা ব্যতীত রাস্তায় ঘোরাফেরা করে বা সে নিজেকে দেখাতে চায় তা হলে তাকে যেন বেশ্যালয়ে পাঠানো হয়।- বাদাউনি, Text. II. pp. 391-92. Trs. II, pp. 404-406.

www.pathagar.com

সম্পর্কিত মহিলাদেরকে তাঁর সামনে ঘোমটা সরাতে বলতেন তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছিল বিপুল সম্মানস্বরূপ। একদা জাহাঙ্গীর তাঁর শ্বশুর ইতিমাদ-উত-দৌলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং সম্রাট তাঁর প্রতি অশেষ সম্মান জানান তাঁর হেরেমের মহিলাদেরকে ঘোমটা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল সম্রাটের দৃষ্টির আড়াল না করার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে।[১২৮২]

কথায় আছে, যেকোনো জিনিসের অতিরিক্তই খারাপ এবং পর্দার বেলায়ও একথা প্রযোজ্য ; রাজকীয় অন্দরমহলে কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অনেক মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং অচেনা ব্যক্তিদের দৃষ্টি গোচর হওয়ার চেয়ে আগুনের শিখায় মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় বলে মনে করত। বার্নিয়ার জোর দিয়ে বলেছেন, 'রাজকীয় অন্দরমহলের অনেক বাসিন্দা ধ্বংসাত্মক ঘটনার শিকার হয়েছেন কারণ এই হতভাগ্য মহিলারা এত বেশি লজ্জাশীল ও অসহায় ছিলেন যে তাঁরা অচেনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁদের মুখমণ্ডল আড়াল করা ছড়া অন্য কিছু করতে পারতেন না এবং এভাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন তাঁদের বিপদ থেকে পালাবার মতো যথেষ্ট মনোবল ছিল না।[১২৮৩] শত শত বছরের নিঃসঙ্গতা, অধীনতা ও নির্যাতনে এসব চিরনির্ভরশীল মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবেই এত বেশি স্নায়বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন যে তাঁরা বিপদ থেকে পালাতে পারতেন না। আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধে যোগ দেবার আগে বা পলায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সময় অন্য লোকদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাঁদের মহিলাদেরকে কোনো অনুশোচনা ছাড়াই হত্যা করতেন।[১২৮৪] কাবুলের শাসনকর্তা আমিরখান তাঁর স্ত্রী ক্ষিপ্ত হাতির পিঠ থেকে জীবন রক্ষার্থে লাফিয়ে ওঠাতে তাঁর ঘোমটা অপসারিত হয়ে মুখমণ্ডল অনাবৃত হওয়ার কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।[১২৮৫] ওভিংটন ঠিকই লিখেছেন, 'ভারতের সকল সুন্দরী মহিলাকে তাঁদের স্বামীরা রক্ষণশীল অবস্থায় রাখেন এবং তাঁরা তাদেরকে অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হওয়া থেকে নিষেধ করেন।[১২৮৬] মুহাম্মদ জহিরউদ্দিন আজফারি লিখেছেন যে সম্রাট মুহাম্মদ শাহের প্রধান রানি তাজমহল এত কঠোর পর্দা মেনে চলতেন যে তিনি এমনকি একজন শিশু ছেলেকে কোলে নিতেন না এবং একজন চার বছরের বালক তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি

১২৮২. Tuzuk. I. pp. 351.
১২৮৩. Bernier. p. 246.
১২৮৪. Manucci.. III. pp. 272. 423: Finch. p. 146; Jourdain. pp. 162-63.
১২৮৫. যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 'মোঘল ভারতের অধ্যয়ন', পৃষ্ঠা- ১১৬.
১২৮৬. ওভিংটন বিরচিত 'সুরাটে ভ্রমণ' পৃষ্ঠা- ২১১.

www.pathagar.com

মুখ ঢেকে রাখতেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এমনকি মৃত্যুর সময়ে তিনি কোনো চিকিৎসককে নাড়ি পরীক্ষার অনুমতিও দেননি।[১২৮৭] হেরেমের মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাসের ওপর পর্দার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও পুরুষরা তাদের ওপর বাধা-নিষেধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকে। অন্যথায় আব্দুল কাদের বাদাউনির পুনঃপুন এটা বলার প্রয়োজন হতো না যে একজন মহিলার বাসভবনের চার দেয়ালের মধ্যে বসবাস করা, তাঁর সমস্ত দেহ চাদরে আবৃত রাখা, ভ্রমণকালে আবরণযুক্ত আমিরি লেবাস ব্যবহার এবং শুধুমাত্র পুরুষের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণ করা উচিত।[১২৮৮] তিনি আরো বলেন যে যখন স্বামী ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দূরে থাকেন তখন মহিলাদের সাজগোজ করা বা না মাহরুম বা অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়।[১২৮৯]

অবিবাহিতা শাহজাদিরা

রাজকন্যাদের ওপর আরেকটি নিষেধাজ্ঞা ছিল যেমন বিস্ময়কর তেমনি নৃশংস। সম্রাটের কন্যাদেরকে বিবাহ না দেওয়া একটি প্রথায় পরিণত হয় এবং এই ক্ষতিকর নিয়ম প্রবর্তনের জন্য মানুচীসহ অনেক লেখক আকবরকে দায়ী করেন।[১২৯০] আকবর তাঁর কন্যা ও বোনদেরকে বিবাহ দেন যোগ্য বরের সাথে। তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মুহম্মদ হাকিমের বোন সাকিনা বানু বেগমকে নাকিব খানের ছেলের সাথে বিবাহ দেন।[১২৯১] তিনি তাঁর বোন বখশি বানু বেগমকে বিবাহ দেন বাদাখশানের ইব্রাহিমের সাথে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে বিবাহ দেন শরীফ উদ্দিনের সাথে।[১২৯২] তাঁর কন্যা আরাম বানু বেগমকে পরবর্তীকালে খান-ই-খানান হিসেবে পরিচিত মির্জা আব্দুর রহিমের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়।[১২৯৩] আর একজন কন্যা শুকুরুন নিসাকে বিবাহ দেওয়া হয় মির্জা শাহরুখের সাথে।[১২৯৪] আকবরের বড় কন্যা সুলতান খানম খান্দেশের শাহজাদার পত্নী হন[১২৯৫] এবং শাহজাদি খানমের বিবাহ হয় গুজরাটের প্রাক্তন

১২৮৭. আব্দুস সাত্তার কর্তৃক অনূদিত 'আজফারি, ওয়াকিয়া-ই-আজফারি', প্রাচ্যের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ ১৯৩৭. পৃষ্ঠা- ২৬.

১২৮৮. Badaoni. Nijat-ul-Rashid, p. 460.

১২৮৯. Ibid., p. 472.

১২৯০. Manucci., II, p. 58.

১২৯১. আকবরনামা, ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠা- ৩৬৪ n.

১২৯২. Ibid., p. 197 and n.

১২৯৩. Ibid., II, pp. 128. 129. 131.

১২৯৪. Ain., I, p. 321.

১২৯৫. Ibid., I. p. 516.

www.pathagar.com

রাজা মোজাফফর শাহের সাথে।[১২৯৬] এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। একইভাবে বিচক্ষণ সম্রাট বিধবাদের পুনর্বিবাহের মোঘল ঐতিহ্য বজায় রাখেন। হুমায়ুনের বোন ফখরুন নিসা বেগমকে প্রথমে বিবাহ দেওয়া হয় আবুল মিয়ার সাথে। তাঁর মৃত্যুর পরে খাজা হাসানের সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[১২৯৭] আকবর নিজে বৈরাম খানের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। একইভাবে মুহাম্মদ মুকিমের কন্যা হাজি বেগমকে প্রথমে বিবাহ দেওয়া হয় কাসেম কোকার সাথে এবং বিধবা হওয়ার পরে তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয় মুহম্মদ হাসানের সাথে। মুহম্মদ হাসানের মৃত্যুর পরে তিনি বিবাহ করেন মুহম্মদ ঈসাকে।[১২৯৮] প্রকৃতপক্ষে অনেক রাজকীয় ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এমনকি দুই বা তিন বার বিবাহ বন্ধনেআবদ্ধ হন। এ ব্যাপারে সকলের ব্যক্তিগত বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যখন শাহজাদা দানিয়ালের মৃত্যু হয় এবং তাঁর তিনশত মহিলা বিশিষ্ট হেরেমটিকে শাহজাদা সেলিমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ন্যস্ত করা হয় তখন তিনি হেরেমের মহিলাদেরকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন যে, যদি তাঁদের মধ্যে কেউ বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন তবে তা তাঁকে জানাবেন এবং তাঁদের পছন্দের আমির সম্বন্ধে সংকেত দেবেন।[১২৯৯] এভাবে বোঝা যায় যে আকবর শাহজাদিদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেননি। এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তিনি যা অনুমোদন করেননি তা হলো নিকটতম সম্পর্কের চাচাত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ।[১৩০০] সম্ভবত তিনি মনে করতেন যে, রক্তের সম্পর্ক ভিত্তিক বিবাহের ফলে স্বাস্থ্যহীন সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়[১৩০১] অথবা তিনি এ ব্যাপারে হিন্দু পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে এ ধরনের বিবাহ ছিল ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। কারণ যাই হোক না কেন তিনি নিকট সম্পর্কের ভাইবোন ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেন যদিও তা মুসলিম বিধান দ্বারা অনুমোদিত।[১৩০২] তাঁর ধারণাগুলো হয়তো তাঁর উত্তরাধিকারীদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল বা করেনি। কিন্তু শাহজাহানের আমল থেকে শাহজাদিদের বিবাহের

১২৯৬. Pelsaert, I, p. 2.

১২৯৭. আকবরনামা, ভলিউম ২য়, পৃষ্ঠাগুলো- ৩৬৪-৬৫, ৩১৮ এবং n.

১২৯৮. Ibid., pp. 526-27.

১২৯৯. 'তারিখ-ই-সেলিমশাহী', পৃষ্ঠাগুলো- ১০৭-১০৮.

১৩০০. আকবরনামা, ভলিউম ৩য়, পৃষ্ঠা- ৬৭৭.

১৩০১. 'আইন-ই-আকবরি', প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৮.

১৩০২. শ্রীরাম শর্মা প্রণীত 'মোঘল সম্রাটদের ধর্মীয় নীতি', পৃষ্ঠা- ২৫; 'আইন-ই-আকবরি', ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৯৮; মুন্তাখাব-উত-তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩০৬.

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ স্পষ্টত দেখা যায়। শাহজাদিদেরকে বিবাহ না দেওয়ার প্রথাটির মূলে রয়েছে অনেক উৎস। ভারতীয় সমাজের মানসিকতা ছিল উচ্চতর মর্যাদার বিবাহকেন্দ্রিক এবং সম্রাট নিজেকে সাম্রাজ্যের কারো চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন বলে অনুভব করতে অনিচ্ছা পোষণ করতেন। কারণ ভারতীয় সামাজিক মূল্যবোধের পরিমণ্ডলে যেখানে মোঘল শাসকগণ নিজেরাও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন মনে করা হতো যে কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার ফলে সম্রাট তাঁর জামাতা ও জামাতার পরিবারের চেয়ে নিকৃষ্টতর অবস্থার সম্মুখীন হবেন।[১৩০৩] সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ও সম্রাটের কন্যাদেরকে বিবাহ দেওয়া হতো না। সম্রাটের পুত্রদের মধ্যে ছিল সিংহাসনের জন্য লড়াই করার প্রবণতা এবং তাঁর জামাতাদের দ্বারা ক্ষমতার সংঘাতের পরিমাণ ও তীব্রতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।[১৩০৪] কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব উভয়েই রক্তের নদী পেরিয়ে ক্ষমতা লাভ করেন। সিংহাসনের জন্য এই সংঘাতে তাঁরা তাঁদের নিকটতম সম্পর্কের ভাই, ভাগ্নে, ভাতিজা ও অন্যান্য আত্মীয় যাঁরা তাঁদের কন্যা এবং ভাগ্নি ও ভাতিজিদের সম্ভাব্য বিবাহের পাত্র ছিলেন তাঁদেরকে হত্যা করেন। কখনো কখনো শাহজাদিদেরকে পরিবারের বাইরে বিশেষত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমিরদের সাথে বিবাহ দেওয়া হতো। কিন্তু বিবাহ দেওয়ার এই রীতিকে আবার নিরুৎসাহিত করা শুরু হয় এবং শাহজাহান জাহানারাকে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিতে সম্মত হননি। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শাহজাদিদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী ছিলেন না যাঁরা প্রচলিত ধারায় তাঁদের স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব করতেন এবং সামান্যতম অজুহাতে তাঁদের স্বামীদের মর্যাদা ও মনসবের অবনতি ঘটাতেন সম্রাটের কাছে নালিশ করে।[১৩০৫] এভাবে একদিকে শাহজাহানের মতো সম্রাটদের দেখা মিলে যাঁরা আমিরদের সাথে তাঁদের কন্যাদেরকে বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং অন্যদিকে ছিলেন এমন সব যুবক বয়সের আমির ও তাঁদের মাতা-পিতা যাঁরা একজন আধিপত্যকারিণী স্ত্রীর সাথে জীবন যাপনের আশঙ্কায় শাহজাদিদেরকে বিবাহ বর্জন করতেন। যুবতি শাহজাদিরা এই দুটির যেকোনো একটি কারণে দুর্ভোগ পোহাতেন। জাহানারা ও রওশন আরাসহ অনেক শাহজাদিকে বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়নি প্রধানত উপযুক্ত পাত্রের

১৩০৩. বিহার ও উড়িষ্যা গবেষণা সমাজের পত্রিকা, ১৯৩৪ তে প্রফেসর রাইভার্স বহুগামিতার ওপর লিখেন.

১৩০৪. Bernier, p. 12.

১৩০৫. Tavernier, Travels in India, 1, p 393.

www.pathagar.com

দুষ্প্রাপ্যতা হেতু। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

(ঙ) রাজকুমারী জীবন নিসা

এ ব্যাপারে অত্যন্ত বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত হলেন আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জীবন নিসা। পারস্য দেশীয় একজন মা দিলরাস বানু বেগমের গর্ভে দৌলতাবাদে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবন নিসা (নারীদের শোভাদায়িনী) এর জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ও কমনীয় তরুণীরূপে বেড়ে ওঠেন। তাঁর শারীরিক বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন লম্বা ও ছিপছিপে গড়নের। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার এবং সুন্দর বর্ণবিশিষ্ট বাম গালে ছিল দুটি তিল বা সৌন্দর্য চিহ্ন। তাঁর চোখ ও পর্যাপ্ত কেশের রং ছিল গাঢ় কালো এবং তাঁর ঠোঁটগুলো ছিল সরু এবং দাঁতগুলো ছোট ছোট। জে. ডি. ওয়েস্ট ব্রুক আরও বর্ণনা করেন যে লাহোরের জাদুঘরে তাঁর একটি সমসাময়িক প্রতিকৃতি রয়েছে, যা এই বর্ণনার সাথে সংগতিপূর্ণ।[১৩০৬] নিঃসন্দেহে জীবন নিসা ছিলেন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজেই তাঁর চিত্তাকর্ষক চেহারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং একদা তিনি লিখেন :

আমার গাল থেকে যখনই আমি ঘোমটা করি উন্মোচন
ঈর্ষাতে গোলাপেরা করে পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ।[১৩০৭]

তাঁর সৌন্দর্যের সাথে তাঁর প্রতিভার মিলন ঘটে। ইতোমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে। রাজপ্রাসাদের শিষ্টাচারের প্রায় অবিচ্ছেদ্য বিষয় শিক্ষানুরাগ ছিল মোঘল শাহজাদিদের বিশেষ আদর্শ এবং জীবন নিসা কবিদের প্রতি আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পূরণ করেন যথেষ্ট পরিমাণে। তিনি তাঁর বার্ষিক ভাতার চার লক্ষ টাকা সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও দানশীলতায় খরচ করতেন।[১৩০৮] জীবন নিসা নিজেও ছিলেন একজন কবি হিসেবে পারদর্শিনী। তাঁর সাহিত্যিক নাম ছিল জেব, কিন্তু তিনি মাকফি নামে লিখতেন। তিনি অস্ত্র পরিচালনাতেও ছিলেন পারদর্শিনী এবং তিনি কয়েকবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমন একজন গুণান্বিতা শাহজাদির জন্য পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। তাঁর চাচা দারা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর পিতামহ শাহজাহানের ইচ্ছানুসারে দারা শিকোর জ্যেষ্ঠ পুত্র সোলায়মান

১৩০৬. 'দিওয়ান জীবন নিসা'র ভূমিকায় ওয়েস্ট ব্রুকে আলোকপাত করেন. পৃষ্ঠাগুলো- ১৩-১৪.

১৩০৭. সারোজিনী নাইডু কর্তৃক অনূদিত এবং মার্গারেট ম্যাকনিকল কর্তৃক ভারতীয় মহিলাদের কবিতাগুলো- পৃষ্ঠা-৭৭.

১৩০৮. 'মাসির-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠাগুলো- ২৩১-২৭২, ৩৮১: মিরাত-উল আলম, পৃষ্ঠা- ৬০৫.

www.pathagar.com

শিকোর সাথে তাঁর বিবাহের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু এই বিবাহটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি কারণ আওরঙ্গজেব দারার মৃত্যু দণ্ড কার্যকর করেন এবং সোলায়মান শিকোকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার আদেশ দেন। একজন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভাইয়ের অভাবে আওরঙ্গজেব এমনকি তাঁকে রাজকীয় পরিবারের বাইরে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন। তাঁকে বিবাহ করতে অভিলাষী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন ইরানের দ্বিতীয় শাহ আববাসের পুত্র মির্জা ফারুখ। কিন্তু জীবন নিসা দাবি করে বসেন যে, তিনি প্রথমে শাহজাদার সাথে সাক্ষাৎ করবেন, তাঁর মেধা কেমন তা জানার জন্য। তিনি কেমন জাঁকজমকপূর্ণ অনুচরবর্গ নিয়ে এসেছিলেন এবং জীবন নিসা স্বশরীরে উপস্থিত থেকে কীভাবে তাঁকে তাঁর উদ্যানে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তাঁর যত্ন নেন তার দলিল এখনও আছে। তিনি ভাষার চাতুরিতে এক রকমের মিষ্টির জন্য অনুরোধ করেন যার অর্থ চুম্বনও হতে পারে।[১৩০৯] এতে জীবন নিসা খুব মর্মাহত হন। শাহজাদা এর প্রতিবাদ জানান এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু জীবন নিসা অস্বীকৃতি জানান তাঁকে বিবাহ করতে।[১৩১০]

তিনি আকিল খানকেও বিবাহ করতে পারেননি যাঁকে তিনি সম্ভবত ভালোবেসেছিলেন। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরে যাওয়ার পথে আওরঙ্গজেব যখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য লাহোর বেড়াতে যান তখন আকিল খান ছিলেন লাহোরের শাসনকর্তা। একদিন যখন তিনি সমতল ছাদের উপরে নির্মল বাতাস উপভোগ করছিলেন তখন আকিল খান তাঁকে দেখতে পান এবং তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি কবি সুলভ উক্তি উচ্চারণ করেন 'প্রাসাদের ছাদের উপরে একজনের রক্তিম চেহারা দেখা যাচ্ছে।' কারণ সেই সময়ে যৌবনোম্মুখ জেবের পরনে ছিল ডালিম (গুলনার) রঙের পোশাকপরিচ্ছদ। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তিনি আকিলের কবিসুলভ উচ্চারণে একটি দু'চরণ বিশিষ্ট কবিতার শ্লোকে সম্পূর্ণতা দান করে বলেন– 'কোনো অনুনয় বা বলপ্রয়োগ বা স্বর্ণ উপহার পারবে না জয় করতে তাঁর মন।[১৩১১] তাঁদের দুইজনের প্রেম পরিপক্বতা লাভ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যায়ে আকিল খান কাপুরুষতা বা পরিণামদর্শিতাহেতু তাঁকে বিবাহ করতে দিল্লিতে আসার সাহস করেননি। আকিল খানের সাথে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ যদুনাথ সরকার

১৩০৯ ওয়েস্ট ব্রুক প্রণীত 'দিওয়ান জীবন নিসা'তে, পৃষ্ঠাগুলো ১০-১১.

১৩১০ Loc. Cit.

১৩১১ সুরখ পুসি বালাবি বাম নাজর মিয়াদ ,
নাবাজারি, না বাজোর নাবাজার মিয়াদ।

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করেছেন[১৩১২] এবং আওরঙ্গজেবের শাসনকাল সম্বন্ধে যদুনাথ সরকার অপেক্ষা বেশি পাণ্ডিত্য অন্য কারও নেই। তা সত্ত্বেও জীবন নিসার ব্যক্তিত্ব রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনীতে এতই পরিপূর্ণ যে কল্পনা ও বাস্তব ঘটনাকে পৃথক করা কঠিন।[১৩১৩] এমনকি মারাঠা যোদ্ধা শিবাজি ছিলেন তাঁর স্বপ্নের অন্যতম নায়ক।[১৩১৪] তিনি তাঁর প্রেমের গীতিকবিতায় তাঁর হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়েছেন। তিনি শাহজাহানের শালিমার বাগানের সমতল ছাদে শামিয়ানার নিচে থেকে জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তখন তাঁর মধুর ও চিত্তাকর্ষক বেদনাদায়ক কবিতা রচনা করতেন। একদা এই তাঁবুতে একটি সোনার চেয়ারে বসে প্রবহমান জলপ্রপাত অবলোকন করে জীবন নিসা নিম্নলিখিত তুলনাহীন চারপদ বিশিষ্ট কবিতা লিখেন কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই :

ওহে জলপ্রপাত, এমন শোক করছ প্রকাশ তুমি কার জন্য?
দুঃখে তুমি তোমার মাথা ঝুলিয়ে রেখেছ অধোপানে কার জন্য?
কীসের যন্ত্রণায় বলো আমারই মতো সারাটি জনম ধরে
পাথরে মাথা ঠুকে তুমি বিসর্জন করেছ অশ্রু রাতের আঁধারে?[১৩১৫]

জীবন নিসা তাঁর নিজস্ব উদ্যান ও সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন তাঁর যৌবন ও প্রেমের স্মৃতিবিজড়িত লাহোরের নয়ন কোট গ্রামে। তিনি এটা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেন তাঁর ক্রীতদাসী মিয়াবাঈকে। মিয়াবাঈকে সেখানে সমাহিত করা হলেও দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তাঁর অনন্ত বিশ্রামের জন্য সমাহিত হওয়ার ভাগ্য হয়নি। তার পরিবর্তে তিনি তাঁর জীবনের শেষ কুড়িটি বছর দিল্লিতে (১৬৮১-১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে) কারারুদ্ধ অবস্থায় কাটান এবং মৃত্যুর পরে সেখানে সমাহিত হন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছোট ভাই শাহজাদা মুহাম্মদ আকবরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের কারণে আওরঙ্গজেব জীবন নিসাকে শাস্তি প্রদান করেন। জীবন নিসার ছিল ছোট ভাইয়ের সাথে গোপন যোগাযোগ। যখন সেই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় এবং মুহম্মদ আকবরের শিবির অবরোধ করা হয় তখন শাহজাদার কাছে লেখা জীবন নিসার চিঠিগুলো খুঁজে বের করা হয়।

১৩১২. Sarkar, Aurangzeb, III, pp. 34-35.

১৩১৩. আনসারী কর্তৃক বিরচিত 'মোঘল সম্রাটদের সামাজিক জীবন', পৃষ্ঠা ৮৯.

১৩১৪. মহারানি সুনীতি দেবী কর্তৃক প্রণীত 'সুন্দরী মোঘল শাহজাদিগণ', গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলো ৬০, ৬১, ৭৮.

১৩১৫. ফার্সিতে পড়ুন ঃ
'হায় আবছার নাউহাগার আজবিহর কিস্তি,
চিনবার জবিন ফাগুনদা রা অন্থ কিস্তি;
হায় আচা দার্দবাদ কী চান মা তামাম সাব,
সাররা সাং মিজানী ওয়ামি গায়েস্তি।'

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেব এতে ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, তাঁর বার্ষিক চার লক্ষ টাকার ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেলিমগড় দুর্গে তাঁকে অবশিষ্ট জীবন করারুদ্ধ অবস্থায় রাখা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে।[১৩১৬] সেলিমগড় দুর্গে থাকাকালীন অবস্থায় জীবন নিসা রচনা করেন বিষাদময় কাব্য।

তিনি তাঁর কবিতায় এভাবে বিলাপ প্রকাশ করেছেন:

ওগো মাখফি, দুঃখের কারাগার থেকে করো নাকো মুক্তি অন্বেষণ

ওগো লায়লা, প্রেমের শিকার যে ব্যক্তি সে পায় নাকো সমাধিতেও বিশ্রামের সন্ধান।

কাউকে দিয়ো না জানতে তোমার প্রেমের গোপন আলাপন

প্রেমের পথে, ওগো মাখফি, একেলা পথ চলো।[১৩১৭]

তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে একজন কবি এবং ঈশ্বর প্রেম (ইশকি হাকিকি) কে মরণশীল নর-নারীর প্রেমে (ইশকি মেজাজি) রূপদানে পারদর্শিনী। এই ব্যাপারে সকল সুফি কবি ছিলেন পারদর্শী। তিনি কিছু প্রেমবিষয়ক কবিতাও রচনা করেন। তিনি রচনা করেন সর্বমোট চারশত অপেক্ষা বেশি গজল (গীতিকবিতা)। এগুলো সুফি ভাবধারায় সমৃদ্ধ, কিন্তু স্পষ্টত এগুলোতে প্রতিদানহীন ভালোবাসার হতাশা প্রকাশ পেয়েছে।[১৩১৮] কিন্তু এগুলোতে দুঃখের প্রতি কোনো আত্মসমর্পণ নেই। এই গীতিকবিতাগুলো সৌন্দর্যের অহংবোধে সম্পৃক্ত। তিনি ছিলেন কাব্য জগতের এক রাজকন্যা এবং তাঁর যুগের অত্যন্ত শক্তিশালিনী কবি। যখন কেউ তাঁর কবিতা পাঠ করেন তখন তাঁর আবুল ফজলের এই কথাগুলো স্মরণ পথে উদিত হয় 'যিনি শব্দের সাথে শব্দ সংযোজন করেন তিনি একবিন্দু রক্ত দান করেন তাঁর হৃদয় থেকে।'[১৩১৯]

* জীবন নিসার হৃদয় থেকেও রক্তক্ষরণ হয় তিনি লিখতেন যখন:

'সেই সমস্ত নির্বোধ বসন্তদের কবি সম্ভাষণ

আমার প্রেমাস্পদকে আমার বাসগৃহে যারা করেনি আনয়ন।

হ্যাঁ, যৌবনের সকল বন্ধু আমাকে ছেড়ে গেছে এবং

প্রত্যেকে যাত্রা করেছে তার নির্বাচিত পথ ধরে।'

১৩১৬. 'মাসির-ই-আলমগীরী', পৃষ্ঠা ১২৬; যদুনাথ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আওরঙ্গজেব', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ৩২-৩৪.

১৩১৭. The Diwan of Zeb-un-Nissa. pp. 17-18.

১৩১৮. Maonicol. op. cit., p. 18.

১৩১৯. Ain., I. p. 618.

www.pathagar.com

'আমার বাসভবনের চারদিকে প্রবাহিত ঝড়ে দুর্গপ্রাচীরগুলো হয়েছে ভূপাতিত,
গভীর ভিত্তি ইহার হয়েছে ঝড়ের মুখে আন্দোলিত।
বিশ্রামের জন্য গৃহ পানের উড়ন্ত এক পাখি আমি,
দেখতে পেলাম প্রবেশ করছে আমার নীড়ে অনেক পানি।'
'বহু বছর ধরে আমার দুঃখের সঙ্গে বসবাস,
তথাপি লিপ্ত আছি কঠোর সংগ্রামে না করে কোনো আর্তি প্রকাশ।
হতাশার বিরুদ্ধে আমার কঠোর সংগ্রামে পলায়নে উদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ
এই পরবর্তী যুগের এক রুস্তম আমি তো নিশ্চয়ই।'[১৩২০]

এই নির্ভীক ব্যক্তিটির তীব্র জীবন সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁকে সমাহিত করা হয় দিল্লিতে জিনাতুল মসজিদের মধ্যে।[১৩২১] কিন্তু এ ধরনের দারুণ ক্লেশ তাঁর জন্য বয়ে আনে অস্বাস্থ্যকর প্রতিক্রিয়া। অনেক অবিবাহিতা কুমারী বিবাহের সকল আশা ত্যাগ করেন এবং কুমারী জীবন বরণ করেন। অন্য কয়েকজন হয়ে ওঠেন অন্তর্মুখী, বিমর্ষ ও অসুখী। আওরঙ্গজেবের শাসন আমলেই এই প্রথার কুফল ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়। মোল্লা ও ফকিরেরা সম্রাটের কন্যাদের কুমারী অবস্থায় জীবন যাপন ও মৃত্যুবরণের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।[১৩২২] আওরঙ্গজেব তাঁর পরিবারের মেয়েদেরকে উপযুক্ত পাত্র পেলেই বিবাহ দিতেন। মুরাদ বখশের মেয়েকেও বিবাহ দেওয়া হয় একজন পীরজাদা বা বলখের একজন সাধু ব্যক্তির সাথে। তিনি তাঁর দুই কন্যা মেহেরউন্নেসা বেগম ও জাবাতুন নিসা বেগমকে বিবাহ দেন যথাক্রমে দারার পুত্র ও মুরাদ বখশের পুত্রের সাথে। তিনি দারার কন্যা জানি বেগমকে সুলতান আজমের সাথে বিবাহ দেন এবং বিবাহের সময় তাঁকে ভূষিত করেন 'আজম তারা' উপাধিতে।[১৩২৩] কিন্তু অনেকের তেমন সৌভাগ্য হয়নি। আওরঙ্গজেবের আরেকজন কন্যা জীনাত-উন-নিসাও ছিলেন অবিবাহিতা। তিনি দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের হেরেমের মহিলাদের সহচরী ছিলেন। এই সুশীল স্বভাবের মহিলা তাঁর পিতার কাছে যৌতুক হিসেবে প্রাপ্য অর্থ প্রদানের জন্য আবেদন জানান এবং এই অর্থ কুমারী মসজিদ নামক একটি মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করেন এবং এই মসজিদেই তাঁর স্মৃতিসৌধ অবস্থিত। তাঁর স্মৃতি স্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ স্বরচিত লিপিতে বলা হয়েছে:

১৩২০. Diwan of Zeb-un-Nissa, pp19, 107, 77 respectively.
১৩২১. Syed Ahmaed Khan, Asar-us-Sanadid, pp 51-52
১৩২২. Sarkar, Aurangzeb, III, p. 35.
১৩২৩. Manucci., II, pp. 187-188.

www.pathagar.com

'আমার সমাধিতে খোদার রহমতই আমার তরে একমাত্র সাহায্য;
এটাই যথেষ্ট যদি তাঁর করুণার মেঘ আমার স্মৃতিসৌধ ঢেকে রাখে ।'[১৩২৪]

একজন উপযুক্ত বর খুঁজে পাবার আগেই বাইশ বছর বয়সে যুবতি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন বদরুন নিসা । আওরঙ্গজেব তাঁর বৃদ্ধ বয়সে উদয়পুরি মহলের পুত্র কাম বখসের কাছে লিখিত এক চিঠিতে লিখেছেন উদয়পুরির দুঃখ এবং পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করতে না পারা এবং দুঃখক্লিষ্ট কন্যা জিনাত-উন-নিসা সম্বন্ধে ।[১৩২৫]

(চ) অলংকরণ ও সৌন্দর্যসাধন

বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, সুখী বা অসুখী শাহজাদিরা সুরক্ষিত অবস্থায় ও উত্তমরূপে লালিত-পালিত হয়ে জীবন যাপন করতেন মহলের মধ্যে । তাঁরা কদাচিৎ বাইরে যেতেন । তাঁরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না । যদি তাঁরা যেতেন তবে তা সম্রাটের বিশেষ অনুমতিতে । তাঁরা সকাল নয়টার সময় যাত্রা করতেন; তাদের সঙ্গে থাকত তিন বা চারজন নপুংসক এবং মর্যাদাসম্পন্ন এক ডজন মহিলা এবং তাঁরা রাত হওয়ার আগেই ফিরে আসতেন ।[১৩২৬] অন্যথায় তাঁরা হেরেম সীমানার মধ্যে বাস করতেন কিন্তু সেখানে তাঁরা উপভোগ করতেন সকল প্রকার বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য । তাঁরা জানতেন অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের আনন্দ কেমন । জাহানারা ও রওশন আরার মতো উচ্চ মর্যাদার রাজকন্যাদের ছিল বড় সম্পত্তি ও ভাতা । অন্যদেরকেও দেওয়া হতো ভাতা, নগদ অর্থ ও অলংকারের উপহার ।[১৩২৭] একদা আওরঙ্গজেব যখন রওশন আরা বেগমকে সাত লক্ষ রুপি উপহার দেন তখন তিনি জীবন নিসা বেগমকে চার লক্ষ রুপি, জীনাত-উন-নিসাকে দুই লক্ষ রুপি, বদরুন নিসাকে এক লক্ষ সত্তর হাজার রুপি এবং জীবত-উন নিসাকে প্রদান করেন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রুপি ।[১৩২৮] যেহেতু শাহজাদিদের কাজকর্ম ছিল সামান্য পরিমাণের এবং তাঁরা মহলের সীমানার মধ্যে থাকতেন সেহেতু তাঁরা তাঁদের অর্থ ও সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করতেন প্রসাধন ও তাঁদের সৌন্দর্য সাধন কার্যে ।

১৩২৪. Translation by Barkat Ullah in Macnicol, Poems by Indian women, p. 79.
১৩২৫. Ruqaat-i-Alamgiri, trs. Billimoria, pp. 73-74
১৩২৬. Tavernier, Travels in India, I. p. 392.
১৩২৭. Tuzuk. I. p. 10.
১৩২৮. Alamgir nama, I. p. 368.

www.pathagar.com

আইন-ই-আকবরিতে আবুল ফজল ভারতীয় নারীদের ষোলটি প্রসিদ্ধ প্রসাধন সামগ্রীর (ছোলা সিঙ্গার) তালিকা প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রধানত স্নানের জন্য চন্দন কাঠের লেই ও অন্যান্য অনুলেপন দ্বারা দেহ সুবাসিতকরণ, বিভিন্ন রকমের পোশাক পরিধান, কাজল ব্যবহার, হারের সাথে ঝোলানো পরিপূরক অলংকার ও কানের দুল পরিধান, নাকফুল বা মুক্তা ও সোনার আংটি দ্বারা নাকের অলংকরণ, গ্রীবার চারধারে অলংকার পরিধান, ফুল বা মুক্তার মালা দ্বারা সাজসজ্জা, সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা অঙ্গমর্দন, মেহেদি দ্বারা হাতের সৌন্দর্য সম্পাদন, গোলাপের নির্যাস ব্যবহার, ঝুলানো ঘুঙ্গুরসহ কোমর বন্ধনী পরিধান, পায়ের হাঁটুতে অলংকার ব্যবহার এবং পান চিবানো।[১৩২৯] অর্ধশতাব্দী আগে মালিক মুহম্মদ জাইসিও একটি অনুরূপ তালিকা প্রদান করেছেন তাঁর 'পদ্মা ভাটে' সৌন্দর্য সাধনের উপকরণ সম্বন্ধে। সপ্তদশ শতাব্দীর হেরেমবাসীদের সম্মন্ধে স্টোরিয়া ডু মগোর রচনায় মানুচীর বিবরণটি একেবারে বিস্তৃত ও জীবনঘনিষ্ঠ। হেরেমের সম্ভ্রান্ত মহিলারা তাঁদের দেহের প্রসাধন কার্য সম্বন্ধে বিশেষ নজর দিতেন এবং দেহ পরিষ্কার, নরম ও মসৃণ রাখার জন্য ব্যবহার করতেন সকল প্রকার মলম। মাথার চুলে অত্যন্ত যত্ন নেওয়া হতো এবং প্রয়োজন হলে কালো রং চুলে ব্যবহার করা হতো। মানুচীর ভাষায় 'তাঁদের চুল অত্যন্ত সুসজ্জিত বিনুনি করা এবং সুগন্ধি তেলে সুবাসিত।' কেশ বিন্যাসের বিচিত্র পদ্ধতিকে শোভিত করা হতো ফুল ও সুগন্ধি তেল দ্বারা। আবুল ফজল বলেন, 'বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি পুষ্প ব্যবহার করা হয়। ফুল থেকে তেল নির্যাস আকারে সংগৃহীত করা হয় এবং তা ত্বক ও চুলের জন্য ব্যবহৃত হয়।'[১৩৩০] তিনি চমৎকার গন্ধবিশিষ্ট ও সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ ফলের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিউলি, চামেলি, মোগরা, চাম্পা, কেতকি, জুঁই, মালসারি, নার্গিস, বাতান কেউরা, মানজারি (উজ্জ্বল লাল), কেনার (লাল ও সাদা) ইত্যাদি তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট ফুল।[১৩৩১] মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বিরাজ করে চোখ, ঠোঁট ও নাকে এবং এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। চোখের ভ্রু সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিন্যস্ত করা হতো। চোখের পাতায় পেন্সিল দ্বারা বারবার কাজল দেওয়া হতো। ভঙ্গুর রসাঞ্জন দ্বারা তৈরি মিশি দাঁত ও দাঁতের মাড়িতে বিশেষত ঠোঁটে ব্যবহার করা হতো। গোলাপি লাল বর্ণ ঠোঁটের প্রতি এই প্রথার ভিত্তি হিসেবে আরবীয়দের

১৩২৯. Ain., III. p. 312.

১৩৩০. Ibid., pp. 78-79.

১৩৩১. Ibid., I. pp. 81-82: Jahangir also gives many names of flower's, Tuzuk. I. pp. 5-7.

www.pathagar.com

কাছে প্রশংসনীয় ছিল।[১৩৩২] সাধারণত হীরক বসানো নথ বা নাকফুল দ্বারা নাকের শোভা বৃদ্ধি করা হতো। নথ ছিল সাধারণত নববিবাহিতা বধূকে দেওয়া বরপক্ষের প্রীতিস্বরূপ উপহার।[১৩৩৩] এটার কথা উল্লেখ করলেই কনের গালে ফুটে উঠত রক্তিমাভা। পানেরও ছিল সৌন্দর্য ও ঔষধি গুণ। পান ব্যবহারে ঠোঁট লাল হতো, মুখের গন্ধে মিষ্টতা আনে ও দুর্গন্ধ দূর করে।[১৩৩৪] মানুচীর মতে, শাহজাদিরা সর্বদা তাঁদের হাত ও পায়ের পাতা লাল বর্ণের মেহেদি দ্বারা রঞ্জিত করতেন।[১৩৩৫] মেহেদি দ্বারা ব্যবহার করা হতো প্রসাধন সামগ্রী ও চর্ম রোগের ঔষধি হিসেবে। এর রোগ উপশমকারী গুণ একে মুক্তার মতো মূল্যবান করে তোলে।[১৩৩৬] কিন্তু রাজকন্যাদের পক্ষে দামের বিষয়টি নিয়ে কোনো সমস্যা হতো না এবং তাঁরা সচরাচর মেহেদি ব্যবহার করতেন।[১৩৩৭]

শৈশবকাল থেকেই হেরেমের মধ্যে বসবাসরত মহিলারা অলংকার ব্যবহার করতেন এবং তাঁরা সারাটি জীবন হৃদয়ের আনন্দে কাটাতেন।[১৩৩৮] আবুল ফজল তৎকালীন অলংকারের একটি তালিকা তৈরি করেছেন[১৩৩৯] এবং মানুচী সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন: 'তাঁরা (শাহজাদিরা) কনুইয়ের উপরে বাহুতে পরতেন মূল্যবান পাথর খচিত ও মুক্তার ছোট ছোট ঝোলানো গুচ্ছ যুক্ত দুই ইঞ্চি প্রশস্ত মূল্যবান তাগা। তাঁদের কব্জিতে অত্যন্ত মূল্যবান নয় বা বারো পাকে বাঁধা বালা বা মুক্তার বন্ধনী রয়েছে। এভাবে তাঁরা প্রায়ই নাড়ি পরীক্ষার স্থানটি আবৃত রাখতেন যে আমার পক্ষে সেখানে হাত রাখা কঠিন হতো। তাঁদের হাতের আঙ্গুলে রয়েছে দামি আংটি এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতেও সার্বক্ষণিকভাবে রয়েছে একটি আংটি এবং সেই আংটিতে পাথরের পরিবর্তে রয়েছে চারদিকে মুক্তা বসানো একটি ছোট গোলাকার আয়না। সেই আয়নাটি (আরশি) তাঁরা নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য ব্যবহার করতেন এবং তাঁরা প্রতি মুহূর্তে এই কাজটি করতে পছন্দ করতেন। তদুপরি আয়নাগুলো মূল্যবান পাথরে পরিবেষ্টিত। এর দেরাজের সাথে বাঁধা সুতার প্রান্তভাগে রয়েছে পাঁচ

১৩৩২. Burton, A Thousand Nights and A Night, III, p. 365.
১৩৩৩. Ali Mir Hassan. Observations on the Mussulmans of India. p. 58n.
১৩৩৪. Right from the coming of Muslims in India, Amir Khusrau, Ibn Battuta and many other writers have praised the Great qualities of tambul or pen. For detailed references see K. S. Lal, Twillght of the Sultanath, pp. 275-76.
১৩৩৫. Manucci, II, p. 238.
১৩৩৬. A. N. III. pp. 939-40.
১৩৩৭. Pal, Pratapditya Court Paintings of India, Fig. M67 of later Mughal times (1700-1750) shows a lady colouring her feet.
১৩৩৮. Ovington, op. cit. p. 320; Also first Englishmen in India, p. 76.
১৩৩৯. Ain., III. pp. 312-13.

www.pathagar.com

আঙ্গুল দীর্ঘ পনেরটি সুতা দিয়ে তৈরি মুক্তাগুচ্ছ। তাঁদের পায়ের নিচে চারদিকে রয়েছে গোলাকার ধাতব বন্ধনী বা মূল্যবান মুক্তার মালা। তাঁদের কপালের মাঝখানে ও মস্তকের মধ্যভাগ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে দ্যুতিময় রত্নখচিত তারকা, সূর্য বা চন্দ্র বা ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট একগুচ্ছ মুক্তা বা মূল্যবান অলংকার।[১০৪০] তিনি আরও বলেন, 'এই সকল শাহজাদির রয়েছে অন্যান্য সেট বাদেও ছয় থেকে আট সেট গহনা। এটা বিস্ময়কর নয় যে, স্বর্ণকারগণ (ভারতীয় ও ইউরোপীয়)[১০৪১] প্রায় বিরতিহীনভাবে অলংকার তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন। তাদের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে দামি সামগ্রী তৈরি করা হয় সম্রাটের লোকজন, রানি ও শাহজাদিদের জন্য।'[১০৪২]

হেরেমের মহিলারা পরিধান করতেন তুলা, রেশম বা পশমের তৈরি উৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে মূল্যবান বস্ত্র। প্রতিদিন তাঁরা কয়েকবার পোশাক বদল করতেন। মানুচী লিখেন, 'সাধারণত তাঁরা অনূর্ধ্ব এক আউন্স ওজন বিশিষ্ট এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রুপি মূল্যের দুটি বা তিনটি বস্ত্র পরতেন। তাঁরা পোশাকের সাথে সোনার পাড় সংযোজনে অভ্যস্ত। তাঁরা এসব পোশাকে ঘুমান এবং প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা পর এই পোশাক পরিবর্তন করেন এবং পরিবর্তন করার পরে তা আর ব্যবহার করতেন না; তাঁরা সেগুলো ভৃত্যকে দিতেন।[১০৪৩] মোঘল হেরেমের অনেক চিত্রে মসলিন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় মহিলাদেরকে দেখা যায় তা এত সূক্ষ্ম যে প্রায় কাচের মতো স্বচ্ছ। সেগুলোর বুনন প্রক্রিয়া খুব চমৎকারের জন্য পরবর্তীতে মোঘল রাজদরবারে সেগুলোকে আব-ই-বাওয়ান (ধাবমান জলরাশি), বাফত হাওয়া (বুননকৃত বাতাস) এবং শবনম (সন্ধ্যার শিশির) এর মতো কাব্যিক ভাষায় বর্ণনা করা হতো।[১০৪৪] শবনম নামে আখ্যায়িত মসলিনের বেশির ভাগ তৈরি হতো ঢাকায় এবং তা প্রসিদ্ধ ছিল ঢাকার মখমল নামে। এসব বস্ত্র তৈরি হতো সূক্ষ্ম সুতা দ্বারা এবং এগুলো শিশিরের মতো ঝকমক করত। ভেজা ঘাসের উপরে রাখলে এই কাপড় প্রায় চোখেই দেখা যেত না। কথিত আছে যে, একদা যখন এত স্বচ্ছ পোশাক পরার ব্যাপারে আওরঙ্গজেব তাঁর কন্যা জীবন নিসার কাছে প্রতিবাদ জানান তখন তিনি উত্তর দেন যে, তিনি এই বস্ত্র সাত পাক দিয়ে পরিধান করেছেন।

১০৪০. Manucci. II. pp. 330-340. Also Ovington, p. 320 and Roc & Fryer. Travels in India in the 17th Century, p. 384.
১০৪১. Tuzuk. II, pp. 80-82.
১০৪২. Manucci. II, p. 339.
১০৪৩. Ibid., II. P.341; also Bernier, p. 258.
১০৪৪. Comaras Wami. Arts and Crafts of India and Ceylon. p. 196.

www.pathagar.com

শাহজাদিদের পোশাক ছিল এমনই হাল্কা, ঠাণ্ডা, বায়ু চলাচলের উপযোগী এবং মাকড়সার জালের মতো হাল্কাভাবে বুনন করা এবং এই পোশাকে তাঁরা যা গোপন করতে চাইতেন তা গোপনে প্রকাশ পেত। তাঁরা তাঁদের মস্তক আবৃত করতেন বিভিন্ন গঠন ও বর্ণের তারকার চুমকি বসানো সোনালি কারুকাজ বিশিষ্ট একটি চাদরের দ্বারা এবং পরিধান করতেন উটপাখির পালক ও কিশমিশের মতো পদ্মরাগ মণি এবং মুক্তা ও মূল্যবান পাথর দ্বারা পরিবেষ্টিত পাগড়ি।[১৩৪৫] এটি অত্যন্ত মানানসই এবং এই বেশভূষাতে তাঁদেরকে খুব সুন্দর দেখাত।[১৩৪৬] শীতের আবহাওয়াতে অন্যান্য জিনিসের উপরে একটি পশমি কুবা বা একটি দীর্ঘ খোলা ঢিলা বহির্বাস ও কাশ্মীরের গঠন প্রণালিতে উৎপন্ন মিহি শাল কাপড় দ্বারা দেহ আবৃত রেখে তাঁরা এই পোশাক পরতেন।[১৩৪৭] তাঁদের শাল কাপড়গুলো এত পাতলা যে তা একটি ছোট আংটির মধ্য দিয়ে এপাশ ওপাশ করা যেত।[১৩৪৮] তাঁদের জামাওয়ারগুলো ছিল পশম বা রেশম দ্বারা বুননকৃত ফুলবিশিষ্ট পশমি পোশাক। তাছাড়া তুস বা বন্য ছাগলের পশম দ্বারা তৈরি বস্ত্রও পরিধান করতেন কিন্তু সম্ভবত তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল ভেড়ার লোমের মতো ব্যতিক্রমধর্মী হাল্কা ও উষ্ণ পশম দ্বারা তৈরি পাশমিনা।

মোঘল হেরেমের সম্ভ্রান্ত মহিলারা নাইলনের পোশাক পরিধানের আনন্দ উপভোগ না করলেও একটি উৎকৃষ্ট বস্ত্র তাঁদের পোশাকে কোমলতা ও নমনীয়তা প্রদান করত এবং তা হলো রেশম। রেশমের পরশে হাতের আঙ্গুল ও দেহে প্রশান্তি বোধ হতো, এর মসৃণ উজ্জ্বলতা ছিল আলোর মতো। রেশমি পোশাক সাধারণ চেহারার শাহজাদিদেরকে অত্যন্ত রূপসী নারীতে পরিণত করত। মধ্যযুগে রেশম ছিল প্রত্যেকটি সামরিক বিজয়ের লুণ্ঠন সামগ্রী এবং সাধারণ মহাজনি দ্রব্য। এটি ছিল পোশাকের রানি এবং হেরেমের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পোশাক। এই মসৃণ পোশাকে রাজকীয় অন্দরমহলের মহিলারা আপাদমস্তক ঢেকে রাখত। তাঁরা এটি ব্যবহার করতেন এবং পরনে থাকা অবস্থায় আরামে ঘুমাতেন। মহিলাদের পোশাকে সোনা ও রুপার সুতা দ্বারা সূচিশিল্প শোভিত করা হতো এবং আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তা কাপড়ের পাড়ে ফিতা লাগানো হতো। এসব পোশাক গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের নির্যাস

১৩৪৫. Abdul Aziz, Arms and Jewellery of the Indian Mughals, pp. 212-13.
১৩৪৬. Manucci, II, p. 341.
১৩৪৭. For Mughal Shawls see Ain., I, p. 258.
১৩৪৮. Manucci, II, pp. 341-42.

www.pathagar.com

দ্বারা সুবাসিত করা হতো। আবুল ফজলের সুগন্ধি দ্রব্যের তালিকা ও সেগুলোর প্রস্তুত প্রণালি পাঠ করা মজার বিষয়।[১৩৪৯] মোঘলরা সুগন্ধি দ্রব্য কত ভালোবাসতেন তা প্রকাশ পেয়েছে রাজকীয় স্মৃতিকথার লেখক জাহাঙ্গীরের দ্বারা। যখন তাঁর শাশুড়ি আসমত বানু বেগম গোলাপের সুবাস বা আতর-ই-জাহাঙ্গীরী তৈরির একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তখন তাঁর উদ্যমী জামাতা লিখেন, 'এটি এত তীব্র সুগন্ধি দ্রব্য যে এর এক ফোঁটা হাতের তালুতে ঘষলে তা সমগ্র দরবারকে সুরভিত করে এবং মনে হয় তাৎক্ষণিকভাবে যেন লাল গোলাপের অনেক কুড়ি প্রস্ফুটিত হয়েছে।[১৩৫০] তীব্র সুগন্ধি দ্রব্যগুলো শরীরে ব্যবহার করা ও কাপড়ে ঘষে দেওয়া হতো। সাধারণভাবে হেরেমের মহিলারা এবং বিশেষত শাহজাদিরা তাঁদের আপাদমস্তক সাজসজ্জার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তাঁদের জুতাগুলোও ছিল সোনা ও রুপার চুমকি বসানো বিভিন্ন গঠনশৈলীতে আকর্ষণীয়। এগুলো ছিল উপরের দিকে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও বাঁকানো; কিন্তু গোড়ালির দিকে অবনত, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ও মূল্যবান পাথরে সুশোভিত।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, রাজকীয় কারখানা ও ব্যক্তিগত কারখানা থেকে হেরেম সারার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটত। স্বদেশ জাত রেশম ছাড়াও চীন ও পারস্যের মতো বহির্দেশ থেকে রেশম আমদানি করা হতো। বার্নিয়ার বলেছেন যে রাজকীয় অন্দরমহলে সোনার কাজ করা কাপড়, বুটিদার শিল্পজাত দ্রব্য, রেশম, সূচিশিল্পজাত দ্রব্য, মুক্তা, মৃগনাভি, বাদাম ও মধুর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ ধারণাতীত।[১৩৫১] এ ব্যাপারে মানুচী ও বার্নিয়ার একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আবুল ফজল এ ব্যাপারে ভারতীয় এবং তুরস্ক, ইউরোপ ও পর্তুগাল থেকে আমদানিকৃত তুলা, রেশম ও পশমি কাপড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[১৩৫২] সাটিন, এটলাস, কিমখাব, কাতান, তাফতা, আম্বারি, তসর ইত্যাদি ছিল সুপরিচিত। সাদামাটা ও সূচিশিল্প শোভিত মখমল আমদানি করা হতো ইউরোপ, সাসান, ইয়াজদ, মাসাদ, হেরাত ও অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে।[১৩৫৩] শাহজাহানের আমল থেকে আরো বেশি বিদেশি সামগ্রী আমদানি করা শুরু হয়।[১৩৫৪] দেশের অভ্যন্ত

১৩৪৯. Ain., I. pp. 83-93.
১৩৫০. Tuzuk. I, p. 271; Also Beni Prasad. p. 160.
১৩৫১. Bernier. p. 222
১৩৫২. Ain.. I. pp. 93-102.
১৩৫৩. Ibid.. pp. 98-100.
১৩৫৪. Lahori. II. pt. 1. pp. 363-64; Manucci. II. p. 340.

www.pathagar.com

রে লেপ, কাঁথা, বিছানার চাদর ও বালিশ তৈরি হতো। সাতগাঁওয়ের রেশমি লেপ ছিল প্রসিদ্ধ। এগুলো প্রস্তুত হতো পাটনা, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ ও উড়িষ্যাতে।[১৩৫৫] বেনারসের রেশমি কাপড় ও সূচিশিল্প শোভিত রেশমি পোশাক ছিল সত্যিই প্রসিদ্ধ। টেরি সাহেব বলেন যে, দেশটিতে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয় এবং ভারতীয়রা আগ্রহের সাথে কখানো কখনো রুপা ও সোনার সাথে তা মিশিয়ে কাপড় বুনন করেন। তাঁরা মখমল ও রেশমি তাফতা তৈরি করেন।[১৩৫৬] দিল্লি, লাহোর, আগ্রা, পাটনা, বেনারস, বুরহানপুর, ঢাকা ও অন্য অনেক স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো।[১৩৫৭] ঢাকাতে বিপুল পরিমাণ মিহি সাদা কাপড় ও রেশমি বস্ত্র উৎপন্ন হতো।[১৩৫৮] পোশাক, সূচিশিল্পজাত দ্রব্য, গালিচা, জুতা, হাতব্যাগ, সৌখিন থলি বা বাক্স, আসবাবপত্র এবং বহুসংখ্যক ছোট দ্রব্যসামগ্রী রাজকীয় কারখানাতে তৈরি হতো এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। ইউরোপীয় দূত, ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীরা বড় ও ছোট আয়না, সোনা বা রুপার ফিতা, মিহি উজ্জ্বল লাল ও সবুজ বর্ণের কাপড় এবং কিছুসংখ্যক চীনা ও জাপানি কারিগরি কৌশলে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করে সুখী হতেন।[১৩৫৯]

কাশ্মীর, লাহোর ও আগ্রা থেকে আহম্মদাবাদ ফতেপুর ও বুরহানপুর পর্যন্ত সরকারি কারখানা বিস্তৃত ছিল সারা দেশে। কাশ্মীরের কারিগরি কাজ ছিল প্রসিদ্ধ। এখানকার পালকি, বিছানার চাদর, ধাতুনির্মিত বড় বাক্স, দোয়াতদানি, বাক্স ও চামচ ব্যবহার হতো সারা ভারতে। কিন্তু এখানকার শাল কাপড় ছিল চমৎকার। পাটনা, আগ্রা ও লাহোরে একই রকমের শাল তৈরির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য সকল প্রকার যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও সেগুলোতে কাশ্মিরী শালের মতো সুন্দর বুনন কারুকাজ ও কোমলতা নেই।[১৩৬০] কাশ্মীর, ফাতেপুর ও জৌনপুরের গালিচাও ছিল বিখ্যাত। পশমি গালিচা বা কুলীন আমদানি করা হতো ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে। মোটা গালিচাকে আখ্যায়িত করা হতো পারি বলে এবং শতরঞ্চি গালিচা ছিল পশম ও তুলার তৈরি। সংক্ষেপে বলা যায়, বিভিন্ন স্থানে বড় বড় কক্ষে কারখানা দেখা যেত। একটি বড় কক্ষে সূচিশিল্পের কারিগররা কাজ করত এবং অন্য একটিতে কাজ করত স্বর্ণকার, চিত্রকর, রং করার কারিগর, ধাতব বস্তু জোড়াতালি

১৩৫৫. Mukherjee, R.K. Economic History of India, pp. 117-119.
১৩৫৬. Terry in Foster's Early Travels, p. 302.
১৩৫৭. Manrique. I, p. 56; II, pp. 149. 180, 424.
১৩৫৮. Manucci, op. cit. p. 430.
১৩৫৯. Bernier. p.p. 128, 292.
১৩৬০. Ibid., pp. 402-403.

www.pathagar.com

দেওয়ার কারিগর, দর্জি, লেদমেশিনের কারিগর, চর্মকার, রেশম, বুটিদার শিল্পদ্রব্য এবং ঐসব শৌখিন মসলিন যার দ্বারা পাগড়ি তৈরি হতো, প্রস্তুত করা হতো সোনালি ফুলের কটিবন্ধ নারীদের জন্য পরিহিত পাজামা সেগুলো এত কোমল হতো যে এক রাত ব্যবহার করার ফলে পুরনো হতো।[১৩৬১]

পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার এই সকল উপকরণ দ্বারা কীভাবে ইন্দ্রিয় সুখ বিলাসিতায় জীবন যাপন করা যায় তা হেরেমবাসী নারীগণ জানতেন এবং মোঘল সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জানতেন কীভাবে উক্ত মহিলাদেরকে বিলাসিতার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়। যুবতি নারীরা নিচের দিকে সরু পোশাক পরতেন, মেহেদির সুন্দর নকশাতে হাতের আঙ্গুল রঞ্জিত করে একরোখা পাখির মতো হেসে হেসে নারী সুলভ আবেগে একতা এবং সঙ্গী ও সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতেন। অনেক মোঘল অনুচিত্রে ধরা পড়েছে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধক সৌন্দর্য ও আবেদনময়ী আকষণ, যা এখনও ভারতীয় নারীদের পোশাক ও সৌন্দর্যের বিশুদ্ধতার ছাপ হিসেবে রয়ে গেছে।

(ছ) বিশ্রাম ও বিনোদন

হেরেমের মহিলাদের শ্রেষ্ঠ বিনোদন ছিল সঙ্গী ও সহকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব স্থাপন। পাশ্চাত্য মহিলাদের নির্জনতার ধারণা ছিল একা থাকা। প্রাচ্যের নারীদের নির্জনতার ধারণা ছিল অন্যান্য মহিলার সান্নিধ্যে অবসর কাটানো। হেরেমের মহিলারা সঙ্গীদের সান্নিধ্যের মতো নির্জনতা পছন্দ করত না। তাঁদের নিঃসঙ্গতা বলতে বোঝাত পুরুষদের কাছ থেকে আলাদা থাকা। নারীদের মধ্যে ছিল বৃহত্তর একতাবোধ এবং এক ধরনের সংঘবদ্ধ জীবন যাপন প্রণালি। নারী সমাজের মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিল না। প্রত্যেক শাহজাদার সম্মানিত মহিলা ও পরিচারিকাদের মধ্যে সঙ্গী-সাথি ছিল। সঙ্গ লাভ ছিল সংক্রামক। এটি যুবতি নারীদেরকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে একত্রিত করত। তাঁরা একত্রে ঠাসাঠাসিভাবে সর্বদা গল্প, হাসাহাসি ও আলাপ করে জীবন যাপন করতেন। শাহজাদি এবং সমগ্র দেশ ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত স্বাস্থ্যবতী, প্রফুল্ল ও শিষ্টাচারসম্পন্ন শত শত সুন্দরী মহল ভরিয়ে তুলতেন আনন্দে। বন্ধুত্বভাবাপন্ন দলে সমবেত হয়ে দিন-রাত গল্প, গান ও হাসিতে তাঁরা রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করতেন তাঁদের কমনীয় অথচ উজ্জ্বল উপস্থিতি দ্বারা। রাজপ্রাসাদ বা শিবিরে তাঁদের সমস্ত সময় কাটত আমোদ-ফুর্তিতে ও হৈহল্লা করে মদ্যপানে।[১৩৬২]

১৩৬১. Ibid., pp. 258-59.
১৩৬২. Jauhar. p. 104.

www.pathagar.com

সকল প্রকার সঙ্গই খাদ্য ছাড়া নীরস। যুবতি নারীরা সুস্বাদু পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করত এবং এটি ছিল আর একটি বড় ধরনের অবসর যাপন প্রণালি। এই অবসর যাপন কার্যে তাঁরা ছিলেন উৎকৃষ্ট আপ্যায়নকারী ও অতিথি বৎসল। মোঘল সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের সুন্দর রুচিবোধের জন্য ছিলেন বিখ্যাত এবং রসনাতৃপ্তি সাধন ছিল এর একটি প্রধান উপাদান। সম্রাটের জন্য প্রস্তুত খাবারের অংশীদার হতেন হেরেমের নারীরা। হেরেমের সকল বাসিন্দা না হলেও অন্তত পক্ষে রানি, শাহজাদি ও প্রিয়জনেরা এতে অংশীদার হতেন। আবুল ফজল লিখেন যে 'রাজকীয় রন্ধনশালায় সকল দেশের রাঁধুনিরা তৈলাক্ত, মিষ্টি স্বাদযুক্ত ও মসলাযুক্ত সকল ধরনের খাদ্যশস্য, সবুজ শাকশবজি, গোশত রান্না করত। হেরেমে প্রত্যহ এমন খাবার প্রস্তুত হয়, যা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কদাচিৎ তাঁদের ভোজের সাথে পেতে পারেন এবং এ থেকে আপনারা অনুমান করতে পারেন খাবারগুলো কেমন আকর্ষণীয়... ।' রান্নার কাজে ব্যবহৃত হতো বাহরেচের চাল, গোয়ালিয়রের দিউজিরা চাউল, রাজৈরী ও নিমলা থেকে জিনজিন চাউল, হাইছার ফিরোজা থেকে ঘি এবং কাশ্মীর থেকে পাতিহাঁস, জলচর পাখি ও নির্দিষ্ট প্রকারের শাকশবজি। খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয় সোনা, রুপা, পাথর ও মাটির তৈরি থালাতে। খাদ্যদ্রব্য ভাণ্ডারের ভৃত্যরা পাঠায় বিভিন্ন রকমের রুটি, দধি দ্বারা স্তূপীকৃত রেকাবি, ছোট পাদানির ওপর আচারের পাত্র, টাটকা আদা, লেবু ও বিভিন্ন সবুজ শাকসবজি। কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য অর্ধপ্রস্তুত অবস্থায় রাখা হয় যাতে এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একশ খাবার থালা পরিবেশন করা যায়।'[১৩৬৩] আমি (আবুল ফজল) কিছু বিবরণ প্রদান করব। রান্না করা খাবারকে তিন শ্রেণিতে সাজানো যেতে পারে। প্রথমত আজকাল সুফিয়ানা নামে আখ্যায়িত মাংসবিহীন খাবার। দ্বিতীয়ত মাংস, ভাত ইত্যাদি মিশ্রিত খাবার এবং তৃতীয়ত মসলাযুক্ত মাংসের খাবার। আমি এই তিন প্রকার খাবারের প্রত্যেকটির রন্ধন প্রণালি উল্লেখ করব।[১৩৬৪] এর পরেই রয়েছে জিভে পানি আনয়নকারী খাবার ও আচার প্রস্তুত প্রণালি।[১৩৬৫] এ রকম সুস্বাদু খাবার আকবরের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালেও হয়তো চালু ছিল। যদি এমন কিছু ঘটে থাকে তবে রন্ধনবিদ্যা হয়ে উঠেছিল আরও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যই শুধু বৃদ্ধি পেয়েছিল। রন্ধনকার্যে ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য।[১৩৬৬] শুকনা ও

১৩৬৩. Ain., I. p. 59.
১৩৬৪. Ibid., p. 60.
১৩৬৫. Ibid., pp. 60-64.
১৩৬৬. Ibid., p. 78.

www.pathagar.com

টাটকা ভারতীয় ও বিদেশি ফল হেরেমের বাসিন্দারা খেতেন পরম আগ্রহ সহকারে।[১৩৬৭] আম পছন্দ করতেন সকলেই।[১৩৬৮] দুধ মিশ্রিত কফি ঘনঘন পান করা হত[১৩৬৯] এবং পান সবসময় চিবানো হতো। একটি কেন্দ্র থেকে রন্ধনকার্য পরিচালিত হতো এবং রাজকীয় অন্দরমহলের নারীদের জন্য রন্ধনশালা থেকে খাবার নেওয়া শুরু হতো সকালে এবং রাত পর্যন্ত তা চলত।[১৩৭০] তাই খোশগল্প, খেলাধুলা ও গল্পকাহিনী বর্ণনার জন্য ছিল প্রচুর সময়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে নিম্নলিখিত ধারা ক্রমানুসারে শুধু চার রকমের খেলার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে– চৌপার, চাণ্ডাল-মাণ্ডাল, তাস ও দাবা। এ থেকে এ রকম ধারণাও পাওয়া যায় যে, এই খেলাগুলো আকবর ও তাঁর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্রাট তাঁর সভাসদগণের সাথে খেলার মাধ্যমে নিরূপণ করেন একজন ব্যক্তির মেধা বা দাবা খেলাতে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের যোগ্যতা যাচাই করা।[১৩৭১] কিন্তু অনেক মোঘল অনুচিত্রে এসব খেলা হেরেমের নারীদেরকে খেলতে দেখা যায়। এটি অত্যন্ত সুবিদিত যে, জীবন নিসা তাঁর বান্ধবীদের সাথে চৌপার খেলার মাধ্যমে প্রচুর সময় কাটাতেন।[১৩৭২] এই উপর্যুক্ত খেলাগুলো এবং অনুরূপ খেলা স্বাধীনভাবে মোঘল হেরেমে খেলা হতো।

দাবাখেলার ছকটি ছিল আধুনিক, দাবা খেলার ছকের মতো এবং তাতে ৬৪টি বর্গকৃতি ঘর ছিল, কিন্তু দাবার ঘুঁটিগুলোতে ছিল কিছুটা পার্থক্য।[১৩৭৩] এই খেলাটি ছিল শাহজাদি ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রিয়। আকবর প্রায়ই দাসীদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে স্থাপন করে ফতেপুর সিক্রিতে একটি আঙ্গিনাতে ডোরাকাটা বড় মঞ্চের উপরে এই খেলাটি খেলতেন। এই স্থানটি এখনও দেখা যায়। দাবার ঘুঁটির সাজে সজ্জিত একদল সুন্দরী মেয়েকে দাবার ছকে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং সম্রাট ও তাঁর খেলার সাথির নির্দেশে স্থান পরিবর্তন করতে দেখা ছিল নিশ্চয়ই একটি উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা। সাধারণত দর্শকরাও ছিলেন মহিলা। সম্ভ্রান্ত মোঘলেরা ও তাঁদের মহিলারা দাবা খেলাতে ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। মানুচী তাঁদের সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং এই

১৩৬৭. Ibid., pp. 74-78.
১৩৬৮. Tuzuk. I, pp. 5, 116. 332.
১৩৬৯. Ibid., I. p. 155.
১৩৭০. Ain., I, p. 59.
১৩৭১. Ibid., pp. 315-320. Also A. N. II. p. 534.
১৩৭২. Sarkar. Studies in Mughal India, p. 82.
১৩৭৩. For details see Ain-i-Akbari. I. pp. 315-320. 374. & plate XVII. Herklot. Islam in India, pp. 333-35. Also Badaoni trs. II, pp. 18. 324; III, pp. 408-467.

www.pathagar.com

কথা বলে তাঁদের বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, দাবা খেলার মাধ্যমে তাঁরা শিখতেন বিচক্ষণভাবে শাসন করা, কাউকে কর্মস্থল নির্ধারণ করা ও অপসারণ করা ও দেওয়া-নেওয়ার কাজ।[১৩৭৪]

হেরেমের মহিলাদের একটি সহজ ও অধিকতর জনপ্রিয় খেলা ছিল চৌপার এবং খেলাটি আজও চালু রয়েছে পাচিশি, চৌসার ও চৌপার এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে। মোঘল চিত্রাবলিতে শাহজাদিদেরকে এই খেলা খেলতে দেখা যায়।[১৩৭৫] এই খেলার ছকটি একটি চতুর্ভুজের মধ্যে মর্মর পাথরের বর্গাকার ক্ষেত্রে অঙ্কিত রয়েছে এবং এ ধরনের ছক দেখা যায় আগ্রা দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রিতে। কথিত আছে যে আকবর এই খেলাতে ক্রীতদাসীদেরকে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতেন। সাধারণত এই খেলাটি চারজন খেলোয়াড় খেলতেন এবং দুইজন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা করতেন অপর দুইজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। সহজেই এই খেলাটি খেলা যেত যেকোনো সময়ে ও যেকোনো স্থানে। যুবতি মহিলারা মেঝের উপরে বা কোনো কাগজের উপরে দুটি সমান্তরাল সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেখা টেনে আরো দুটি সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেখা টানতেন আবার রেখা দুটিকে সমকোণে ছেদ করে এবং তারপরে খেলতে শুরু করতেন। আকবর চাণ্ডাল-মাণ্ডাল নামে আর একটি খেলা উদ্ভাবন করেন এবং এই খেলাতে একই সময়ে ষোলজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারত।

আইন-ই-আকবরির বর্ণনা মতে এই খেলাটি বারো প্রকারে খেলা যেত[১৩৭৬] এবং অনেক মহিলা এই খেলাতে যোগ দিতে পারতেন এক বা একাধিক দলে একই সময়ে বিভক্ত হয়ে। তারপর হতো তাসখেলা বা গাঞ্জাফা। এই খেলাটি ছিল আধুনিককালের তাস খেলা থেকে আলাদা, কারণ সব তাসে উৎকীর্ণ থাকত ছবি। সমস্ত খেলা হতো বাজি ধরে, কখনো কখনো ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশি হতো এবং তার ফলে মেজাজ বিগড়ে যেত।[১৩৭৭] নারদ বা পাশা খেলা হতো একটি কাঠের বর্গাকৃতি বোর্ডের উপরে। পর্দা শারীরিক পরিশ্রমের কারণে সাধারণত হেরেমের মহিলারা বাড়ির বাইরে অনুষ্ঠিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত না। তথাপি কেউ কেউ চৌপার বা পোলো খেলত এবং পাখি শিকারে অংশগ্রহণ করত। হেরেমের নারীদের মধ্যে নূরজাহানই সম্ভবত একমাত্র মহিলা যিনি বাঘ ও সিংহ শিকার করতেন। কিন্তু কবুতর ওড়ানো (ইশকবাজি), ঘুড়ি ওড়ানো এবং কানামাছি খেলা ছিল সাধারণ বিনোদন।

১৩৭৪. Manucci. II, p. 460.
১৩৭৫. Pal Prata Pditya. Court Paintings of India. Figs M. 50M. 68.
১৩৭৬. Ain. I, pp. 317-18.
১৩৭৭. Ibid., p. 374.

www.pathagar.com

নৌকা বিহারও ছিল সাধারণত প্রচলিত বিনোদন এবং রঞ্জিত দাঁড়যুক্ত হাল্কা নৌকা ও মাঝখানে মহিলাদের জন্য জায়গা বিশিষ্ট বড় নৌকাতে প্রমোদ ভ্রমণ করা হতো।[১৩৭৮] মোঘল মহিলারা অশ্বারোহণও উপভোগ করত।[১৩৭৯] কিন্তু তাঁরা পুরুষদের মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ঘোড়দৌড় এবং মাঝে মাঝে ইন্দ্রজাল ও দড়াবাজি অবলোকন করতেন শুধু একটি পর্দার আড়াল থেকে।

বই পড়া ছিল অন্যতম বিনোদন এবং হেরেমে বইয়ের ভালো সংগ্রহ ছিল। আবুল ফজল লিখেছেন, 'রাজকীয় গ্রন্থাগারটি কয়েক ভাগে বিভক্ত। কিছুসংখ্যক বই রাখা হয় হেরেমের মধ্যে এবং কিছুসংখ্যক বই রাখা হয় হেরেমের বাইরে।[১৩৮০] গদ্য রচনার বই, কবিতার বই এবং হিন্দি, পারস্য, গ্রিক, কাশ্মিরী, আরবি ভাষার বই সাজানো হয় আলাদাভাবে।[১৩৮১] হেরেমের বৃদ্ধা ও যুবতি মহিলারা বেশিরভাগ আগ্রহী ছিলেন কাব্য, কল্পকাহিনী ও নীতিমূলক গল্পকাহিনীতে। তখন ব্যাপকভাবে পঠিত অন্যতম বই ছিল আলিফ লয়লা, আরব্য রজনী বা এক হাজার এক রাত্রি নামক বিখ্যাত প্রাচ্যদেশীয় গল্পের সংকলন, যা আরববাসীদের দ্বারা ফারসি ভাষার মাধ্যমে ভারত থেকে সংগৃহীত বলে অনুমান করা হয়। 'এক হাজার এক রাত্রি' গল্প সংগ্রহের সাথে যে গল্পগুলো সংযোজিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কনের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধান্বিত সুলতান শাহরিয়ার একটি আইন তৈরি করেন যে তাঁর ভবিষ্যতের প্রত্যেক স্ত্রীকে বিবাহের পরবর্তী সকালে হত্যা করা হবে। পরিশেষে শাহরাজাদ নামক তাঁদের একজন এই নিষ্ঠুর প্রথা বিলোপ সাধনে সফল হন। রূপসী গল্পকথক তাঁর গল্পের জাদুতে কৌতূহল উদ্দীপক গল্পের মাঝখানে বিরতি দিয়ে প্রতিদিন প্রভাতে সুলতানকে তাঁর প্রাণদণ্ড দানের কাজ স্থগিত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে গল্পগুলো বেড়ে যেত এবং অন্যান্য গল্পে বিকশিত হতো এবং এভাবে গল্পগুলো আকর্ষণীয় ও সমাপ্তিহীন (ধারাবাহিক) গল্পে পরিণত হতো। নাবিক সিন্দাবাদের পুরাতন বইটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে তুর্কি কাহিনীরূপে।[১৩৮২] নল ও দামান এর হিন্দি ভাষার সংবেদনশীল পাঠকের হৃদয়স্পর্শী গল্পটি ছিল আরেকটি সুখপাঠ্য বিষয়। এটি অনূদিত হয় আবুল ফজলের ভাই শেখ ফয়েজীর দ্বারা এবং তা এখন সর্বত্র 'নল দামান'

১৩৭৮. Babur Nama, pp. 387. 406: A.N.. II. p. 112; Tuzuk. II, p. 151; Peter Mundy, II, p. 158.
১৩৭৯. আকবরনামা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১১.
১৩৮০. আইন-ই-আকবরী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭.
১৩৮১. Ibid., I. p. 110: শাহজাদা ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় এক মহিলার বই পড়ার চিত্র উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালোরের নাতিমানে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে চিত্রিত করেন। pl. VI.
১৩৮২. Hamilton gibbin the Legacy of Islam, p. 200.

www.pathagar.com

শিরোনামে পরিচিত।[১৩৮৩] অন্যান্য সমকালীন কল্পকাহিনী হলো নাকাশ বিরচিত 'টুটিনামা', হাসান ওয়ায়েজ কাশাফি রচিত 'আনোয়ার সুহালী', আবুল ফজল রচিত 'আয়ার দানিস' এবং এনায়েতুল্লাহ রচিত 'বাহার দানিস'।[১৩৮৪] আয়ার দানিস[১৩৮৫] অনূদিত হয় কালিলা দামনা নামক আরবি রচনা থেকে এবং এটা বাস্তব জ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট রচনা। রাজা বিক্রমাদিত্যের শিক্ষামূলক ধারাবাহিক গল্প 'সিংহাসন ভাটিসি' অনুবাদ করেন বাদউনি একজন পণ্ডিতের সহায়তায় এবং তার নামকরণ করা হয় ক্ষীরোদ আফজা (জ্ঞান বর্ধনকারী)। আকবর এটি পছন্দ করতেন ও তা তাঁর গ্রন্থাগারে সংযোজন করেন।[১৩৮৬] শেখ শাদীর গুলোস্তান ও বোস্তান বারবার অধ্যয়ন করা হতো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ আকর্ষণীয় রচনার মধ্যে ছিল তৈমুর ও বাবরের আত্মজীবনী ও ঐতিহাসিক বই। হেরেমের কিছুসংখ্যক মহিলার কাছে রামায়ণ ও মহাভারত ছিল জনপ্রিয়। এসব এবং অনুরূপ গ্রন্থাবলি ছিল যুবতী ও বৃদ্ধা মহিলাদের মনের ঔষধ যা চিকিৎসা হিসেবে কাজ করত।

প্রকৃতপক্ষে অনেক বই সর্বদা পঠিত হতো না। গল্প বলা বা কিচ্ছাকাহিনী ছিল সাধারণ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, আরব্য রজনীর অধিকাংশ গল্প কিছুসংখ্যক মেধাবী মহিলা মুখস্ত করত এবং তাঁরা সেগুলো বর্ণনা করত একদল আগ্রহী মহিলা শ্রোতার কাছে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গৃহকর্ত্রীকে আনন্দ দিতে বর্ণনা করে শোনাত বা তাকে ঘুম পাড়াত। মানুচী লিখেছেন, রোমাঞ্চকর বইয়ের মতো প্রেমবিষয়ক বইগুলো খুব আগ্রহের সাথে পঠিত হতো।[১৩৮৭] এই কারণে পারস্যের প্রণয়মূলক কবিতা ছিল খুবই জনপ্রিয়। এই কবিতার সৌন্দর্য নিহিত থাকে এর সংবেদনশীলতায়। এটি বেদনার্ত হৃদয়ে সঞ্চার করত উত্তেজনা, আবেগ ও মানসিক যন্ত্রণায় ঔষধের মতো। এটি ভালোবাসার যন্ত্রণাকে সহ্য করতে বিষয়টি সহজ করে তুলত। তাই প্রত্যেকের মুখ থেকে অবাধে কবিতা উচ্চারিত হতো এবং প্রত্যেকটি কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে কবিতার হৃদয়স্পর্শী ছন্দ ব্যবহার হতো। রোমান্টিক কবিতার প্রতি এমন আকর্ষণ ছিল যে আওরঙ্গজেব বেগম ও শাহজাদিদের জন্য হাফিজ সিরাজীর অত্যন্ত কাম উদ্দীপকপূর্ণ রচনা অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি

১৩৮৩. আইন-ই-আকবরী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো ১১২-১১৩.

১৩৮৪. পি.এন. চোপরা কর্তৃক প্রণীত 'ভারতে মোঘলদের সমাজ ও সংস্কৃতি', পৃষ্ঠাগুলো ১৭৩, ৮০-৮১.

১৩৮৫. আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১২.

১৩৮৬. Badaoni. II, p. 183.

১৩৮৭ Manucci. II. p. 331.

www.pathagar.com

তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা জীবন নিসার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটান, কারণ তিনি নিজে (জীবন নিসা) ছিলেন একজন নিপুণ কবি।[১৩৮৮]

মানুচী যথার্থই বলেছেন, শাহজাদি ও উচ্চ শ্রেণির মহিলাদের আমোদ-প্রমোদ ছিল প্রধানত বাসভবনের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদেরকে অনুমতি দেওয়া হতো কৌতুক, অভিনয় ও নৃত্যের আনন্দ উপভোগ করতে, প্রেমের আলাপ ও গল্প শুনতে, ফুলের বিছানায় হেলান দিয়ে আরাম করতে, বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে, ধাবমান জলধারার কলতান শুনতে, গান শ্রবণ করতে এবং অন্যান্য বিনোদন উপভোগ করতে।[১৩৮৯] মহিলা সঙ্গীসহ বাগানে ধীরে সুস্থে হেঁটে বেড়ানো ছিল উল্লাসজনক। কিছুসংখ্যক শাহজাদির ছিল তাঁবু, ধাবমান জলরাশি, ছায়াযুক্ত গাছ ও দীপ্তিপূর্ণ ফুলে পূর্ণ উদ্যান। আব্দুল হামিদ লাহোরি বাদশাহনামাতে আমাদেরকে জানান যে শাহজাহান হেরেমের বাসিন্দাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের জন্য অনেক বাগান তৈরি করেন এবং প্রমোদ ভ্রমণের জন্য যখন রাজকীয় মহিলারা তাঁকে সঙ্গ দিতেন তখন তাঁবু ব্যবহারের ফলে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বড় স্থান ভরে যেত এবং এগুলো বর্জন করা যেত। রাজকীয় ভ্রমণের সময় এসব বাগানে পুরুষদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ এবং তখন মেনে চলা হতো কঠোর পর্দা ব্যবস্থা।[১৩৯০] শাহজাহান আগ্রা দুর্গে নির্মাণ করেন আঙ্গুরীবাগ নামক একটি জেনানা উদ্যান। এর জলাশয়গুলোতে সাধারণ জলের পরিবর্তে গোলাপ ও কেউরা জল ছিটকে বের হতো। সম্রাট কাশ্মীর থেকে মাটি নিয়ে আসেন এবং এই মাটিতে উৎপন্ন হয় আঙ্গুর।[১৩৯১] একইভাবে লাহোরের ৫ কি. মি. উত্তর-পূর্ব দিকে শাহজাহান স্থাপন করেন বিখ্যাত ও চিত্তাকর্ষক শালিমার উদ্যান বা আনন্দ ভবন যা দৈর্ঘ্যে ১২০০ কদম এবং প্রস্থে ৮০০ কদম।

শাহজাহানের অন্যতম প্রিয় পত্নী ইজু-উন্নেসা আরেকটি শালিমার উদ্যান স্থাপন করেন শাহজাহানাবাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাডলি সরাইয়ের নিকটে। এসব এবং এমন ধরনের অন্যান্য উদ্যানে রাজপরিবারের বেগম ও শাহজাদিরা একদল যৌবনোন্মুখ অবিবাহিতা কুমারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শীতকালে রোদ পোহাতেন এবং গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতেন। তাঁরা বিচরণ করতেন প্রাকৃতিক মুক্ত বাতাসে পরিপূর্ণ খোলা জায়গাতে চমৎকার অবসরপূর্ণ পরিবেশে। তাঁরা বাগানে বাগানে পদচারণা করতেন যেখানে সকল প্রকার ফুল প্রস্ফুটিত হতো এবং বিশাল আকৃতির আম, জাম, নিম ও পিপলের

১৩৮৮. ওয়েস্ট ব্রুক প্রণীত 'দিওয়ান জীবন নিসা', পৃষ্ঠা ৯.

১৩৮৯. Manucci, II. pp. 352-53.

১৩৯০. এস. এম. লতিফ লাহোরে এই সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন নিদর্শনের কথা বলেন, পৃষ্ঠা- ১৪১.

১৩৯১. Lahori. I, pt. II. p. 241.

www.pathagar.com

গাছ একাকার হয়ে ছায়াযুক্ত আশ্রয়স্থান প্রদান করত এবং কোয়েল ও কোকিল সারাদিন ধরে গাইত শান্তিপূর্ণ সুরে। এখানে উত্তরের জনপদ পাঞ্জাব, কাশ্মীরের পাহাড়ি এলাকা ও কাবুলের উপত্যকার গান গাইত পরিচারিকাবৃন্দ এবং রাজকীয় আগন্তুকদের বিনোদনের জন্য পল্লী এলাকার নৃত্য অনুষ্ঠিত হতো।[১৩৯২] যখন দাসী মেয়েরা অভিনয় ও সঙ্গীত পরিবেশন করত তখন তার প্রতি মনোযোগবিহীনভাবে সময় কাটত।[১৩৯৩] রাজপরিবারের বেগমরা ধাবমান জলরাশির সঙ্গীত শ্রবণ করতেন মর্মরপাথর নির্মিত ছোট নিভৃতাবাসে ফুলের বিছানায় হেলান দিয়ে এবং প্রায়ই কানামাছি খেলে আনন্দ উপভোগ করতেন। সঙ্গীত ছিল কিছুসংখ্যক ব্যক্তির কাছে মাংসতুল্য এবং অন্যদের জন্য ঔষধতুল্য। যুবতি মেয়েরা অতিযত্নে গান গাইত এবং মনোযোগের সঙ্গে অন্যদের গান শুনত। জশন-ই-মাহতাবি উপলক্ষে সমগ্র পরিবেশকে স্বর্গীয় সুষমায় শুভ্র ও আরামদায়ক করা হতো। জ্যোৎস্না রাতে তারা সকলে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করত। গালিচা, পেয়ালা, মোমবাতি, পাখা সব কিছুই সাদা রঙের হতো যাতে সমগ্র পরিবেশ সম্বন্ধে স্বর্গীয় অনুভূতি বজায় থাকে।

এগুলো ছিল কম-বেশি নিয়মমাফিক বিনোদন। যুবতি মহিলারাও উপভোগ করত জন্মদিনের উৎসব, মক্তব (বিদ্যারম্ভের অনুষ্ঠান), আকিকা (চূড়াকরণ সংস্কার) ও বিবাহ অনুষ্ঠান। মোঘল হেরেমের বিশাল পরিসরে এ ধরনের প্রায় অসংখ্য অনুষ্ঠান হতো। হিন্দু ও মুসলমান উভয় রীতির উৎসব উদ্‌যাপিত হতো। ঈদ-ই মিলাদ বা নবী সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে ভোজ, শবেবরাত, মহানবীর মেরাজ, ঈদুল ফেতের রমজানের দীর্ঘ সময়ের রোজা ভাঙ্গা উপলক্ষে অনুষ্ঠান, ঈদ-উল-জ্জোহা- কুরবানীর উৎসব এবং পারস্যের ঐতিহাসিক ও বিদেশি পর্যটকদের দ্বারা উল্লেখিত অন্য অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হতো। একইভাবে অনুষ্ঠিত হতো দশোরা, দিওয়ালি, হোলি, রাখী বন্ধন এবং বসন্ত উৎসব।[১৩৯৪] হেরেমের মহিলারা এ ধরনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করতেন এবং উৎসবের স্থানটিকে শোভিত করার কাজে সাহায্য করতেন। এসব অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল আলোকসজ্জা, আতশবাজি, পর্যাপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, হীরা ও অলংকারের প্রদর্শনী। একই রকম আয়োজন করা হতো নওরোজ, খোশরোজ এবং সম্রাট ও শাহজাদাদের ওজন নির্ণয় অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে প্রাধান্য লাভ করত হেরেমের বাসিন্দাদের আবেগপূর্ণ অংশগ্রহণে।

১৩৯২. Latif, op. cit. pp. 140-41.
১৩৯৩. মহারানি সুনীতি দেবী কর্তৃক প্রণীত 'সুন্দরী মোঘল শাহজাদিগণ', পৃষ্ঠা-২.
১৩৯৪. আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬.

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনে মোঘল নারীদের অবদান

মোঘল হেরেমের রাজকীয় জীবন ও প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মোঘল যুগের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। এটা ছিল ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সর্বাধিক গৌরবময় স্বর্ণযুগ। মোঘল সম্রাজ্যে কৃষি, অভ্যন্ত রীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্র, ব্যাংকিং ও মুদ্রা প্রচলন ক্ষেত্রসহ সর্বত্র উন্নতি দেখা যায়। মোঘল যুগের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিরা আলোচনা ও লেখালেখি করেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে মোঘল সম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে মোঘল নারীদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, যা ভারতের ইতিহাসে অসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে।

(ক) সমুদ্রপথে বাণিজ্য

মোঘল সম্রাটগণ বিশেষত সামুদ্রিক বাণিজ্যসহ সামগ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ পোষণ করতেন। বাণিজ্যিক জাহাজের পাশাপাশি মোঘল সম্রাটদের মালিকানাধীন সমুদ্র বাণিজ্যে ব্যবহার্য জাহাজও ছিল। এ ক্ষেত্রে আকবর খুব আগ্রহী ছিলেন। জাহাঙ্গীরেরও নিজস্ব জাহাজ ছিল এবং সেগুলো সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত। যখন সম্রাট শাহজাহান যুবরাজ খুররম পরিচয়ে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তখন তিনি প্রশস্ত মাপের বস্ত্র, টেক্সটাইল, গঁদ, নীল ও তামাকের উচ্চ লাভজনক ব্যবসায় করতেন এবং সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেও এই ব্যবসায় চালিয়ে যান।[১৩৯৫] লোহিত সাগরের লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয় যুবরাজ খুররম ও ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘাত ক্ষেত্রে।[১৩৯৬] এ রকম বিকাশশীল ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিরাজমান পরিবেশে এটা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, এর পাশাপাশি মোঘল

১৩৯৫. জগদীশ নারায়ণ সরকার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সঞ্চয়', (কলিকাতা, ১৯৮৭), পৃষ্ঠা ২২৮.

১৩৯৬. Ibid., পৃষ্ঠা ২২৮.

www.pathagar.com

সম্রাটগণ, মোঘল রাজকীয় মহিলাগণ, তাঁদের আত্মীয় ও আমিরগণ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন এবং মোঘল আমলের অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে অংশগ্রহণ করেন সক্রিয়ভাবে। যদিও মোঘল হেরেমের খুব বেশিসংখ্যক রাজকীয় মহিলা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেননি তথাপি জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম-উজ-জামানি, নূরজাহান বেগম এবং শাহজাহানের কন্যা শাহ্জাদী জাহানারার মতো বিখ্যাত মহিলারা তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।

আরো কয়েকজন ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অবদান রাখেন।

(খ) বাণিজ্যে মোঘল নারীদের অংশগ্রহণ

রাজকীয় মোঘল মহিলাগণ নির্মাণ করেন হাট বাজার যেখানে প্রচুর ক্রয় বিক্রয় হতো, পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নির্মাণ করেন সরাইখানা এবং তাঁদের মালিকানায় ছিল তাদের পক্ষে সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যে রত জাহাজ। এসব জাহাজ সুরাট ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলোর মধ্যে চলাচল করত। এগুলো ছিল বিভিন্ন রকমের– ৪০০ থেকে ১৫০০ টনের তীর্থযাত্রী বহনকারী জাহাজ ও চীন দেশীয় মডেলের চ্যাপ্টা তলাবিশিষ্ট পালতোলা খসড়া হিসাবে ৩০ থেকে ৪০০ টনের নৌকার মতো[১৩৯৭]। মোঘল নারীরা ছিলেন বিশাল জায়গিরের মালিকা যার রাজস্ব তাঁরা লাভ করতেন। যেহেতু এ সমস্ত জায়গিরের মালিকানা অর্জন বলতে তাঁদের প্রচুর উপার্জন বোঝায় সেহেতু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, এসব জায়গিরের অর্থনৈতিক আয় বৃদ্ধির জন্য তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা করেছেন।

এমনকি পরোক্ষভাবেও মোঘল সম্ভ্রান্ত নারীরা অবদান রেখেছেন মোঘল যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে। মোঘল হেরেমের প্রয়োজনে ও চাহিদায় রাজকীয় কারখানা এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক কলকারখানায় অনুপ্রেরণা জোগাত। তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা পূরণের জন্য আনা হতো তাঁদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। টেক্সটাইল সম্বন্ধে কথা বলার শুরুতে এ কথাও আমাদের ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে যে, হেরেমের মোঘল মহিলারা তুলা, রেশম বা পশমের সবচেয়ে মিহি উপাদানে তৈরি দামি কাপড় পরিধান করতেন। তাঁদের পোশাকে ব্যবহৃত মসলিন ছিল তিন প্রকার– আবে রাওয়ান (প্রবাহমান জলরাশি), বাফ্ত হাওয়া (বুননকৃত বাতাস) ও শবনম (সান্ধ্য শিশির)।[১৩৯৮] শবনম নামক মসলিন বস্ত্র ঢাকাই মলমল নামে বিখ্যাত ছিল

১৩৯৭. জগদীশ নারায়ণ সরকার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সঞ্চয়', পৃষ্ঠা-১৯৩.

১৩৯৮. কে. এস. লাল কর্তৃক রচিত মোঘল হেরেম, (নিউ দিল্লি, ১৯৮৮) পৃষ্ঠা- ১২২.

www.pathagar.com

এবং তা আসত ঢাকা থেকে। পোশাক তৈরির জন্য মোঘল নারীদের রেশমপ্রীতির ফলে চীন ও পারস্যের মতো ভিন্ন দেশ থেকে এবং বেনারস, বাংলা ও উড়িষ্যার মতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর রেশম আমদানি করা হতো। মোঘল মহিলাদের দ্বারা ব্যবহৃত অন্য কয়েকটি সুবিদিত পোশাক হলো রেশমি বস্ত্র, কিমখাব, কাতান, তসর, তাফতা, আম্বরি, এটলাস ইত্যাদি। মখমল নামে সাদামাটা ও বুটিদার শিল্পকর্ম শোভিত বস্ত্র ইউরোপ, শাসান, ইয়াদ, মাশাদ, হেরাত ও অন্য কয়েকটি স্থান থেকে আনা হতো।[১৩৯৯] নিপুণ পোশাক নির্মাতারা এসব রাজকীয় নারীদের জন্য সব উপাদান থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরি করত। এসব পোশাক সুন্দরভাবে শিল্পকর্ম শোভিত করত দক্ষ কারিগরগণ ।

১৩৯৯. কে. এস. লাল কর্তৃক রচিত 'মোঘল হেরেম', পৃষ্ঠা-১২৩.

www.pathagar.com

মিহি কাপড় ও সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও মোঘল নারীরা গহনা ও তাঁদের প্রাসাদে প্রয়োজনীয় অলংকার সামগ্রী, আসবাবপত্র, আয়না, কাপড়ের পাড়, গালিচা, জুতা ও চটি, কাঁটা চামচ, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, শাল বস্ত্র ও অন্য অনেক সামগ্রী পছন্দ করতেন। এগুলোর মধ্যে অনেক সামগ্রী রাজকীয় কারখানাতে দক্ষ কারিগররা তৈরি করত, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কয়েকটি সামগ্রী বিদেশ থেকে আনা হতো। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, কাশ্মীর, ফতেপুর ও জৌনপুরে চমৎকার গালিচা তৈরি হতো, কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার গালিচা আনা হতো ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে।

যেহেতু বিদেশসহ অন্যান্য স্থান থেকে অনেক দ্রব্য আনা হতো, সেহেতু তা নিশ্চয়ই অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা সাহায্য করত। যাহোক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুব বেশিসংখ্যক মোঘল মহিলার আগ্রহ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আকবরের আমল পর্যন্ত হুমায়ুনের অন্যতম পত্নী হাজি বেগম ব্যতীত কোনো রাজকীয় মহিলার সাক্ষ্য আমরা পাইনি যিনি এক্ষেত্রে কোনো রকম অবদান রেখেছেন। হাজি বেগম ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির কাছে আরবীয় সরাই নামে ৩০০ লোকের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন।[১৪০০] এই হাজি বেগমই হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন দিল্লিতে। তাঁর দানশীল স্বভাবই ছিল এই অট্টালিকা নির্মাণের প্রেরণা। কিন্তু এর আগে ও পরে মোঘল আমলে সরাইখানা নির্মাণকাজ স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াত করত তীর্থযাত্রী এবং সেই সাথে ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে ব্যবসায়-বাণিজ্য জোরদার করার প্রক্রিয়াকে। এ ধরনের নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ব্যবসায়ীরা তাদের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে বেচাকেনার উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে চলাচল করতে পারত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। মোগল শাসনকালে সম্রাট ও রাজপরিবারের অন্য সদস্যরাও সেই সাথে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা জনহিতকর বলে সরাইখানা নির্মাণ কাজ সম্পাদন করেন।

(গ) সমুদ্রপথের বাণিজ্যে যোধবাঈ এর অংশগ্রহণ

মরিয়ম-উজ-জামানি খেতাবে ভূষিত আকবরের স্ত্রী ও জাহাঙ্গীরের মা যোধবাঈ তাঁর সমকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব আগ্রহী ছিলেন এবং তিনিই প্রথম রাজকীয়

১৪০০. এস. কে. ব্যানার্জি কর্তৃক সম্পাদিত হুমায়ুন বাদশাহ (কলিকাতা;১৯৮৩), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭; এন্টনি মুনসিরেটের টীকায় জে.এস. হল্যান্ডের অনুবাদ (লন্ডন, কলিকাতা ইত্যাদি, ১৯২২), পৃষ্ঠা-৯৬; জগদীশ নারায়ণ সরকার কর্তৃক রচিত 'মোঘল সঞ্চয়', পৃষ্ঠা-১১৫.

www.pathagar.com

মহিলা হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে এতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নিজস্ব জাহাজ ছিল এবং সুরাট থেকে লোহিত সাগরের বিভিন্ন বন্দরে তেজি ব্যবসায় করতেন। তাঁর অন্যতম জাহাজ ছিল সুরাটের বিখ্যাত রাহিমি।[১৪০১] এই জাহাজটি মক্কা বা মক্কার জেদ্দা বন্দরে প্রায় ১৫০০ জন যাত্রী ও তীর্থযাত্রী বহন করে নিয়ে যেত। জন জর্ডিয়ান এটাকে রেহেমি বলে অভিহিত করেছেন।[১৪০২] কখনো কখনো বিদেশিরা এটাকে রিমি নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪০৩] জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতে অবস্থানরত অনেক বিদেশি উল্লেখ করেছেন রানিমাতা মরিয়ম-উজ-জামানির জাহাজগুলো এবং ভারত ও আরবের মধ্যে তেজি ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁদের বিবরণীতে। উইলিয়াম ফিন্স লিখেন যে, 'সম্রাটের মাতা বা তাঁর সুরক্ষায় কর্মরত অন্য ব্যক্তিরা ব্যাপক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং এ সময়ে তাঁর মালিকানাধীন একটি জাহাজ মক্কার উদ্দেশে ভ্রমণের জন্য বোঝাই করা হয়।[১৪০৪]

বায়ানাতে নীল ক্রয়ের জন্য প্রেরিত রানিমাতার ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের সাথে ফিন্সের অপ্রীতিকর ব্যবসায়িক আচরণের ফলে মোঘল রাজদরবারে ইংরেজ দূত হাকিন্সের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।[১৪০৫] বিদেশের শক্তিধর ব্যবসায়ীদের রাহিমিসহ রানিমাতার জাহাজগুলোর প্রতি দৃষ্টি ছিল। ইংরেজরা মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে তাদের ব্যবসায়ীদের ধৈর্যচ্যুতি ও অসুবিধা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য সেগুলো দখল করতে চেয়েছিল।[১৪০৬] ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজরা মক্কার উদ্দেশে গমনের জন্য একটি মালপত্র দ্বারা বোঝাই করা হবে এমন একটি জাহাজ দখলের কারণে মোঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।[১৪০৭] জাহাজটিতে মালপত্র ও যাত্রী ছিল এবং কোনো রকম উৎপীড়ন থেকে নিরাপত্তার জন্য জাহাজটিতে পর্তুগিজ স্বীকৃতিপত্র ছিল।[১৪০৮] মোঘলরা পর্তুগিজদের এই উদ্ধত আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। যখন

১৪০১. জগদীশ নারায়ণ সরকার কর্তৃক রচিত মোঘল ভারতের অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা, (দিল্লি-১৯৭৫) পৃষ্ঠা- ২৭৪.

১৪০২. উইলিয়াম ফস্টারের টীকায় জন জড়দাইন পত্রিকায় প্রকাশ (কেমব্রিজ, ১৯০৫), পৃষ্ঠাগুলো- ১৮৬, ১৯৪, ২০৯.

১৪০৩. নিকোলাস ডাউনটনের মতামত যদুনাথ সরকারের পর্যালোচনায় মোঘল ভারতের অর্থনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-২৭৫.

১৪০৪. উইলিয়াম ফিন্স কর্তৃক ফস্টারের ভারত ভ্রমণের প্রারম্ভে উল্লেখিত, পৃষ্ঠা-১২১৩.

১৪০৫. Ibid., পৃষ্ঠা-১২৩.

১৪০৬. জগদীশ নারায়ণ সরকার কর্তৃক রচিত মোঘল ভারতের অর্থনৈতিক জীবন পর্যালোচনা, পৃষ্ঠা- ২৭৪.

১৪০৭. ফিন্স কর্তৃক ফস্টারের ভারত ভ্রমণের শুরুতে, পৃষ্ঠা-১২৯.

১৪০৮. নিকোলাস উইদিংটন, ফস্টারের ভারত ভ্রমনের শুরুর উদ্ধৃতিতে, পৃষ্ঠা-১৯১.

www.pathagar.com

পর্তুগিজদের জাহাজটি ফেরত দেবার কোনো ইঙ্গিত না পাওয়ায় মুকারব খানকে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ ও পর্তুগিজ শহর দামান অবরোধ করে প্রতিশোধ গ্রহণের আদেশসহ পাঠানো হয়। একই সময়ে আগ্রাস্থ খ্রিষ্টীয় গির্জা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ধর্মযাজকদেরকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৃত্তি থেকে করা হয় বঞ্চিত।[১৪০৯] স্যার টমাস রোঁ তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণে মরিয়ম-উজ-জামানির কথা উল্লেখ করেন।[১৪১০] তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৬১৫ খৃস্টাব্দের ৭ জুন তারিখে যীশুইট জেভিয়ার, মুকাররব খান ও গঞ্জালো পিন্টোদা ফনসিকোর মধ্যস্থতায় একটি প্রাথমিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই মর্মে সমঝোতা হয় যে, তা মহান মোঘল সম্রাট ও ভাইসরয়ের কাছে পেশ করা হবে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে অনুমোদনের জন্য। অন্যান্য ব্যাপার ছাড়াও এতে সুরাট থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং এরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয় যে, যে সমস্ত পর্তুগিজদের দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) জেরাফিন্স মুদ্রার অংক হিসাব থেকে বাদ দিয়ে পর্তুগিজদের দ্বারা আটককৃত দ্রব্যাদির মূল্য বাবদ এবং পর্তুগিজরা তাদের দ্বারা গোয়াতে পোড়ানো একটি জাহাজের পরিবর্তে রানিমাতাকে উপহার দিবে একটি জাহাজ।[১৪১১] সমসাময়িক কালের লেখকদের বিবরণ জাহাঙ্গীরের মাতা যোধবাঈয়ের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের যথেষ্ট প্রমাণ দেয়। কিন্তু এটাও দেখা যাবে যে, মোঘল হেরেমের এসব গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় মহিলাদেরকে মোঘল সম্রাটগণ উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে সবচেয়ে ভালো বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান ও তাদের মালপত্র ও জাহাজ রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জাহাঙ্গীরের অন্যতম হিন্দু স্ত্রী জগৎ গোসাইন ও যোধপুরের রাজা উদয় সিংহের কন্যা তথা পরবর্তীকালে শাহজাহান নামে পরিচিত যুবরাজ খুররমের মা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান না রাখলেও কথিত আছে যে, তিনি সোহাগপুরা নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাঁর প্রাসাদ ও সমাধিসৌধের ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায়। এটি ছিল কাচের রেশমি চুড়ি তৈরির একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং এই রেশমি চুড়ি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অবিবাহিত ও বিবাহিতদের দ্বারা তা খুব শুভকর বলে বিবেচিত হতো।[১৪১২]

১৪০৯. Ibid., পৃষ্ঠা-১৯২.

১৪১০. উইলিয়াম ফস্টার, টমাস রোঁর ভারত দূতাবাসের উল্লেখ (লন্ডন, ১৯২৬), পৃষ্ঠাগুলো-৩৮৭-৩৮৮.

১৪১১. Ibid., পৃষ্ঠা-৭৪.

১৪১২. কবির কাউসার ও এনামুল কবির কর্তৃক প্রণীত বিখ্যাত মুসলিম নারীদের জীবনীমূলক অভিধান (নিউ দিল্লি: ১৯৮২), পৃষ্ঠা-১৫১.

www.pathagar.com

(ঘ) নূরজাহান বেগমের বাণিজ্যিক কার্যাবলি

জাহাঙ্গীরের মা ছাড়া এবং জাহাঙ্গীরের মায়ের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় তার শেষ স্ত্রী নূরজাহান তাঁর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। শিল্পকলা, স্থাপত্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নূরজাহানের অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবিক এবং তা পরিমাণ গতভাবে সম্ভবত শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা ব্যতীত অন্য যেকোনো মোঘল মহিলার চেয়ে বেশি। তাঁর শাশুড়ি যোধাবাঈয়ের মতো তাঁর বাণিজ্যিক কার্যাবলি শুধু সামুদ্রিক বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাজার ও সরাইখানা নির্মাণের জন্য তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে এবং তাঁর নিজস্ব মালিকানাধীন জাহাজ মারফতে তিনি তেজিভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনা করতেন এবং এমনকি তাঁর নামে মুদ্রাও অঙ্কিত হতো। অন্য কোনো মুসলিম নারীর নামে মুদ্রা অঙ্কনের এই সুযোগ ছিল না। নূরজাহানের মুদ্রাগুলো ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং রাশিচক্রের বারোটি চিহ্ন মুদ্রায় অঙ্কিত থাকত।[১৪১৩] একটি মুদ্রায় একটি করে রাশির ছবি থাকত। এটা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই মুদ্রাগুলো দ্বারা কী পরিমাণ অর্থনৈতিক লেনদেন হয়েছিল? মানুচী এই মুদ্রাগুলোকে চলতি অর্থ বলে আখ্যায়িত করেন।[১৪১৪] কিন্তু পিলসার্ট বলেন যে, এই মুদ্রাগুলো চলতি অর্থ নয়।[১৪১৫] নূরজাহানের চারদিকে ছিল অসীম সম্পদ। জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি ছিলেন প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা আবর্তিত হতো তাঁকে ঘিরে। তাঁর সম্রাট পদে আসীন স্বামী কর্তৃক উদারভাবে প্রদত্ত সম্পদ ছাড়াও তাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অনুগ্রহ লাভে ইচ্ছুক অনেক ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি প্রচুর নজর বা উপহার লাভ করেন। আজমীর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রামসরের জায়গিরসহ নূরজাহানের ছিল বিশাল জায়গির।[১৪১৬] দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের বিজয় অনুষ্ঠানের একটি অংশরূপে জাহাঙ্গীর তাঁকে সুরাট ও আজমীরের বাণিজ্য পথে অবস্থিত আজমীর থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা রাজস্বের টোডা পরগনাটি প্রদান করেন।[১৪১৭] বেণীপ্রসাদের মতে, 'যদি তিনি মনসবদারদের শ্রেণিভুক্ত হতেন তবে তাঁর জায়গির তাঁকে ৩০,০০০ এর স্তরে মর্যাদা দান

১৪১৩. পিলসার্টের অভিযোগ মূরল্যান্ড ও গিলবার্ট কর্তৃক অনূদিত, পৃষ্ঠা-২৯.

১৪১৪. মানুচী রচিত স্টোরিয়া ভুমোগর, উইলিয়াম আরভাইনের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭.

১৪১৫. পিলসার্ট, পৃষ্ঠা-২৯.

১৪১৬. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরির অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪২.

১৪১৭. Ibid., ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮০.

www.pathagar.com

করত।[১৪১৮] কিন্তু নূরজাহান তাঁর মালিকানাধীন অর্থ নষ্ট করেছেন বলে কখনো জানা যায়নি। এই অর্থ দ্বারা তিনি অনেক দানকার্য সম্পন্ন করেন ও নির্মাণ করেন অনেক স্মৃতিসৌধ। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন।

১. সরাইখানা নির্মাণ

নূরজাহান বেগম সরাইখানাও নির্মাণ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সরাইখানা হলো জলন্ধরের নূরমহল সরাই। এই সরাইখানাটি ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে নির্মিত হয় এবং নূরজাহান এর যাবতীয় নির্মাণ খরচ বহন করেন।[১৪১৯] এই সরাইখানাটি জলন্ধরের ১৬ মাইল দক্ষিণে, সুলতানপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ও পালোরের ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই সরাইখানাটি ছিল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও তা বহু লোককে ধারণ করতে পারত। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় এই সরাইখানাটি সম্বন্ধে বলেছেন।[১৪২০] আগ্রার কাছে নূরমহল সরাই নামে আর একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। পিটার মানডি তাঁর বিবরণীতে এই সরাইখানাটি, সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর ধারণ ক্ষমতা দুই থেকে তিন হাজার লোক এবং ৫০০ ঘোড়া।[১৪২১]

২. হস্তশিল্প ও নকশ শিল্প

আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি পোশাক, টেক্সটাইল, গালিচা ও অলংকারের নকশা শিল্প সম্বন্ধে নূরজাহান বেগমের ভালো লাগা বিষয়াবলি, প্রতিভা ও অলংকারের নকশা শিল্প সম্বন্ধে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবন অবশ্যই কারিগরদেরকে বিশেষত এ ধরনের কাজে উৎসাহিত করেছে। তাঁর আমলে তাঁর প্রেরণায় আগ্রাতে কিনারি বাজার নামে একটি পরিপূর্ণ বাজারের অস্তিত্ব ছিল যেখানে কারিগররা কিমখাব টেক্সটাইল তৈরির কাজে নিয়োজিত ছিল। তাঁর অনুপ্রেরণায় ও নব নব উদ্ভাবনে পোশাক তৈরি, গালিচা তৈরি ও গহনা তৈরির শিল্প আরও উজ্জীবিত হয়। এসব শিল্প কারখানায় আরো বেশি দক্ষ কারিগর কর্মসংস্থান লাভ করে।

১৪১৮. বেণী প্রসাদ কর্তৃক রচিত জাহাঙ্গীরের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৯৪.

১৪১৯. ই, বি, ফাইন্ডলী কর্তৃক রচিত মোঘল ভারতের সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (নিউইয়র্ক: ১৯৯৩), পৃষ্ঠা-২২৯.

১৪২০. তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরির অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো-১৯২, ৩৩৮.

১৪২১. পিটার মানডির এশিয়া ভ্রমণ থেকে আর সি ট্যাম্পল কর্তৃক উল্লেখ (কেমব্রীজ ১৯০৭-৩৬), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৭৮-৭৯.

www.pathagar.com

নূরজাহান বেগম ব্যাপক উদ্দীপনার সাথে বিদেশের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর ছিল বেশ কিছুসংখ্যক জাহাজ। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে কাজকর্মে তাঁর প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন তাঁর ভাই আসফখান।[১৪২২] তাঁর প্রধান জাহাজগুলো সুরাট ও আরব সাগরের উপকূলের মধ্যে যাতায়াত করত। নূরজাহান বেগম একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মোঘল ও পর্তুগিজদের মধ্যকার প্রতিশোধ উত্তেজনা তাঁর জাহাজগুলোকে বিদেশে মালপত্র নেওয়ার কাজে বাধা প্রদান করবে। তাই তিনি যাতে তাঁর দ্রব্যসামগ্রী ইংরেজদের জাহজে করে পাঠাতে পারেন এ জন্য ইংরেজদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাতেন।[১৪২৩] টমাস রো ও জন ফ্রাইয়ারের মতে, এই মুহূর্তে ২১তম নূরমহলের নামাঙ্কিত বিজ্ঞপ্তিটি এলো একজন ভৃত্য আসফখানের কাছ থেকে যাতে বলা হয়েছে তিনি (নূরমহল) সম্রাটের কাছে আবেদন করেছিলেন আর একটি ফরমানের জন্য এবং তিনি তা লাভ করেছেন এবং তিনি প্রস্তুত রয়েছেন তাঁর ভৃত্যকে সেই ফরমানসহ পাঠাতে এবং আমরা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি তা দেখতে। তিনি দেখবেন যেন আমাদের প্রতি কোনো অন্যায় করা না হয়।[১৪২৪] নূরজাহানের দ্বারা পরিচালিত বৈদেশিক বাণিজ্যে নীল ও বুটিদার শিল্পকর্ম শোভিত বস্ত্র ছিল প্রধান উপকরণ।[১৪২৫] নূরজাহান বেগম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আগ্রার যমুনা নদী দিয়ে আগ্রাতে নির্মিত কিছুসংখ্যক দ্রব্য দেশের অন্যান্য অংশে পাঠানো হতো এবং একইভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের অনেক সামগ্রী এই পথে আগ্রাতে আসত। পিলসার্ট তাঁর বিবরণে আগ্রা নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন যে, সেখানে নূরজাহান বেগমের অফিস রয়েছে এবং নদীপথে জাহাজযোগে পাঠানোর আগে এসব দ্রব্য এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে উৎপাদিত অন্যান্য অসংখ্য প্রকার শস্য, মাখন, ও দ্রব্যের শুল্ক আদায় করা হতো এবং দ্রব্যাদি আমদানি করা হতো একইভাবে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে।[১৪২৬] ডিলেট ও সিকান্দ্রাতে তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেন, 'এখানে পূর্ব বাংলা, পূরবেট ও ভুটান থেকে সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী আনা হয় এবং নদীপথে পরিবহন করার আগে এসব পণ্যসামগ্রীর জন্য শুল্ক পরিশোধ করা হয়।[১৪২৭]

১৪২২. ডি. প্যান্ট কর্তৃক রচিত মোঘলদের বাণিজ্যিক কৌশল (মুম্বাই: ১৯৩০), পৃষ্ঠা-১৬৬.

১৪২৩. Ibid.. পৃষ্ঠা-১৬৫.

১৪২৪. জন ফ্রাইয়ার কর্তৃক উল্লেখিত টমাস রোঁর সপ্তদশ শতকে ভারত ভ্রমণ (লন্ডন:১৮৭৩), পৃষ্ঠা-১৪৪.

১৪২৫. ডি. প্যান্ট কর্তৃক রচিত মোঘলদের বাণিজ্যিক কৌশল (মুম্বাই: ১৯৩০), পৃষ্ঠা-১৬৫.

১৪২৬. পিলসার্ট, পৃষ্ঠা-৪.

১৪২৭. জে.এস হাইল্যান্ড কর্তৃক অনুবাদ ডিলেট এর বিখ্যাত মোঘল সম্রাজ্য (নিউ দিল্লি: ১৯৭৪ পুনঃ মুদ্রণ), পৃষ্ঠা-৪১.

www.pathagar.com

(ঙ) জাহানারা বেগমের বাণিজ্যিক কার্যাবলি

শাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা ছিলেন একমাত্র মোঘল রাজকীয় মহিলা যিনি সাগ্রহে সক্রিয়ভাবে ও সর্বান্তকরণে তৎকালীন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেন।

জাহানারার মা ও শাহ্জাহানের প্রিয় পত্নী মমতাজমহল যদিও রাজদরবার ও অন্দরমহলের একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন তবুও তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর নাম অনুসারে একটি সমৃদ্ধিশালী ও উন্নয়নশীল মমতাজাবাদ নামক স্থান রয়েছে, যা শাহজাহান তাঁর অকালমৃত্যুর পরে তাঁর নামকে অমর করার জন্য নির্মাণ করেন। ১৬৩১ সাল থেকে ১৬৪২ সালের মধ্যে ১২ বছর সময়ে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে মমতাজাবাদ শহরটি নির্মাণ করা হয় এবং এই শহরে অনেক দালান ছাড়াও ছিল অনেক বাজার ও সরাইখানা।[১৪২৮] বেসরকারি ব্যবসায়ীরাও এখানে সরাইখানা ও দালান নির্মাণ করেন। কিন্তু এই শহরে মমতাজমহলের নাম ছাড়া অন্য কোনো অবদান নেই। কালক্রমে মমতাজাবাদ শহরটি পুরাতন আগ্রার সাথে একীভূত হয়ে যায়। কিন্তু মমতাজাবাদের দালানগুলোর মধ্যে তাজমহল নামক মমতাজমহলের সমাধিসৌধটি এখনো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শাহজাহানের একজন উপপত্নী আকবরাবাদী মহল একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়।[১৪২৯] কিন্তু সেই সময়ে একমাত্র জাহানারা বেগমই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যাপকভাবে অবদান রাখেন।

(১) সরাইখানা, জায়গির ও বন্দর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব

রাজকুমারী জাহানারা বেগমের সরাইখানা বা বেগম সরাই নামক দূরের যাত্রীর জন্য বিখ্যাত সরাইখানাটি নির্মাণ করেন। এটা নির্মিত হয় দিল্লিতে এবং মানুচী, বার্নিয়ার, ট্যাভারনিয়ার ও থিভিনট তাঁদের বিবরণে বলেছেন এর সম্বন্ধে। এর মধ্যে রাতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল পর্যাপ্ত নিরাপত্তার। কথিত আছে যে, এই সরাইখানা ধনী পারস্য দেশীয়, উজবেক ও অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীর জন্য নির্মিত হয়।[১৪৩০] সিপাহি বিদ্রোহের পরে বেগম সরাইটি ধ্বংস করা হয়।[১৪৩১] নিঃসন্দেহে দিল্লির

১৪২৮. কে.এস. লাল কর্তৃক রচিত মোঘল হেরেম, পৃষ্ঠা-৮৫.

১৪২৯. মহেশ্বর দায়ল কর্তৃক প্রণীত দিল্লিতে শাহজাহানাবাদের গল্প পুনঃ আবিষ্কার (নিউ দিল্লি; ১৯৮২), পৃষ্ঠা-৭১.

১৪৩০. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠাগুলো- ২৮০-৮১; মানুচী রচিত স্টোরিয়া ডু মোগর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২১.

১৪৩১. বার্নিয়ার, পৃষ্ঠা-২৮.

www.pathagar.com

পথে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদেরকে এই সরাইখানাটি উৎসাহিত করত। শাহ্জাদি জাহানারা নূরজাহান বেগমের মতো সরাইখানা ও বাজার নির্মাণ করেন, সমুদ্রপথের বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং মোটের ওপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে আগ্রহান্বিত হন। নূরজাহান বেগমের মতো তিনি ছিলেন অনেক জায়গিরের মালিকা। তাঁর স্নেহময় পিতা তাঁকে প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত উপহার ছাড়াও তিনি সেই জায়গির থেকে পেতেন রাজস্ব। তাঁর কয়েকটি জায়গিরের নাম হলো পানিপথ,[১৪৩২] আচ্চল,[১৪৩৩] বাচ্চল,[১৪৩৪] শফিপুর,[১৪৩৫] দোহরাহা[১৪৩৬] ও ফারজাহারা।[১৪৩৭] বিকাশশীল সুরাট বন্দরের রাজস্ব শাহজাদিকে দেওয়া হতো পানের খরচের জন্য, যা তিনি তাঁর সমগ্র রাজকীয় বাসভবনে সরবরাহ করতেন এবং দোহরাহা সরকারের রাজস্ব তাঁকে দেওয়া হতো বাগানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।[১৪৩৮] পানিপথের পরগনাটি তাঁকে বছরে এক কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করত।[১৪৩৯] যেহেতু শাহজাদি জাহানারা তাঁর পিতার শাসনব্যবস্থায় বিরাট প্রভাব রাখেন সেহেতু অনেক লোক এমনকি বিদেশিরা মূল্যবান উপহার প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন। ওলন্দাজরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর মধ্যস্থতা কামনা করত।[১৪৪০] ইংরেজরাও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত প্রশস্ত কাপড়, বুটিদার, শিল্পকর্ম শোভিত কাপড়, আয়না, সুগন্ধি তেল, দেরাজ ইত্যাদি উপহারের মাধ্যমে।[১৪৪১] ট্যাভারনিয়ার শাহজাদিকে উপহার প্রদানের কথা তাঁর বিবরণে বলেছেন।[১৪৪২]

১৪৩২. বিগনী ও দেশাই কর্তৃক অনূদিত এনায়েত খানের শাহজাহাননামা (দিল্লি; ১৯৯০), পৃষ্ঠা-৪৪৭; সালেহ কম্বো, আমূল-ই-সালেহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৯.

১৪৩৩. লাহোরী কর্তৃক রচিত 'বাদশাহনামা' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২, ৫১; ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২০৯; কাজইউনির 'পাদশাহনামা', পৃষ্ঠা-৬২৬.

১৪৩৪. লাহোরী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১; ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২০৯; কাজইউনির 'পাদশাহনামা', পৃষ্ঠা-৬২৬.

১৪৩৫. লাহোরী ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪২৬.

১৪৩৬. Ibid., ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৫১; ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা-২০৭.

১৪৩৭. Ibid., ২য় খণ্ড ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৫৮২.

১৪৩৮. মানুচী রচিত স্টোরিয়া ডুমোগর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাগুলো- ৬৭, ২১৬.

১৪৩৯. Ibid., পৃষ্ঠা-২১৬.

১৪৪০. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৫১-১৬৫৪), পৃষ্ঠাগুলো-১১,১২,৫০, (১৬৪৬-১৬৫০), পৃষ্ঠাগুলো-২১৯-২০.

১৪৪১. Ibid., (১৬৪৬-১৬৫০), পৃষ্ঠা-৩০৪.

১৪৪২. ট্যাভারনিয়ারের ভারত ভ্রমণ অনুবাদ (লন্ডন: ১৮৭৩), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪১.

www.pathagar.com

২. বৈদেশিক বাণিজ্য

জাহানারা বেগম সক্রিয়ভাবে বৈদেশিক ব্যবসায় পরিচালনায় তাঁর ধনসম্পদ বিনিয়োগ করতেন এবং তা থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করতেন। তিনি ছিলেন বহুসংখ্যক জাহাজের মালিক এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সাথে স্থাপন করেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁদের সহযোগিতা তাঁকে সাহায্য করে ব্যাপকভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য করতে ও প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে।[১৪৪৩] মানুচীর মতে, তাঁর মূল্যবান পাথর ও গহনাদি ছাড়া তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।[১৪৪৪] বেগম সাহেবের নাম অনুসারে জাহানারা বেগমের সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত জাহাজের নাম ছিল সাহেবি যা ছিল জাহানারা বেগমের জনপ্রিয় খেতাব। এটা বেগম কর্তৃক নির্মিত হয় সুরাটে যেখান থেকে জাহাজটি চলাচল করত। সাধারণত সম্রাট স্বয়ং নিয়োগ করতেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিক দল ও দারোগা এবং মুনশিরিটের মতো অন্যান্য কর্মচারীকে। কিন্তু শাহজাদী জাহানারা একবার তাঁর জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকদল নির্বাচনের বিষয়টি ছেড়ে দেন তার সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর। কিন্তু পরবর্তী বছর তার জাহাজের দারোগাকে নিজেই নিয়োগ করেন এবং এই পদটি মোহাম্মদ রাফিকে দেওয়া হয়।[১৪৪৫] এই সাহেবি নামক জাহাজটি শাহজাদি জাহানারা কর্তৃক ব্যবহার করা হতো মুনাফার জন্য এবং হজযাত্রীদেরকে সাহায্য করতে।[১৪৪৬] ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ নভেম্বর প্রথম সমুদ্র যাত্রায় সাহেবি নামক জাহাজটিকে সংরক্ষিত করা হয় মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য। জাহানারা বেগম এই আদেশ দেন যে, প্রতিবছর যেন জাহাজটি দ্বারা পরিবহন করে ৫০ কোনি চাউল মক্কার দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠানো হয়। হজযাত্রীদের কাছ থেকে কোনো জাহাজ ভাড়া নেওয়া হতো না। কিন্তু তাদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হতো যেন তারা তাদের নামে অন্য ব্যবসায়ীদের দ্রব্যসামগ্রী বহন না করে।[১৪৪৭] ব্যবসায়ীদেরকেও তাদের মালপত্র নিয়ে জাহাজটিতে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হতো। যদিও তাদের কাছ থেকে

১৪৪৩. ইংরেজ কারখানা নথিপত্র (১৬৪২-১৬৪৫), পৃষ্ঠা-১৪৮; (১৬৪৬-১৬৫০), পৃষ্ঠাগুলো-২১৯-২০; (১৬৫১-১৬৫৪), পৃষ্ঠাগুলো-১১, ১২, ৫০.

১৪৪৪. মানুচী রচিত স্টোরিয়া ডুমোগর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৬.

১৪৪৫. শিরিন মুস্তভি ভারতীয় ঐতিহাসিক সভায় বলেন সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ পাঁচ বার সুরাট বন্দরে মোঘল জাহাজ ভিড়ে। (কলিকাতা: ১৯৯০), পৃষ্ঠাগুলো- ৩০৯, ৩১৩.

১৪৪৬. Ibid.. পৃষ্ঠা-৩১২.

১৪৪৭. শিরিন মুস্তভির মতে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে সুরাট বন্দরে মোঘল জাহাজ ভিড়ে। পৃষ্ঠা-৩১২.

www.pathagar.com

সংগৃহীত ভাড়ার অর্থ দেওয়া হতো ভিক্ষুকদেরকে। এই জাহাজে পরিবহনকৃত শাহজাদি জাহানারার পণ্য সামগ্রীর মূল্য ছিল ১০ থেকে ১৫ লক্ষ রুপি। সাধারণত পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়া হতো জেদ্দাতে। জাহাজের ভাড়াও শাহজাদির পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব ছিল জাহাজের কোষাধ্যক্ষের। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দেওয়া হতো জেদ্দা থেকে তাঁর পক্ষে যতগুলো সম্ভব ঘোড়া কিনে আনতে। জানা যায় যে, সাহেবি নামক জাহাজটি চলাচল করেছে ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।[১৪৪৮] গুনজাওয়ার নামক অন্য যে জাহাজটি মূলত শাহজাহানের মালিকানাধীন ছিল তা ১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাহানারাকে দেওয়া হয় যন্ত্রপাতি, জাহাজের মূল্যবান সামগ্রী ঔষধ ও উপকরণ সমেত। এই জাহাজটিও চলাচল করত সুরাট থেকে ।[১৪৪৯]

৩. বাজার নির্মাণ

একটি লাহোরে ও আর একটি দিল্লিতে প্রসিদ্ধ বাজার নির্মাণের কৃতিত্ব অর্পণ করা হয়েছে জাহানারা বেগমকে। এই বাজারগুলো ঐ শহরগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। যেখানে বিদেশের বণিকরাও তাদের পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসত। লাহোরে জাহানারা বেগম চক সরাই বাজারের ইমারতের পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান করেন।[১৪৫০] ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দিল্লিতে চাঁদনি চকও ছিল শাহজাদি জাহানারার অবদান।[১৪৫১] এটা দিল্লির লাল দুর্গের লাহোর তোরণের বিপরীতে অবস্থিত। নিকটবর্তী আলী মর্দান খালের পানি দ্বারা প্রবহমান একটি ছোট জলাশয় ছিল চাঁদনি চকের কেন্দ্রস্থলে।[১৪৫২] চাঁদনি রাতে সমগ্র স্থাপনা ও জলাশয়টি থেকে নির্গত রুপালি চাঁদের ঝিকিমিকি আলোর জন্য স্থানটির নাম হয় চাঁদনি চক। চাঁদনি চকের প্রত্যেক প্রান্তে ছিল একটি সুন্দর অলংকৃত দরজা। মোঘলদের আমলে চাঁদনি চক ছিল একটি বিখ্যাত ও বিকাশশীল বাণিজ্য কেন্দ্র। সেখানে হিন্দুস্তানের সকল অঞ্চল এবং বিদেশ থেকেও আসত ব্যবসায়ীরা। প্রত্যেকটি দোকানে ছিল বিশেষ ধরনের সামগ্রী। সেখানে ছিল চমৎকার ও বিরল রত্ন এবং মুক্তার বা গহনা বিক্রয়ের দোকান। সেখানে সবচেয়ে পছন্দনীয় আফগানিস্তান ও

১৪৪৮. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো- ৩১২-৩১৩.

১৪৪৯. Ibid., পৃষ্ঠা-৩১১.

১৪৫০. আমল-ই-সালেহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭.

১৪৫১. Ibid..

১৪৫২. মহেশ্বর দায়ল কর্তৃক প্রণীত দিল্লিতে শাহজাহানাবাদের গল্প পুনঃ আবিষ্কার, পৃষ্ঠা-১৫.

www.pathagar.com

কাশগরের ফল বিক্রয়ের একাধিক দোকান ছিল। কতকগুলো দোকানে চমৎকার মদ, কতকগুলো দোকানে অলংকারযুক্ত হুকা এবং কতকগুলো দোকানে সাজসজ্জার উপকরণ বিক্রি হতো। এমনকি বিভিন্ন রকমের পাখি ও পোষা প্রাণী বিক্রয়ের দোকানও ছিল সেখানে। এখানে বিক্রীত অনেক জিনিসই ছিল দুর্লভ ও মূল্যবান। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই কেনাকাটার জন্য চাঁদনি চকে আসতেন।[১৪৫৩] আজও চাঁদনি চক রাজধানী দিল্লির অন্যতম ব্যস্ততম বাণিজ্য কেন্দ্র।

আওরঙ্গজেবের আমলে রাজকীয় মহিলাদের অর্থনৈতিক অবদান

সরাইখানা নির্মাণ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী কোনো রাজকীয় মহিলা ছিলেন না বলে মনে হয়। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় কন্যা দানশীলা জিনাত-উন-নিসা বেগম গরিব পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নির্মাণ করেন চৌদ্দটি সরাইখানা।[১৪৫৪] এর পরে আওরঙ্গজেবের স্ত্রী নওয়াব বাঈ ফরদাপুরে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন বলে কথিত আছে।[১৪৫৫] এই দুইজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ব্যতীত অন্য কোনো রাজকীয় মোঘল নারী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন কিনা তা বলা কঠিন। বাবর থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত মোঘল মহিলাদের বাণিজ্যিক আগ্রহের বিষয়, কার্যাবলি ও অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জরিপে প্রকাশ পায় যে, এমনকি অর্থনীতির জটিল ক্ষেত্রে সেই যুগের রাজকীয় মহিলারা যদি এগিয়ে এসে থাকেন ও অংশগ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁরা তা করেছেন সক্রিয়ভাবে ও প্রচুর আগ্রহের সাথে। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন এবং লভ্যাংশরূপে বিনিময়ে অনেক বেশি অর্থ লাভ করেন। তাঁদের দ্বারা দালান, বাজার ও সরাইখানা নির্মাণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যরত জাহাজের মালিকানা অর্জন নিশ্চয়ই ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রচলিত পদ্ধতিকে সাহায্য করেছিল। হয়তো খুব অল্পসংখ্যক মহিলা বাণিজ্যিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন। তৎসত্ত্বেও যে অল্প কয়েকজন মহিলা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা এ ক্ষেত্রে তাঁদের স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছেন।

১৪৫৩. Ibid., পৃষ্ঠাগুলো-১৫-১৬.

১৪৫৪. রেখা মিশ্রা কর্তৃক রচিত 'মোঘল ভারতের নারীগন', পৃষ্ঠা-১১০.

১৪৫৫. যদুনাথ সরকার কর্তৃক রচিত 'আওরঙ্গজেবের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৩.

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
সাহিত্যক্ষেত্রে মোঘল নারীদের অবদান

১. মাদ্রাসা ও কলেজ প্রতিষ্ঠা

মোঘল সম্রাটগণ ছিলেন সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত। তাঁরা শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে জানতেন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করতেন ও শিক্ষা বিস্তারে ছিলেন আগ্রহান্বিত। তাঁরা বহুসংখ্যক মাদ্রাসা, মক্তব ও উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন গ্রন্থাগার। আকবর ব্যতীত প্রায় সকল মোঘল সম্রাট ছিলেন শিক্ষিত। এমনকি বাবর জাহাঙ্গীর লিখেছেন তাঁদের আত্মজীবনী। ইতিহাস গ্রন্থের তালিকায় অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত সম্রাট হুমায়ুন দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মাদ্রাসা যেখানে গণিতবিদ্যা, জোতির্বিদ্যা, ভূগোল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা।[১৪৫৬] যদিও আকবর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেননি তবুও তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি এমনকি প্রচলিত শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বিশেষত প্রাথমিক স্তরে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন।[১৪৫৭] পাটিগণিত, যুক্তিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব, জোতির্বিদ্যা, মুখ ও হাবভাব দেখে চরিত্র নির্ণয় বিদ্যা, হিসাববিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন ও কৃষিবিদ্যাকে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁর আদেশে।[১৪৫৮] এভাবে আকবরের শাসনাধীনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রদান করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতার পরশে এ যাবৎ পর্যন্ত যা ছিল ধর্মভিত্তিক।

আকবর ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ও আরো অন্য কয়েকটি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪৫৯] এইসব কলেজে সর্বদা আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং শিক্ষার্থীরা সেখানে বসবাসের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই পড়াশোনা করতে পারত।[১৪৬০] জাহাঙ্গীরের শাসনাধীনেও শিক্ষার বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং

১৪৫৬. Yusuf Husain. Glimpses of Medieval Indian Culture (Bombay: 1962), P. 79.
১৪৫৭. Abul Fazl, Ain-i-Akbari, vol. I (tr), pp. 288-89.
১৪৫৮. Ibid., p. 289.
১৪৫৯. F.E. Keay. Indian, Education in Ancient and later times (London; 1938), p. 119.
১৪৬০. Ibid., p. 119.

www.pathagar.com

তিনি একটি আইন তৈরি করেন যে, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি মাদ্রাসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজে লাগানো হবে।[১৪৬১] শাহজাহান দিল্লির জামে মসজিদের কাছে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জোগান দেন পর্যাপ্ত তহবিল।[১৪৬২] আওরঙ্গজেবও তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো ছিলেন শিক্ষার একজন পৃষ্ঠপোষক; কিন্তু তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ অপেক্ষা বেশি ধর্মভিত্তিক। তিনি অনেক জায়গাতে কিছুসংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে প্রদান করেন শিক্ষা বৃত্তি। তাঁর শাসনকালের অন্যতম মাদ্রাসা হলো মাদ্রাসা-ই-রাহিমিয়া।[১৪৬৩] তিনি প্রাদেশিক দেওয়ানদের প্রতি এই মর্মে হুকুম জারি করেন যে, যে সমস্ত ছাত্র মিজান ও কাশাহাফ পড়ছে তাদের প্রাদেশিক রাজকোষ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে।[১৪৬৪]

(ক) গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ

যেহেতু মোঘল সম্রাটগণ বিদ্যা ও শিক্ষাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন সেহেতু এটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, তাঁরা দুর্লভ গ্রন্থাদি ও অনূদিত গ্রন্থারাজির বিপুলসংখ্যক সংগ্রহ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন সুসজ্জিত গ্রন্থাগারসমূহ। এই গ্রন্থাগারগুলো জ্ঞান ও শিক্ষার বিশাল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। হুমায়ুনের এ রকম একটি গ্রন্থাগার ছিল এবং তিনি এই গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান।

আকবর বই খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁর ছিল একটি বিশাল গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে ছিল ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মতো অনেক বিষয়ের বই ও প্রায় ২৪,০০০ পাণ্ডুলিপি। এই গ্রন্থাগারে আরো ছিল সংস্কৃত, আরবি ও গ্রিক রচনাবলির পারস্য ভাষার অনুবাদ।[১৪৬৫] আকবর তাঁর সামরিক বিজয়গুলোর কালগত পর্যায়ে গুজরাট, কাশ্মীর, যৌনপুর, বিহার, বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থাগারগুলো থেকে সংগৃহীত গ্রন্থরাজির দ্বারা সমৃদ্ধ করেন তাঁর গ্রন্থাগারটি। তিনি গুজরাট থেকে যে সমস্ত বই এনেছিলেন মনে হয় সেগুলো ছিল ইতিমাদ খান গাভারাভির মালিকানাভুক্ত।[১৪৬৬] রাজকীয় গ্রন্থাগারটি ছিল

১৪৬১. A. L. Srivastava, Medieval Indian Culture (Agra; 1964), P. 166.
১৪৬২. Yusuf Husain, Glimpses of Medieval Indian Culture, p. 86.
১৪৬৩. Ibid., p. 86.
১৪৬৪. Ibid., p. 87.
১৪৬৫. A. L. Srivastava, Akbar the great, vol. II (Agra; 1967) p. 96.
১৪৬৬. Abdul Qadir Badauni, 'Muntakhab-ul-Tawarikh', vol. II (tr) Lowe (Dilhi; 1973), p. 205.

www.pathagar.com

আগ্রা দুর্গের অষ্টভুজ উঁচু স্তম্ভের পার্শ্বে অবস্থিত। আকবরের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেন :

সম্রাটের গ্রন্থাগারটি কতিপয় ভাগে বিভক্ত; কিছুসংখ্যক বই হেরেমের মধ্যে রাখা হয় এবং কিছুসংখ্যক বই হেরেমের বাইরে থাকত। গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিভাগে আবার বই-এর মূল্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়বস্তুর বিবেচনায় উপবিভক্ত। গদ্য বই, কবিতার বই, হিন্দি ভাষা, পারস্য ভাষা, গ্রিক ভাষা, কাশ্মিরী ভাষা ও আরবি ভাষার সকল বই আলাদাভাবে সাজানো হয়। এই উদ্দেশ্যে বইগুলো পরিদর্শনও করা হতো। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বইগুলো সম্রাটের কাছে এনে প্রত্যহ পাঠ করতেন এবং সম্রাট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা শ্রবণ করতেন।[১৪৬৭] জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার কাছ থেকে এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। যেহেতু তিনি বই খুব পছন্দ করতেন তাই তাঁর বইয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহও ছিল। যখন তিনি ভ্রমণে বা যুদ্ধ অভিযানে বের হতেন তখন তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন কয়েকটি নির্বাচিত বই।[১৪৬৮] শাহজাহানের ছিল প্রায় ২৪,০০০ উত্তমরূপে বাঁধানো বইয়ের একটি বিশাল গ্রন্থাগার।[১৪৬৯] আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এই গ্রন্থাগারটি বিশাল আকারে বর্ধিত করা হয়।

(খ) গ্রন্থাগারের সরকারি কর্মচারীগণ

রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন গ্রন্থাগারগুলো পৃথক পৃথক দালানে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এগুলোতে ছিল যথেষ্ট আলো ও বাতাস এবং বই যাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য এগুলোর মেঝে রাখা হতো কীটপতঙ্গ ও আর্দ্রতামুক্ত।[১৪৭০] কয়েকজন সরকারি কর্মচারী গ্রন্থাগারের সংগঠন ও প্রশাসন দেখাশোনা করতেন। গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ সরকারি কর্মচারী ছিলেন নাজিম যিনি মুতামিদ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরকে নিয়োগ ও পদচ্যুতি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব করতেন।[১৪৭১] তাঁর পরেই পদমর্যাদার ক্রমানুসারে ছিলেন মুহতামিন বা দারোগা[১৪৭২] এবং তিনি দেখাশোনা করতেন গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন। তাঁকে একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি হতে

১৪৬৭. Abul Fazl, Ain-i-Akbari, vol. I (tr), Blochmann, pp. 109,110.
১৪৬৮. P. N. Ojha, Some aspects of north Indian social life (Patna: 1961), p. 131.
১৪৬৯. M.S. Commissariat, Mandelslo's Travels in Western India (London; 1913), p. 118.
১৪৭০. S.A. Zafar Nadvi, "Libraries During the Muslim Rule in India", Islamic Culture, January 1946, p. 18.
১৪৭১. P. N. Ojha, Some aspects of north Indian social life, p. 133.
১৪৭২. Ibid., p. 133.

www.pathagar.com

হতো এবং তিনি ছিলেন বিষয় অনুসারে বই নির্বাচন, ক্রয় ও শ্রেণিবিন্যাসকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাঁর অধীনে ছিলেন কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, করণিক ও অন্যান্য কর্মচারী। এসব কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন বই-এর ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে সাজাতেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের দায়িত্ব ছিল বইগুলো নিয়মিত সময়ে বের করে ধূলিমুক্ত করা এবং বইয়ের পাতাগুলো একত্রে জড়িয়ে গেলে সেগুলো আবার পৃথক করা।[১৪৭৩] গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত ছিল বই বাঁধাইকারীগণ (জিলদ সাজ), দুর্লভ বই নকল করার জন্য সুন্দর হস্তাক্ষর শিল্পী (খুশনভিজ) এবং বইয়ের পৃষ্ঠার প্রান্তভাগে সুন্দর ছবি অংকন করার চিত্রশিল্পীগণ।[১৪৭৪] এমনিভাবে মোঘলদের রাজকীয় গ্রন্থাগার হয়ে উঠেছিল একটি সুসংগঠিত বিভাগে এবং তা উত্তমরূপে দেখাশোনা করা হতো ও তা ছিল সুসজ্জিত। এটা ছিল জ্ঞান অন্বেষণের একটি উৎকৃষ্ট স্থান।

১৪৭৩. Ibid., p. 134.
১৪৭৪. Ibid., p. 134.

www.pathagar.com

(গ) নারীশিক্ষা

ব্যাপকভাবে পুরুষশাসিত মধ্যযুগীয় সমাজে নারীশিক্ষাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হতো না। আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি কীভাবে মধ্যযুগে ভারতে নারীশিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হতো এবং এই সুযোগ শুধু অভিজাত ও রাজকীয় পরিবারগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও খুব অল্পসংখ্যক মহিলা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ এবং সাধারণভাবে সামাজিক অবস্থান নারীদেরকে নিম্নমানের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য দায়ী ছিল।

আমরা দেখেছি যে, মোঘল সম্রাটগণ ছিলেন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিদ্যা ও শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ছিল প্রচুর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম অবদান হলো প্রাসাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাঁদের কন্যা ও হেরেমের অন্যান্য মহিলাকে শিক্ষা দান করা। শাহজাদিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বয়স্ক শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে নিয়োগ করা হতো। নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদে কয়েকটি কক্ষ আলাদা করে রাখা হতো। সুসজ্জিত রাজকীয় গ্রন্থাগার রাজকীয় মহিলাদেরকে সরবরাহ করতে পারত প্রয়োজনীয় বইপত্র। নিশ্চয়ই রাজকীয় মহিলাদের ছিল সম্রাটের গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার এবং কখনো কখনো তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থাগারও থাকত। সঠিকভাবে বাবর থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মোঘল সম্রাটদের শাসন আমলে আমরা দেখতে পাই উচ্চ শিক্ষিতা ও গুণান্বিতা মোঘল নারীদেরকে যাঁরা শুধু উচ্চতর শিক্ষা লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা বিদ্যা ও শিক্ষার জন্য বিরাট অবদান রাখেন এবং কখনো কখনো তাঁরা এমন মূল্যবান সাহিত্যকর্ম রেখে যান, যা তাঁদেরকে দিয়েছে অমরত্ব।

২. বাবরের শাসনকালে শিক্ষিত মোঘল নারীগণ

মোঘল মহিলারা বাবরের শাসনকাল থেকেই ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে। বাবরের মা কুতলুক নিগার খানম ও তাঁর মাতামহী আইসান দৌলত উভয়েই ছিলেন শিক্ষিত মহিলা ও তাঁরা বাবরের চরিত্র গঠনে বিরাট প্রভাব রাখেন। কথিত আছে যে, বাবর তাঁর শিল্পকলা ও বুদ্ধিবৃত্তিগত গুণাবলি তাঁদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। বাবরের অন্যতম কন্যা গুলরুখ বেগম কিছুসংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন বলে মনে হয়।[১৪৭৫] বাবরের স্ত্রীদের

১৪৭৫. Rekha Misra, Women in Mughal India, p. 88

www.pathagar.com

মধ্যে কয়েকজন শিক্ষিতা ও সংস্কৃতিমনা মহিলাও ছিলেন। কিন্তু যে প্রথম মোঘল মহিলা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন তিনি হলেন গুলবদন বেগম যিনি তাঁর ভাই হুমায়ুনের জীবনীমূলক গ্রন্থ হুমায়ুননামার জন্য প্রসিদ্ধ।

(ক) গুলবদন বেগম

গুলবদন বেগম (গোলাপের মতো পেলব দেহ বিশিষ্ট রাজকুমারী) ছিলেন দিলদার বেগমের গর্ভজাত বাবরের কন্যা। তিনি ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে কোনো এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা ছিলেন কাবুলের শাসনকর্তা এবং তিনি ছিলেন সবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন ব্যক্তির সন্তান। বাবরের সঙ্গে তুর্কি বীর তৈমুরের পুত্র মীরন শাহ ও মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত চেঙ্গিস খানের পুত্র চাগতাইয়ের মধ্যে ছিল রক্তের সম্পর্ক।[১৪৭৬] গুলবদন কাবুল ও হিন্দুস্তানে তাঁর পিতার শাসনকালে শৈশব অতিবাহিত করেন, বালিকা ও নববিবাহিত স্ত্রী থাকাকালে তিনি হুমায়ুনের পতন ও নির্বাসন প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁর পরিণত বয়স অতিবাহিত হয় তাঁর ভাগ্নে আকবরের সুরক্ষায়। বাবর তাঁর স্মৃতিকথায় বা গুলবদন তাঁর হুমায়ুননামাতে গুলবদনের মা দিলদার বেগম সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেননি। যখন গুলবদনের বয়স প্রায় দুই বছর তখন বাবরের প্রধান পত্নী ও হুমায়ুনের মা মাহাম বেগম তাঁকে গ্রহণ করেন। মাহাম তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনের জন্মের পরে চারজন সন্তানকে হারান। সম্ভবত এই কারণে এবং বাবরের প্রধান পত্নী হিসেবে তাঁর মর্যাদার কারণে তিনি গ্রহণ করেন দিলদারের সন্তানদের মধ্যে হিন্দাল ও গুলবদন এই দুইজনকে। গুলবদন মাহাম বেগমের স্নেহে লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।[১৪৭৭] গুলবদন তাঁর হুমায়ুননামাতে মাহাম বেগমের স্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় মহিলা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বাবরের মৃত্যুর পরে যখন দিলদার বেগম হিন্দালের সাথে বাস করতেন তখন তিনি গুলবদনকে ফেরত নেন এবং তখনও গুলবদন ছিলেন অবিবাহিত মেয়ে।[১৪৭৮] বাবরের হিন্দুস্তান বিজয়ের পরে গুলবদন মাহাম বেগম ও তাঁর বাবার সঙ্গে আসেন এই নতুন দেশে।[১৪৭৯] পরে হুমায়ুনের রাজত্বকালে তাঁকে খিজির খান খাজার সাথে বিবাহ দেওয়া হয়।[১৪৮০]

১৪৭৬. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), P. I (Introduction).
১৪৭৭. Ibid., p. 9.
১৪৭৮. Ibid., p. 10.
১৪৭৯. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), P. I (Introduction). , p. 22.
১৪৮০. Ibid., p. 22.

www.pathagar.com

গুলবদন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন তাঁর পিতার সাহিত্যবিষয়ক মননশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তি। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত মহিলা এবং পারস্য ও তুর্কি ভাষায় তাঁর ভালো জ্ঞান থাকলেও তিনি কোনো ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন সেই সম্বন্ধে কোনো সূত্রের উল্লেখ নেই। কিন্তু একাধিক সূত্রে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে অনুরাগ ও কৃতিত্বের উল্লেখ আছে, যা তাঁর উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রমাণ দেয়। গুলবদন বেগম ছিলেন উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভাসম্পন্ন মহিলা এবং কথিত আছে যে, তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেন।[১৪৮১] কিন্তু তাঁর কবিতাগুলোর এখন আর কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ সেগুলো সংরক্ষণ করা হয়নি। মীর মাহদি সিরাজী তাঁর তাজকিরাত-উল-খাওয়াতিন রচনাতে তাঁর কবিতার দুটি চরণ সংরক্ষণ করেছেন :

অনুবাদ : যে সুন্দরী নারী বিশ্বস্ত নয় তাঁর প্রেমিকের তরে
বিশ্বাস কর, জীবন তাঁর মিথ্যা বলে হয় অনুভূত।[১৪৮২]

গুলবদন বেগম বই সংগ্রহ করতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল এবং এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য বই ছিল।[১৪৮৩] আকবরের নির্দেশে লিখিত বায়েজীদের হুমায়ুননামার নয় কপির মধ্যে একটি কপি গুলবদন বেগমকে দেওয়া হয়েছিল[১৪৮৪] সম্ভবত গ্রন্থ সংগ্রহে এবং সেগুলো তাঁর গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করার ব্যাকুলতা ও আগ্রহের কারণে।

(খ) হুমায়ুননামা

তবে গুলবদন বেগমের সাহিত্যিক দক্ষতার সর্বোত্তম প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ভাইয়ের স্মৃতিকথা হুমায়ুননামাতে। যখন একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ মহিলা হিসেবে গুলবদন তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও তৎকালীন ভারতের সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জীবন অতিবাহিত করছিলেন তখন আকবরের ইচ্ছানুসারে ও আদেশে তিনি আবুল ফজলের লেখনীতে আকবরনামা রচনার তথ্য সরবরাহের জন্যও 'হুমায়ুননামা' শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন।[১৪৮৫] এই বইটি ঐতিহাসিকভাবে খুব মূল্যবান এবং প্রথম দুইজন মোঘল সম্রাট তথা

১৪৮১. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), P. I (Introduction). , p. 76.

১৪৮২. Ibid., p. 76.

১৪৮৩. F.E. Keay, Indian. Education in Ancient and later times (London; 1938), p. 80; Law, Promotion of learning in India During Muhammaden Rule, p. 201-202; Shelat, Akbar, vol. II (Bombay: 1959), p. 341.

১৪৮৪. A.S. Beveridge in Humayun Nama. p. 76.

১৪৮৫. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), vol. I, p.441 (Translation).

www.pathagar.com

বাবর ও হুমায়ুন, তাঁদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণির প্রামাণিক গ্রন্থ। এই বইটি পারস্য ভাষায় প্রচুর তুর্কি শব্দ ও বাগধারায় রচিত। তুর্কি ভাষা ছিল গুলবদনের মাতৃভাষা এবং পারস্য ভাষাটি ছিল তাঁর গুণের পরিচায়ক। গুলবদনের হুমায়ুন নামা একমাত্র পারস্য ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিটি (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) ছিল অসম্পূর্ণ এবং মির্জা কামরানের অন্ধত্বের সাথে সাথেই তার সমাপ্তি ঘটে।[১৪৮৬]

অন্য কোনো সূত্রে গুলবদন বেগমের হুমায়ুননামার উল্লেখ নেই। কাজেই এই গ্রন্থটি এর একমাত্র সাক্ষ্য বহন করে। এ. এস. বেভারিজ বলেন যে, হুমায়ুননামা কোনো সাহিত্য নয়, তবে আকবরনামা রচনার সুবিধার্থে তিনি যা জানতেন বা তিনি যা শুনেছিলেন তা টুকে রাখা বিবরণ।[১৪৮৭]

এমনকি যদি বইটির সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা ঐতিহাসিক মূল্য বেশি হয়, তবে এটাতে লেখিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ আছে– যিনি ছিলেন বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ও রসিকতা বোধসম্পন্ন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। এ বিষয়ে মিসেস বেভারিজ মন্তব্য করেছেন 'তাঁর এই বইটিতে শুধু আমাদেরকে তাঁর সজীব মনের পরিচয় জানাননি, বরং তাতে একথাও আমাদেরকে জানান যে, এই বইটি তিনি এমন বয়সে রচনা করেছেন যখন মানুষের বুদ্ধিমত্তা হয়ে ওঠে ঘরোয়া-শান্তির জন্য ব্যাকুল। অর্ধশতাব্দী পরেও তাঁর শৈশব জীবনের একটি প্রখর আলো প্রজ্বলিত ছিল– তাঁর অনভ্যস্ত লেখনীকে পরিচালনা করতে এবং সুখময় ভাবনা ও দ্রুত গতির ধারণা বোধ যৌবনে তাঁকে হুমায়ুনের আমলের দুঃখ-কষ্ট অতিক্রম করে এই অবাধ রেখেছিল আনন্দাপ্লুত ও সজীবতাপূর্ণ।[১৪৮৮]

বাবরের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত এবং হুমায়ুনের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন গুলবদন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা হেরেমের রাজকীয় মহিলাদের জীবন ও তাঁদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সুস্পষ্ট চিত্র দেখতে পাই। গুলবদন বেগমের বিবরণ থেকে আমরা বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সময়ের অনেক মজার ঘটনাবলি সম্বন্ধে জানতে পারি। গুলবদনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কীভাবে খানজাদা বেগম তাঁর ভাই বাবরকে সায়বানীর শত্রুতা থেকে রক্ষার্থে শাহীবেগ খান বা সায়বানীকে বিবাহ

১৪৮৬. V.A. Smith, Akbar the great Mogul (Delhi; 1988), p. 343.
১৪৮৭. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p. 76.
১৪৮৮. Ibid., p. 22.

www.pathagar.com

করেন,[১৪৮৯] বাবরের হিন্দুস্তান আক্রমণ ও পাঁচজন রাজার সম্পদরাশি তাঁর হাতে পড়ার পরে কাবুলে তাঁর সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কাছে মূল্যবান উপহার প্রেরণ,[১৪৯০] হিন্দুস্তানে গুলবদনের আগমন,[১৪৯১] কঠিন রোগ থেকে হুমায়ুনের আরোগ্যলাভের পরে বাবরের আশ্চর্যজনক জীবনাবসান,[১৪৯২] হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণ,[১৪৯৩] হামিদা বানু বেগমের সাথে হুমায়ুনের বিবাহ, যদিও হামিদা বানু প্রথমে হুমায়ুনের সাথে তাঁর বিবাহের ধারণা বিরোধী ছিলেন,[১৪৯৪] আকবরের জন্ম ও তাঁর জন্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়।[১৪৯৫] এভাবে গুলবদনের হুমায়ুননামা হয়ে উঠেছে একটি আনন্দদায়ক পাঠ্য বিষয়ে এবং তাঁর হুমায়ুননামা তার সমকাল, তাঁর পিতা বাবর ও তাঁর ভাই হুমায়ুনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের বাসভবনের রাজকীয় মহিলাগণ, বড় বড় যুদ্ধ, প্রচারাভিযান, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ভোজ ও উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সর্বোপরি আনন্দ ও দুঃখ, জয়, পরাজয়ের মুহূর্তগুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যাবলি প্রদান করে।

৩. আকবরের শাসনকালে শিক্ষিত মোঘল নারীগণ

আকবরের সময়েও আমরা দেখতে পাই রাজকীয় মোঘল হেরেমে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নারীদেরকে। আকবরের মা হামিদা বানু বেগম ছিলেন একজন শিক্ষিত মহিলা। আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আনাগাও ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষক। মাহাম আনাগা দিল্লিতে খায়রুল মঞ্জিল নামক একটি কলেজ (মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই কলেজের সাথে সংযুক্ত ছিল একটি মসজিদ।[১৪৯৬] আকবরের পত্নীদের মধ্যে শিক্ষিত পত্নীরাও ছিলেন। আকবরের শাসনকালে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজকীয় মহিলা ছিলেন তাঁর অন্যতম পত্নী সেলিমা সুলতান বেগম এবং তিনি আত্মনিয়োগ করেন সাহিত্যকর্মে।

১৪৮৯. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p. 84.
১৪৯০. Ibid., p. 93-95.
১৪৯১. Ibid., p. 100.
১৪৯২. Ibid., p. 105-109.
১৪৯৩. Ibid., p. 110.
১৪৯৪. Humayun Nama (tr.), pp. 149-51.
১৪৯৫. Ibid., pp. 176-79.
১৪৯৬. Keay, Indian. Education in Ancient and later times, p. 80; Law, Promotion of learning in India., p. 202; Shelat, Akbar, vol. III, pp. 341-42; Banerjee, Humayun Badshah, vol. II, p. 324; Yosuf Husain, Glimpses of Medieval Indian Culture, p. 82.

www.pathagar.com

(ক) সেলিমা সুলতান বেগম

সেলিমা সুলতান বেগম ছিলেন মির্জা নূরুদ্দিন মুহম্মদ চানকানিয়ার কন্যা।[১৪৯৭] তার মা ছিলেন বাবরের অন্যতম কন্যা এবং সম্ভবত তাঁর নাম ছিল গুলরুখ বেগম। কতকগুলো সূত্রে তাকে গুলবাগ বেগম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৪৯৮] তাই তিনি ছিলেন আকবরের খুব নিকট সম্পর্কের বোন। ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে (৯৬৫ হিজরি বর্ষে) বৈরাম খান-ই-খানানের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে বৈরামের হত্যাকাণ্ডের পরে (৯৬৮ হিজরি বর্ষে) আকবর বিবাহ করেন সেলিমা সুলতানকে। সম্ভবত তিনি ছিলেন আকবরের চেয়ে বয়সে বড়। এরপরে তিনি আকবরের হেরেমে অর্জন করেন সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আসন এবং পরবর্তী অনেক ঘটনাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন একজন আর্কষণীয় ও অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা সম্ভ্রান্ত মহিলা। সেলিমা সুলতান বেগম ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৪৯৯] সেলিমা সুলতান বেগম ছিলেন বুদ্ধিমতী ও সাহিত্যিক প্রতিভাসম্পন্ন মহিলা। পারস্য ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল এবং তিনি মহিলা কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।[১৫০০] তাঁর কবিতাগুলো ছিল খুব উন্নতমানের এবং তিনি তাঁর সমকালীন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। সেলিমা বেগম 'মাখফি' (গোপন কোনো ব্যক্তি) ছদ্মনামে পারস্য ভাষায় তাঁর কবিতাগুলো রচনা করেন।[১৫০১]

তাঁর একটি কবিতা লেখা হয়েছে এইভাবে:

অনুবাদ :

হৃদয়ের প্রেমাবেগে তোমার কেশগুচ্ছকে
আমি বলেছিলাম জীবন সুন্দর বলে;
আত্মহারা হয়েছিলাম বলেই আমি
উচ্চারণ করেছিলাম এমন আবেগ অনুভূতি।[১৫০২]

সেলিমা সুলতান বেগম শুধু কবিতাই লিখেননি, এমনকি তিনি একজন গ্রন্থ সংগ্রহকারিণী হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।[১৫০৩] এমনকি তিনি একটি নিজস্ব লাইব্রেরিও পরিচালনা করতেন।[১৫০৪] কবি আমির খসরু কর্তৃক রচিত দুবাল

১৪৯৭. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p. 276 (Translation's note).
১৪৯৮. Ibid., pp. 276-77.
১৪৯৯. Tuzuk-i-Jahangiri (tr.) vol. I, p. 232.
১৫০০. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p. 58, Keay. Indian. Education in Ancient and later times, p. 80.
১৫০১. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p.279; Maathir-ul-Umara (tr.) vol. I, p. 371.
১৫০২. Maathir-ul-Umara (tr.) vol. I, p. 371.
১৫০৩. A.S. Beveridge in Humayun Nama (tr.), p.76.
১৫০৪. Rekha Misra. Women in Mughal India, p. 89.

www.pathagar.com

রানি খিজির খানের মতো শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের লাইবেরিতে সংগৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি একসময়ে ছিল সেলিমা সুলতান বেগমের মালিকানাভুক্ত।[১৫০৫] এভাবে সেলিমা সুলতান বেগম তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিঃসন্দেহে মোঘল আমলের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেন এবং মোঘল পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মধ্যে স্থান অর্জন করেন।

৪. জাহাঙ্গীরের শাসনকালে শিক্ষিত মোঘল নারী নূরজাহান

অন্যান্য অনেকের মতো জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা, শিক্ষিতা, দক্ষ ও অতিশয় সুন্দরী এবং সাহিত্য অনুরাগী মহিলা। পূর্বে মেহেরুন্নিসা নামে পরিচিত নূরজাহান বেগম ছিলেন সম্রাট আকবরের আমলে ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগত মির্জা গিয়াসবেগ নামক পারস্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। ভারতে আসার পথে তাঁর স্ত্রী আসমত বানু বেগমের ক্লেশদায়ক অবস্থার মধ্যে পরবর্তীকালে তাদের জন্য সৌভাগ্য আনয়নকারী এক কন্যার জন্ম দেন। গিয়াসবেগ ও তার পরিবারকে আকবরের দরবারে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা হয় এবং গিয়াস বেগকে প্রশাসনে ভালো মর্যাদা প্রদান করা হয়। রাজকীয় অনুগৃহ লাভ করে তিনি হন সুখী ও আরামদায়ক পরিবার জীবনের অধিকারী। মেহের-উন-নিসা পিতৃগৃহে কাটান তাঁর সুখময় শৈশবকাল। তিনি একজন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা ও দক্ষ বালিকাতে পরিণত হন। সতের বছর বয়সে ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শের আফগান নামে পরিচিত আলিকুলি ইস্তালজুর সাথে তাকে বিবাহ দেওয়া হয়। পরে আলিকুলিকে বাংলা প্রদেশের বর্ধমানে দেওয়া হয় স্বাধীন জায়গির। তিনি তার স্ত্রী মেহের-উন-নিসা ও কন্যা লাডলী বেগমকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে বাস করতে শুরু করেন। লাডলী বেগমের জন্ম হয় ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নতুন শাসনকর্তা ও জাহাঙ্গীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুতুব উদ্দিন খানের সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন যে, জাহাঙ্গীরই শের আফগানের হত্যার পরিকল্পনাকারী। কারণ মেহের-উন-নিসার প্রতি তাঁর প্রণয় দৃষ্টি পতিত হয়েছিল এবং তিনি মেহের-উন-নিসাকে বিবাহের পূর্ব থেকেই চিনতেন ও ভালোবাসতেন, কিন্তু নিজে তাঁকে বিবাহ করতে পারেননি। অন্য অনেক ঐতিহাসিক এই অভিমত গ্রহণ করেননি ঘটনা যাই হোক না কেন, শের আফগানের মৃত্যুর পরে মেহের-উন-নিসা তাঁর শিশুকন্যা লাডলী বেগমকে নিয়ে ফিরে আসেন আগ্রাতে। তারপরে তিনি আকবরের বিধবা পত্নী রোকেয়া

১৫০৫. S.C. Welch. India. Art & Culture (New york: 1985). p. 153.

www.pathagar.com

বেগমের লেখিকা নিযুক্ত হন। রোকেয়া বেগম তাঁর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল ও স্নেহশীল।

১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে নওরেজ উৎসবের সময় জাহাঙ্গীর মেহের-উন-নিসাকে দেখতে পান এবং গভীরভাবে নিমগ্ন হন তাঁর প্রেমে।[১৫০৬] এই সাক্ষাৎকারের দুই মাস পরে তাঁরা দুজনে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময়ে মেহের-উন-নিসার নাম রাখা হয় নূরমহল (প্রাসাদের আলো)। ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর তাঁকে উপাধি দেন নূরজাহান (পৃথিবীর আলো)।[১৫০৭] তিনি পাদশাহ বেগম (সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মহিলা) উপাধি অর্জন করেন।[১৫০৮]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ তাঁর পরিবারকে বিখ্যাত করে তোলে এবং তার বাবা ইতিমাদ-উদ-দৌলাহ (গিয়াসবেগ) এবং তার ভাই আসফখান সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে লাভ করেন গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা। খুব শীঘ্রই তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য ও দক্ষতার দ্বারা নূরজাহান শুধু জাহাঙ্গীরের হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হননি, তাঁর সাম্রাজ্যেরও সম্রাজ্ঞী হন এবং প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাতে জাহাঙ্গীরও অত্যন্ত সুখী হন কারণ তিনি ছিলেন নূরজাহানের প্রেমে অন্ধ এবং তিনি তার পারস্য স্ত্রীর দৃঢ়সংকল্প, সাহস, বিচক্ষণতা, যোগ্যতার মতো উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিমূলক গুণাবলির উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে নূরজাহান তাঁর জামাতা ও জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসাতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর তিনি সম্পূর্ণভাবে অবসরগ্রহণ করেন রাজনীতি থেকে এবং ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনে জীবন যাপন করেন লাহোরে।

ইতিহাস সব সময় আকর্ষণীয় ও প্রতিভাময়ী নূরজাহানকে স্মরণ রাখবে তাঁর বহুমুখী কৃতিত্বের জন্য এবং এ সম্বন্ধে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেছি ও আলোচনা করব অধ্যায়ভিত্তিতে। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর সাহিত্যবিষয়ক কৃতিত্ব, বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করব। ঠিক তাঁর শৈশবকাল থেকে নূরজাহান বেগম বা তৎকালীন নাম অনুসারে মেহের-উন- নিসা লাভ করেন সুশিক্ষা। তাঁর পিতা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষিত শিক্ষক ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মৌলবীদেরকে

১৫০৬. Mutamid Khan, Iqbal Nama-i-Jahangiri (text) (Calcuta: 1865), p. 56; Mutamid Khan, Iqbal Nama, tr. in Elliot and Dowson, vol. 6, pp. 404-405; Delect, p. 181.

১৫০৭. Tuzuk-i-Jahangin (tr.) vol. I, p. 319.

১৫০৮. R.P. Tripathi, Rise and Fall of the Mughal Emrire (Allahabad: 1960), p. 421.

www.pathagar.com

নিযুক্ত করেন। পনের বছর বয়সেই তিনি ইতিহাস ও পারস্যের দ্রুপদী সাহিত্যে হয়ে ওঠেন পারদর্শিনী।[১৫০৯] আরবি বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল।[১৫১০] এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, নূরজাহান বেগম তরুণ বয়স থেকেই ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগিনী। তিনি সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর অনেক আত্মীয় কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর দাদা মুহম্মদ শরীফ হিজরি, তাঁর নিকট সম্পর্কের আর এক দাদা খাজাজি রাজি এবং তাঁর পুত্র মির্জা আহমেদ শাপুর, তাঁর চাচা মুহম্মদ তাহির ওয়াসলি এবং তার বাবা নিজেও ছিলেন কবি এবং তাঁদের সাহিত্য রচনায় বেশকিছু অংশ আজও টিকে আছে।[১৫১১] তার বোন মানিজা বেগমের স্বামী কাসিম খান ছিলেন উঁচু স্তরের কবি এবং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই কবিতা রচনায় দক্ষ। তিনি ছিলেন মোঘল দরবারে কবিতা প্রতিযোগী বা মুশাহারার একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং তিনি প্রায়ই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।[১৫১২] কবিতা ছিল নূরজাহানের আবেগের বিষয় এবং তিনি পারস্য ভাষায় রচনা করতেন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কবিতাগুলো। তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে তীব্র প্রেমানুভূতি, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট ও সুফি ভাবধারা। কাফি খান এর সাক্ষ্য বহনকারী তাঁর কতিপয় কবিতা উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনাতে।[১৫১৩] নূরজাহানের কবিতায় বিশেষ করে তাঁর পূর্বপ্রস্তুতিবিহীন কবিতাগুলোতে বুদ্ধি ও রসবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কবিতাগুলোর অধিকাংশই প্রশ্নোত্তরের আকারে এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে কবিতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে রচিত। এখানে কবিতাগুলোর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো :

জাহাঙ্গীর বলেন

(অনুবাদ)

বিলাসপূর্ণ চিৎকারে বাতাসকে ভরিয়ে তোলার বুলবুল নই আমি,

আমাকে শুধু কোনো আর্তনাদ না করে মৃত্যুবরণকারী এক কীট বলে জেনো তুমি।

নূরজাহান জবাব দেন

১৫০৯. Mutamid Khan, Iqbal Nama-i-Jahangiri tr. in Elloit and Dowson, vol. 6, p. 405

১৫১০. Keay, Indian Education in Ancient and later times. p. 80.

১৫১১. Findly, Noorjahan, Empress of Mughal India, (New York; 1993). p. 226.

১৫১২. Ain-i-Akbari, vol. I (tr), pp. 559-60.

১৫১৩. Khafi Khan, Muntakhab-ul-Lubab. vol. I. ed. Kabir Uddin Ahmad and Woolslay Harg (Calcutta; 1860). pp. 269-271.

www.pathagar.com

(অনুবাদ)

তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণকারী কীট নই আমি

কেবল একটি আর্তনাদ ব্যতীত সারারাতব্যাপী জ্বলে থাকা দীর্ঘস্থায়ী মৃত্যুবরণকারী মোমবাতি তুল্য বলে আমাকে জেনো হে মোর স্বামী।[১৫১৪]

জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করেন,

(অনুবাদ)

'কেন বৃদ্ধ ব্যক্তিরা তাদের পৃষ্ঠদেশ অবনত করে ঘোরাফেরা করেন?'

নূরজাহান জবাব দেন,

(অনুবাদ)

'তারা ধূলিকণার মধ্যে অন্বেষণ করছে তাদের যৌবনের দিনগুলো।[১৫১৫]

একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর পদ্মরাগমণি দিয়ে তৈরি কুবা (দীর্ঘ বহির্বাস) পরিহিত অবস্থায় ছিলেন।

জাহাঙ্গীর বলেন :

(অনুবাদ)

ওগো মোর প্রিয়তমা, তোমার গলাবন্ধনী জাফরান রঙে রঞ্জিত হয়নি, ওটাতে ফুটে উঠেছে আমার মুখমন্ডলের পাণ্ডুরবর্ণ।

নূরজাহান তা শুনে মন্তব্য করেন :

(অনুবাদ)

আমার হৃদয়ের পদ্মরাগমণি থেকে নির্গত তরল বিন্দু তোমার পদ্মরাগমণি খচিত রেশমি কোটে ধার দিয়েছে তার রং।[১৫১৬]

রমজানের রোজার সমাপ্তি লগ্নে ঈদের চাঁদ অবলোকন করে

জাহাঙ্গীর বলেন:

(অনুবাদ)

ঈদের আনন্দ ভোজের অর্ধচন্দ্র আকাশের উঁচু অবস্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নূরজাহান জবাব দেন :

১৫১৪. Quoted from Hadi Hasan. A Golden Treasury of Persian Poetry (New Delhi; 1972) pp. 368-69.

১৫১৫. Ibid., p. 368-69.

১৫১৬. Khafi Khan, Muntakhab-ul-Lubab. vol. I. p. 270: English tr. from Hasan's Mughal Poetry (Aligrah; 1952) p. 79.

www.pathagar.com

(অনুবাদ)

ঈদের চাঁদ অবশেষে স্বর্গীয় আকাশের মুখমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছে। মদ্যশালার চাবি হেরে গিয়েছিল এবং অবশেষে তার সন্ধান পাওয়া গেছে।[১৫১৭]

জাহাঙ্গীর নূরজাহানের চোখে পুনর্মিলনের আনন্দাশ্রু দেখে বলেন:

(অনুবাদ)

তোমার গন্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তার মতো অশ্রু।

নূরজাহান উত্তর দেন :

আমি যে পানি পান করেছিলাম (যে অশ্রু আমি লুকিয়ে রেখেছিরাম) তোমাকে না পেয়ে তা আমার চোখ থেকে নির্গত হয়েছে।[১৫১৮]

তালিব আমুলি নামে একজন কবি জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন। তিনি নূরজাহানকে বলেন :

(অনুবাদ)

আমি এতবেশি হতবুদ্ধি হয়েছি যে আমি পানি হয়ে গেছি এবং পানিকে ভাঙ্গা যায় না। তাই আমি হতবুদ্ধি হয়েছি এই ভেবে যে কেন আমার সম্মানিত অশ্রু (মুখমণ্ডলের পানি) ভেঙে গেল।

নূরজাহান বললেন তাঁকে :

আপনার সম্মানিত অশ্রু পরিণত হয়েছে বরফে এবং সেই বরফ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।[১৫১৯]

একদা নূরজাহান আকাশে একটি উল্কা দেখতে পেয়ে মন্তব্য করেন :

কোনো তারাই কখনো এত উঁচুতে মাথা তুলেনি; এটা দেখতে এমন একটি বেহেস্ত তুল্য স্থান যেখানে সম্রাটের খেদমতে কটিদেশ করা হয়েছে বস্ত্রাবৃত।[১৫২০]

প্রাকৃতিক বস্তুগুলো যেন নূরজাহানের কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা প্রেম, আনন্দ, বিচ্ছেদ দুঃখ বা অন্যান্য আবেগের প্রকাশক। বিশেষত তাঁর প্রেমের কবিতাও শ্লোকগুলো আবেদনব্যঞ্জক। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো– প্রেম আমার দেহকে করেছে বিগলিত এবং তার ফলে তা পরিণত হয়েছে পানিতে। যে কোনো রসাঞ্জন, যা জমাট অবস্থায় থাকতে পারত তা পরিণত হয়েছে জল বুদবুদের চোখে।

১৫১৭. Khafi Khan, vol. I. pp. 270-271; English tr. by Barakat Ullah in Macnicol ed. Poems by Indian Women, p. 78.

১৫১৮. English translation in Findly's Noorjahan ..... , p. 227.

১৫১৯. Ibid., p. 227.

১৫২০. Ibid., p.227.

www.pathagar.com

বাগানে প্রবাহিত সকালের মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের কুঁড়ি ফুটতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ের তালার চাবি হচ্ছে আমার প্রিয়তমের মুচকি হাসি।[১৫২১] ঘটনার গতি প্রকৃতি না জানা পর্যন্ত আমি মনের মধ্যে তৈরি করি না কোনো ধারণা। আমি প্রেমের অধীন এবং প্রেমের বাহাত্তরটি ধারা আমি জানি। সাধু দরবেশগণ আমাদের মনে প্রলয়কালীন ভীতি সঞ্চার করতে পারেন না; আমরা বিচ্ছেদের বিভীষিকার কষ্ট ভোগ করেছি তাই প্রলয় দিবসের কথা আমাদের জানা হয়ে গেছে।[১৫২২]

যখন আমি সরিয়ে ফেললাম ঘোমটা আমার মুখমণ্ডল থেকে তখন গোলাপ ফুল থেকে একটি আর্তনাদ উত্থিত হলো; আমি যদি আমার কেশগুচ্ছ চিরুনি দ্বারা স্পর্শ করি তাহলে কচুরিপানা থেকে একটি আর্তনাদ ধ্বনিত হতো বলে মনে হয়। যখন আমি বাগানের মধ্যে দিয়ে এমন সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব সহকারে পথ অতিক্রম করি তখন একটি আশীর্বাদযুক্ত ধ্বনি উঠে আসে বুলবুলের আত্মা থেকে।[১৫২৩]

সৌন্দর্য ও প্রীতি দ্বারা বন্দি হৃদয় চিনে না বা জানে না গোলাপ ফুল, রং, সৌরভ, কপটতা বা বৃক্ষ।[১৫২৪] আমরা প্রাণ দিয়ে কিনেছি লাহোর নগর, আমরা দিয়েছি আমাদের জীবন এবং কিনেছি আরেকটি বেহেস্ত।[১৫২৫]

নূরজাহানের কবিতাধর্মী শ্লোকগুলো অত্যন্ত উঁচুমানের কাব্যরূপে আখ্যায়িত এবং সেগুলো এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পর্যাপ্তপ্রমাণ স্বরূপ। তিনিও সেলিমা সুলতান বেগমের মতো 'মাখফি' ছদ্মনামে লিখতেন।[১৫২৬] তাঁর সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার দ্বারা তিনি সক্ষম হন তাঁর স্বামী জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করতে।[১৫২৭]

নূরজাহান শুধু নির্মল ও প্রাণবন্ত কবিতা রচনায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। পুস্তক সংগ্রহে তার ছিল প্রবল আগ্রহ এবং তাঁর ছিল একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার।[১৫২৮] তিনি মাঝে মাঝে বই কিনে এই গ্রন্থাগারে তা সংযোজন করা অব্যাহত রাখেন। জানা গেছে যে, তিনি 'দিওয়ান-ই-কামরান' গ্রন্থটি ক্রয় করেন তিন মোহর (স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা) দ্বারা। এই গ্রন্থটির প্রথম পৃষ্ঠায় আছে তিনটি লাইন 'এই সম্পদের মূল্য তিন মোহর, নওয়াব নূর-উন-নিসা বেগম।'[১৫২৯]

১৫২১. English tr. by Barakat Ullah in Macnicol ed. Poems by Indian Women, (london; 1923), p.76.
১৫২২. English translation in Findly's Noorjahan, p.227.
১৫২৩. Ibid., p.227.
১৫২৪. Ibid., p.227.
১৫২৫. Ibid., p.227.
১৫২৬. Khafi Khan, vol. I. p. 270.
১৫২৭. Beni Prasad, History of Jahangir (Madras; 1922) p. 172.
১৫২৮. P. N. Ojha, Some aspects of north Indian social life, p. 131.
১৫২৯. Ibid., p.131.

www.pathagar.com

নূরজাহান ছিলেন শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত কবিগণ, পণ্ডিতগণ ও লেখক-লেখিকাগণ মোঘল রাজদরবারে ভিড় জমাতেন। তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর সমর্থন দিতেন এবং তাঁদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেন। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাহাঙ্গীরও অনেক কবি ও পণ্ডিতকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন যাদের অনেকেই এসেছিলেন পারস্য থেকে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন নাজিরি, তালিব, ইস্ফাহানি, সাঈদা, মুনির লাহোরি, নিশানি, সাঈদা-ই-জিলানি, নাকিব খান, নিয়ামত উল্লাহ ও আব্দুল হক দেহলভি।[১৫৩০] নূরজাহান তাঁর সমকালীন মহিলা কবিদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন অত্যন্ত উদার। তাঁর একজন পরিচারিকা মেহের হারুই ছিলেন একজন মহিলা কবি এবং তাঁর সারাপি-ই-মেহেরি এখনও টিকে আছে।[১৫৩১]

নূরজাহান তার আমলে লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও অন্যান্য স্থানের রাজদরবারে কবিতা রচনার প্রতিযোগিতার আয়োজনে ছিলেন সক্রিয়।[১৫৩২] মুশাইরা নামেও আখ্যায়িত এসব প্রতিযোগিতায় দূর-দূরান্তের অনেক প্রসিদ্ধ কবি অংশগ্রহণ করতেন। জাহাঙ্গীরের শ্যালক কাসিম খান ছিলেন এসব মুশাইরাতে অন্যতম অংশগ্রহণকারী এবং নূরজাহান ছিলেন তার কৃতিত্বের জন্য গর্বিত।[১৫৩৩] এইভাবে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য ক্ষেত্রেও নূরজাহানের প্রসিদ্ধ অবদান নিশ্চয়ই তাকে ভারতে অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজকীয় মহিলা বা সম্ভবত অগ্রগামী ও সবচেয়ে স্মরণীয় রাজকীয় মোঘল রাজবংশীয় মহিলাতে পরিণত করে। তাঁর কৃতিত্ব তাঁকে মোঘল দিগন্তে পরিণত করেছে অবিস্মরণীয় তারকাতে। তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ লিপি তাঁর নম্রতা ও সরলতার সাথে উচ্চাভিলাষপূর্ণ মনের প্রতিফলনস্বরূপ।

(অনুবাদ)

আমাদের মতো গরিব লোকদের সমাধির উপরে থাকবে না কোনো আলো বা ফুল বা কোনো পতঙ্গের ডানা বা ধ্বনিত হবে না কোনো বুলবুলের কণ্ঠ।[১৫৩৪]

৫. শাহজাহানের আমলে শিক্ষিত মোঘল নারীগণ

মমতাজমহল বা আরজুমান্দ বানু বেগম ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইতিমাদ-উদ-দৌলার পুত্র ও নূরজাহানের ভাই

১৫৩০. Sugam Anand, History of Begum Noorjahan, p.67.

১৫৩১. K. S. Lal, The Mughal Harem, p. 76.

১৫৩২. Sugam Anand, History of Begum Noorjahan, p.67. Findly's Noorjahan ..... , p.226.

১৫৩৩. Findly's Noorjahan ..... , p.226

১৫৩৪. English tr. by Barakat Ullah in Macnicol ed. Poems by Indian Women, p. 79.

www.pathagar.com

আসফখানের কন্যা। আরজুমান্দ বানু পারস্য ও আরবি ভাষায় দক্ষ একজন সুন্দরী, শিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনা ও গুণবতী যুবতিরূপে বড় হয়ে ওঠেন। আঠারো বছর বয়সে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুররমের (শাহজাহান) সাথে তাঁর বাগদান সম্পন্ন হয় এবং তাঁদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় দুই বছর পরে। শাহজাহান মোঘল সিংহাসনে আরোহণের পরে আরজুমান্দ বানু, মমতাজ মহল নামে (রাজকীয় অন্দরমহলের সমাজ্ঞী) পরিচিতি লাভ করেন।

মমতাজমহল শাহজাহানকে উপহার দেন চৌদ্দজন সন্তান এবং চতুর্দশতম কন্যা সন্তান প্রসব করার পরে শিশু জন্ম দানকালে মৃত্যুবরণ করেন ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আটত্রিশ বছর। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে শাহজাহানের হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। মমতাজকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন, তিনি ছিলেন তাঁর সন্তানের জননী এবং সকল সুখ-দুঃখে তার নিত্যসঙ্গিনী। তিনি মমতাজের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে তাঁর সমাধিসৌধ তাজমহল নির্মাণের মাধ্যমে অমর করে রাখেন। মমতাজমহল পরিচিত ছিলেন তাঁর দানশীলতা এবং অনেক কবি, পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার কারণে।

মমতাজমহল ছিলেন সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন একজন মহিলা এবং তিনি কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতাগুলো তার ফুপু নূরজাহানের কবিতাগুলোর মতো ছিল প্রধানত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য ও শাহজাহানের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে পারস্পরিক কথোপকথনের সময়ে উচ্চারিত। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

একদা শাহজাহান (পৃথিবীর বাদশাহ) মমতাজকে তাঁর পাশে নিয়ে তাঁর প্রাসাদে বসে দেখছিলেন নিচে পাথরের উপরে যমুনা নদীর সফেন তরঙ্গমালা। তাঁর স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তিনি মন্তব্য করেন :

(অনুবাদ)

তোমার মুখমণ্ডলের দীপ্তি দর্শন করার জন্য নদীটি এতদূর পথ অতিক্রম করে এসেছে।

মমতাজ উত্তর দেন :

(অনুবাদ)

পৃথিবীর বাদশাহ (শাহজাহান) এর ভয়ে নদীটি তার মাথা ঠুকছে পাথরের গায়ে।[১৫৩৫]

মমতাজমহলের একজন দাসীকে দেওয়া হয় সম্রাট শাহজাহানকে ঘুম থেকে প্রতিদিন জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব। একদিন সে ভুলক্রমে প্রভাত হওয়ার

১৫৩৫. Quoted from Hadi Hasan. A Golden Treasury of Persian Poetry, pp. 374-75.

www.pathagar.com

আগেই জাগিয়ে তোলে সম্রাটকে। এতে শাহজাহান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে মমতাজমহলের কাছে এসে বলেন :

(অনুবাদ)
দাসীটির মাথা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে।
তাৎক্ষণিকভাবে মমতাজ জবাব দেন :

(অনুবাদ)
যে পাখিটি তার সঠিক সময়ের আগেই গান গেয়েছে সেই পাখিটির মাথা অবশ্যই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। কারণ এই সুন্দর প্রাণীটি জানে না কিছুই গোধূলি বা প্রভাত সম্বন্ধে।[১৫৩৬]

যদিও মমতাজমহলের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায়নি, তবু তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কবিতাগুলো প্রকাশ করে তাঁর সজীব মন ও বুদ্ধিকে। মোটকথা তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিমনা ও শিক্ষিত মহিলা।

(ক) জাহানারা বেগম

শাহজাদি জাহানারা বেগম ছিলেন শাহজাহান ও মমতাজমহলের সবচেয়ে বড় কন্যা। ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মমতাজমহলের মৃত্যুর সময়ে জাহানারার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি ছিলেন শাহজাহানের সবচেয়ে প্রিয় ও সবচেয়ে আদরের সন্তান। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে তিনি তাঁর শোকসন্তপ্ত পিতার দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিজেই এবং তিনি তা সর্বোচ্চ ভক্তিশ্রদ্ধার সাথে সম্পন্ন করেন শাহজাহানের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। শাহজাহানও তাঁকে স্নেহ করতেন এবং তাঁর উপরে বিশেষভাবে নির্ভর করতেন, কারণ তিনি দারাশিকো ব্যতীত অন্যকোনো সন্তানের ওপর ভরসা করতে পারতেন না। শাহজাহানের সিংহাসনচ্যুতি ও আগ্রা দুর্গে নির্বাসনের পরে ক্ষমতার উত্তরাধিকার সংগ্রামের সময় তিনি আরাম ও বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করেন, নিজেই নির্বাসিত জীবন বেছে নেন এবং আগ্রা দুর্গের আবেষ্টনীর মধ্যে পিতার সান্নিধ্যে জীবন যাপন শুরু করেন। শাহজাহানের মৃত্যুর পরে আওরঙ্গজেব জাহানারাকে ফিরিয়ে দেন তাঁর আগের সর্বোচ্চ রাজদরবার ও পরিবারকেন্দ্রিক পদমর্যাদায়। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে চলে যান এবং ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তথায় বাস করেন। তিনি কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর মৃত্যুতে শোক দিবস পালন করেন এবং তাকে তখন থেকে সিহাবাত-উদ-জামানি (যুগের নেত্রী) বলে উল্লেখ করার আদেশ দেন।

১৫৩৬. Ibid., pp. 374-75.

www.pathagar.com

শাহজাদি জাহানারা ছিলেন তাঁর মা মমতাজমহলের মতো অসহায়, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির হৃদয়। তিনি অনাথ, বিধবা ও অন্যান্য গরিব লোকদের জন্য দাতব্য কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

জাহানারা তাঁর শৈশবকাল থেকেই ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিমতী বালিকা এবং তিনি মোঘল হেরেমে শাহজাদিদের জন্য লভ্য সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। তার শিক্ষয়িত্রী হিসেবে শাতি-উন-নিসাকে শাহজাহান নিয়োগ করেন (মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বল্লমধারী) নামে একজন পারস্য মহিলাকে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও চিকিৎসক পরিবারভুক্ত এবং তিনি নিজে ছিলেন শিক্ষিত মহিলা। তিনি ভালোভাবে কোরআন আবৃতি করতে পারতেন এবং তিনি ছিলেন পারস্য দেশীয় গদ্য সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের জ্ঞানসম্পন্ন মহিলা। শাতি উন নিসার যোগ্য ও সস্নেহ পরিচালনায় শাহজাদি জাহানারা অল্প সময়ের মধ্যেই পবিত্র কোরআন পাঠ করতে শেখেন এবং পারস্য ভাষায় ভালো জ্ঞান অর্জন করেন।

এর পর শীঘ্রই জাহানারা কবিতা রচনা শুরু করেন নিজের চেষ্টায়।[১৫৩৭] তাঁর কবিতাবলি সাহিত্যিক মূল্যের কারণে সকলের কাছ থেকে বয়ে আনে প্রশংসা। দিল্লিতে দরবেশ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সমাধির কাছে পারস্য দেশীয় শ্লোকের আকারে তাঁর সমাধিসৌধ উৎকীর্ণ লিপিতে লেখা রয়েছে এভাবে ঃ[১৫৩৮]

অন্য কিছু যেন আবৃত না করে মোর সমাধিতে সবুজ ঘাস ছাড়া;
কারণ গরিবের তরে পর্যাপ্ত আবরণ সবুজ ঘাসের চাবড়া।[১৫৩৯]

শাহজাহানের স্নেহের কন্যারূপিনী এই শাহজাদি অসাধারণ বিনম্রতা সমাধিক্ষেত্রে উৎকীর্ণ লিপির পঙক্তিতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। বয়স বাড়ার সাথে জাহানারা বেগমের মনে আধ্যাত্মিক ও মরমিভাবের প্রবণতা দেখা দেয়। তিনি মরমিবাদ ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে লিখেছেন অনেক রিসালা।[১৫৪০] ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'মুনিস-উল-আরওয়া' নামক গ্রন্থটি জাহানারার সাহিত্যবিষয়ক কৃতিত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন।[১৫৪১] গ্রন্থটি হলো আজমীরের সুফি সাধক খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (রহঃ) এর জীবনী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে আছে

১৫৩৭. Law, Promotion of Learning in India. p. 203; S.M. Jafar, Education in Muslim India (Lahore; 1936), pp. 195-96.

১৫৩৮. Law, Promotion of Learning in India. pp. 203-204; S.M. Jafar, Education in Muslim India, pp. 195-96.

১৫৩৯. English tr. in K. S. Lal, The Mughal Harem, p. 98.

১৫৪০. Rekha Misra, Women in Mughal India, p. 90.

১৫৪১. R. C. Majumdar ed, The Mughal Empire (Bombay: 1974), p. 14.

www.pathagar.com

তার কয়েকজন উত্তরসূরি ও শিষ্য সম্বন্ধে জীবনীমূলক বিবরণ।[১০৪২] মুসলিম দরবেশ ও সুফিদের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা নিয়ে তৈরি এ ধরনের পারস্য সাহিত্য পরিচিত হয় 'মালফুজাত' বলে।[১০৪৩] রিসালা-ই-শাহীরিয়া, 'মোল্লা শাহ বাদাখশি' নামক আরেকটি রচনা জাহানারার সাহিত্যকর্ম বলে কথিত আছে।[১০৪৪]

সাহিত্যক্ষেত্রে জাহানারা বেগমের অবদান তাঁর কবিতা ও সাহিত্যকর্মে সীমাবদ্ধ নয়। জনপ্রিয়তাহেতু 'বেগম সাহেব' নামে পরিচিত জাহানারা বেগম ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণকারিণী ও শিক্ষিতা। অনেক কবি, পণ্ডিত ও সাহিত্যিক তাঁর কাছে সমবেত হন এবং তিনি তাদেরকে দিতেন পুরস্কার ও ভাতা।[১০৪৫] তাঁর উদারতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মুরিদখান নামেও পরিচিত। মীর মোহাম্মদ আলী মহির জাহানারা বেগমের প্রশংসায় রচনা করেছেন মসনবি (দীর্ঘ কবিতা)।[১০৪৬] কথিত আছে যে, জাহানারা বেগম আগ্রার জামে মসজিদের সাথে সংলগ্নভাবে তৈরি করেন একটি মাদ্রাসা।[১০৪৭] এই মাদ্রাসাটি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে এবং পরবর্তীকালেও এর উন্নতি ঘটতে থাকে।

৬. আওরঙ্গজেবের সময়কার শিক্ষিত মোঘল মহিলাগণ

(ক) জীবন নিসা

আওরঙ্গজেবের আমলে তার কন্যাদ্বয় জীবন নিসা ও জীনাত উন নিসার নাম সাহিত্যবিষয়ক কৃতিত্বের জন্য প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য, বিশেষত প্রসিদ্ধ মহিলা কবি জীবন নিসার কবিতা। জীবন নিসা (নারীত্বের অলংকার) ছিলেন স্ত্রী দিলরাস বানু বেগমের গর্ভজাত আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং তিনি ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৪৮] তাঁর দাদা শাহজাহান ছিলেন তদানীন্তন মোঘল ভারতের সম্রাট এবং তার পিতা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তৃপক্ষ। জীবন নিসা ছিলেন একজন সুন্দরী, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও সংস্কৃতিবান মহিলা তথা মরমি ভাবধারার অধিকারিণী। তারপরেও

১০৪২. Ibid., p. 14.
১০৪৩. Ibid., p. 14.
১০৪৪. Rekha Misra, Women in Mughal India, p.93: Zinat Kausar Muslim Women in Medieval India, (New Delhi; 1992), p.159.
১০৪৫. Law, Promotion of Learning in India, p. 203; S.M. Jafar, Education in Muslim India, p. 196.
১০৪৬. M.A. Ansari, Social Life of the Mughal Emperors (New Delhi; 1983), p. 119.
১০৪৭. Yusuf Husain, Glimpses of Medieval Indian Culture, p.86
১০৪৮. Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. pp. 68-69: Studies in Mughal India, p. 79.

www.pathagar.com

তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত সঠিক তথ্য অজ্ঞাত আছে। তিনি একজন সুন্দরী, মিষ্টভাষী ও অমায়িক ব্যবহারসম্পন্ন মহিলা হওয়ার পরও যুদ্ধবিদ্যায় অস্ত্র পরিচালনায় তিনি ছিলেন দক্ষ।[১০৪৯] তিনি ছিলেন গভীরভাবে একজন ধার্মিক মহিলা তথাপি যুগের ধারাবাহিক রীতিনীতিতে তাঁর কোনো অনুভূতি ছিল না। অন্যকথায়, তিনি তাঁর পিতার মতো একজন গোঁড়া ধার্মিক ছিলেন না। তাঁর একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও কোরআন তত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি ছিলেন ধর্মীয় নীতিমালায় উদার। রাজদরবারে অনেক সময় ধর্মীয় বিতর্ক নিষ্পত্তি করার জন্য তাকে ডেকে পাঠানো হতো।[১০৫০] আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, যিনি বাকপটুতা ও কোরআনের জ্ঞান দ্বারা পিতাকে পর্যাপ্ত যুক্তি দেখাতেন তাঁর প্রতি গর্বিত হতে। কিন্তু পরবর্তীকালে পিতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারণা ও মতামতের বৈরিতার কারণে তিনি তিক্ত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শাহজাদা আকবর বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তিনি এমনকি ভাইয়ের প্রতি সমর্থন দেওয়ার কারণে পিতার রোসানলে পড়ে যন্ত্রণা ভোগ করেন।[১০৫১] পিতা জীবন নিস কে সালিমগড় দুর্গে বন্দি করে রেখেছিলেন। তিনি শুধু তাকে কারারুদ্ধই করেননি, তাঁর জীবনকেও নিশ্চল করে দেন।[১০৫২] জীবন নিসাকে দিল্লি ত্যাগে বাধ্য করেন ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মে তারিখে।[১০৫৩] এই দিনগুলোতে সংযম ও অনিশ্চয়তার সাথে পূর্ণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করেন। শাহজাদি জীবন নিসা পিতার প্রখর মেধা ও সাহিত্যিক রুচিবোধ পারিবারিক সূত্রে লাভ করেন এবং বেশিরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করতেন সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডে। অন্য অনেক শাহজাদির মতো তিনি লাভ করেন সুশিক্ষা। মূলত খোরাসানের নাইশাবুর থেকে আগত কাশ্মীরের একটি পরিবারভুক্ত মির্জা শুকুরুল্লাহের স্ত্রী হাফিজা মরিয়ম নামক একজন শিক্ষিত মহিলাকে তিনি পান শিক্ষয়িত্রী হিসেবে।[১০৫৪]

তাঁর মিয়াবাঈ নামে একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন[১০৫৫] এবং শাহ রুস্তম গাজী নামে অন্য একজন কবি ছিলেন তাঁর শিক্ষক।[১০৫৬] খুব শীঘ্র জীবন নিসা আরবি

১০৪৯. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa (London; 1913), p. 14.

১০৫০. Ibid., p. 11.

১০৫১. Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India. pp. 86-88.

১০৫২. Jadunath Sarkar. History of Aurangzeb. vol. I. p.78; Macnicol ed, Poems by Indian Women. p. 36.

১০৫৩. Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb. vol. I. p. 69; Studies in Aurangzeb's Reign (Calcutta; 1933) p. 141.

১০৫৪. Jadunath Sarkar. Studies in Mughal India. p. 79: Maharani Sunity Devee, The Beautyful Mogul Princesses (Lonfon; 1918), p. 55.

১০৫৫. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa. p. 8.

১০৫৬. Ibid., P. 8.

www.pathagar.com

ও পারস্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং জোতির্বিদ্যা ও পাটিগণিতের মতো বিষয়গুলো শিখে ফেলেন।[১৫৫৭] মাত্র সাত বছর বয়সে[১৫৫৮] তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করে হাফিজ হন।[১৫৫৯] তাঁর পিতা আওরঙ্গজেব খুবই আনন্দিত হন তাঁর এই সাফল্যে এবং তাই তিনি তাঁর সমগ্র সেনাবাহিনীকে ভোজে আপ্যায়িত করেন, দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করেন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) স্বর্ণমুদ্রা এবং সরকারি অফিসসমূহ বন্ধ রাখেন দুই দিন।[১৫৬০] শাহজাদিরাও তার পিতার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পান পুরস্কার হিসেবে।[১৫৬১] জীবন নিসা কোরআনের ওপরে ভিত্তি করে একটি ধারাভাষ্য রচনা করতে শুরু করেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি নারী বলে তাঁর পিতা এই কাজটি অনুমোদন করেননি।[১৫৬২] তিনি নাস্তালিক, মাস্ক ও সিকাস্তি নামক বিভিন্ন পারসিক হস্তাক্ষরে লিখতে পারতেন শিল্পসম্মত ও পরিচ্ছন্নভাবে।[১৫৬৩] শাহজাদি জীবন নিসা ছিলেন বিদ্যানুরাগী। একই সাথে তিনি ছিলেন শিক্ষার উপকরণসমূহ বিশেষত গ্রন্থানুরাগী। তিনি কতকগুলো মূল্যবান বই ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং তিনি নিজেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটি লাইব্রেরি পরিচালনা করতেন,[১৫৬৪] যেখানে তাঁর পিতা তাঁর লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহারের জন্য কন্যার পছন্দমতো পৃথক করে রাখেন কয়েকটি প্রশস্ত কক্ষ।[১৫৬৫] তিনি অনেক সুন্দর হস্তাক্ষর শিল্পীকে নিয়োগ করেন তাঁর দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ নকল করার উদ্দেশ্যে।[১৫৬৬] এই কাজ অব্যাহত রাখার জন্য কাশ্মীরে ছিল তাঁর একটি রচনাশালা– কাশ্মীরে উৎকৃষ্ট কাগজ ও ভালো লেখক পাওয়া যেত বলে।[১৫৬৭] তিনি এই কাজে বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতি সকালে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আগের দিনের কাজ খতিয়ে দেখতেন। তিনি পারস্য ভাষায় অন্য ভাষার অনেক মূল্যবান

১৫৫৭. Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79; Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 8.

১৫৫৮. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 8.

১৫৫৯. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un- Nissa, p. 8; Mustaid Khan's Maaasir-i-Alamgiri tr. in Elliot & Dowson, vol. 7. o. 196.

১৫৬০. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 8.

১৫৬১. Sunity Devee, The Beautyful Mogul Princesses, p. 55; Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. & II, pp. 37-38.

১৫৬২. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, pp. 8-9.

১৫৬৩. Jadunath Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79.

১৫৬৪. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79. Sarkar tr. Maasir-i-Alamgiri, 322; Yusuf Husain, Glimpses of Medieval Indian Culture, p. 93.

১৫৬৫. Sunity Devee, The Beautiful Mogul Princesses, p. 55.

১৫৬৬. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79.

১৫৬৭. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 13.

www.pathagar.com

রচনা অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করেন অনেক অনুবাদক।[১৫৬৮] শাহজাদি তাঁর গ্রন্থাগারে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সময় ধরে অধ্যয়ন করতেন এবং সেই সময় কেউ তাকে বিব্রত করতেন না। তাঁর পরিচর্যার জন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে যেসব পরিচারিকা থাকত তাদেরকে পছন্দ করা হতো বিশেষ করে তাঁর অধ্যয়নে সাহায্যের জন্য।[১৫৬৯] জীবন নিসা ছিলেন শিক্ষার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। আমরা ইতিমধ্যেই তাঁর গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তাঁর গ্রন্থপ্রীতি ছাড়াও জীবন নিসা অনেক পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে উৎকর্ষ লাভ করেন।[১৫৭০] তাঁর উদারতা ও বদান্যতায় তাঁর পিতার সাহিত্যবিষয়ক পৃষ্ঠপোষকতার ঘাটতি পূরণ হয়েছে। তিনি তাঁর বার্ষিক চার লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত ভাতা বিদ্বান ব্যক্তিদের উৎসাহ দানে এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতেন।[১৫৭১] তাঁর সমর্থন ও উৎসাহে কাশ্মীরের সফিউদ্দিন আদেলি ইমাম রাজির তাফসির-ই-কাবির (মহতী ধারার ভাষ্য) পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয় জেব-উত-তাফসীর।[১৫৭২]

জীবন নিসার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি নিহিত আছে তাঁর কবিতাগুলোর মধ্যে। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন কাব্যের প্রতি অনুরাগী। প্রথমে তিনি আরবি ভাষায় কবিতা রচনা করেন, কিন্তু একজন আরবি ভাষার পণ্ডিত তা দেখে কবিতাগুলোকে উৎকর্ষহীন দেখতে পান এবং সেগুলোর সমালোচনা করেন।[১৫৭৩] এরপর কবিতা রচনায় তাঁর নৈপুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্বুদ্ধ করে পারস্য ভাষায় কবিতা রচনা করতে। জীবন নিসার শিক্ষক স্থানীয় একজন পণ্ডিত শাহ রুস্তম গাজী তাকে অনুপ্রাণিত করেন এ ক্ষেত্রে।[১৫৭৪] জীবন নিসা প্রথম গোপনে যে কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন সেগুলো খুঁজে বের করেন এবং দেখতে পান যে সেগুলো খুব উঁচু মানসম্পন্ন। তিনি আওরঙ্গজেবকে পারস্য, কাশ্মীর ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কবিদেরকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে শাহজাদির জন্য উপযুক্ত সাহিত্যিক পরিমণ্ডল তৈরির জন্য অনুরোধ জানান যাতে শাহজাদি তাদের সান্নিধ্যে উপকৃত হতে পারেন।[১৫৭৫] এই কবিদের মধ্যে ছিলেন

১৫৬৮. Ila Mukherjee, Social Status of North Indian Women (Agra; 1972), p. 106.
১৫৬৯. Sunity Devee, The Beautiful Mogul Princesses, p. 58.
১৫৭০. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79.
১৫৭১. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 13.
১৫৭২. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 79; Sarkar tr. Maasir-i-Alamgiri, 322.
১৫৭৩. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 9.
১৫৭৪. Ibid., p. 9.
১৫৭৫. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 9.

www.pathagar.com

নাসির আলী, সোয়েব, শামসিওয়ালি উল্লাহ্, ব্রাহ্মণ ও বাহরোজ।[১৫৭৬] ইমামি নামে একজন মহিলা কবি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গিনী।[১৫৭৭]

তাঁর সঙ্গিনী সকল কবি ও মহিলা কবিকে সাথে নিয়ে তিনি মুশাহারা নামক কবিতা প্রতিযোগিতামূলক এক ধরনের বুদ্ধির লড়াইতে আত্মনিয়োগ করেন।[১৫৭৮] এই প্রতিযোগিতায় একজন ব্যক্তি একটি পঙ্ক্তি প্রস্তাব করতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি এমনকি একটি প্রশ্ন করতেন। অন্য একজন ব্যক্তি এর উত্তর দিতেন অথবা এর বিরোধিতা করতেন বা এটার যথার্থতা স্বীকার করতেন অথবা এক বা একাধিক পঙক্তি দ্বারা এটাকে সম্প্রসারণ করতেন একই মাত্রা ও ছন্দের মধ্যে। জীবন নিসা সরহিন্দ থেকে আগত কবি নাসির আলীর খুব প্রশংসা করতেন এবং তিনি প্রায় নিশ্চিতভাবে জীবন নিসার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি হিসেবে বিবেচিত হতেন।[১৫৭৯] তাঁর পিতার বড় ভাই দয়াবান, উদার ও আলোকিত ব্যক্তি। দারাশিকো জীবন নিসার কবিতার খুব প্রশংসা করতেন। তিনি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেন তখন তিনি সবিনয়ে সেগুলো উৎসর্গ করেন দারাশিকোকে এবং তাঁর অনেক কবিতা দেখতে পাওয়া যায় দারাশিকোর দিওয়ানে।[১৫৮০] জীবন নিসা 'জেব' ছদ্মনামে লিখতেন।[১৫৮১]

তিনি তার দুইজন পূর্বসূরির মতো 'মাখফি' (গোপন ব্যক্তি) ছদ্মনামে লিখতেন। একদা নাসির আলী তাকে বলেন—

O envy of the moon, lift up thy veil and let me
enjoy the wonder of thy beauty.

(অনুবাদ)
ও গো চাঁদের ঈর্ষাভাজন রূপসী, সরিয়ে নাও তোমার ঘোমটা;
আমাকে উপভোগ করতে দাও তোমার বিস্ময়কর রূপের ছটা।[১৫৮২]

জীবন নিসা উত্তর দেন :

I will not lift my veil,
For, if I did, who knows?
The Bulbul might forget the rose,

১৫৭৬. Ibid., p. 9.
১৫৭৭. D.S. Roy, Warring Women of Ind. (Bombay; 1973), p. 6.
১৫৭৮. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 9.
১৫৭৯. Ibid., pp. 9-10.
১৫৮০. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 11.
১৫৮১. Macnicol ed. Poems by Indian Women, p. 36.
১৫৮২. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 11. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 80.

www.pathagar.com

The Brahman worshipper
Adoring Lakshmi's grace
Might turn, forsaking her,
To see my face;
My beauty might prevail
Think how within the flower
Hidden as in a bower
Her Fragrant soul must be,
And none can look on it,
So me the world can see
Only within the verses I have writ-
I will not lift the veil.

(অনুবাদ)
আমার ঘোমটা তুলিব না আমি
কারণ কী হবে, কে জানে যদি ঘোমটা তুলি?
বুলবুল হয়তো ভুলে যাবে গোলাপকে-
লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্যের পূজারি ঐ যে
ব্রাহ্মণ, হয়তো মুখ ফিরিয়ে নেবে
যাবে চলে পরিত্যাগ করে তাঁকে।
এমনি কিছু হবে দেখে আমাকে।
বেঁচে রইবে অপার সৌন্দর্য রাশি,
যেমন কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলের শোভায়
নিহিত রয় আত্মার সুরভি;
ফুলের সুরভিত আত্মা অবশ্যই
পারে না কেউ দেখতে;
তেমনি আমাকেও বহিঃঅঙ্গে দেখতে পারেন না পৃথিবীবাসী,
কবিতার মধ্যে এ কথাই শুধু আমি লিখেছি-
আমার ঘোমটাখানি তুলব না আমি।[১৫৮৩]

তবু অন্য এক সময়ে তিনি বলেন—
When from my cheek I lift my veil,
The roses turn with envy pale.

১৫৮৩. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, pp. 11-12.

www.pathagar.com

And from their pierced hearts, rich with pain,
Send forth their fragrance like a wail.
Or if perchance one perfumed tress
Be lowered to the wind's caress,
The honeyed hyacinths complain,
And languish in a sweet distress
And, when I pause, still groves among,
(Such loveliness is mine) a throng,
Of nightingales awake and strain
Their souls into a quivering song.

(অনুবাদ)
যখন আমি আমার কপোল থেকে ঘোমটা করি উন্মোচন
গোলাপেরা করে ঈর্ষায় পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ।
তাদের বর্শাবিদ্ধ বেদনায় রুদ্ধ হৃদয় থেকে
পাঠায় সৌরভ নির্মম কষাঘাতে।
অথবা যদি হঠাৎ এক সুরভিত কেশগুচ্ছকে
নিচে আলগা করে দেওয়া হয় বাতাসের সোহাগে
তবে সুমিষ্ট কচুরিপানা জানায় অভিযোগ
হয়ে অবসন্ন এক মধুর দুর্যোগে।
এবং যখন আমি থেমে পড়ি তরুবীথি মাঝে
সৌন্দর্য মোর ঠিক এমনই বিরাজ ;
সমবেত বুলবুল পাখিরা সেথায় ওঠে জেগে
এবং তাদের হৃদয় নিঙরে বেরোয় সঙ্গীত বেগে।[১৫৮৪]

জীবন নিসার কবিতায় রয়েছে প্রেম, সৌন্দর্য, করুণ রস ও আধ্যাত্মিকতার অনুভূতি। ১৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পরে তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো দিওয়ান-ই-মাখফি বা একজন গোপন ব্যক্তির গ্রন্থরূপে সংগৃহীত হয়।[১৫৮৫] এতে ছিল ৪২১টি গজল ও কয়েকটি রুবাইয়াৎ। ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরো কয়েকটি গজল সংযোজিত করা হয় এর সঙ্গে।[১৫৮৬] স্যার যদুনাথ সরকারের মতো কয়েকজন ঐতিহাসিক এই অভিমত পোষণ করেন যে, দিওয়ান-ই-মাখফি জীবন নিসা বেগমের দ্বারা লেখা সম্ভব হয়নি,

১৫৮৪. Poem, tr. by Sarojini Naidu in Macnicol ed. Poems by Indian Women, p. 77.
১৫৮৫. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 20.
১৫৮৬. Ibid., p. 20.

www.pathagar.com

কারণ মাখফি এই ছদ্মনামটি ব্যবহৃত হয়েছে তখনকার অনেক কবি দ্বারা।[১৫৮৭] হয়তো দিওয়ান-ই-মাখফি জীবন নিসার হাতে লেখা হয়নি। অন্য কেউ জীবন নিসার কাছ থেকে শ্রুত লিখন পদ্ধতিতে এটা রচনা করেছেন। দিওয়ান-ই-মাখফির সুন্দর কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে বিরাট কবি প্রতিভা ও সুফি ভাবধারা। এই কাব্যের বিষয়বস্তুতে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আরাধনা করা হয়েছে পরম সুন্দররূপে, স্বর্গীয় প্রেমাস্পদরূপে যিনি লাভ করেন আমাদের ভালোবাসা ও ভক্তি, কিন্তু তিনি আবার অত্যাচারী এবং তিনি তাঁর প্রেমিককে হতাশার মধ্যে ঠেলে দেন কিন্তু মৃত্যুকালে আবার তাকে দেন আশার আলোক রশ্মি।

ঐশী প্রেমের পথ অত্যন্ত কঠিন এবং তাতে রয়েছে অনেক বাধাবিঘ্ন।

Here is the path of love– how dark and long
It's winding ways, with many snares beset.
Yet Crowds of eager pilgrims onward throng
And fall like dove into the fowler's net.

(অনুবাদ)
এই তো এখানে ঐশী প্রেমের দীর্ঘ ও আঁধার পথখানি,
এর আঁকাবাঁকা পথে অনেক ফাঁদ বিছানো জানি,
তথাপি ব্যাকুল তীর্থযাত্রীরা ভির করে যে হেথায়
এবং পূর্ণ করে শিকারির জাল ঘুঘু পাখির প্রায়।[১৫৮৮]

কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ঐশী প্রেমের পথে উপনীত হলে পাওয়া যায় সান্ত্বনা ও চিরন্তন শান্তি এবং সাধকের মন বুঝতে পারে স্বর্গস্থ বন্ধু ছাড়া মানব জীবনের ব্যর্থতা।

O Foolish heart,
Thy carelessness how can I comprehend?
Hast thou no strength, no will, to tear a part
The barrier that divides me from my Friend?

Treading love's path so long;
Under such heavy burden did I bow.
At last my chastened heart has grown so strong,
No task, no pain, can bend my spirit now.

১৫৮৭. Sarkar, Studies in Mughal India, p. 80.
১৫৮৮. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa. Verses V, p. 31.

www.pathagar.com

I have wiped clean my heart
From actions, yea and from desires as well,
And yearn alone for peace, to have no part
At Judgement day, either in Heaven or Hell.

(অনুবাদ)
ওগো মোর অবুঝ মন,
কীভাবে বুঝবো আমি তোমার অবহেলা?
তোমার কি নেই শক্তি ও সংকল্প যা দ্বারা
ছিন্ন করতে পারো সেই বিঘ্ন ও বাধা
যা দ্বারা আমার বন্ধুকে তোমা থেকে করেছে আলাদা?

জীবনের এমন ভারী বোঝা বয়ে বয়ে
প্রেমের এত দীর্ঘ পথ বেয়ে
আমি প্রণতি দিয়েছি মোর প্রেমাস্পদকে;
অবশেষে মোর পবিত্র হৃদয় হয়েছে শক্তিশালী এত
কোনো কাজ, কোনো ব্যথা এখন করতে পারে না মোর আত্মাকে অবনত।
কাজকর্ম ও আশা আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে
আমি মোর হৃদয়কে করেছি মার্জিত নির্মল;
এবং বিচারের দিনে স্বর্গ নরকের পরিবর্তে
শুধু শান্তির কামনাকে করেছি প্রবল [১৫৮৯]

প্রেমাস্পদের প্রেম সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করে, প্রেমিককে করে শৃঙ্খলযুক্ত এবং সেই প্রেম থেকে পলায়নের আর কোনো পথ নেই। তখন হৃদয় শুধু একটি বস্তুই কামনা করে– প্রেমাস্পদের দর্শন,

ভক্তের হৃদয়ে আনন্দ ও কামনায় পরিপূর্ণকারী তাঁর পরম সুন্দর রূপ।

The love of thee the bulbul sings.
The moth that burns its silken wings.
Thy love has drawn into fire.
And see the wine of thy desire –
On every goblet's lip it clings –
No case, no respite any where

১৫৮৯. Ibid., verse XIV p. 47.

www.pathagar.com

And now for me, for in thy snare
Blindly or willingly I fall.
No liberty have I at all.
Bound by the fetters of thy hair.[1590]
Long, long am I denied.
The vision of thy face, for o'er it flows
The musky darkness of thy waving hair,
As though a temple curtain should enclose
The Kaaba, and our hearts, unsatisfied.
Could never see it there.

....

Night after endless night
I sat in lonely grief remembering thee.
Tears fell into my heart disconsolate
How long have I, in striving to be free.
Broken my bleeding nails, but never quite
Untied the knot of fate !

....

Stronger my love shall grow.
Bearing the bonds of sorrow for thy sake.
More patient and more proud my heart shall be,
Like the imprisoned bird who tries to make
His cage a garden, though His wild heart knows
He never shall be free.[1591]
Let not thy curl, whose loveliness
Maddens the world, bring new distress
Upon thy lovers, floating free,
Tossed by the wind that all may see
And fall beneath thy sorcery.

১৫৯০. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa. Verses XXXVIII, P. 86.
১৫৯১. Ibid., verse XLIV, p. 95.

www.pathagar.com

Let not the valley of thy love
A place of bitter torment prove
For dolorous souls, already worn
By all the penance they have borne
Betrayed by love and left forlorn.[1592]

(অনুবাদ)
তোমার প্রেমে বুলবুল গায় গান,
তোমার প্রেমের টানে পতঙ্গের দল
রেশমি ডানাসহ করে জ্বলন্ত অনল
মাঝে আত্মাহুতি দান।
ঐ দেখ তোমাকে পাবার বাসনা প্রবল
প্রতি গ্রাসে ওষ্ঠদেশে চিত্রিত অবিকল;
কোথাও নেই কোনোক্রমে ইহার বিরতি
আমার বেলাতে, কারণ ওহে জগৎপতি
অন্ধজনের মতো আমি তো স্বেচ্ছায়
পড়েছি তোমার প্রেমের ফাঁদে, হায়!
পরাধীন আজি আমি প্রেমের খেলায়!
তোমার কেশগুচ্ছের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছি আমি; (১৩৫)
সুদীর্ঘ কাল ধরে ওগো জগৎস্বামী
তোমার প্রিয় মুখের দর্শন চেয়েও পেয়েছি প্রত্যাখ্যান,
কারণ তোমার প্রিয় মুখের উপরে ঐ যে প্রবহমান
মুখোশের মতো তোমার ঢেউ খেলানো কেশ
যেন ভজনালয়ের একটি পর্দা দেবে না প্রবেশ
অধিকার কাবাগৃহে এবং মোদের অতৃপ্ত হৃদয়-মন
পাবে না কভু সেথায় তোর প্রিয় বদনখানি দরশন।

....

সমাপ্তিহীন রাতের পর রাত ধরে
আমি বসে ছিলেম বিমর্ষ একেলা তোমার তরে।
মোর অতৃপ্ত হৃদয়ের কত না সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারায়,
কেটেছে মোর জীবনের দিনগুলো মুক্তির প্রত্যাশায়।

১৫৯২. Ibid., verse XLIX, p. 105.

www.pathagar.com

মোর হাতের অবক্ষয়িত নখগুলো থেকে তো হয়েছে রক্তক্ষরণ
কিন্তু কখনো আমি ছিঁড়িতে পারিনি ওগো মোর ভাগ্যের বাঁধন।

....

তোমার জন্য বন্ধু গো মোর প্রেম যে হয়ে উঠবে আরো প্রবল
তোর প্রেমে মোর বেদনার বন্ধনকে করি সমুজ্জ্বল।
আমার হৃদয় হবে ধৈর্যশীল ও গর্বিত আরো,
খাঁচায় বন্দি পাখির মতো মুক্তি প্রচেষ্টায় রত–
প্রেয়সী যেন খাঁচাকে উদ্যানে করে পরিণত।
যদিও সে জানে তার কারাবাসী মন
পাবে না মুক্তি এই জীবনে কখনো।(১৩৬)
তোর প্রেমের উপত্যকা পরিশ্রান্ত বিমর্ষ ব্যক্তিদের তরে
যেন পরিণত না হয় হে প্রিয়তম তিক্ত যন্ত্রণা ভরা স্থানে,
সকল বেদনা সয়ে সয়ে
প্রেম বঞ্চিত ও রিক্ত হয়ে। (১৩৭)

ঐশী প্রেমপীড়িত ও প্রেমক্লিষ্ট হৃদয়ের জন্য একমাত্র আনন্দ নিহিত রয়েছে স্বর্গীয় প্রেমাস্পদের ক্ষণিক দরশনে।

When thou unveil's thy shining countenance,
Burnt are my lashes by thy lightning glance,
And all the night I passionately weep,
While o' er my heart tempests of longing sweep,
And If I see it not, desiring it,
My heart is darkened like a lamp unlit,
I have no hope, no comfort any where,
Caught by the fluttering of thy hair. [১৫৯৩]
No remedy can heal the heart's distress
Except the vision of thy loveliness,
Here, suffering souls, the solace that you need!
Tear not your wounds, no longer make them bleed. [১৫৯৪]

১৫৯৩. Ibid., verse XXXVII, p. 85.
১৫৯৪. Ibid., verse XLVII, p. 103.

www.pathagar.com

(অনুবাদ)

যখন তুমি তব উজ্জ্বল চেহারা করো অনাবৃত,
মোর চোখের পলক তব বিজলি তুল্য চাহনিতে হয় দগ্ধীভূত।
এবং আবেগের সাথে আমি কাঁদি সারাটি রাত
যখন মোর হৃদয়ের উপরে বহে ঝঞ্ঝাঘাত।
যদি আমি তোকে না দেখতে পেয়ে তার জন্য করি অভিপ্রায়,
আমার হৃদয় আঁধারেই ঢাকে নিভানো প্রদীপের প্রায়।
আমার নেই কোনো আশা, নেই আনন্দ অন্য কোথাও;
তব চঞ্চল কেশগুচ্ছে আমি বন্দিনী হে সখা।
কোন ঔষধই নিরাময় করতে পারে না মোর মন,
যদি না পাই আমি তোমার স্বর্গীয় রূপের দরশন।
হেথায় বেদনার্তজন সবে মিলে তব সান্ত্বনা করে অন্বেষণ।
ছিন্ন করো না মোদের ক্ষতগুলো, আর হতে দিয়ো নাকো রক্তক্ষরণ।

হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মুছে যায় যদি প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের দর্শন লাভ করে এবং প্রেমিকের প্রতি বর্ষিত স্বর্গীয় করুণার জন্য তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কৃতজ্ঞতায়।

From the glance thou bestowed, O Beloved,
Flows beauty no words can express;
My life– it were little to offer in thanks
For thy bountifulness. (140)

(অনুবাদ) তোমার দেয়া ক্ষণিক দৃষ্টি থেকে, হে প্রিয়তম!
হয় প্রবাহিত সৌন্দর্যরাশি অনির্বচনীয়।
আমার জীবন যেন অতি সামান্য করিতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,
তোমার প্রেম আর উদারতা সম্ভব তো নয় নিরূপণ।[১০৯৫]

দিওয়ান-ই-মাখফির কতকগুলো কবিতাতে ধ্বনিত হয়েছে সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয় ও মহান প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা। এগুলোতে সম্মিলন ঘটেছে হিন্দু ও মুসলিম ধ্যানধারণার। এই মাখফিতে বলা হয়েছে—

Whether it be in Mecca's holiest shrine.
Or in the temple pilgrim feet have trod.
Still thou art mine,

১০৯৫. Ibid., verse VIII, p. 37.

www.pathagar.com

Wherever god is worshipped is my God .[১৫৯৬]

O Makhfi, if the Kaaba keeper close
To Thee His door.
Complain not, thou possessest even more
A holy place;
For look into the well-Beloved Face,
Over His Eyes
Arches more fair than Kaaba gates arise;
Thy heart shall bend.
Itself an arch way welcoming the friend.[১৫৯৭]

In the mosque I seek my idol shrine.
On the Day of Judgement we should have
Had much difficulty in proving that we were
True believers, had we not brought with us
Our beloved kafir idol as a witness! [(143)]

(অনুবাদ)
হতে পারে তা কাবাগৃহের পবিত্রতম তীর্থস্থান
অথবা সেই মন্দির যেথা তীর্থযাত্রী করছে পদার্পণ,
তথাপি তুমি যে আমার, ও গো চিরদিন তুমি যে আমার।
যেথাই ঈশ্বরের অর্চনা হয়ে থাক্, তিনি তো আমার। [(১৪১)]
ও হে মাখফি, যদি কাবাগৃহের দ্বারপাল
তোমার তরে তার দরজাটি রুদ্ধ করে দেয়;
তবে করো নাকো অভিযোগ, হে ঐশী প্রেমের ভিখারিনী।
কাবার চেয়েও পবিত্র স্থানের যোগ্য তুমি হে বরেণ্য।
কারণ চেয়ে দেখ তুমি ঐ সুপ্রিয় মুখপানে
তাঁর সুদর্শন নয়ন যুগল 'পরে;
কাবার চেয়ে সুন্দর খিলানশ্রেণি সমুদয় সেথায়,
তব হৃদয় হবে অনবত তা দেখে।
খিলানের নিম্নে পথসদৃশ পরম বন্ধুকে অভ্যর্থনাকারী। [(১৪২)]

১৫৯৬. Ibid.. verse II, p. 27.
১৫৯৭. Ibid.. verse III, p. 28.

www.pathagar.com

মসজিদে, আমি যে আমার প্রেমপ্রতিমার বীর্য অন্বেষণকারী।
বিচার দিনে মোরা হব অনেক সমস্যার সম্মুখীন
মোদের পরিচয় দিতে বিশ্বাসী বলে,
যদি মোরা না আনি প্রকৃত মোদের পরিচয়
সাক্ষ্য মোদের প্রেমাস্পদের কাফির মূর্তি রয়।[১৫৯৮]

জীবন নিসা তার পিতার মতো ছিলেন না; তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে ছিল উদার ধারণা এবং তিনি বিশ্বাস করতেন স্বর্গীয় প্রেমাস্পদ ও সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বন্ধুরূপে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের নামে, উপাসনাতে।

তাঁর কতকগুলো কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মীয় ঐক্যানুভূতি।

No Muslim I,
But an idolater.
I bow before the image of my love.
And worship her;
No Brahman I,
My sacred thread
I cast away, for round my neck I wear.
Her plaited hair instead.[1599]

(অনুবাদ)
কোনো মুসলিম তো নই আমি;
আমি জনৈক প্রতিমা পূজারি।
আমি অনবত করি আমার মাথা
আমার প্রেমের প্রতিমার সামনে
এবং উপাসনা করি যে তারে।
কোনো ব্রাহ্মণ নই আমি,
আমার প্রবিত্র পৈতাটি
ছুড়ে ফেলে দিয়েছি আমি;
কারণ আমি পরিধান করি আমার কণ্ঠে
তাঁর বেণীগাঁথা কেশগুচ্ছের বদলে।[(১৪৪)]

১৫৯৮. Ibid., p. 22.
১৫৯৯. Ibid., p. 22.

www.pathagar.com

জীবন নিসার পরবর্তী জীবনের কয়েকটি বছর কেটেছে বন্দি অবস্থায় ও নির্জনতায় এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

(অনুবাদ)
রাজার কন্যা হয়েও আমি হয়েছি দারিদ্র্যের মুখোমুখি;
এই দারিদ্র্য আমায় করেছে শোভিত যৌবনের রূপরাশি
নামটি আমার জীবন নিসা (নারীর শোভাদায়িনী)।[১৬০০]

তাঁর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—
Long is thine exile, Makhfi, long thy yearning.
Long shalt thou wait, thy heart within thee burning.
Looking thus for word to thy home returning.
But now what home hast thou, unfortunate?
The years have passed and left it desolate.
The dust of ages blows across its gate.
If on the Day of Reckoning
God says, " In due proportion I will pay.
And recompense thee for thy suffering."
Lo, all the joys of heaven it would out weigh;
Were all God's blessings poured upon me, yet
He would be in my debt. (১৪৬)

(অনুবাদ)
ওহে মাখফি! দীর্ঘ তোমার ঔৎসুক্য এবং দীর্ঘ তোমার নির্বাসন
দীর্ঘকাল থাকবে তুমি প্রতীক্ষায়, তোমার অন্তরে জ্বলছে আগুন।
তোমার ঘরে ফেরার দিনের তরে আছি পথ পানে চেয়ে,
কিন্তু ওহে হতভাগী, এখন তোমার কোনো গৃহ আছে বলো?
বছরের পর বছর কেটে গেছে,
এবং তোমার কাঙ্ক্ষিত স্বগৃহ নির্জনে পড়ে আছে;
যুগ-যুগান্তরের ধূলিবালি বহে দরজার কাছে।
শেষ বিচারের দিনে যদি খোদা বলেন ডেকে—
তোমার প্রেমের মূল্য দেবো, হিস্যা অনুপাতে
দেবো আমি তোমার কষ্টের ক্ষতিপূরণ;

১৬০০. Verse tr. by Barakat Ullah in Macnicol's Poems by Indian Women, p. 78.

www.pathagar.com

স্বর্গের সকল আনন্দেও হবে না সমতুল্য ওজন।
যদি খোদার সকল আশীর্বাদ পড়ে ঝরে
ঐ আসমান থেকে আমার মাথার 'পরে
তথাপি তিনি থাকবেন আমার ঋণডোরে।[১৬০১]

তাঁর বন্দিজীবনের দিনগুলোতে নাসির আলী ব্যতীত সকল বন্ধু তাঁর পাশ থেকে সরে যান দূরে।

Friends had I, many friends, who shared with me
Days glad and sad.
But mine they are no more, I am cut free
From all I had. [(147)]

(অনুবাদ)
একদা অনেক বন্ধু ছিল তো আমার,
আমার সুখ-দুঃখের হয়ে অংশীদার।
কিন্তু আজ আর আমার নয় গো তারা,
বিচ্ছিন্ন আমি এখন সকল বন্ধুহারা।[১৬০২]

তথাপি অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন :
(অনুবাদ) অতি দীর্ঘকাল এসব শৃঙ্খল জড়িয়ে আছে আমার দুটি পায়ে;
আমার বন্ধুরা সবে পরিণত হয়েছে শত্রুতে, আত্মীয়রা আগন্তুকে।
বন্ধুরা যখন উদ্যত মোরে করতে অপমান
তখন নিজের সম্মান রক্ষার্থে উদ্বিগ্ন চিত্তে
আর করার আছে কী বলো ওহে ভাই-ভগিনি?
চেষ্টা করো না মাখফি, দুঃখের কারাগার থেকে করতে পলায়ন;
কারণ তোমার মুক্তি তো নয় রাজনীতির কোনো বিষয় বিলক্ষণ।
ওগো মাখফি! তোমার মুক্তির আর কোনো আশা নেই যে
শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত! মজনুনের সমাধি থেকে
এমনকি আমার কানে এসেছে ভেসে এই বারতা–
"ওগো লায়লা, প্রেমের দ্বারা হয়েছে আক্রান্ত যারা
কবরেও পাবে না তারা কোনোই বিশ্রাম সুখ।'

১৬০১. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa. p. 18 (Introduction).
১৬০২. Ibid., verse XII. p. 4.

www.pathagar.com

আমি তো কাটিয়েছি মোর সারাটি জনম,
কিন্তু আমি হায় করিনি তো
দুঃখ, অনুশোচনা ও অতৃপ্তি
কামনার অশ্রু ছাড়া কিছু অর্জন ।[১৬০৩]

সমাধিক্ষেত্রে উৎকীর্ণ লিপির মতো একটি নিরানন্দ কবিতা শ্লোকে জীবন নিসা প্রকাশ করেছেন তাঁর পিতার নিষ্ঠুরতার কথা-

(অনুবাদ) হিন্দুস্তানের মাটিতে আমি এমন নিষ্ঠুর ও কঠোরতার লভিনু অভিজ্ঞান, চলে যাব আমি অন্য কোথাও, রচিবারে এক নতুন শান্তি সুখময় বাসস্থান ।[১৬০৪]

জীবন নিসা বেগম তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও সপ্রতিভ কাব্যধর্মী মন্তব্য ও প্রশ্নোত্তর দানের জন্যও বিখ্যাত । একদা রাজপ্রাসাদের একজন পরিচারিকা বলে জীবন নিসাকে- চীন দেশীয় দর্পণটি ভেঙ্গেছে এবং নষ্ট হয়েছে । জীবন নিসা তার উত্তরে বলেন-

সব কিছু ঠিক আছে; অহমিকা ও নিজেকে দেখার প্রয়োজনীয় একটি জিনিস চলে গেছে মাত্র ।[১৬০৫]

অন্য একটি বিষয়ে নিম্নোক্ত উক্তিটি-
অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো একটি মুক্তা বিরল ।

এর ব্যাপারে জীবন নিসা মন্তব্য করেন ;
যদি না হয় তা কাজলপরা কোনো কুমারীর অশ্রুজল ।[১৬০৬]

একদা সবুজ পোশাক পরিধান করে জীবন নিসা যখন প্রাসাদের ছাদের উপরে হাঁটছিলেন তখন তাঁর প্রণয়প্রার্থী আকিল খান তাঁকে দেখে মন্তব্য করেন—

সবুজ পোশাক পরিহিত একটি মানবী আবির্ভূত হয়েছে বেহেস্তের নীল খিলান করা ছাদের নিচে ।

দ্রুত উত্তর দেন জীবন নিসা :

ধর্মের নামে শপথ করে বলছি বল প্রয়োগ, স্বর্ণ বা প্রতারণা কোনো কিছুই তাকে আনবে না তোমার কাছে ।

১৬০৩. Ibid., p. 18.
১৬০৪. W. Hansen, The Peacock Throne (Great Britain; 1973), p. 465.
১৬০৫. Quoted from Hadi Hasan, Mughal Poetry, p. 8; A Golden Treasury of Persian Poetry, pp. 402-403.
১৬০৬. A Golden Treasury of Persian Poetry, pp. 402-403.

www.pathagar.com

আকিল খান যখন তার প্রেমের প্রস্তাব অব্যাহত রাখেন তখন তিনি কবি সাদীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

কেন বিচক্ষণ ব্যক্তিটি এমন কাজ করবেন, যা তাঁর জন্য অনুশোচনা বয়ে আনবে?[১৬০৭]

এই কবিতার মধ্যে তাঁর দুঃখ ও বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(অনুবাদ) ও গো জলপ্রপাত, তুমি এমন শোক প্রকাশ কর কার জন্য?
দুঃখে তুমি তোমার মাথা অবনত রেখেছ নিম্নে কার তরেতে?
কোন্ ধরনের যন্ত্রণা এটা যে আমার মতো কাঁদো সারাটি জনম ধরে
তুমি কেন পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে অশ্রু বিসর্জন করেছ রাতের আঁধারে?[১৬০৮]

জীবন নিসার কবিতাগুলো অন্য কিছু অপেক্ষা বেশি প্রকাশ করেছে তাঁর জীবনের দুঃখ ও বেদনা। সম্ভবত তাঁর দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তা ধারাকে- করেছে আধ্যাত্মিকতামুখী। কিন্তু তার উদার ধর্মীয় মতো তাঁকে তাঁর পিতার মতো ধর্মীয় দিক থেকে গোঁড়া স্বভাবের ব্যক্তিতে পরিণত করেনি। তাঁর কবিতাগুলোতে ধ্বনিত হয়েছে স্বর্গীয় প্রেমাস্পদের প্রতি ভালোবাসা, শান্তির অবতারের প্রতি ভালোবাসার মতো সুফি চিন্তাধারা। তাঁর মতে এই স্বর্গীয় প্রেমাস্পদের কাছে পৌঁছা যাবে অত্যন্ত কঠিন ও কণ্টকময় পথে এবং তাঁর প্রেম প্রেমিককে এমন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, যা থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই তাঁর ধর্মীয় মতামত পরমেশ্বরের একত্ব ও বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত। তাঁর কবিতাগুলো সত্যিই প্রশংসনীয় এবং কবি হিসেবে তাঁর উঁচুস্তরের মেধাকে প্রকাশ করে। তিনি তাঁর নিজের ভাষায় বলেন– কাব্যের ক্ষেত্রে আমি গোলাপ ফুলের পাপড়িতে লুক্কায়িত সৌরভের মতো একজন গোপন ব্যক্তি। যে কেউ আমার কাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে সেই হয়েছে আমার প্রতি অনুরক্ত।[১৬০৯]

জীনাতুন নিসা

আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় কন্যা জীনাতুন নিসাও ছিলেন শিক্ষিতা। তিনিও ছিলেন দিলরাস বানু বেগমের কন্যা এবং ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ৫ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন আওরঙ্গাবাদে।[১৬১০]

১৬০৭. Quoted from Hadi Hasan, Mughal Poetry, p. 80; A Golden Treasury of Persian Poetry, pp. 404-405.
১৬০৮. Mughal Poetry, p. 79; A Golden Treasury of Persian Poetry, pp. 402-403.
১৬০৯. Ila Mukherjee, Social Status of North Indian Women (Agra: 1972), p. 105.
১৬১০. Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. p. 70.

www.pathagar.com

১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বহু বছর এবং তারপরেও কয়েক বছর তিনি তাঁর পিতার গার্হস্থ্যকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। তিনি তার ধর্মপরায়ণতা ও বদন্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দিল্লিতে জীনাতুল মস্‌জিদ নামে তিনি একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করেন নিজ খরচে। মৃত্যুর পরে তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়।[১৬১১]

জীনাতুন নিসাও তাঁর বড় বোনের মতো একজন কবি ছিলেন, যদিও তাঁর কবিতাগুলো সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবত অন্যান্য মোঘল শাহজাদির মতো এই কাজে নিয়োজিত থাকতেন শুধু অবকাশ যাপনের জন্য। পারস্য ভাষায় তাঁর সমাধিক্ষেত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে–

(অনুবাদ) আমার সমাধিতে খোদার রহমতই কেবল আমার তরে সাহায্য এটাই যথেষ্ট যদি তাঁর করুণার মেঘ ঢেকে রাখে আমার স্মৃতিসৌধ।[১৬১২]

এভাবে মোঘল যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে মোঘল পুরুষদের মতো মোঘল রাজকীয় মহিলা ও শাহজাদিরা অবদান রাখেন নিজ নিজ পন্থায়। মনে হয় যে, কবিতা রচনা করা এসব সুশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনা ও অত্যন্ত গুণান্বিতা মোঘল রাজকীয় নারীদের প্রিয় অবকাশ যাপন প্রণালি ও শখ ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু কবিতা রচনা ও সুশিক্ষা লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এইসব মহিলা এক ধাপ অগ্রসর হয়ে মহৎ সাহিত্যবিষয়ক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক রাজকীয় মহিলার ছিল বই সংগ্রহের আকর্ষণ এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থাগার পরিচালনা করতেন প্রাসাদের মধ্যে। অনেকে ছিলেন শিক্ষার উদার পৃষ্ঠপোষক এবং বিদ্যা ও শিক্ষার প্রসারের জন্য স্থাপন করেন বিদ্যালয় ও কলেজ। তাঁরা তাঁদের কাছে সমবেত বহুসংখ্যক পণ্ডিত, কবি ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে জমি ও অর্থ মঞ্জুরি দান করেন।

জীবন নিসার আর একটি কবিতা নিম্নে দেওয়া হলো—

বুলবুল তব প্রেমে করে গুঞ্জরণ
পতঙ্গের রেশমি ডানা তার সে অনলে পুড়ে
আগুনের তরে তব প্রেমে করেছ মহীয়ান-গরীয়ান।
তাই তব কামনার শরাব করেছি পান
তারই প্রত্যেক পিয়ালা স্পর্শ করে ঠোঁট
কোথাও নেই আবরণ, নেই ক্ষণিক বিশ্রাম

১৬১১. Ibid.,
১৬১২. Verse translated by Barakat Ullah in Macnicol ed. Poems by Indian Women, p. 79.

www.pathagar.com

আর এখন মম তরেতে আছে তব প্রলোভন
না দেখে বা স্বেচ্ছায় আমি পড়ে গিয়েছি,
কেবল নেই মোর কোনো স্বাধীনতা,
তব কেশ বন্ধনী দিয়ে বাঁধাই করা
অনেক অনেক আমি করি অস্বীকার
তব সম্মুখের দৃষ্টি, তার জোয়ার বহে চিরকাল
তব কেশ তরঙ্গিত আঁধারে সুরভিত
যেন এক যবনিকা দেবতার মন্দির করবে অবরোধ।
কাবা ও হৃদয়ে মোরা অতৃপ্ত রই
যেথায় কখনো কভু পারবে না উপলব্ধি করতে
আমি আঁধারে পশ্চাতে আছে দুর্দশা
নির্মম যন্ত্রণায় আমি নির্জনে বসে তোকে জপি,
হৃদয়ে মোর সান্ত্বনা অতীত অশ্রু ঝরে
সংগ্রাম থেকে মোর মুক্তি আর কত দূরে।
মোর ভাঙ্গা নখে রক্ত ঝরে, তবে পুরাপুরি কভু না সারিবে,
অদৃষ্টের সেতুবন্ধন খুলে গিয়েছি।
মোর প্রেম উৎপন্ন করিবে মহত্ত্ব,
দুঃখের দহনে তোর মায়া সহ্য করি এ বিরাগে
বুকে মোর কঠিন ব্যাধি, তবে অহংকার বেড়ে যাবে।
যে নীড় বাঁধতে চেষ্টা করে যেন বন্দিনী পাখি।
যদিও এক উদ্যান তার খাঁচা অসভ্য হৃদয় তাকে চিনে
কখনো সে হবে না স্বাধীন।
তোর বাঁকে যেতে না দিতে যার অনুরাগ জাগে
জগৎ পাগল করে, নিত্য যন্ত্রণা হানে
তোর বন্ধুরা উপরে ভাসমান বন্ধনহীন,
প্রত্যেকে তা বুঝতে পারে হাওয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়ে
আর তোর জাদুর অন্তরালে নেমে আসে।
তোর প্রেম উপত্যকায় অনুমতি না দিতে
ব্যথাতুর এক জায়গা, দারুণ আঘাত হানে
পূর্বেই অঙ্গে বহিলাম বেদনাক্লিষ্ট আত্মার উদ্দেশ্যে
তারা ফলপ্রসূ হয়েছে সকল প্রায়শ্চিত্তের তরে
প্রেম ছলনায় আর অবহেলায় পরিত্যক্ত হলো।
তোর সমুজ্জ্বল মুখ থেকে যবে ঘোমটা খুলবে

www.pathagar.com

তব বিদ্যুতের ঝলকানির দ্বারা মোর কষ্ট বেড়ে যাবে
আর আমি বিহ্বল হয়ে কাঁদি সারারাত।
প্রচণ্ড ধেয়ে প্রবল তৃষ্ণার ঝড় আঘাত হানে মোর হৃদয়ে
যদিও আমি দেখিনি তোকে, তবু কামনা করি,
কোনো আলো ছাড়া যেন আঁধারে রয়েছি আমি একা
কোথাও মোর নেই আশা, নেই কোনো যন্ত্রণা থেকে মুক্তি
শঙ্কিত হয়ে তব কেশের খাঁচায় আবদ্ধ।
হৃদয়ে যন্ত্রণা প্রশমনে নেই কোনো প্রতিকার
মনোরম একমাত্র তব দৃষ্টি ছাড়া।
হেথায় আত্মার যন্ত্রণা ভোগ, তোমার প্রয়োজন সান্ত্বনা।
হেন মর্মব্যথায় নেই অশ্রু, তাদের রক্তপাতে আর নয় সৃষ্টি।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
মোঘল নারীদের শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবদান

মোঘলরা ছিলেন শিল্পকলার প্রতি অনুরাগী। তাঁরা ছিলেন উঁচুমানের স্থপতি, সাহিত্যসেবী, সংগীতজ্ঞ, চিত্রকর, উদ্যান রচয়িতা, পোশাক ডিজাইনার এবং প্রায় সকল প্রকার শিল্পকলা ও কারিগরি বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মোঘলদের অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আর. সি. মজুমদারের মতে, মোঘল যুগ সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাবন ও নবজাগরণের যুগ ছিল না, কিন্তু তা ছিল পরবর্তী পর্যায়ের তুর্কি-আফগান যুগে সূচিত প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ও চরম উৎকর্ষ। প্রকৃত পক্ষে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী শিল্পকলা ও স্থাপত্য আগের সময়ের মতো মুসলিম ও হিন্দু শিল্পকলার ঐতিহ্যও উপাদানের আনন্দপূর্ণ সংমিশ্রণের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে।[১৬১৩]

(ক) স্থাপত্য

মোঘল নারীরা সম্রাট ও শাহজাদাদের দ্বারা নির্মিত সুন্দর বাসগৃহ ও প্রাসাদে বাস করতেন অত্যধিক বিলাসিতার মধ্যে। সম্রাটের হেরেমে নারীর মর্যাদা অনুসারে এসব বাসগৃহ নির্মিত হতো আলাদা আলাদাভাবে, প্রশস্ত ও চমৎকারভাবে। তাদের প্রত্যেকের ছিল নিজস্ব উদ্যান, পানির ঝরনা, চলমান জলরাশির সংরক্ষণার এবং জীবনকে সুখময় করার অন্য অনেক সুযোগ সুবিধা। এই বাস্তবতাটি স্পষ্টরূপে বোঝা যায় ফতেপুর সিক্রির মরিয়মের কোঠি, তুর্কি সুলতানার বাসভবন, যোধা বাঈয়ের মহল এবং অন্যান্য মহিলার বাসগৃহ. আগ্রায় বিলকিস মাকানি (জাহাঙ্গীরের মায়ের), নূরজাহানের বাসভবন ও বিভিন্ন জাতির মহিলাদের বাসস্থানস্বরূপ বাঙালি মহল, দিল্লির লাল কেল্লাস্থ ইমতিয়াজ ও রংমহল এবং লাহোর দুর্গের মহিলাদের বাসগৃহ থেকে। মোঘল মহিলাদের এই সুন্দর ও বিলাসবহুল আবাসিক ভবনগুলো থাকা সত্ত্বেও সেগুলো তাঁদেরকে নিজ প্রচেষ্টায় নির্মাণকার্যে নিমগ্ন হওয়া থেকে নিবৃত

১৬১৩. R.C. Mazumdar ed. An advanced History of India (Madras: 1978), p. 577.

www.pathagar.com

করেনি। মোঘল যুগে আমরা হাজি বেগম, যোধাবাঈ, নূরজাহান, রওশন আরা, জীবন নিসা ও জীনাত-উন-নিসার মতো প্রসিদ্ধ মহিলাদের সাক্ষাৎ পাই কখনো সামগ্রিকভাবে ও কখনো আংশিকভাবে এবং তাঁদের নির্মিত অট্টালিকাসমূহ অস্তিত্বশীল রয়েছে আজও।

১. মোঘল মহিলাদের নির্মিত স্মৃতিসৌধসমূহ

পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা যোগ্য কয়েকটি উদ্যান ব্যতীত বাবর বা হুমায়ুনের রাজত্বকালে মোঘল মহিলাদের নির্মিত কোনো উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা আমরা দেখতে পাই না। কোনো মোগল মহিলার তত্ত্বাবধানে নির্মিত প্রথম স্মৃতিসৌধটি হচ্ছে আকবরের আমলে হুমায়ুনের একজন বিধবা স্ত্রী হাজি বেগম কর্তৃক নির্মিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ। গুলবদন তাঁকে বিগা বেগম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৬১৪] তিনি ছিলেন হুমায়ুনের চাচাতো বোন এবং তাঁর যৌবনকালের স্ত্রী।[১৬১৫]

২. হুমায়ুনের অবদান

দিল্লিস্থ হুমায়ুনের সমাধিসৌধ

হুমায়ুনের মৃত্যুর আট বছর পরে হুমায়ুনের বিধবা স্ত্রী হাজি বেগম কর্তৃক দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়[১৬১৬] এবং তারপরে তিনি এর বিশ্বস্ত তত্ত্বাবধানকারিণী হন।[১৬১৭] এটা মোঘলদের দ্বারা নির্মিত অন্যতম প্রথম উদ্যান বিশিষ্ট সমাধিসৌধ[১৬১৮] এবং এটা ছিল কতকটা পরবর্তীকালে নির্মিত তাজমহলের মডেলস্বরূপ।[১৬১৯] পার্সি ব্রাউনের মতে, হুমায়ুনের সমাধিসৌধটি শুধু ভারতের স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত নয়, মোঘল স্থাপত্যরীতির উন্নয়নে একটি বিশেষ স্মারক চিহ্নও বটে।[১৬২০] গঠনগত ও প্রকৃতিগত দিক থেকে এটা পারস্য দেশীয় ও ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের

১৬১৪. A.S. Beveridge in Gulbandan Begam's Humayun Nama, p. 219.

১৬১৫. Ibid., p. 218.

১৬১৬. Md. Yasin, Studies Historical and Cultural {Jammu (Tawi): 1964}, p. 76.

১৬১৭. A.S. Beveridge in Gulbandan Begam's Humayun Nama, p.220; Sylvia Crowe and Sheila Haywood, The Gardens of Mughal India (Delhi;1973), p. 71; Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period) (Bombay; 1981), p. 89.

১৬১৮. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 71; Md. Yasin, Studies Historical and Cultural, p. 76.

১৬১৯. Md. Yasin, Studies Historical and Cultural, p. 76. James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II (Delhi;1767), p. 290.

১৬২০. Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period), p. 96.

www.pathagar.com

সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত। হ্যাভেলির কাছে এটা শেরশাহের পারস্যরীতিতে প্রভাবিত সমাধিসৌধ।[১৬২১] সমাধিসৌধটি তানপুরার লাল বেলেপাথর দ্বারা সাদা মাকরানা মর্মরপাথর শোভিত করে নির্মিত।[১৬২২]

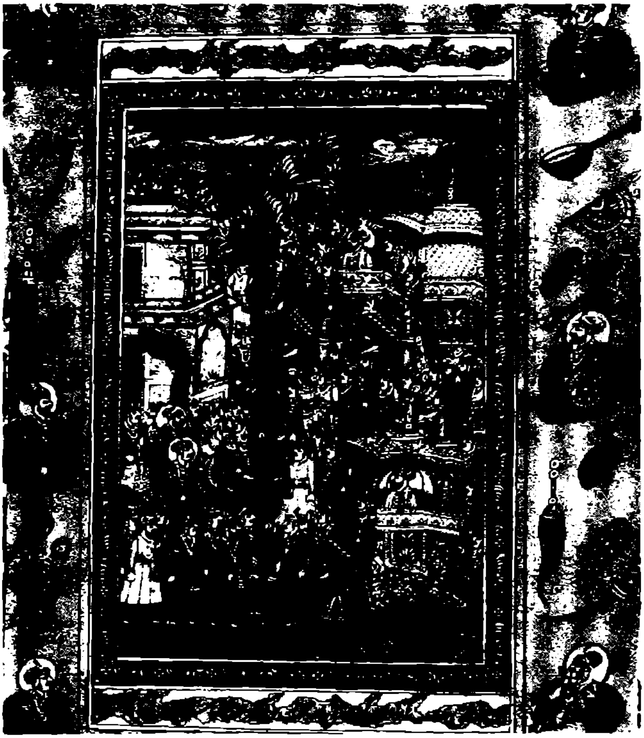

এই সমাধিসৌধের নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে।[১৬২৩] এটা ২২ ফুট উঁচু বিশাল খিলানযুক্ত বর্গাকার মঞ্চের উপরে অবস্থিত এবং খিলানের কারুকাজগুলো সাদা মর্মরপাথরে খচিত।[১৬২৪] প্রধান সমাধিসৌধটি আটটি ধারযুক্ত আড়াআড়িভাবে সাতচল্লিশ ফুট ও চার ইঞ্চি পরিমাণ যুক্ত এবং সাদা মর্মর পাথরের গম্বুজ শোভিত।[১৬২৫] কোণে

১৬২১. J.B. Havell. Indian Architecture through the Ages (New Delhi: 1978), p. 160.
১৬২২. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 71.
১৬২৩. Ibid., p. 71
১৬২৪. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II. p 290.
১৬২৫. Ibid., p 290.

www.pathagar.com

অবস্থিত কক্ষগুলোতে রয়েছে হাজি বেগম ও অন্য নয়জন রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তির সমাধিসৌধ। সমস্ত কক্ষ একত্রে রচনা করেছে প্রতি দিকে প্রায় ১৫৫ ফুট পরিমাপের পরিকল্পিত বর্গাকৃতি স্মৃতিসৌধ। এর কোণাগুলো কিছুটা কাটা।[১৬২৬] বাগানের সাথে সংযুক্তভাবে রয়েছে একটি সুন্দর বাগান। এই অট্টালিকাটি সম্রাট আকবরের অন্য যেকোনো অট্টালিকার মতো নয় এবং এর পরিকল্পনাকারী আমার ধারণা অনুযায়ী অন্য কেউ। ফার ফারগুশানের মতে, হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলি হচ্ছে এর বিশুদ্ধতা এবং এটাকে পরিকল্পনার দৈন্য বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[১৬২৭] স্যার সাঈদ আহম্মদ খান স্মৃতিসৌধটির প্রশংসা করেছেন এভাবে : (অনূদিত) যদি কারও স্বর্গ দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তাকে হুমায়ুনের উদ্যান দেখার জন্য আসতে বলো।[১৬২৮] হাজি বেগম ৩০০ লোকের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আরবান সরাই নামক একটি সরাইখানা ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।[১৬২৯]

৩. মরিয়ম-উজ-জামানির বাউলি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে বিয়ানা থেকে দেড় ক্রোশ দূরে জিসাত পরগনাতে জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম উজ জামানি যোধাবাঈয়ের আদেশে নির্মিত হয় উদ্যান বিশিষ্ট একটি বাউলি (সিঁড়িযুক্ত কুয়া)।[১৬৩০] জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এই বাউলি (সিঁড়িযুক্ত কুয়া) একটি উৎকৃষ্ট নির্মাণকার্য এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে এটা নির্মিত হয়েছে।[১৬৩১] এই বাউলির অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান।

উইলিয়াম ফিঙ্গ তাঁর বর্ণনায় বিয়ানার কাছে মিনাপুর নামক স্থানটি সম্বন্ধে বক্তব্য দিয়েছেন যেখানে তিনি নীল ক্রয় করতে গিয়েছিলেন এবং রানিমাতার (জাহাঙ্গীরের মা) মহল বা গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থলের কাছে একটি সরাইখানাতে অবস্থান করেছিলেন।[১৬৩২] খুব কৌতূহলের সাথে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই দুটো স্থানই ছিল সম্ভবত এক ও একই রকমের।

১৬২৬. Ibid., p. 290.
১৬২৭. Ibid., p. 290.
১৬২৮. Sir Sayid Ahmad Khan quoted in Md. Yasin's, Studie's Historical and Cultural, p. 76.
১৬২৯. Monserrate, The Commentary, tr. J. S. Hoyland (Oxford; 1922), p. 96; Jagdish Narain Sarkar, Mughal Economy (Culcutta; 1987), p. 115; S.K. Banerji, Humayun Badshah, vol. II (Lucknow; 1941), p. 317.
১৬৩০. Tuzuk-i-Jahangiri (tr.), vol. II, p. 64.
১৬৩১. Ibid., p. 64.
১৬৩২. Finch in Foster ed., Early Travels in India (London; 1921), p. 148.

www.pathagar.com

(খ) নূরজাহান বেগমের অবদান

জাহাঙ্গীরের পরমা সুন্দরী স্ত্রী, তাঁর হৃদয় ও সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী এবং মোঘল নারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান নূরজাহান বেগম সাহিত্য, স্থাপত্য, উদ্যান রচনা, পোশাকের নকশা তৈরি, অলংকরণ, শিকার, তীর নিক্ষেপণ বা অন্য কোনো বিষয়ের মতো এমন কোনো চারুকলা ও বাস্তবমুখী বিদ্যা নেই যেখানে তিনি কৃতিত্ব ও অবদানের ছাপ রেখে যাননি। নূরজাহানের শিল্পকলা সংক্রান্ত সকল কৃতিত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী বিষয়টি রয়েছে তাঁর পরিকল্পিত ও পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত স্থাপত্য, অট্টালিকা ও স্মৃতিসৌধসমূহ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আগ্রায় তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধ, জলন্ধরের কাছে নূরমহল সরাই, শ্রীনগরের পাথর মস্‌জিদ, লাহোরের শাহদাজার কাছে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ এবং লাহোরে তাঁর নিজের সমাধিসৌধ।

১. আগ্রাতে অবস্থিত ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধ

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ অট্টালিকা হচ্ছে ইতিমাদ-উদ-দৌলা (সরকারের স্তম্ভ) খেতাবপ্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সেই সঙ্গে তাঁর রানি নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ। নূরজাহানের তত্ত্বাবধানে নির্মিত ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধটির নির্মাণকার্য শেষ হতে ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বছর সময় লেগেছিল।[১৬৩৩]

সমাধিসৌধটি যমুনা নদীর বাম তীরে আগ্রার একটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত। বাগানটির প্রত্যেক পার্শ্বে ৫৪০ ফুট পরিমিত দেওয়ালদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এর প্রত্যেক পার্শ্বে আছে লাল বেলেপাথরের প্রবেশপথ।[১৬৩৪] সমাধিসৌধটি বাগানের মাঝখানে প্রত্যেক পাশে ৬৯ ফুট পরিমিত বর্গাকার মঞ্চের উপরে অবস্থিত।[১৬৩৫] দ্বিতল বিশিষ্ট সমাধিসৌধটির চারধারে আছে অষ্টভুজ টাওয়ার এবং সমাধির ওপর আছে একটি উন্মুক্ত তাঁবু। উপরের তাঁবুতে রয়েছে প্রত্যেক পার্শ্বে বড় ঝাঁঝরিযুক্ত জানালা পরিবেষ্টিত দ্বিতীয় পর্যায়ে একজোড়া সমাধিসৌধের প্রতীক স্মৃতিচিহ্ন।[১৬৩৬] নিচের তলায় রয়েছে একটি কেন্দ্রস্থ প্রতি পাশে ২২ ফুট ৩ ইঞ্চি পরিমিত সামান্তরিক ক্ষেত্র।[১৬৩৭]

১৬৩৩. Ellison Banks Findly, Noorjahan Empress of Mughal India (New York; 1993), p. 230; E. B. Havell, A handbook to Agra and The Taj (London; 1904), p. 87.

১৬৩৪. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, p. 305.

১৬৩৫. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, p. 305; Findly, Noorjahan Empress of Mughal India, p. 231.

১৬৩৬. Findly, Noorjahan ...., p. 231.

১৬৩৭. A. L. Srivastava, Medieval Indian Culture (Agra: 1964) p. 207.

www.pathagar.com

এই কক্ষে আছে ইতিমাদ-উদ-দৌলা ও তাঁর স্ত্রী আসমত বানু বেগমের সমাধিসৌধের প্রতীক স্মৃতিচিহ্ন। এর মেঝেটি মর্মর পাথর দ্বারা তৈরি ও মোজাইক কাজ দ্বারা সুশোভিত। এর দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে ইসলামী ধর্মগ্রন্থের বাণী। চার কোনায় অবস্থিত কক্ষগুলোতে রয়েছে ইতিমাদ-উদ-দৌলার ভাই, বোন ও আরো কয়েকজন পারিবারিক সদস্যের কবর।[১৬৩৮] এই সমাধিসৌধের প্রধান অংশের প্রত্যেক পার্শ্বে রয়েছে বাইরের দিকে খোলা তিনটি খিলান এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি ঝাঁঝরিযুক্ত ল্যানসেট দ্বারা পরস্পর থেকে আলাদা করা হয়েছে।[১৬৩৯]

সমাধিসৌধটির নকশা প্রবলভাবে নারীভাবাপন্ন। সমাধিসৌধটি খুব বড় বা বিশাল নয় এবং একজন ব্যক্তি এর আকৃতি অপেক্ষা অলংকরণের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হন। এটা সম্পূর্ণভাবে সাদা মর্মর পাথরে তৈরি এবং সম্পূর্ণভাবে পেট্রোডুরা নামক কারুকার্যখচিত। এটা ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্সে বিকশিত স্থাপত্য কৌশলের মতো অনেকটা মূল্যবান মসৃণ পাথর খচিত নির্মাণ শৈলীর সাথে সংমিশ্রিত শ্বেতপাথরের আস্তরণ।[১৬৪০] এ ধরনের সাজসজ্জা ভারতে এই প্রথম।[১৬৪১] এই সমাধিসৌধের বহিঃস্থ নিম্নভাগে প্রধানত রয়েছে জ্যামিতিক গঠন এবং বহিঃস্থ উপরের অংশে ফুলের সরল বর্গীয় গাছ, লতাপাতা, আঙ্গুর, ফুলদানি, পানির জগ ইত্যাদি নকশাখচিত। এর উপরিভাগের অলংকরণ এত সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে এটাকে মণিরত্ন রাখার ছোট বাক্সের মতো মনে হয়।[১৬৪২] এই সুন্দর সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজটি ছিল খুব ব্যয়সাপেক্ষ। ডিলেটের মতানুসারে এই জাঁকজমকপূর্ণ সমাধিসৌধটি হিসাব অনুযায়ী ১০ লক্ষ টাকার বেশি খরচে নির্মিত হয়।[১৬৪৩] পিলসার্টের হিসাব মোতাবেক এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত না হতেই ৩,৫০,০০০ রুপি খরচ হয়ে যায় এবং এর নির্মাণকার্য শেষ করতে আরো ১,০০০,০০০ রুপির প্রয়োজন হয়।[১৬৪৪] একটি প্রবাদ আছে যে নূরজাহান এটা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ রুপার দ্বারা তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় আবহাওয়াগত অবস্থার কারণে তার পরিবর্তে

১৬৩৮. A. L. Srivastava. Medieval Indian Culture, p. 207; E. B. Havell. A handbook to Agra and The Taj. p. 86.

১৬৩৯. Findly, Noorjahan ...., p. 231.

১৬৪০. Ibid., p. 239

১৬৪১. Findly, Noorjahan ...., p. 231-32; Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, p. 305

১৬৪২. Findly, Noorjahan ...., p. 232; Bamber gascoigne, The Great Moghals (London: 1976), p. 159.

১৬৪৩. Delect, The Empire of Great Moghals, tr. J.S. Hoyland (New Delhi: 1974), p. 41.

১৬৪৪. Pelsaert, The Remonstrantic........, tr. W.H. Moreland & P. Gayl, p. 5.

www.pathagar.com

মর্মরপাথর ব্যবহারের জন্য তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।[১৬৪৫] এর সম্পূর্ণ খরচ নির্বাহ করা হয় নূরজাহানের রাজকীয় কোষাগার থেকে।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধটি ছিল নানা দিক দিয়ে উদ্ভাবনশক্তিপূর্ণ। এটা ভারতীয় ধারায় পরিবর্তিত লাল বেলেপাথরের এবং আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের মর্মর পাথরের নির্মাণকাজ এবং পারস্য ধারায় পরিবর্তিত শাহজাহানের সুভ্রমর্মর পাথরের স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে অবস্থান্তর প্রাপ্তির পরিচায়ক।[১৬৪৬] শ্বেত মর্মর পাথরের সামগ্রিক কাঠামো, পেট্রোডুরা নামক অভ্যন্তরীণ কারুকাজ, দেওয়ালে পারস্য দেশীয় স্ফটিক ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে এর ডিজাইন (নকশা) পরবর্তীকালে নির্মিত তাজমহল নির্মাণকার্যে গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৬৪৭] চার কোনায় অষ্টভুজ টাওয়ারসহ ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের সামগ্রিক কাঠামো লাহোরের শাহদারাতে নির্মিত জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধের মডেল হিসেবে কাজ করেছিল।[১৬৪৮] পার্সি ব্রাউন এই স্মৃতিসৌধের উচ্চ প্রশংসা করে বলেন : সমগ্র মোঘল স্থাপত্যকর্মে এমন আর কোনো অট্টালিকা নেই। এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমনীয়তা ও অলংকরণের বিশুদ্ধতা এটাকে একটি শ্রেণিতে পরিণত করেছে।[১৬৪৯]

২. জলন্ধরের নূরমহল সরাইখানা

মোঘল যুগ ছিল অর্থনীতিসহ আমরা ভাবতে পারি এমন প্রায় সকল ক্ষেত্রে উন্নতির যুগ। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তৎসহ রাজনীতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের সংযোগ সাধনকারী বহুবিস্তৃত রাস্তাঘাট নির্মাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই সকল রাস্তার পাশে ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজি রোপণ করা হয়েছিল, কূপ খনন করা হয়েছিল এবং পথিকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল– সরাইখানা নামক বিশ্রামের স্থান। এই সকল কর্মধারায় সম্রাটদের পাশাপাশি মোঘল নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের জলন্ধরের কাছে অবস্থিত নূরমহল সরাই মোঘল নারীদের গৃহীত এই ধরনের কার্যাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সরাইখানার নাম থেকে পাওয়া

১৬৪৫. Findly, Noorjahan ...., p. 230.

১৬৪৬. Findly, Noorjahan .... p. 233; Md. Yasin, Studie's Historical and Cultural, p. 81; Havell. A handbook to Agra and The Taj, p. 87; George Michell, ed. Architecture of the Islamic world (London; 1978), p. 266.

১৬৪৭. Findly, Noorjahan ...., p. 233; Md. Yasin, Studie's Historical and Cultural, p. 81; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.123.

১৬৪৮. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.123.

১৬৪৯. Percy Brown quoted in the Cambridge History of Indian, vol. IV (Mughal Period), ed. Richard Burn (Cambridge ; 1937), pp. 552-53.

www.pathagar.com

ধারণা অনুযায়ী ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে নূরজাহান বেগম কর্তৃক নির্মিত হয় এবং তিনি এর সমস্ত খরচ বহন করেন।[১৬৫০] এটা জলন্ধর থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণে, সুলতানপুর থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত।[১৬৫১] সরাইখানাটি নির্মিত হয় ৫৫১ বর্গফুট পরিমিত স্থানের উপরে। এর কোনোগুলোতে রয়েছে অষ্টভুজ টাওয়ার। পশ্চিম দিকের লাহোর গেট নামক প্রবেশ পথটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং লাল বেলে পাথরে নির্মিত। এর সম্মুখভাগ দরজার খোপে খোপে বিভক্ত এবং সমতল থেকে উঁচু করে নকশা তৈরির স্থাপত্য পদ্ধতিতে অলংকৃত। এতে রয়েছে ফেরেশতা, পদ্মফুল, জলপরি, সিংহ, হাতি, পাখি, ময়ূর ও ঘোড়ার পিঠে চড়া মানুষ ইত্যাদির ছবি। হাতির লড়াই ও চারজন অশ্বারোহীর চৌগান খেলার মতো মোঘল সম্রাটদের জীবন সম্বন্ধে বর্ণনাকারী দৃশ্যাবলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।[১৬৫২] প্রবেশ তোরণে যাতায়াত পথের উপর রয়েছে একটি খোদাই কর্ম এবং এর পাশে রয়েছে যুদ্ধরত প্রাণী ও ভাস্কর্য প্রণালিতে তৈরি পদ্মফুলের ছবি। চারটি ছন্দযুক্ত শ্লোকে লেখা পাথরে উৎকীর্ণ লিপিতে এ রকম পাঠ রয়েছে :

১. আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর শাহের ন্যায়পরায়ণ শাসনকালে বেহেশ্‌ত ও যাঁর তুলনা নয় এবং যাঁকে পৃথিবীবাসীরা স্মরণ করে না!
২. নূর সরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পালোর জেলাতে সেই ফেরেস্তা, নূরজাহান বেগমের আদেশ দ্বারা।
৩. কবি সানন্দে এর প্রতিষ্ঠার তারিখ আবিষ্কার করেন; এই সরাইটি ১০২৮ হিজরিতে নূরজাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪. এর প্রতিষ্ঠাকার্য সমাপ্তি বিষয়ক জ্ঞানমূলক তথ্য অনুসারে এই সরাই প্রতিষ্ঠিত হয় নূরজাহান কর্তৃক ১০৩০ হিজরিতে।[১৬৫৩]

সরাইখানার এলাকার মধ্যে ছিল প্রচুর কক্ষ, সম্রাটের বাসস্থান, একটি কুয়া ও একটি মসজিদ। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় এই সরাইখানা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন এ রকম ভাষায় : আমি নূরসরাইতে আমার বাসভবনে বসবাস শুরু করলাম। এই স্থানে নূরজাহানের ভাকিলরা একটি উঁচু বাসভবন তৈরি করেন এবং একটি রাজকীয় উদ্যান নির্মাণ করেন। এখন এর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষে বেগম সাহেব বিনোদনের জন্য সম্রাটের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে একটি জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করেন এবং উপহার হিসেবে

১৬৫০. Findly. Noorjahan ...., p. 229.
১৬৫১. Ibid., p. 229.
১৬৫২. Ibid., p. 229.
১৬৫৩. Findly. Noorjahan ...., p. 229.

www.pathagar.com

উপস্থাপন করেন সকল প্রকার সুন্দর ও দুর্লভ বস্তু। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি পছন্দমতো কিছু জিনিস নিলাম। আমি দুই দিন যাবৎ এই স্থানে অবস্থান করলাম।[১৬৫৪] জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় অন্য এক জায়গায়ও উল্লেখ করেছেন এই স্থান সম্বন্ধে।[১৬৫৫] তখনকার আমলে জলন্ধরের কাছে নূরমহল সরাইটি বেশ প্রসিদ্ধ ছিল এবং প্রচলিত অর্থে সরাই নূরমহল বলতে বোঝাত একটি বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ অট্টালিকা।[১৬৫৬]

৩. নূরমহল সরাই, আগ্রা

নূরজাহান বেগম আগ্রাতেও নূরমহল সরাই নামে আরও একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। পিটার মান্ডি তাঁর বর্ণনায় নূরমহল জেলাতে অবস্থিত এই অট্টালিকার কথা বলেছেন।[১৬৫৭] মান্ডি এই স্থানে ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগস্ট তারিখে যাত্রা বিরতি করেন। এই সরাইখানা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এটা ছিল একটি অত্যন্ত সুন্দর সরাইখানা এবং সম্রাজ্ঞী নূরমহল পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করতে এটা নির্মাণ করেন।[১৬৫৮] মান্ডির হিসাব মতে এখানে দুই থেকে তিন হাজার লোক ও পাঁচশত ঘোড়ার থাকার জায়গা ছিল।[১৬৫৯] এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে পাথরে তৈরি এবং এতে এক টুকরা ফালি করা কাঠও ছিল না। প্রত্যেকটি কক্ষ ছিল কয়েকটি বন্ধনী দ্বারা খিলানযুক্ত। এটা অবস্থিত ছিল তাঁরই নির্মিত দুটি বাগানের মাঝখানে।[১৬৬০] স্যার রিচার্ড কার্নাক টেম্পল বলেন যে এই বাগানগুলোর একটি হচ্ছে শাহজাহানের আমলে নির্মিত মতিবাগ এবং অন্যটি নওয়াল বা নবাবগঞ্জ।[১৬৬১]

৪. পাথর মসজিদ (স্টোনমস্ক), শ্রীনগর

কাশ্মীরে দেখতে পাওয়া যায় মোঘল যুগের অন্যতম মসজিদ পাথর মসজিদটি, যা নির্মিত হয় নূরজাহান বেগমের দ্বারা।[১৬৬২] এই মসজিদটি শাহী মসজিদ

১৬৫৪. Tuzuk.-i-Jahangiri (tr). vol. II, p. 192.
১৬৫৫. Ibid., p. 338.
১৬৫৬. Findly, Noorjahan ...., p. 229.
১৬৫৭. R.C. Temple in the Travels of Peter Mundy in Europe and Asia. vol. II (London; 1914), p. 78n.
১৬৫৮. Peter Mundy, vol. II. pp. 78-79.
১৬৫৯. Ibid., pp. 78-79.
১৬৬০. Ibid., pp. 78-79.
১৬৬১. R.C. Temple in the Travels of Peter Mundy ...... vol. II (London; 1914), p. 78n to 79n.
১৬৬২. Findly, Noorjahan ...., p. 238; Pant, Economic History of India Under the Mughals (Delhi; 1990), p. 119.

www.pathagar.com

(রাজকীয় মসজিদ) ও নও মসজিদ (নতুন মসজিদ) নামেও পরিচিত। মসজিদটি ধূসর বর্ণের চুনাপাথর দ্বারা নির্মিত এবং এর রাস্তামুখী খোলা সামনের অংশটি নয়টি খিলান বিশিষ্ট; তন্মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি অন্য আটটি খিলানের চেয়ে বড়।[১৬৬৩] কথিত আছে যে, এই মসজিদটি জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় এবং যে উদ্দেশ্যে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে এটা কখনো ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ হলো একজন মহিলার তত্ত্বাবধানে নির্মিত হওয়ায়, মুসলমানগণ এই মসজিদটিকে অবজ্ঞা করত। এটাকে ব্যবহার করা হয় একটি ভাণ্ডার কক্ষ হিসেবে।[১৬৬৪]

৫. লাহোরের শাহদারাতে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ

একথা বলা হয়ে থাকে যে, লাহোরের শাহদারাতে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধের নকশা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করেন নূরজাহান বেগম।[১৬৬৫] এটা লাহোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছয় মাইল দূরে দিলকুশা বাগানে অবস্থিত। একদা এটা ছিল নূরজাহানের প্রমোদস্থান এবং বর্তমানে এর নাম শাহদারা।[১৬৬৬] এই সমাধিসৌধের পরিকল্পনা আগ্রাতে অবস্থিত ইতিমাদ-উদ-দৌলার ও[১৬৬৭] সিকান্দ্রাতে অবস্থিত আকবরের সমাধিসৌধের সদৃশ।[১৬৬৮] এর নকশার অন্তর্ভুক্ত ছিল পর্যটকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য দেওয়ালের চারদিকে কয়েক গুচ্ছ কুলঙ্গিসহ একটি বহিঃস্থ সরাইখানা; এর সাথে সংযুক্ত ছিল ভেতরের উদ্যান ও উদ্যানের মধ্যস্থ সমাধিসৌধের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী একটি উঁচু প্রবেশ দ্বার।[১৬৬৯] এর চতুর্দিকে রয়েছে প্রবেশপথ। স্মৃতিসৌধটি ২৫৬ বর্গফুট বিশিষ্ট একটি নিচু ভিত্তিমূলের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এটা তিনতলা বিশিষ্ট অষ্টভুজ মিনার সমন্বিত একটি ছাদযুক্ত মঞ্চ নিয়ে গঠিত। এর একেবারে উপরে রয়েছে সাদা মর্মর পাথরের গম্বুজ। এটা অর্ধবৃত্তাকার ছাদযুক্ত পথসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এর রয়েছে একাধারে একটি দরজাসহ মধ্যবর্তী খিলান ও

১৬৬৩. Findly, Noorjahan ...., p. 239.

১৬৬৪. Pant, Economic History of India Under the Mughals (Delhi; 1990), p. 119.

১৬৬৫. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, p. 304; Havell. A handbook to Agra and The Taj, p. 28; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131; S.M. Jaffar. Some Cultural Aspects of Muslim Rule in India (Delhi; 1922), p. 107.

১৬৬৬. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131.

১৬৬৭. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131; C.M.V Stuart gardens of the great Mughal's (London: 1913), p. 131.

১৬৬৮. C.M.V. Stuart gardens of the great Mughal's (London: 1913). p. 131. A. L. Srivastava. Medieval Indian Culture, p. 208.

১৬৬৯. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131.

www.pathagar.com

প্রত্যেক পার্শ্বে রয়েছে অন্য পাঁচটি খিলান।[১৬৭০] পাথর নির্মিত শবাধারটি পেট্রাডোরা কারুকাজখচিত সাদা মর্মর পাথরে নির্মিত এবং এটা একটি অষ্টভুজ কক্ষে স্থাপিত।[১৬৭১] কথিত আছে যে, এই মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত বুক সমান উঁচু দুর্গপ্রাচীর রাজা রঞ্জিত সিং হরণ করে নিয়ে যান এবং পরে তা পুনরুদ্ধার করা হয়।[১৬৭২] প্রকৃতপক্ষে সমাধিসৌধের বহুলাংশ রাজা রঞ্জিত সিং কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তিনি তাঁর নিজ অট্টালিকার জন্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যান মর্মর পাথরটি।[১৬৭৩] অট্টালিকাটিতে গম্বুজ নেই এবং একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি যে, সমাধিসৌধটির একটি মধ্যবর্তী গম্বুজ রয়েছে কিনা যার নির্মাণ কার্য কখনো সমাপ্ত হয়নি বা পরবর্তীকালে তা বিধ্বস্ত হয়েছিল কিনা।[১৬৭৪] সমাধিসৌধটির ভিত্তির চারদিকে রয়েছে সাইক্লামেন ও টিউলিপ ফুলের একটি সুন্দর নকশা যেমনটি দেখা যায় কাশ্মীরে।[১৬৭৫] অট্টালিকাটি মর্মর পাথরখচিত লাল বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত।

৬. লাহোরে অবস্থিত নূরজাহানের সমাধিসৌধ :

নূরজাহানের তত্ত্বাবধানে ও অর্থে নির্মিত অন্যান্য সমৃদ্ধ ও উঁচু অট্টালিকার তুলনায় লাহোরে অবস্থিত নূরজাহান বেগমের নিজের সমাধিসৌধটি অনাড়ম্বর ও বিনয়পূর্ণ। ১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরে নূরজাহান লাহোরে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নির্জনে জীবন কাটান। এখানে রাভি নদীর তীরে তাঁর স্বামীর সমাধি থেকে অনতিদূরে লাহোরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সীমানা প্রাচীরযুক্ত একটি চারবাগের কেন্দ্রস্থলজুড়ে একটি বর্গাকার মঞ্চের ওপর নূরজাহানের সমাধিসৌধটি স্থাপন করা হয়। মূল বাগানটি এখন আর নেই; কিন্তু এক সময়ে এর মধ্যে খাল, পুকুর, জলপ্রপাত, ঝরনা, সরল বর্গীয় গাছ, টিউলিপ ফুল, গোলাপ, জেসমিন ও ফুলের গাছ, বিশেষ করে খেজুর গাছ ছিল।[১৬৭৬] পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলা ও স্বামী জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধের সাথে নূরজাহানের সমাধিসৌধের অনেক সাদৃশ্য ছিল। এটা ছিল বর্গাকৃতি একতলা বিশিষ্ট, সাতটি খিলান বিশিষ্ট এবং এর চারধারে উন্মুক্ত বারান্দা। এর অভ্যন্ত

১৬৭০. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, p. 305.
১৬৭১. Ibid., p. 305.
১৬৭২. Ibid., p. 305.
১৬৭৩. Richard Burn ed. the Cambridge History of India, vol. IV, p. 151.
১৬৭৪. C.M.V. Stuart gardens of the great Mughal's (London: 1913), p. 131; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131.
১৬৭৫. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p.131.
১৬৭৬. Findly, Noorjahan ...., p. 241.

www.pathagar.com

রভাগে তিনটি খিলান ও স্তম্ভ বিশিষ্ট সারিবদ্ধ গ্যালারিতে বিন্যস্ত। এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বর্গাকৃতি কক্ষ এবং এই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মঞ্চে স্থাপিত রয়েছে নূরজাহান ও তাঁর কন্যা লাডলি বেগমের প্রতীকী সমাধিসৌধ।[১৬৭৭] এই সমাধিসৌধের অলংকরণের বহুলাংশ কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যদিও তার কিছুটা লাল বেলে পাথর ও মর্মর পাথরের কারুকার্যসহ পরবর্তীকালে পুনরুদ্ধার করা হয়।[১৬৭৮] এর ভেতরের উপরিতলের অলংকরণের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ভেতরে বসানো পাথর অপেক্ষা রঙিন নকশাকেই বেশি প্রকাশ করে।[১৬৭৯] নূরজাহানের সমাধিসৌধটি সকলের কাছে সর্বদা রহস্যময় হয়ে থাকবে। এটা সমষ্টিগতভাবে মূলত কী ছিল এবং এটা কী উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল তা জানা যাবে না কোনোদিনই। কিন্তু সমগ্র নির্মাণকার্যের ও এর মালিকের দীনতা স্মৃতিস্তম্ভের উপরে উৎকীর্ণ লিপিতে স্পষ্ট হয়ে উঠে এ রকম ভাষায় :

মরনের পরে মোর সমাধিতে
জ্বলিবে না দীপশিখা, নহ জেসমিন
কিংবা জ্বলিবে না মোমবাতির কম্পিত শিখা,
আমার স্মরণে আমার স্মৃতিতে লেখা।
মাথার উপরে বসি গাহিবে না কোনো বুলবুল,
জানিবে না পৃথিবীতে মোর মৃত্যু বারতা হয়ে ব্যাকুল।[১৬৮০]

(গ) জাহানারা বেগমের অবদানসমূহ

শাহজাহানের উপপত্নী আকবরাবাদীমহল নির্মাণ করেন আকবরাবাদী মসজিদ (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়)। ফতেপুরী মহল চাঁদনি চকে নির্মাণ করেন ফতেপুরী মসজিদ এবং সরহিন্দি বেগম দিল্লির খারি বাউলি বাজারের কাছে লাহোরি গেটে নির্মাণ করেন সরহিন্দি মসজিদ। আকবরাবাদীমহল দুই সিঁড়িবিশিষ্ট কুয়া এবং একটি সরাইখানাও নির্মাণ করেন।[১৬৮১] কিন্তু ঐ সময় এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে অবদান রাখেন শাহজাহানের কন্যা জাহানারা ও রওশন আরা। জাহানারা ও রওশন আরার

১৬৭৭. Findly, Noorjahan ...., pp. 241-42.
১৬৭৮. Ibid., p. 242.
১৬৭৯. Ibid., p. 242.
১৬৮০. Noorjahan's epitaph transtaled by poet John Bowen in Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 131.
১৬৮১. Maheshwar Dayal, Rediscovering Delhi, The Story of Shahjahanabad (New Delhi: 1982), p. 71.

www.pathagar.com

মতো কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মোঘল নারী যাঁদের সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি– তাঁরা সক্রিয়ভাবে নির্মাণকার্যে জড়িত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের সমাধিসৌধের মতো এখনও তাঁদের পরশমাখা কিছুসংখ্যক স্মৃতিস্তম্ভ রেখে গেছেন। স্থাপত্য ক্ষেত্রে জাহানারার অবদান শুধু তাঁর নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়; উদ্যান, প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, সন্ন্যাসী বা দরবেশের আশ্রম এবং এমনকি বাজার নির্মাণ পর্যন্ত তা বিস্তৃত।

১. মসজিদ নির্মাণ

কাশ্মীর উপত্যকায় জনপ্রিয়ভাবে বেগম সাহেব নামে পরিচিত শাহজাদি জাহানারা অপূর্ব সুন্দর শৈল্পিক আঙ্গিকে চল্লিশ হাজার রুপি খরচে নির্মাণ করেন একটি মসজিদ এবং এই অর্থ খরচ করা হয় শাহজাদির নিজস্ব তহবিল থেকে।[১৬৮২] এই মসজিদটি নির্মিত হয় মোল্লাশাহ বাদাখশানি নামে আখ্যায়িত একজন বিদ্বান ব্যক্তির জন্য এবং এই উপলক্ষে জাহানারার পক্ষ থেকে এই বিদ্বানকে উপহার দেওয়া হয় একটি দামি হীরা।[১৬৮৩] এই মসজিদের চতুর্দিকে ছিল গরিবদের বসবাসের জন্য বিশাল অট্টালিকাসমূহ এবং তা নির্মিত হয় আরও কুড়ি হাজার রুপি ব্যয়ে।[১৬৮৪] কাফি খানও উল্লেখ করেছেন এই অট্টালিকা ও তার নির্মাণ খরচ সম্পর্কে।[১৬৮৫] জাহানারা বেগম আগ্রাতে জামে মসজিদ নামে আবার তাঁর ব্যক্তিগত ভাতা ও তহবিলের অর্থ দ্বারা নির্মাণ করেন আর একটি মসজিদ।[১৬৮৬] এটা আগ্রা দুর্গের বাইরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পাঁচ বছর যাবৎ কাজ করার পরে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এবং এর জন্য খরচ হয় পাঁচ শত হাজার রুপি। এটা খাড়া নকশা, চমৎকার বার্নিশ ও জাকঁজমকপূর্ণ সৌন্দর্যযুক্ত একটি সুন্দর গঠনশৈলী। তিনি এই ইচ্ছা পোষণ করেন যে এটা তাঁর জন্য পরবর্তী জীবনে বয়ে আনবে শাশ্বত ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতি। একসময়ে শাহজাহান এই একই মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এটা নির্মাণের অনুমতি দেন জাহানারাকে।[১৬৮৭] কথিত আছে যে, জাহানারা একটি রাবাতও (সাধু বা

১৬৮২. Inayat Khan. The Shahjahan Nama. tr. & ed. Beglay and Desai, p. 455.
১৬৮৩. Ibid., p. 458.
১৬৮৪. Ibid., p. 458.
১৬৮৫. Khafi Khan. Muntakhab-ul-Lubab. vol. I, p. 706.
১৬৮৬. Abdul Hamid Lahori, Badshah Nama, vol. I, pt. II. p. 252.
১৬৮৭. Lahori. vol. I. pt. II. p. 252; Qazwini. Padshah Nama, Fol, 406; Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture, vol. II, pp. 318-20; S.M. Latif, Agra Historical and Descriptive (Calcutta; 1896), pp. 184-88.

www.pathagar.com

দরবেশদের আশ্রম বা মাস্তানা) নির্মাণ করেন।[১৬৮৮] শাহজাদি জাহানারার মনের ধর্মীয় প্রবণ বিবেচনায় এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার যে তিনি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কয়েকটি অট্টালিকা নির্মাণ করেন।

২. দূরগামী পথিকদের জন্য সরাইখানা ও বাজার

জাহানারা দূরগামী পথিকদের জন্য সরাইখানা ও হাট-বাজার নির্মাণ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবদান রাখেন। মানুচী, বার্নিয়ার, টাভার নিয়ার ও থিভিনট জনপ্রিয়তাহেতু বেগম সাহেব নামেও পরিচিত জাহানারা বেগমের সম্বন্ধে বলেছেন।[১৬৮৯] এই সরাইখানাটি নির্মিত হয় দিল্লিতে এবং এর ছিল একটি সুন্দর বাগান ও জলাধার। সরাইখানাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বার্নিয়ার লিখেছেন : দূরগামী পথিকদের জন্য এই সরাইখানাটি আমাদের রাজকীয় প্রাসাদের মতো উভয় পাশে অর্ধবৃত্তাকার ছাদযুক্ত বিশাল বর্গাকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু খিলানগুলো বিভাজন দেওয়াল দ্বারা পরস্পর থেকে পৃথক এবং এর ভেতরের প্রান্তগুলোতে রয়েছে ছোট ছোট কক্ষ। এই অট্টালিকার চারধারে অর্ধবৃত্তাকার ছাদগুলোর উপরে আছে একটি গ্যালারি যেখান থেকে নিচের অংশটির মতো সমানসংখ্যক কক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়।[১৬৯০] রাতে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা। কথিত আছে যে, এই দূরগামী পথিকদের জন্য সরাইখানাটি নির্মিত হয় ধনী পারস্যবাসী, উজবেক ও অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীর জন্য।[১৬৯১] সিপাহি বিদ্রোহের পরে বেগম সরাইখানাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।[১৬৯২] জাহানারা বেগম লাহোরের চকসরাই বাজারের অট্টালিকার নকশাও তত্ত্বাবধান করেন।[১৬৯৩] দিল্লির লাল কেল্লার কাছে বিখ্যাত চাঁদনি চকবাজারও তিনি নির্মাণ করেন[১৬৯৪] এবং এটা এখনও রাজধানীর বাণিজ্যিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল।

৩. জাহানারার সমাধিসৌধ

দিল্লিতে সুফি দরবেশ নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজার শরীফের কাছে অবস্থিত জাহানারা বেগমের সমাধিসৌধটি সাদামাটা হলেও তা প্রকাশ করে

১৬৮৮. Lahori, vol. II. pt. 11, p. 469.
১৬৮৯. Manucci, Storia do Magor, tr. William Irvine (London; 1907). vol. I, p. 221.
১৬৯০. Bernier, pp.280-81.
১৬৯১. Bernier, p. 281; Manucci, Storia do ....,..vol. I, p. 221.
১৬৯২. Bernier, p. 281n.
১৬৯৩. Muhammad Saleh Kambu, Amal-i-Saleh, vol. III, p. 47.
১৬৯৪. The 'Sonet Lumiere' show conducted at the Red Fort, Delhi.

www.pathagar.com

তাঁর শিল্পবোধ। সাদা মর্মর পাথর দ্বারা তাঁর নির্মিত সমাধিসৌধটি আকাশ পানে উন্মুক্ত এবং এই অট্টালিকার উপরিভাগে একটি গর্তে গজিয়ে উঠেছে সবুজ ঘাস। তাঁর বিশেষ অনুরোধে এটা করা হয়েছিল। এর বহিরঙ্গে একটি মূল্যবান বৃদ্ধ ঘোড়ার মূর্তি কেটে তৈরি সবুজ পদ্মফুল ব্যতীত অন্য কোনো অলংকরণ নেই।[১৬৯৫]

৪. দিল্লিতে রওশন আরা বেগমের সমাধিসৌধ

সম্রাট শাহজাহানের আর এক মেয়ে রওশন আরা বেগমও দিল্লির উত্তর-পশ্চিম অংশে উদ্যানসহ তাঁর নিজ সমাধিসৌধের পরিকল্পনা তৈরি করেন। এই সুন্দর স্মৃতিসৌধটি বহিরঙ্গে বিশুদ্ধ সাদা মর্মর পাথরের সুন্দর অলংকরণে নির্মিত। এটা উপরের সমতল স্থানের মাঝখানে অবস্থিত উদ্যানে প্রশস্ত নিচু মঞ্চের উপরে অবস্থিত এবং তা এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে।[১৬৯৬] কথিত আছে যে, শাহজাহানের একজন কন্যাকে তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত একটি স্মৃতিসৌধে সমাহিত করা হয়েছে।[১৬৯৭] সঠিকভাবে তাঁর কন্যাদের মধ্যে এটা কার নাম তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

৫. জীবন নিসা বেগমের সমাধিসৌধ

কথিত আছে যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর অন্যতম স্ত্রী এবং মুহাম্মদ সুলতান, মোয়াজ্জেম ও বদরুন্নেছার মা নওয়ার বাঈ ফতেপুরে একটি সরাইখানা এবং আওরঙ্গাবাদের শহরতলিতে বাঈজিপুরা নামক স্থানটি নির্মাণ করেন।[১৬৯৮] কিন্তু আওরঙ্গজেবের আমলে স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে অবদান রাখেন তাঁর কন্যাদের মধ্যে দুইজন, সবচেয়ে বড় জীবন নিসা এবং দ্বিতীয় কন্যা জীনাত-উন-নিসা। জীবন নিসা বেগম লাহোরের চারবুর্জি ও নয়নকোটের মতো বেশকিছুসংখ্যক বাগান তৈরি করেন এবং সেখানেই তাঁকে চিরদিনের মতো সমাহিত করা হয়।[১৬৯৯] তাঁর সমাধিসৌধটির চূড়ায় সোনার টিপসহ সুন্দর মর্মর পাথরে নির্মিত। কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকারের মতে, তাঁকে সমাহিত করা হয় কাবুলি দরজার বাইরে তিন হাজার বৃক্ষের উদ্যানে।[১৭০০] একটি রেলপথ নির্মাণের জন্য তাঁর সমাধিসৌধটি পরে ধ্বংস করা হয়। তাঁর

১৬৯৫. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, pp. 109-10.
১৬৯৬. Ibid., p. 110.
১৬৯৭. Jadunath Sarkar, Mustaid Khan's Maasir-i-Alamgiri, (Calcutta; 1947), p. 90.
১৬৯৮. J. Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. (Calcutta;1912), p. 63.
১৬৯৯. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa (London: 1913), pp. 19-20.
১৭০০. J. Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. (Calcutta;1912), p. 69.

www.pathagar.com

শবাধার ও উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত প্রস্তর নির্মিত সমাধিসৌধটি এখন সিকান্দ্রাতে আকবরের সমাধিসৌধে রয়েছে।[১৭০১]

৬. জীনাত-উন-নিসা বেগমের অবদানসমূহ

সবশেষে স্থাপত্যশিল্প ক্ষেত্রে আর একজন মোঘল শাহজাদি সম্রাট আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় কন্যা জীনাত-উন-নিসার অবদান সম্বন্ধে জানতে পারি। তাঁর নির্মিত প্রায় চৌদ্দটি দূরাগত পথিকদের জন্য সরাইখানার পরিচয় পাওয়া গেছে।[১৭০২] ৩৭ বছর বয়সে জীনাত-উন-নিসা অযোধ্যার সাথে বাংলার যোগাযোগ স্থাপনকারী মহাসড়কে কিছুসংখ্যক সরাইখানা নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি অর্জন করেন তাঁর পিতার প্রশংসা।[১৭০৩] সম্ভবত তাঁর এই প্রচেষ্টা ছিল দূরাগত পথিকদের জন্য তাঁর নির্মিত সরাইখানাসমূহ। দিল্লিতে তাঁর খরচে নির্মিত হয় জীনাত-উন-মসজিদ নামক একটি সুন্দর মসজিদ।[১৭০৪] মৃত্যুর পরে তাঁকে সেখানে সমাহিত করা হয় এবং পরে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সেটা অন্যত্র সরিয়ে ফেলে তারা অট্টালিকাটি দখল করে নেয়।[১৭০৫] ঐতিহ্যগত সূত্র হতে জানা যায় জীবন নিসা তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁর যৌতুকের অর্থ দাবি করেন এবং তা ব্যয় করেন এই মসজিদ নির্মাণকজে।[১৭০৬]

(ঘ) মোঘল মহিলাদের অনুপ্রেরণায় নির্মিত মোঘল স্মৃতিসৌধসমূহ

মোঘল নারীদের উদ্যোগে সম্পন্ন বিভিন্ন নির্মাণকার্য সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা যদি স্ত্রীর জন্য মোঘল সম্রাটদের ভালোবাসার অনুপ্রেরণায় নির্মিত স্মৃতিসৌধগুলোর নাম উল্লেখ না করি তবে এই বর্ণনাটি অসমাপ্ত থেকে যাবে। আমরা জানি যে, জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা আনারকলির জন্য লাহোরে একটি সুন্দর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদে তাঁর অন্যতম প্রিয় পত্নী ও খশরুর মা শাহ বেগমের উদ্যানসহ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আগ্রার তাজমহল সম্রাজ্ঞীর জন্য সম্রাটের ভালোবাসাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে যত স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সমাধিসৌধ পৃথিবীতে দাম্পত্য প্রেমের জন্য নির্মিত শ্রেষ্ঠ স্মৃতিসৌধ।

১৭০১. Ibid.,
১৭০২. Rekha Misra, Women in Mughal India, p. 112.
১৭০৩. Muni Lal, Aurangzeb (New Delhi; 1988) p. 63.
১৭০৪. Jadunath Sarkar, History of Aurangzeb, vol. I. p. 70.
১৭০৫. Ibid., p. 70.
১৭০৬. Ibid., p. 70

www.pathagar.com

১. আগ্রার তাজমহল

কথিত আছে যে, ১৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্দশতম সন্তান জন্মের পর মমতাজমহলের মৃত্যুতে শাহজাহানের মন ভেঙে পড়ে। কিছুদিনের জন্য তাঁর রাজদরবারের উৎসবাদি বন্ধ থাকে এবং সম্রাট অসম্মতি জানান যে, কোনো রকম সরকারি কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবেন না। যে নারী তাঁর সমস্যায় সুখে ও সাফল্যে সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন এবং যাঁকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাঁর বেদনাদায়ক অকাল মৃত্যুতে তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। শাহজাহান এরকম সিদ্ধান্ত নেন যে যদিও মমতাজমহলের মৃত্যু হয়েছে তবুও তিনি তাঁর চিরবিশ্রামের স্থানরূপে নির্মিতব্য সমাধিসৌধে চিরদিন বসবাস করবেন। এভাবেই তাজমহলের অস্তিত্ব সূচিত হয়। রাজা মানসিং[১৭০৭] ও পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র রাজা জয় সিংয়ের মালিকানাধীন আগ্রার দক্ষিণ দিকে যমুনা নদীর তীরবর্তী জমি তাজমহল নির্মাণের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।[১৭০৮]

প্রাচ্যের প্রেমমন্দির তাজমহল নির্মাণকাজ প্রায় ২০ বছর সময় ধরে (১৬৩২-১৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে) সমাপ্তি হয়। এর নির্মাণকার্যে নিযুক্ত করা হয় ২০,০০০ শ্রমিক। এর জন্য খরচ হয় ৫০ লক্ষ রুপি। কিন্তু কিছু সূত্রের হিসাব অনুযায়ী খরচের পরিমাণ নয় কোটি সতের লক্ষ রুপি।[১৭০৯] এই নির্মাণকার্যটি মুকাররামাত খান ও মীর আব্দুল করিম তত্ত্বাবধান করেন।[১৭১০] উস্তাদ ঈষা ছিলেন এর প্রধান স্থাপতি। কান্দাহার, সিংহল (বর্তমান শ্রীলংকা), নীল, ওরমুজ সাগর, বসরা, ইয়েমেন, পারস্যের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ও অনুল্লেখিত স্থান থেকে কারিগর ও নির্মাণ উপকরণ আনা হয়। সমগ্র সমাধিসৌধটি আয়তাকার ১৯৯০ ফুট × ১০০০ ফুট পরিমিত স্থানে স্থাপিত হয়।[১৭১১] শুধু নদী অভিমুখী দিকটি একটি আটধারযুক্ত গম্বুজ বিশিষ্ট দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অন্য দিকগুলো রাখা হয়েছে আবদ্ধ অবস্থায়। তিনটি দিকের প্রত্যেকটিতে আছে পরস্পর সদৃশ প্রবেশ পথ, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দক্ষিণমুখী দরজাটিকে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অন্য সকল প্রবেশপথের মতো এই প্রবেশপথটি মর্মর পাথরখচিত লাল বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত। এর সম্প্রসারিত অংশে ঘেরা স্থানের কাঠামোতে সাদা মর্মর পাথরের পটভূমিতে দেখা যায় কালো অক্ষরে উৎকীর্ণ কোরআনের বাণী। প্রধান প্রবেশ পথটি

১৭০৭. S.C. Welch. India, Art & Culture (New York; 1985). p. 173.
১৭০৮. Lahori. vol. I. pt. II, p. 403.
১৭০৯. Khafi Khan. vol. I, p. 596.
১৭১০. Lahori. vol. II. pt. II. p. 322.
১৭১১. A. L. Srivastava, Medieval Indian Culture, p. 225.

www.pathagar.com

প্রত্যেক পার্শ্বে ১০০০ ফুট পরিমিত এবং ৪২ একর ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বর্গাকৃতি উদ্যানের দিকে ঢালুভাবে নেমে গেছে।[১৯১২] সমাধিসৌধটির পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে একটি মসজিদ। উদ্যানটির উত্তর প্রান্তে একটি মর্মর পাথরের মঞ্চের উপরে প্রধান সমাধিসৌধ অবস্থিত এবং মোঘলদের উদ্যান মধ্যস্থ সমাধিসৌধগুলোর পরিকল্পনামতো এটা উদ্যানের মাঝখানে নয়। এই মঞ্চের মধ্যস্থলে রয়েছে সমাধিসৌধের অট্টালিকা। তাজমহলের নান্দনিক সৌন্দর্য শোভা, কমনীয়তা ও পবিত্রতা আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন কখনও ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এটা অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় ব্যক্তিগতভাবে। এই বিশাল খাঁটি শ্বেত মর্মর পাথরে নির্মিত অট্টালিকাটি কোনো মতেই সৌষ্ঠবহীন নয়। এর এক একটি বিশেষ দিক অন্যান্য দিকের সাথে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠিত যে তা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণে তৈরি হলেও এতে রয়েছে সরলতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নিশ্চিতরূপে এর ফলাফল হচ্ছে যে উদ্দেশ্যে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন। কারণ যে কেউ তাজমহলের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা দেখেছে ও অনুভব করেছে সে কখনও তা ভুলতে পারবে না।

২. মোঘল উদ্যানসমূহ

মোঘল শাসনকর্তাগণ ও তাঁদের সম্মানিত মহিলারা শুধু সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরা এসব স্মৃতিসৌধের সাথে বিদেশি গাছপালার বাগান বা সুন্দর দালান প্রতিষ্ঠা করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণী ও গাছপালার দেশ। ফুল এই দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে সর্বদাই একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। ভারতে মোঘলদের আগমনের অনেক পূর্বে নিশ্চয়ই এই দেশে বাগানের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সেই বাগানগুলো জ্যামিতিক নকশা অনুযায়ী স্থাপিত হতো না।[১৯১৩] মধ্য এশিয়া ও পারস্য থেকে সুন্দর উদ্যানের ঐতিহ্য ভারতে আসে। মোঘলরাই উদ্যানবিষয়ক শিল্পরীতিকে পৌঁছে দেন চরম উৎকর্ষে।[১৯১৪]

মোঘলরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন উদ্যান তৈরির নিজস্ব ধারণা। পারস্য ও তুর্কিস্তানে বিকশিত এই নতুন শিল্প আদর্শের বৈশিষ্ট্য হলো নর্দমার সাহায্যে পানি নিষ্কাশন, পুকুর ও ছোট জলপ্রপাত এবং এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তি চালু ছিল জমিনের ওপর কয়েকটি সমতল ছাদ। এই সমতল ছাদের সংখ্যা ছিল

১৯১২. Ibid., p. 252.
১৯১৩. Ibid., p. 252.
১৯১৪. C.M.V. Stuart. gardens of the great Mughal's, p. 4.

www.pathagar.com

সাধারণত আটটি, যা কোরআনে উল্লেখিত আটটি বেহেশতের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং কখনও সংখ্যায় সাতটি, যা সাতটি গ্রহের প্রতীক। প্রধান তাঁবুটি নির্মিত হতো সর্বোচ্চ সমতল ছাদের উপরে এবং মাঝে মাঝে সর্বনিম্ন সমতল ছাদের উপরে যাতে উদ্যানের মালিক সবুজ পত্রালি ও জলপ্রপাতের দৃশ্য দেখতে পান বিরতিহীনভাবে।[১৭১৫] মোঘলরা ভারতে আসার পর বাগান তৈরির নতুন শিল্পরীতির উন্নয়ন ঘটে ত্বরিতগতিতে। বাগান তৈরির এই কাজে পানির ব্যবস্থা করা ছিল প্রধান লক্ষ্য এবং কিছুসংখ্যক নতুন ফুল উৎপাদনকারী গাছগাছালি, ফল ও শাকসবজি নিয়ে আসা হয় ভারতে।[১৭১৬] অম্বরের রাজপুত বংশীয় রাজকুমারী যোধাবাঈয়ের সাথে আকবরের বিবাহের সাথে সাথেই উদ্যান রচনার ক্ষেত্রে সূচিত হয় ভারতীয় প্রভাব।[১৭১৭]

প্রসিদ্ধ ফুল বৃক্ষ

তখনকার আমলের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ফুল হলো পারস্য থেকে ভারতে আনীত বিদেশি প্রজাতির বানাফসা, জেসমিন, নাসরিন এবং ভারতীয় বেলী, কেভরা, চম্পা, মলসারী, সাবেত্রী, দামরা, কার্মা ও লাং।[১৭১৮] পারস্যিক নামকরণে কয়েকটি ভারতীয় ফুল হলো গুল-ই-সাদবার্গও কুরানফুল বা লাং।[১৭১৯] মোঘল উদ্যানগুলোকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ফলের গাছেও পরিপূর্ণ করা হয়। এসব বাগানে প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফল হলো আম, আপেল, কলা, আঙ্গুর, কমলালেবু, ডালিম, খোবানি, বাদাম ও আরো অনেক।[১৭২০] সাভ,[১৭২১] সাইপ্রাস ও চেনারের মতো কতকগুলো গাছের কোনো ফল না হলেও সেগুলো সাজসজ্জার জন্য রোপণ করা হতো।[১৭২২] এই গাছগুলো আজও এসব বাগানের কয়েকটিতে দেখা যায়। মোঘল উদ্যানগুলো স্থাপিত হতো সৌষ্ঠবপূর্ণভাবে, এগুলোর আকৃতি ছিল জ্যামিতিক পরিমাপসম্মত এবং এ গুলোর সাথে নির্মাণ করা হতো সুন্দর অট্টালিকা, কৃত্রিম হ্রদ, ঝরনা, কুয়া, জলাধার, জল নিষ্কাশনের পাকানালা গরম জলের ব্যবস্থাসহ স্নানাগার এবং এই উদ্যানগুলোর শোভাবর্ধক এ রকম অনেক জিনিস। এডওয়ার্ড টেরি লিখেছেন, আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁদের

১৭১৫. A. L. Srivastava, Medieval Indian Culture, pp. 252-53.
১৭১৬. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 246.
১৭১৭. Ibid., p. 246.
১৭১৮. S.M. Jaffar, Some cultural aspects of Muslim rule in India, p. 115.
১৭১৯. Ibid., p. 115.
১৭২০. Ibid., p. 116.
১৭২১. Ibid., p. 120.
১৭২২. Ibid., p. 116.

www.pathagar.com

রয়েছে কৌতূহল জাগানো ফলবান বৃক্ষ ও আনন্দদায়ক পুষ্পভরা উদ্যান যেখানে প্রকৃতি জোগান দেয় পত্র ও পুষ্পের অম্লান সমারোহ। এসব স্থানে রয়েছে তাঁদের স্নানের জন্য আরামদায়ক ঝরনা ও বিভিন্ন রকমের আরামদায়ক পানির সরবরাহ যার নীরব কলতান গ্রীষ্মের দিনগুলোতে তাঁদের চেতনাকে করে নিদ্রাচ্ছন্ন।[১৭২৩] এই বাগানগুলোর সাধারণত তিনটি পরস্পর সংযোগকারী আবেষ্টনী থাকত বাগানগুলো যথাক্রমে দেওয়ান-ই আমের আধা সরকারি উদ্যান ও দেওয়ান-ই-খাসসহ সম্রাটের বাগান যেখানে তিনি তাঁর প্রধান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লোকজনকে বরণ করতেন এবং সম্রাজ্ঞী ও তার মহিলাদের জন্য পর্দা উদ্যান।[১৭২৪] মোঘলদের বাগান স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট। তাঁদের অধিকাংশ বাগান দেখা যায় কাশ্মীর, লাহোর, কাবুল, আগ্রা ও দিল্লিতে। জাহাঙ্গীরের আমলে কাশ্মীর পরিণত হয় উদ্যান তৈরির একটি জনপ্রিয় স্থানে। জাহাঙ্গীর ও তাঁর সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাশ্মীর প্রীতি সুবিদিত। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: কাশ্মীর হচ্ছে চিরবসন্তে র উদ্যান বা সম্রাটের প্রাসাদের একটি লৌহ নির্মিত দুর্গ, একটি আনন্দময় পুষ্পশয্যা ও দরবেশদের জন্য হৃদয়-প্রসারণকারী একটি ঐতিহ্য।[১৭২৫]

৪. প্রসিদ্ধ মোঘল উদ্যানসমূহ

কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ মোঘল যুগের উদ্যানগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো দাল হ্রদের নিকটবর্তী শালিমারবাগ, নিশাতবাগ, আর্চাবল, ভারনাগ, দারোগাবাগ (লালারুখের বাগান), বাগ-ই-বাহার আরা এবং নূর আফজা উদ্যান। আগ্রাতে রয়েছে রামবাগ, দেহরাবাগ, জাহারাবাগ (নূরমঞ্জিল বাগান), তাজমহল বাগান, ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের বাগানও মতিবাগ। লাহোরের প্রসিদ্ধ মোঘল উদ্যানগুলো হল শালিমারবাগ, সাহাধারা, বাদশাহী মসজিদ বাগান, চৌবুরাজিবাগ ও নয়নকোটবাগ। এ ছাড়া রয়েছে ওয়াহবাগ, রাওয়ালপিন্ডির হাসান আবদাল, এলাহাবাদের খশরুবাগ, উদয়পুরের হ্রদ তীরবর্তী প্রাসাদের বাগান, হুমায়ুনের সমাধিসৌধের উদ্যান ও দিল্লির শালামারবাগ। এই সুন্দর উদ্যানগুলো ব্যবহার হতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। এগুলো সম্রাটও তাঁদের সম্মানিত মহিলাদের প্রমোদ স্থান, বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশ যাপনের স্থান হিসেবে কাজে লাগত। এখানে ভোজের আয়োজন করা হতো এবং অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করা হতো। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় জাহাঙ্গীরের সফরের সময়

১৭২৩. Edward Terry in Early Travels in India. p. 283.
১৭২৪. C.M.V. Stuart. gardens of the great Mughal's. p. 279.
১৭২৫. Tuzuk.-i-Jahangiri. tr. vol. II. p. 143.

www.pathagar.com

নূরসরাই উদ্যানে নূরজাহান কর্তৃক প্রদত্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভোজ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১৯২৬] এবং নূরজাহান বড় ভোজ দেন নূর সরাই উদ্যানে।[১৯২৭] আগ্রাতে ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের বাগান ও তাজমহল বাগান, লাহোরের সাহদ্বারা বাগান, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধের বাগান ও রওশন আরার বাগানের মতো বাগান নির্মাণ করা হতো মোঘলদের সমাধিসৌধের সাথে একত্রে। বাগানগুলো অন্যান্য উদ্দেশ্যেও কাজে লাগত। দিল্লির শালামার বাগানে পিতা শাহজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করার পরে তড়িঘড়ি আওরঙ্গজেবকে রাজমুকুট পরানো হয় এবং পরে দিল্লির লালকেল্লাতে করা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যাভিষেক।[১৯২৮] রাজকীয় মোঘল মহিলারা ঠিক বাবরের শাসন আমল থেকে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন স্থানে ও সুন্দর পরিবেশে বাগান স্থাপনে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজেরাই এসব নির্মাণকার্য পরিদর্শন করেন ও এগুলোর জন্য উপযুক্ত লোকদেরকে নিয়োগ করেন। মাঝে মাঝে সম্রাটগণ তাঁদের সম্মানিত মহিলাদেরকে ও তাঁদের কন্যা ও শাহজাদিদেরকে দান করতেন সুন্দর উদ্যান।

৫. কাবুলের উদ্যানসমূহ

মোঘলদের শাসন আমলে কাবুলে আমরা দেখতে পাই রাজকীয় মহিলাদের মালিকানাধীন কিছুসংখ্যক উদ্যান। গুলবদন তাঁর হুমায়ুননামাতে এবং জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন কাবুলের এসব বাগান সম্বন্ধে। কাবুলে যে সমস্ত রাজকীয় মোঘল মহিলার বাগান রয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আকবরের দাদিমা বিগা বেগম বা বিকা বেগম; কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি বাবরের কোনো স্ত্রী ছিলেন এই পদবির অধিকারিণী। এ. এস. বেভারেজ এই অভিমত পোষণ করেন যে, বাবরের স্ত্রীদের মধ্যে হলেন বিবি মুবারিকা (আফগানি আগাচা) এই সেই বেগম[১৯২৯] যিনি জনশ্রুতি অনুসারে বাবরের অস্থিসমূহ নিয়ে যান কাবুলে।[১৯৩০] আর যে সমস্ত মোঘল মহিলার কাবুলে বাগান ছিল তাঁরা হলেন মির্জা আবু সাঈদের কন্যা ও বাবরের নিজের চাচি শাহের বানু বেগম জাহাঙ্গীরের দাদিমা ও আকবরের মা হামিদা বানু বেগম। রাজকীয় মহিলারা আকবরের পাঁচ বছর বয়সে কাবুলের যে স্থানে

১৯২৬. Tuzuk.-i-Jahangiri. p. 199.
১৯২৭. Tuzuk.-i-Jahangiri. tr. vol. II, p. 192.
১৯২৮. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 105.
১৯২৯. A.S. Beveridge in Humayun Nama, p. 216.
১৯৩০. Tuzuk.-i-Jahangiri. tr. vol. I, p. 107n.

www.pathagar.com

আকবরের সুন্নত প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের অনুষ্ঠান উদযাপন করেন সেই বিগা বেগমের উদ্যান সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন গুলবদন বেগম।[১৭৩১] কাবুলের বাগানগুলো সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে জাহাঙ্গীর লিখেছেন:

সর্বপ্রথমে আমি হেঁটে বেড়ালাম শাহরারা (নগর বন্দনা) বাগানের চারদিকে, তারপরে মাহাতার (চন্দ্রকিরণ) বাগান, তারপরে যথাক্রমে আমার পিতার দাদিমা বিকা বেগম (বিঘা বেগম) কর্তৃক নির্মিত বাগান ও আমার নিজ দাদিমা মরিয়ম মাকানি কর্তৃক নির্মিত বাগানের চারদিকে। শাহরারা বাগান মীর্জা আবু সাঈদের কন্যা ও প্রয়াত সম্রাট বাবরের নিজের চাচি শাহারবানু বেগম কর্তৃক নির্মিত। মাঝে মাঝে এই বাগানের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে এবং কাবুলে এই বাগানের মতো মাধুর্যমণ্ডিত একটি বাগানও নেই। যখন আমি কাবুলে ছিলাম তখন আমি কিছু আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেছিলাম, কখনও আমার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও পারিষদবর্গের সাথে কখনও হেরেমের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সাথে।[১৭৩২]

৬. আগ্রার দেহরাবাগ ও জাহারাবাগ

কথিত আছে যে আগ্রার দেহরাবাগ ও জাহারাবাগের মালিকা ছিলেন বাবরের কন্যারা।[১৭৩৩] বাবরের কন্যা জাহারার জন্য নির্মিত জাহারাবাগ (আমরা নিশ্চিত নই বাবরের কোনো কন্যাকে এই নামে ডাকা হতো) হলো রামবাগ ও চিনিকা-কা -রোজার অবস্থানের মধ্যে আগ্রা নগরীর অন্যতম বৃহত্তম উদ্যানযুক্ত প্রাসাদ।[১৭৩৪] এর ছিল একটি বিশাল অষ্টভুজ কুয়া এবং এটা স্পষ্টত ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল অস্তিত্বশীল।[১৭৩৫]

(ঙ) দিল্লিতে অবস্থিত হুমায়ুনের উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধ

দিল্লিতে অবস্থিত হুমায়ুনের উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধটি হলো মোঘলদের তৈরি অন্যতম প্রাথমিক পর্বে নির্মিত উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধ। এটা হুমায়ুনের অন্যতম বিধবা পত্নী হাজি বেগম কর্তৃক নির্মিত। তাঁতার ও মঙ্গোলীয় ঐতিহ্য অনুসারে উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধ ছিল এগুলোর মালিকদের জীবদ্দশায় আশ্রয় ও বিনোদনের স্থান। তাঁদের মৃত্যু হলে কেন্দ্রস্থলের তাঁবুটি পরিণত হতো

১৭৩১. Gulbandan Begam's Humayun Nama. tr. p. 179.
১৭৩২. Tuzuk.-i-Jahangiri, tr. vol. I, pp. 106-107.
১৭৩৩. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India. p. 60.
১৭৩৪. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 63; S.M. Latif. Agra Historical and Descriptive. p. 190
১৭৩৫. Crowe and Haywood. The Gardens of Mughal India, p. 63.

www.pathagar.com

সমাধিসৌধে ও স্থানটি হস্তান্তর করা হতো ধার্মিক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে।[১৭৩৬] সম্ভবত হুমায়ুনের জীবদ্দশাতে সমাধিসৌধটির পারিপার্শ্বিকতার নকশার কাজ শুরু হয়। মোঘল আমলের প্রারম্ভিক পর্বের এই উদ্যান পরিকল্পনাটি আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ছাড়াই টিকে রয়েছে।[১৭৩৭] এটা নির্মিত হয় চারবাগ শিল্পরীতিতে। পানির ঢেউকে কাজে লাগানোর জন্য পানির নালা ও পুকুরের পানির স্তরে তৈরি করা হয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য। বাগানের বাইরের বিশাল কুয়া থেকে আসত পানির সরবরাহ।[১৭৩৮] সেই ফুলগুলো, বাগানের অধিকংশ গাছ ও পানি আর দেখা যায় না। তৎসত্ত্বে এখনও যেটুকুর অস্তিত্ব রয়েছে তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি একসময় এটা কেমন ছিল।

১. মরিয়ম-উজ-জামানির উদ্যান যোধাবাঈয়ের বাউলি

বিয়ানা থেকে দেড় ক্রোশ দূরে জিসাত পরগনাতে জাহাঙ্গীরের মা মরিয়ম-উজ-জামানির আদেশে ২০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় একটি বাগান ও একটি বাউলি (ইন্দিরা কুয়া)।[১৭৩৯] জাহাঙ্গীর লিখেছেন 'বাউলিটি ছিল একটি সুন্দর অট্টালিকা এবং এটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মিত হয়।'[১৭৪০] বাগানটি আর দেখা যায় না, কিন্তু বাউলিটি এখনও আছে।[১৭৪১] উইলিয়াম ফিন্স বিয়ানার কাছে মেনহাপুর নামক একটি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি নীল কিনতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি সরাইখানাতে অবস্থান করেন এবং সরাইখানাটির কাছে ছিল একটি বাগান ও মহল বা রানিমাতা অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মায়ের অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান।[১৭৪২] এই দুটি স্থান ছিল সম্ভবত এক ও অভিন্ন।

২. নূরজাহানের বাগান

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর শেষ স্ত্রী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অন্যান্য শিল্পকলার মতো উদ্যান স্থাপনের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। মোঘল উদ্যান তৈরিতে যাঁরা অনুপ্রেরণা দান ও পরিকল্পনা করেছেন তাঁদের সকলের মধ্যে নূরজাহানকে এ ক্ষেত্রে সফলতার

১৭৩৬. Ibid., p. 71.
১৭৩৭. Ibid., p. 73.
১৭৩৮. Ibid., p. 73.
১৭৩৯. Tuzuk-i-Jahangiri, tr. vol. II, p. 64.
১৭৪০. Ibid., p. 64.
১৭৪১. Ibid., p. 64n.
১৭৪২. William Finch in Early Travels in India, p. 148.

www.pathagar.com

ব্যাপারে দান করা হয়েছে বাবরের সমমর্যাদা।[১৭৪৩] ভিলিয়ারস স্টুয়ার্ট তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্যানানুরাগী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন নূরজাহানকে।[১৭৪৪] কাশ্মীর উপত্যকা ছিল বাগান তৈরির জন্য যথোপযুক্ত স্থান এবং এটা জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের কাছেও ছিল একটি প্রিয় স্থান। কাশ্মীরে রয়েছে ফুল, ফল ও পানির প্রাচুর্য। অধিকন্তু এখানে বেশ কিছু বাগান ভূমিস্তরের উপরিভাগের বিন্যাস ও উচ্চ সমতল ভূমি তৈরি করা যেত বাগান তৈরির জন্য, যা সমতল ভূমিতে সাধারণত করা যেত না। তুষার আবৃত পর্বতমালা, গভীর উপত্যকা, হ্রদ, জলপ্রপাত এবং গোলাপ, টিউলিপ, জেসমিন, লিলি, বেগুনি রঙের ফুল, নার্সিয়াস ফুল, তরবারির ন্যায় লতা বিশিষ্ট ফুল ও অন্যান্য ইত্যাদি ফুলে শোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত কাশ্মীর ছিল মোটের ওপর একটি প্রসিদ্ধ স্থান।[১৭৪৫] এটাকে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে ভূস্বর্গ। বিশেষত জাহাঙ্গীরের সময় থেকে মোঘল সম্রাট ও তাদের সম্ভ্রান্ত মহিলার ছুটির দিনে কাশ্মীর ভ্রমণ করতে খুব পছন্দ করতেন এবং এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, তাঁদের কয়েকটি প্রমোদ স্থানযুক্ত সুন্দর বাগান এখানে নির্মিত হয়েছিল। এখানে ছুটির দিন যাপনের অর্থ হলো সমতলভূমির প্রখর তাপযুক্ত গ্রীষ্মের গরম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো।

৩. শালামারবাগ, দালহ্রদ ও কাশ্মীর

কাশ্মীরে অবস্থিত জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের বাগানগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রভারাসেনের পুরাতন হিন্দু এলাকাতে অবস্থিত শালামারবাগ।[১৭৪৬]

জাহাঙ্গীর বর্ণনা করেন : 'এই দুই বা তিন দিন প্রায়ই একটি নৌকায় চড়ে আমি ঘুরে বেড়াই ও শালামারের ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। শালামার স্থানটি হ্রদের নিকটবর্তী। এই হ্রদে রয়েছে পাহাড় থেকে নেমে আসা আনন্দদায়ক স্রোতস্বিনী যা পতিত হয়েছে দালহ্রদে। আমি আমার পুত্র খুররমকে আদেশ করলাম এই হ্রদে একটি বাঁধ নির্মাণ করতে এবং একটি দৃষ্টিনন্দন জলপ্রপাত তৈরি করতে। এই স্থানটি কাশ্মীরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান।'[১৭৪৭] যদিও তাঁবুগুলোতে প্রসিদ্ধ কালো মর্মর পাথরে নির্মিত কাজের মধ্যে কাশ্মীরের

১৭৪৩. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 126.

১৭৪৪. Ibid., pp. 42-43.

১৭৪৫. Tuzuk-i-Jahangiri, tr. vol. II, pp. 134, 151, 178; Bernier, pp. 406-407.

১৭৪৬. Findly, Noorjahan ...., p. 256; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 98.

১৭৪৭. Tuzuk-i-Jahangiri, tr. vol. II, pp. 151.

www.pathagar.com

শালামারবাগের ক্ষেত্রে শাহজাহানের অবদান স্পষ্ট[১৭৪৮] তবুও জাহাঙ্গীর যখন শালামার বাগের নকশা তৈরি করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি যথেষ্ট প্রাভবিত হন নূরজাহানের দ্বারা[১৭৪৯] এবং এর সামগ্রিক পরিকল্পনা নূরজাহানের রুচিবোধ ও উদ্ভাবন শক্তির পরিচয় বহন করে।[১৭৫০] বার্নিয়ার শালামারবাগের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন এবং এটাকে তিনি আখ্যায়িত করেন সম্রাটদের বাগানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় বলে।[১৭৫১]

শালামারবাগ তিনটি প্রধান এলাকাতে বিভক্ত হ্রদ থেকে প্রথম বৃহৎ তাঁবু পর্যন্ত বিস্তৃত বড় খালসহ বহিঃস্থ বা গণউদ্যান দেওয়ান-ই-আম থেকে দেওয়ান-ই-খাস। প্রত্যেক প্রান্তে ছোট ছোট প্রহরাকক্ষসহ উপরের দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত রাজকীয় স্নানাগার এবং সবচেয়ে বড় কালো মর্মর পাথরের তৈরি তাঁবু ও এর ভেতরে ও আড়াআড়িভাবে স্থাপিত বিস্তৃত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সমম্বিত হেরেমের মহিলাদের জন্য জেনানা উদ্যান।[১৭৫২] জেনানা উদ্যানগুলো ছিল চারবাগ শিল্পরীতিতে গঠিত। এই কেন্দ্রস্থল থেকেই উন্মুক্ত হয়েছে চারটি বীথিকা। কৃক্ষরাজি, খাল ও অট্টালিকাসমূহ পরস্পরের সাথে মিলিতভাবে অভ্রান্ত সৌষ্ঠব চেতনায় বাগানটির নকশাকে করে তুলেছে মোটামুটিভাবে সরলতাপূর্ণ। পেছনের পর্বতগুলো শালামারের জন্য গড়ে তুলেছে একটি উপযুক্ত পটভূমি।[১৭৫৩] এলিসন ব্যাংকস ফাইন্ডলি এই মত পোষণ করেন যে, শালামারের নকশা তৈরিতে নূরজাহানের অবদান আরো পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তিগত সমতলে কার্যকর বিভাজনে এবং তা এটাকে শুধু ব্যক্তিগত প্রমোদ স্থান নয়, বরং রাজকীয় কর্তব্য সম্পাদনের স্থানেও পরিণত করেছে।[১৭৫৪] জেনানা উদ্যানটি ছিল মহিলাদের দৈহিক রূপান্তরের বৃহত্তম প্রতীক যেখানে মহিলারা ঘোমটা পরিহিতভাবে শরীরকে আবৃত করার দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয় আসক্তি উৎপাদনকারী পোশাক পরিচ্ছদ দ্বারা নৈতিকতামূলক চেতনার বাহকরূপে থাকতেন না।[১৭৫৫] শালামারবাগকে মোঘল যুগে এর সমস্ত সুন্দর বৈশিষ্ট্যের জন্য ফারাহ্-বখশ (আনন্দ অর্পণকারী) বলা হতো।[১৭৫৬]

১৭৪৮. Findly. Noorjahan ...., p.256.
১৭৪৯. Findly. Noorjahan ...., p.256; Crowe and Haywood. The Gardens of Mughal India. p. 96.
১৭৫০. Findly, Noorjahan .... p.256.
১৭৫১. Bernier. pp. 399-400.
১৭৫২. Findly, Noorjahan ...., p.256-57.
১৭৫৩. Crowe and Haywood. The Gardens of Mughal India, p. 96.
১৭৫৪. Findly. Noorjahan ...., p.257.
১৭৫৫. Ibid., p. 257.
১৭৫৬. Crowe and Haywood. The Gardens of Mughal India. p. 98.

www.pathagar.com

শালামার নামটি খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যখন দ্বিতীয় প্রভারসেনা শালামার অর্থাৎ প্রেমের নিবাস নামে সেখানে একটি বাসভবন নির্মাণ করেন।[১৭৫৭]

৪. কাশ্মীরে অবস্থিত আচাবাল

জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত সরাসরি সংযোগকারী পুরাতন সড়ক সংলগ্ন কাশ্মীর উপত্যকার প্রান্তভাগের স্থানটি যেখান থেকে বড় বড় পাহাড় নেমে এসেছে সেটাই হলো আচাবাল। এটা ঝরনা, ফুল ও গাছের সমাবেশে একটি সুন্দর স্থান। নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর এটাকে একটি সুন্দর বাগানের রূপ দেন। নূরজাহানের দ্বারা তৈরি হওয়ার কারণে একদা এটাকে তাঁর নাম অনুসারে বেগমাবাদ বলা হতো।[১৭৫৮] ভিলিয়ার্স স্টুয়ার্ট এটাকে একটি আদর্শ স্থানরূপে আখ্যায়িত করে বলেন, 'আমাকে যদি প্রশ্ন করা হতো মাঝারি ধরনের একটি সর্বাপেক্ষা নিখুঁত আধুনিক বাগান কোথায় আবিষ্কার করা যাবে তাহলে আমি নির্দ্বিধায় উত্তরে বলতাম আচাবাল।[১৭৫৯] আচাবাল নির্মিত হয়েছিল সোসানওয়ার পাহাড় থেকে উৎপন্ন শক্তিশালী একটি জলপ্রপাতের চারধারে।[১৭৬০] এই জলপ্রপাতের দুই পার্শ্বে রয়েছে দুটি ছোট গ্রীষ্মকালীন বাসস্থান। এর নিচে রয়েছে ঝরনার জল দ্বারা অভিষিক্ত একটি সুন্দর দ্বীপসদৃশ তাঁবুযুক্ত প্রশস্ত জলাশয়। তার নিচে একটি বৃহত্তর তাঁবুর নিচ দিয়ে বাগানের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রবল বেগে চূড়ান্তভাবে ভিন্নতর স্তর অভিমুখে পতিত হওয়ার জন্য জলরাশি প্রবাহিত হচ্ছে।[১৭৬১] আচাবাল আগে ছিল আক্‌শাভালো নামে একটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মের উপাসনার স্থান।[১৭৬২] আচাবাল সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে পিটার মানডি লিখেছেন :

বাগানটি নিয়মিত পদক্ষেপ বিন্যস্ত একটি সুন্দর বাগান এবং এটা আপেল, নাশপাতি, কুল, খোবানি ও চেরি ফলের গাছে পরিপূর্ণ। জলপ্রপাতটি বিশেষত রাতে যখন আলো দেওয়ার জন্য দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে বসানো অসংখ্য প্রদীপ জলরাশির নিচে জ্বালানো হতো তখন কল্পনাযোগ্য সবচেয়ে চমৎকার প্রভাব বিস্তার করত।[১৭৬৩] আকবরের আমলে তিনি প্রায়ই আচাবালে

১৭৫৭. Ibid., p. 98.
১৭৫৮. Ibid., p. 108.
১৭৫৯. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 191.
১৭৬০. Findly, Noorjahan .... p.257.
১৭৬১. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 108.
১৭৬২. Findly, Noorjahan ...., p.257.
১৭৬৩. Richard Carnac Temple ed. The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia. vol. II, p. 159.

www.pathagar.com

বেড়াতে যেতেন এবং এটা ছিল তাঁর কাছে আনন্দের উৎস ও ধর্মীয় আশ্রয়স্থল।[১৭৬৪] জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান আচাবালকে খুব পছন্দ করতেন এবং প্রায়ই সেখানে যেতেন।[১৭৬৫] জাহাঙ্গীরের কাছে এটা ছিল বেহেশতের একটি টুকরা।[১৭৬৬] বার্নিয়ার এই ঝরনার বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, এতে পানির পরিমাণ এত পর্যাপ্ত যে এটাকে ঝরনা না বলে নদী বলাই ভালো।[১৭৬৭]

৫. কাশ্মীরে অবস্থিত ভারনাগ

অন্য সকল স্থানের চেয়ে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান ভারনাগকে বেশি পছন্দ করতেন। এটা শ্রীনগরের চেয়ে আরো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বানিহাল গিরিপথমুখী রাস্তার উপরে অবস্থিত। মোঘলদের আগমনের পূর্বে এটা ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান। ভারনাগের অপরূপ সৌন্দর্য, নির্জনতা ও দূরবর্তিতা জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের জন্য একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থানে মর্যাদা লাভ করে। ভারনাগ নামটি কাশ্মীরের প্রাচীন ধর্মীয় নাগ পূজা থেকে উৎপন্ন হয়েছে ।[১৭৬৮]

জাহাঙ্গীর লিখেছেন, এই বিহাতের উৎস কাশ্মীরের ভারনাগ নামক একটি ঝরনা। ভারতীয় ভাষায় নাগ হচ্ছে ভারনাগ। স্পষ্টতই সেই স্থানে ছিল একটি বৃহদাকায় নাগ। ভারনাগের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে জাহাঙ্গীর মন্তব্য করেন : খালের পারিপাট্য এবং ঝরনার নিচে গজানো ঘাসের শ্যামলিমা সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তি কী লিখতে পারেন? সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ ও সুমিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট গাছপালা উৎপন্ন হতো এবং এগুলোর মধ্যে ময়ূরের বিচিত্র রঙের লেজের আকৃতি বিশিষ্ট একটি কাণ্ড (বোঁটা) দেখা যেত। এটা জলের মধ্যে ঢেউ তুলত এবং এটা থেকে যেখানে সেখানে উৎপন্ন হতো ফুল।[১৭৬৯] ভারনাগের যে অসাধারণ বস্তুটি বার্নিয়ারের মনে সবচেয়ে বেশি আবেদন সৃষ্টি করত তা হলো পুকুরের মাছ। তিনি বলেন, ভারনাগের একটি পুকুরে এমন এক ধরনের মাছ আছে যে তাদেরকে ডাকলেই বা তাদের উদ্দেশ্যে রুটি ছুড়ে মারলে তারা আসে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মাছগুলোর নাকে রয়েছে সোনার আংটি যেগুলোর গায়ে খোদাই করে তাদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের দাদা জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত পত্নী নূরজাহান আংটিগুলো

১৭৬৪. Findly, Noorjahan .... p.257.
১৭৬৫. Tuzuk.-i-Jahangiri, tr. vol. II, p. 173.
১৭৬৬. Ibid., p. 173.
১৭৬৭. Bernier, p. 413.
১৭৬৮. Tuzuk.-i-Jahangiri, tr. vol. I, p. 92.
১৭৬৯. Ibid., vol. II, pp. 173-74.

www.pathagar.com

তাদেরকে পরিয়েছেন।[১৭৭০] মোটকথা ভারনাগ অবশ্যই ছিল একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান। জাহাঙ্গীর উপলব্ধি করেন যে সমগ্র কাশ্মীরে এমন সৌন্দর্য ও আকর্ষণের আর কোনো স্থান নেই।[১৭৭১]

৬. কাশ্মীরের নূর আফজা উদ্যান, হরি পর্বত দুর্গ, দাল হ্রদ

আকবরের নির্মিত দাল হ্রদের পশ্চিমে অবস্থিত হরি পর্বত পাহাড়ের উপরে প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে ছোট অট্টালিকাসমূহ একটি ছোট উদ্যান আছে। কাশ্মীরে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রথম ভ্রমণের সময়ে তাঁরা এটাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে পান। এর এই অবস্থা দেখে জাহাঙ্গীর মুতামিদ খানকে সঙ্গে নিয়ে ছোট বাগানটিকে শৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় আনতে এবং অট্টালিকাগুলো সংস্কার করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন[১৭৭২] এবং শীঘ্রই এটা খুব সুন্দর হয়ে উঠে। ৩২ বর্গগজ আয়তন বিশিষ্ট তিন ভাগে বিভক্ত গৃহশ্রেণি এর সাথে যুক্ত হয় এবং সেখানে চিত্রাবলি ঝুলিয়ে রাখা যেত।[১৭৭৩] নূর আফজা বাগানে ছিল খুব উৎপাদনশীল চেরি গাছ। জাহাঙ্গীর সেখানকার গাছগুলোতে অতিরিক্ত পানি সেচ দেওয়ার জন্য একটি খালও নির্মাণ করেন।[১৭৭৪] সংস্কার কার্যের পরে বাগানটির নতুন নাম রাখা হয় নূর আফজা (বর্ধিত আলো)[১৭৭৫] এবং এই নামকরণ হয়তো এই কারণে করা হয় যে, এর সংস্কারকার্যে নূরজাহানের ছিল একটি বড় অংশীদারিত্ব ও সেই সংস্কারের সময় থেকে তিনি ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক।[১৭৭৬]

৭. কাশ্মীরে অবস্থিত বাগ-ই-বাহার ও দাল হ্রদ

বাগ-ই-বাহার দাল হ্রদের পশ্চিম পার্শ্বে সাদুর খানে অবস্থিত। কথিত আছে যে, নূরজাহান ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে এটা নকশার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু এর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব আর নেই। এর ছিল দুটি গৃহশ্রেণি যেখান থেকে জলাশয়ের চমৎকার দৃশ্য অবলোকন করা যেত; একটি গৃহশ্রেণি ছিল হ্রদ অভিমুখী এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানের দিকে প্রসারিত।[১৭৭৭] গৃহশ্রেণিগুলোর মধ্যে ছিল একটি

১৭৭০. Bernier, p. 414.
১৭৭১. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 174.
১৭৭২. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, pp. 150-51.
১৭৭৩. Ibid., p. 151.
১৭৭৪. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 238.
১৭৭৫. Ibid., vol. II. pp 150-51.
১৭৭৬. Findly, Noorjahan ...., p. 255.
১৭৭৭. Ibid., p. 255.

www.pathagar.com

পাথর নির্মিত তাঁবু।[১৭৭৮] এই গৃহশ্রেণিগুলো তৈরি হয় চেহার সিনার স্থাপত্য রীতিতে[১৭৭৯] এগুলোর উপরে সারাদিন ছায়া দেওয়ার জন্য একটি বর্গাকার স্থানের উপরে চারটি সিনার বৃক্ষ সুষমভাবে রোপণ করা হয়।[১৭৮০] এখানকার গাছগুলোতে পানি দেওয়ার জন্য[১৭৮১] সিন্ধুনদ থেকে খননকৃত সুইজ খাল থেকে পানি আসত।[১৭৮২]

৮. দারোগাবাগ (লালারুখের উদ্যান), মানাসবাল হ্রদ, কাশ্মীর

মোঘলদের অনেক পার্বত্য উদ্যানের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির মতে এই স্থানটিতে রয়েছে নূরজাহানের জন্য নির্মিত একটি প্রাসাদ। এটা সমতলভাবে দেওয়ালের উপরে নির্মিত এবং এখানে রোপণ করা হয়েছে জনপ্রিয় বৃক্ষরাজি।[১৭৮৩] এটা স্পেনদেশীয় উঁচু পাটাতন বিশিষ্ট জাহাজের মতো শান্ত জলরাশির দিকে মিলিত হয়েছে[১৭৮৪] এবং মোঘল রাজত্বকালে ধ্বংসাত্মক বন্যার বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে।[১৭৮৫]

৯. লাহোরে অবস্থিত শাহদারা

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের রাজধানী শহর লাহোর ছিল শাহী দম্পতির আর একটি প্রিয় জায়গা। এখানেও নূরজাহান রাভি নদীর তীরে কয়েকটি বাগান স্থাপন করেন। লাহোর থেকে প্রায় ৫ মাইল দূরে দেখা যায় নূরজাহানের দিলকুশা উদ্যান (আনন্দ উদ্যান) নামক বিখ্যাত প্রমোদ উদ্যান। পরবর্তীকালে শাহদারা নামে আখ্যায়িত দিলকুশাবাগে জাহাঙ্গীরকে তাঁর মৃত্যুর পরে সমাহিত করা হয়– যদিও জাহাঙ্গীর মৃত্যুকালে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে কাশ্মীরের ভারনাগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।[১৭৮৬] নূরজাহান আগ্রাতে তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার (এবং তাঁর মা আসমত বানুর) উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধের স্থাপত্যরীতি অনুকরণে জাহাঙ্গীরের উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধের

১৭৭৮. Pant, Economic History of India Under the Mughals, p. 117.
১৭৭৯. Ibid., p. 117.
১৭৮০. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 159.
১৭৮১. Pant, Economic History of India Under the Mughals, p. 117.
১৭৮২. Sugam Anand, The history of Begum Noorjahan, p. 69.
১৭৮৩. Findly, Noorjahan ...., p. 255.
১৭৮৪. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 157.
১৭৮৫. Findly, Noorjahan ...., p. 255.
১৭৮৬. Elizabeth B Moynihan, Paradise as a garden in Persia and Mughal India (London; 1982), p. 128; Findly, Noorjahan ...., p. 252; C.M.V. Stuart gardens of the great Mughal's, p. 130.

www.pathagar.com

নকশা তৈরি করেন।[১৭৮৭] সরাইখানার একটি উঠানের মধ্য দিয়ে রয়েছে শাহদারা উদ্যানগুলোতে প্রবেশের পথ।[১৭৮৮] ভেতরের সমাধিসৌধসহ নির্মিত উদ্যানে যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি উঁচু প্রবেশের পথ।[১৭৮৯] বাগানটি খুব বড় এবং এর আয়তন প্রায় ৫৪০ বর্গগজ ও এটা ৬০ একর জমির উপর বিস্তৃত[১৭৯০] বাগানটি লাহোরের ঐতিহ্যবাহী ইট দ্বারা নির্মিত বাঁধ, খাল ও পুকুর দ্বারা চমৎকারভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত ।[১৭৯১] সমাধিসৌধটিকে পরিবেষ্টনকারী একগুচ্ছ ঝরনা জলাধার থেকে আটটি বড় চাবুট্রাজ নির্মাণ করা হয়েছে।[১৭৯২] খালগুলোর প্রান্তে আছে সরলবর্গীয় গাছ ও ফুল। গৃহশ্রেণির কিনারা ঘেঁষে প্রবহমান একটি সরুপানির নর্দমা জমিটির উপরের ফলগাছগুলোতে পানি সরবরাহ করত।[১৭৯৩] প্রথাগতভাবে নির্মিত বাঁধগুলো নিয়ন্ত্রণ করত পানির প্রবাহ এবং এটা চার ফুট নিচে বাগানে গিয়ে পড়ত।[১৭৯৪]

জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ থেকে নিকটতম মুক্ত ময়দানে শায়িত রয়েছেন নূরজাহান একটি খোলা ও অনাড়ম্বর সমাধিতে। এই সমাধিটি স্থাপন করা হয় একটি বর্গাকৃতি ভিত্তিমূলের উপরে। চারবাগটি ছিল চারশত বর্গগজ বিশিষ্ট এবং এতে ছিল নূরজাহানের ছোট বাসস্থান।[১৭৯৫] নূরজাহানের সমাধিসৌধের খুব কমই এখন অবশিষ্ট আছে এবং তার পরিমাণ নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

১০. জলন্ধরে অবস্থিত নূরসরাই উদ্যান

এটা জলন্ধর শহর থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে নূরজাহান একটি সরাইখানা ও একটি উদ্যান ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তৈরি করেন। এ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর লিখেছেন : আমি নূরসরাইতে আমার বাসস্থানটি গ্রহণ করলাম। এই স্থানে নূরজাহান বেগমের ভাকিলরা একটি উঁচু বাসভবন নির্মাণ করেন ও তৈরি করেন একটি রাজকীয় উদ্যান।[১৭৯৬]

১৭৮৭. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 131; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 131.
১৭৮৮. Findly, Noorjahan ...., p. 252; C.M.V. Stuart gardens of the great Mughal's, p. 130; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 131.
১৭৮৯. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 131.
১৭৯০. James Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture. vol. II, p. 304.
১৭৯১. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 131.
১৭৯২. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 131.
১৭৯৩. E. B. Moynihan, Paradise as a garden ....., p. 128.
১৭৯৪. Ibid., p. 128.
১৭৯৫. Ibid., p. 129.
১৭৯৬. Tuzuk-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 192.

www.pathagar.com

১১. আগ্রাতে অবস্থিত ইতিমাদ-উদ-দৌলার উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধ

আগ্রাতে ভারতের সম্রাজ্ঞী হিসেবে নূরজাহানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সুন্দর বাগান ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নূরজাহানকে দেওয়া বাগান আমরা দেখতে পাই। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো তাঁর পিতা ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধযুক্ত বাগান, মতিবাগ, জাহারাবাগ (নূরমঞ্জিল বাগান), রামবাগ (নূর আফসান বাগান) ইত্যাদি। এই বাগানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় যমুনা নদীর তীরে; বাগানের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলো যমুনা নদীর পূর্বদিকের বাঁকে বাঁকে বিস্তৃত।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধটি আগ্রাতে যমুনা নদীর তীরসংলগ্ন স্থানে নূরজাহান কর্তৃক নির্মিত হয়। ভিলিয়ারস স্টুয়ার্ট এটাকে সকল উদ্যানযুক্ত সমাধিসৌধের মধ্যে অন্যতম সবচেয়ে সুন্দর সমাধিসৌধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১৭৯৭] নদীতীরের উপরে উদ্যানটির বাইরের কাঠামোতে জলাশয়ের সম্মুখবর্তী তাঁবুবিশিষ্ট তিন ধারযুক্ত আবেষ্টনীর মাঝখানে রয়েছে উদ্যানটির প্রবেশপথ। উদ্যানটি ঐতিহ্যবাহী চারবাগ স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। এর জল নির্গমন পথগুলোতে রয়েছে জলপ্রবাহের মিলন কেন্দ্রে চারটি সমান চতুর্ভাগ বিশিষ্ট স্মৃতিসৌধ। মধ্যবর্তী মঞ্চের প্রত্যেক ধারে আছে চারটি ছোট জলাধার, প্রত্যেকটিতে রয়েছে একটি ঝরনা। কৌনিক জলের নালাগুলো ছোট ঘেরা স্থানের চার কোনায় পানি বয়ে নিয়ে যায়।[১৭৯৮] প্রধান দরজাতে যাওয়ার জন্য রয়েছে উভয় পাশে সমান দূরত্বে রোপণ করা আমগাছের বাগান।[১৭৯৯] মোটের ওপর এটা মোঘলদের তৈরি বাগানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দক্ষতাপূর্ণ।

১২. আগ্রার মতিবাগ

মোঘল আমলে ভারত ভ্রমণকারী কয়েকজন পর্যটক মতিবাগের (মতিমহলের) মালিকানা নূরজাহান বেগমের বলে উল্লেখ করেছেন। এই পর্যটকরা হলেন পিলসার্ট ও পিটার মান্ডি। মান্ডি তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণে যমুনা নদীর এক তীরে দারিকা বাগ (দিহরাবাগ) ও সম্রাট আকবরের বাগান ও অন্য তীরে নূরমহল কর্তৃক নির্মিত মতিবাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।[১৮০০] চারবাগ এবং মতিবাগ নামেও পরিচিত মতিমহল বাগান দুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন পিলসার্ট।[১৮০১]

১৭৯৭. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 52.
১৭৯৮. Findly, Noorjahan .... p. 251.
১৭৯৯. Findly, Noorjahan .... p. 251; Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 123.
১৮০০. Peter Mundy in Europe and Asia, vol. II, p. 214.
১৮০১. Pelsaert, p. 5.

www.pathagar.com

পিটার মান্ডি যমুনা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত মাঝখানে সরাইখানাসহ দুটি বাগান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে বাগান দুটির মালিক ছিলেন নূরজাহান। মান্ডি বলেন– আমি আগ্রা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং নদী অতিক্রম করে সাবেক সম্রাজ্ঞী নূরমহল কর্তৃক নির্মিত পর্যটকদের থাকার স্থান নূরমহল কা সারাতে এলাম। এটা তাঁরই (নূরজাহানের) নির্মিত দুটি বাগানের মধ্যে অবস্থিত।[১৮০২] এগুলোর মধ্যে জনশ্রুতি অনুসারে অন্যতম হলো মতিবাগ।[১৮০৩]

১৩. আগ্রায় অবস্থিত রামবাগ (নূর আফসান বা গুল আফসান বাগান)

মূলত রামবাগ বা আরামবাগ (বিশ্রামের বাগান) প্রতিষ্ঠা করেন বাবর এবং তিনি এর নাম রাখেন গুল আফসান (ছড়ানো ফুল)। এটা যমুনা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। নিজের জন্য গরম পানিতে স্নান, জলাধার ও বাড়িতে নিজের ব্যবহারের ও তাঁর নিজের অন্যান্য লোকের জন্য পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বাবর একটি বিশাল কূপ নির্মাণ করেন।[১৮০৪] জাহাঙ্গীরের শাসন আমলে এই বাগানটির মালিকা ছিলেন তাঁর সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।[১৮০৫] তখন বাগানটি নূর আফসান (ছড়ানো আলো) বাগান নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে যে, নূরজাহান কতকাংশে বাবরের নকশাটি পরিবর্তন করেন।[১৮০৬] নূরজাহান এখানে তৈরি করিয়ে নেন নতুন অট্টালিকা।[১৮০৭] বাগানটি এর চমৎকার ফলদায়ক বৃক্ষাদির জন্য ছিল বিশেষভাবে পরিচিত এবং সেখানে এমন কতকগুলো ফল পাওয়া যেত যেমন আঙ্গুর, তরমুজ, আম, আনারস ও তেঁতুল।[১৮০৮] জাহাঙ্গীর ও তাঁর সম্মানিত মহিলারা প্রায়ই পরিদর্শন করতেন নূর আফসান বাগান। এখানে আপ্যায়ন করা হতো অতিথিদেরকে ও আয়োজন করা হতো ভোজের। জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় এমনি একটি উপলক্ষ সম্বন্ধে বলেছেন : বুধবার দিনে মহিলাদের সাথে একটি নৌকাতে একত্রে বসে আমি নূর আফসান বাগানে যেতাম এবং রাতে সেখানে বিশ্রাম করতাম। যেহেতু বাগানটি নূরজাহান বেগমের স্থাপনার অন্তর্গত সেহেতু চতুর্থ বৃহস্পতিবার তিনি আয়োজন করতেন রাজকীয় খানার এবং মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিতেন।[১৮০৯]

১৮০২. Peter Mundy, vol. II, pp. 78-79.
১৮০৩. Richard Carnac Temple in Peter Mundy, vol. II, p. 79n.
১৮০৪. Findly, Noorjahan ...., p. 248.
১৮০৫. Findly, Noorjahan .... p. 248; C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 42; Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 199; E. B. Moynihan, Paradise as a garden ..... p. 102.
১৮০৬. Moynihan, Paradise as a garden ....., p. 102.
১৮০৭. Findly, Noorjahan .... p. 249.
১৮০৮. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. I, p. 5.
১৮০৯. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 199.

www.pathagar.com

এই ভোজ সভাটি ছিল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ১৬তম বছর উদযাপন উপলক্ষে।[১৮১০] রামবাগ বা নূর আফসান বাগানকে ভারতের প্রাচীনতম স্মরণীয় বাগানগুলোর অন্যতম বলে মনে করা হয়। এর মূল জ্যামিতিক গঠন ও এর নির্মাণ কার্যের বিশাল অংশের সবটুকুর অস্তিত্ব আর নেই।

১৪. আগ্রাতে অবস্থিত জাহারাবাগ (নূর মঞ্জিল বাগান)

জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় যমুনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত রামবাগের দক্ষিণে নূর মঞ্জিল নামে একটি বাগানের উল্লেখ দেখতে পাই। এইচ. বেভারিজ বলেন যে, দেহরাবাগ ও নূরমঞ্জিল একই বাগান[১৮১১] এবং ১৬১৩ ও ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দের মতো শিকার অভিযান বা কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য আগ্রা নগরী ত্যাগ করার সময় জাহাঙ্গীর প্রায়ই এখানে অবস্থান করতেন।[১৮১২] এই দাহরাবাগ ও জাহারাবাগ বাবরের একজন কন্যার মালিকানাধীন ছিল বলে কথিত আছে।[১৮১৩] এটা নূরজাহানের ছিল বলে কোনো সূত্র হতে জানা যায় না। কিন্তু এলিসন ফিন্ডলি এই মতো পোষণ করেন যে, এই বাগানের নতুন নামকরণ এবং এর সূচনালগ্ন দেখে বলা যায় এটা নিশ্চয়ই রানির অন্যতম প্রধান প্রকল্প ছিল।[১৮১৪] নূরমঞ্জিল উদ্যানটি এর নবনির্মিত অট্টালিকা, অত্যন্ত সুসজ্জিত বাসভবন, পানি সংরক্ষণাগার, জলাশয়, ঝরনা, জলপ্রপাতসহ স্থাপিত হয় এবং উদ্যানটির সাথে ঠিক দরজার বাইরে ছিল গাছপালায় বত্রিশ জোড়া বলদের সাহায্যে টানা পানি সেচ দেওয়ার একটি বিশাল কূপ।[১৮১৫] জাহাঙ্গীর সেখানে সুখে শান্তিতে অনেক দিন অতিবাহিত করেন। এমন একটি সফর উপলক্ষে সেখানে গিয়ে তিনি লিখেন, 'আমি সেই আনন্দপূর্ণ গোলাপ উদ্যানে সানন্দে সময় কাটাই।'[১৮১৬]

(চ) শাহজাহানের আমলে রাজকীয় মহিলাদের উদ্যান

১. তাজমহল উদ্যান

প্রিয় সম্রাজ্ঞীর জন্য শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত অবিস্মরণীয় স্মৃতিসৌধ তাজমহল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে সম্রাজ্ঞীর জন্য তাঁর

১৮১০. Ibid., p. 199n.
১৮১১. H. Beveridge in Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 76n.
১৮১২. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. I, pp. 232, 252.
১৮১৩. Findly, Noorjahan ...., p. 249.
১৮১৪. Ibid., p. 249.
১৮১৫. Findly, Noorjahan ...., p. 249.
১৮১৬. Tuzuk.-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 98.

www.pathagar.com

ভালোবাসা। এটা আগ্রাতে যমুনা নদীর তীরে একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত। এটা চারবাগের শেষ প্রান্তে যমুনা নদীর সম্মুখে সমতল স্থানে স্থাপিত। এই স্থাপনাটি প্রচলিত ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম এবং স্মৃতিসৌধটি একটি চারবাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। উদ্যানের সাথে নির্মিত স্মৃতিসৌধের দালানগুলো সুপরিকল্পিত। ঝরনাধারাতে সুষম ও সমান পানির বণ্টন ও চাপ নিশ্চিত করার জন্য মাটির নিচে অবস্থিত পানির পাইপ ও পানি চলাচলের পথে ঝরনাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করানো হয় তামার পাত্র।[১৮১৭] পানির দ্বারা পাত্রগুলো ভর্তি না করা পর্যন্ত ঝরনার পানি উঠত না। আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত জল নির্গমন নলে নয়, প্রধান জল নির্গমন নলে পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো আকৃতি বিশিষ্ট মর্মর পাথরে নির্মিত ঝরনা স্থাপন করা হয়। বাগানের মাঝখানে রয়েছে উঁচু বর্গাকৃতি পাঁচটি ঝরনা। বাগানের জন্য পানির সরবরাহ আসত যমুনা নদী ও তাজমহলের আবেষ্টনীর পশ্চিমের দরজার বাইরে বিশাল জলাধারে সঞ্চিত জলরাশি থেকে। একটি রশি ও বালতির সাহায্যে বিড়ালের মতো ঘড় ঘড় শব্দ করে পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলদেরা নদী থেকে উঁচু জল যাওয়ার পাকা নর্দমাতে পানি তুলত এবং পানি সংরক্ষণকারী জলাধারে পানি সরবরাহ করত।[১৮১৮] সেখনে রয়েছে গাছ ও ফুলের প্রাচুর্য।

২. দিল্লিতে অবস্থিত শালামারবাগ

এটা বিবি আকবরাবাদী নামে পরিচিত শাহজাহানের অন্যতম পত্নী আজুন নিসা কর্তৃক কাশ্মীর ও লাহোরের শালামার বাগেরই স্থাপত্য রীতি অনুকরণে নির্মিত হয়।[১৮১৯] ইনায়েত খানের মতে, এই বাগানটি সম্রাট শাহজাহান আকবরাবাদী মহলকে দান করেন।[১৮২০] তাঁর নাম অনুসারে স্থানটি আকবরাবাদ নামে পরিচিত ছিল।[১৮২১] এটা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের একেবারে কাছে রাজপ্রাসাদের প্রান্তসীমা থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে বাদলি সরাইখানার নিকটে শাহজাহানাবাদের (দিল্লির) ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।[১৮২২] মুহাম্মদ সালেহর হিসাব অনুযায়ী এটা চার বছরে ২ লক্ষ টাকা খরচে নির্মিত হয়।[১৮২৩] কিন্তু এনায়েত খানের মতে, এর জন্য খরচ হয় ২০ লক্ষ টাকা।[১৮২৪]

১৮১৭. E. B. Moynihan, Paradise as a garden ...... p. 131.
১৮১৮. Ibid., p. 132.
১৮১৯. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 146; ; C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 103.
১৮২০. Inayat Khan, The Shahjahan Nama, (tr.), p. 451.
১৮২১. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 103.
১৮২২. The Shahjahan Nama, (tr.), p. 451.
১৮২৩. Muhammad Saleh Kambu quoted C.M.V. Stuart gardens of the great Mughal's, p. 105.

www.pathagar.com

আজুন নিসা বেগম বা বিবি আকবরাবাদী তাঁর বাগানে কাশ্মীরের বাগানগুলোর বিভিন্ন প্রকার সাল স্থাপত্য সৌন্দর্যের মিলন ঘটান। বাগানটি ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কোনো এক উৎসবের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়।[১৮২৫] বার্নিয়ার বাগানটিকে রাজকীয় ও সুন্দররূপে দেখতে পান; কিন্তু তাঁর মতে এটা ছিল ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র।[১৮২৬] বাগানটির এখন আর তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই বললেই চলে; এর মূল্যবান বস্তুগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের মধ্যে লুণ্ঠিত হয়।

৩. জাহানারা ও রওশন আরার উদ্যান

শাহজাহানের উভয় কন্যা জাহানারা ও রওশন আরা দিল্লি, কাশ্মীর ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে বেশকিছু বাগান স্থাপন করেন। যদিও দিল্লির সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজার শরীফের কাছে সাদা মর্মর পাথরে নির্মিত অত্যন্ত সাদামাটা ধরনের জাহানারা বেগমের সমাধির সঙ্গে কোনো সুন্দর উদ্যান নেই, তথাপি কাশ্মীরের বাগ-ই-জাহানারা,[১৮২৭] বাগ-ই-সাফা,[১৮২৮] বাগ-ই-নূর বা বাগ-ই-নূর আফসান ও বাগ- ই-আইশাবাদের মতো[১৮২৯] অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্যান তিনি নির্মাণ করেন এবং এগুলো জওহর খান খাজাসারার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয়।[১৮৩০] কাশ্মীরের আর একটি উদ্যান শাহজাহান জাহানারাকে দিয়েছিলেন।[১৮৩১] তিনি আম্বালাতে একটি[১৮৩২] এবং সুরাটে অন্য একটি উদ্যানেরও মালিকা ছিলেন।[১৮৩৩] ব্র্যাচোলে ছিল তাঁর অনেক খালও বৈচিত্র্যপূর্ণ গাছপালা বিশিষ্ট একটি উদ্যান।[১৮৩৪] ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেগম-কা-বাগ নামে দিল্লিতে একটি সুন্দর উদ্যান স্থাপন করেন।[১৮৩৫] এটা ন্যাশনাল ক্লাব থেকে এখনকার লজপত রায় মার্কেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বেগম-কা-বাগের ছিল শীতল বিশ্রামস্থান, প্রচুর ফুল ও ফলের গাছ বিশিষ্ট জলাশয়, পানির

১৮২৪. The Shahjahan Nama, (tr.), p. 451.

১৮২৫. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 148.

১৮২৬. Bernier quoted in Crowe and Haywood, p. 148.

১৮২৭. Qazwini. Padshah Nama, Fol. 279a; Lahori, Badshah Nama, vol. II, pt. 1. p. 99.

১৮২৮. Lahori, Badshah Nama, vol. I, pt. I. p. 195; Qazwini. Fol. 279a

১৮২৯. Qazwini. Fol. 279a; Lahori. Badshah Nama, vol. I, pt. II. p. 27.

১৮৩০. Muhammad Saleh Kambu, Amal-i-Saleh, vol. II, p. 36.

১৮৩১. Lahori, vol. II, pt. 1. p. 99.

১৮৩২. Lahori, vol. II, pt. 1. p. 7 and vol. II, pt. 1, p. 115; Qazwini. FF. 279a and 584.

১৮৩৩. S.N. Sen ed. The Indian Travels of Thevenot and Careri (New Delhi; 1949), p. 25; Stavorinus Voyage too the East indics., tr. S.H. Wilcocke. vol. II. p. 468 and vol. III. p. 177.

১৮৩৪. Lahori, vol. II. pt. 1. p. 428.

১৮৩৫. Maheshwar Daval. Rediscovering Delhi, The Story of Shahanabad. p. 29.

www.pathagar.com

নর্দমা, ঝরনা ও লাল বেলে পাথরের ১২টি স্তম্ভের ওপর একাধিক চাঁদোয়া। এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো সারা বছর পর্যাপ্ত সেচ প্রদানকারী আলী মর্দান খানের খাল। এখানে অনেক উৎসবও উদযাপিত হতো। মহিলাদের জন্য পানখোন-কা-মেলার সমাপ্তিমূলক অংশ এখানে উদযাপিত হতো।[১৮৩৬] কাশ্মীর গেটের বাইরে ত্রিশ হাজারি বাগানগুলোও পরবর্তীকালে পরিণত হয় জাহানারা বেগমের জায়গিরে।[১৮৩৭] একসময় রওশন আরা বেগমের প্রমোদ উদ্যানে তাঁর সমাধিসৌধটি ছিল, এটা শাহজাহানাবাদের (দিল্লির) উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত।[১৮৩৮] এটা তাঁর নাম অনুসারে রওশন আরা উদ্যান নামে আখ্যায়িত সাদা মর্মর পাথরে নির্মিত সমাধিসৌধটি দাঁড়িয়ে আছে লতাবেষ্টিত দেওয়াল ঘেরা বাগানের উচ্চতর সমতল ভূমির মধ্যস্থলে নিচু ও প্রশস্ত মঞ্চের উপরে। দুইধারে ফুলের আবাদ বিশিষ্ট এবং এক সারি ছোট ঝরনা দ্বারা শোভিত একটি উঁচু খাল এই অট্টালিকা ও প্রবেশ তোরণের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত।[১৮৩৯]

৪. জীবন নিসা বেগমের উদ্যানসমূহ

অট্টালিকা ও উদ্যান তৈরির ক্ষেত্রে সকল মোঘল শাহজাদিদের মধ্যে জীবন নিসা সবচেয়ে বিখ্যাত, শিল্পবোধসম্পন্ন, কাব্যিক ভাবাবেগপূর্ণ ও শিক্ষিত এবং আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জীবন নিসা অন্যান্য রাজকীয় মোঘল নারীদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর সকল উদ্যানের মধ্যে চৌবুরাজিবাগ ও নয়ন কোটবাগ ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। দেওয়াল ও দরজার অংশগুলো ব্যতীত বর্তমানে চৌবুরাজি (চারটি উঁচু স্তম্ভ) বাগের অধিকাংশই এখন আর নেই। দেওয়াল ও দরজাগুলোর মধ্যে একটি নীলকান্ত মণি, তৈলস্ফটিক ও আকাশি রঙের টালি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবৃত।[১৮৪০] খিলানযুক্ত প্রধান প্রবেশপথের উপরে সরলবর্গীয় গাছ, ফুল এবং আরবি ও পারস্য ভাষায় উৎকীর্ণ পদাবলিতে শোভিত চারটি উঁচু মিনারের মধ্যে তিনটি এখনও আছে।[১৮৪১] এই উৎকীর্ণ ভাষ্যগুলোর একটি থেকে জানা যায় যে, তিনি এই বাগানটি তাঁর পুরাতন বন্ধু ও শিক্ষয়িত্রী মিয়াবাঈকে উপহার দেন।[১৮৪২] নয়নকোটে অবস্থিত জীবন নিসার

১৮৩৬. Ibid., pp. 29-31.
১৮৩৭. Rediscovering Delhi ...., p. 60; Maasir-i-Alamgiri, J. Sarkar, p. 275.
১৮৩৮. Crowe and Haywood, The Gardens of Mughal India, p. 184.
১৮৩৯. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 110.
১৮৪০. Ibid., p. 134.
১৮৪১. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 135; Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 20.
১৮৪২. Magan Lal tr. The Diwan of Zeb-un-Nissa, p. 20.

www.pathagar.com

বাগানটি চৌবুরাজি থেকে দূরে নয়। এখানে তাঁকে সমাহিত করা হয় তাঁর মৃত্যুর পরে।[১৮৪৩] কিন্তু অন্য কয়েকটি উৎস হতে জানা যায় যে তাঁকে প্রথমে নূরজাহান বেগমের মালিকানাধীন ও পরে জীবন নিসা বেগমের জায়গিরে পরিণত দিল্লিস্থ তিশহাজারি উদ্যানে সমাহিত করা হয়।[১৮৪৪]

৫. অন্যান্য শিল্পকলা

মোঘলরা ছিলেন শিষ্টাচার, দক্ষতা ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন এবং শিল্পের সমঝদার। নির্মাণকার্য পরিচালনা ও উদ্যান তৈরি করা ছাড়াও মোঘল বংশীয় পুরুষ ও তাঁদের সম্মানিত মহিলারা চিত্রাঙ্কন, সংগীত, পোশাক পরিকল্পনা, সাজসজ্জা ইত্যাদির মতো বেশ কয়েকটি অন্য রকমের শিল্পকলায় আগ্রহ পোষণ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এই সকল ক্ষেত্রে মোঘল নারীদের সাফল্য সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তৎসত্ত্বেও আমরা নূরজাহান বেগমের মতো মোঘল নারীদের সাক্ষাৎ পাই– যাঁদের এসব বিষয়ে গুণাবলি ছিল এবং এই গুণাবলি নূরজাহানকে সেই যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। এ রকম প্রতিভাসম্পন্ন আরও কিছু রাজকীয় নারী সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হবে।

৬. সঙ্গীত ও নৃত্য

প্রাচীনকাল থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার ন্যায় নান্দনিক শিল্প ও আত্মপ্রকাশের জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। ভারতেও এগুলো শত শত ও হাজার হাজার বছর আগে থেকে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে মোগলদের আগমনের সাথে সাথে আগে থেকে বিদ্যমান সঙ্গীত প্রকরণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংগীতিক ধারণার প্রবর্তন হয় এবং এভাবে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদ্ভব ঘটে নতুন প্রবণতার। মোঘলরাও নৃত্যকলার ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করেন।

মোঘল সম্রাটগণ সঙ্গীতকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁদের রাজদরবারে নামিদামি সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা অলংকৃত হতো এবং তাঁদেরকে বিপুল পরিমাণে পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো এবং এমনকি তাঁদেরকে দেওয়া হতো আমিরদের মতো উচ্চ পদমর্যাদা।[১৮৪৫] এমনকি শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের মতো কয়েকজন মোঘল সম্রাট কিছু সঙ্গীত যন্ত্র বাজাতে পারতেন, যদিও আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের পরবর্তীকালে সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদেরকে তাঁর

১৮৪৩. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 135

১৮৪৪. Maasir-i-Alamgiri, J. Sarkar, p. 275.

১৮৪৫. M.A. Ansari, Social life of the Mughal Emperors (New Dwlhi; 1974), p. 175.

www.pathagar.com

দরবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[১৮৪৬] বাবর, হুমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গীর ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমিক। আকবরের রাজদরবারে ছিলেন মিঞা তানসেনের মতো সঙ্গীত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তানসেনের দ্বীপক রাগে আগুন জ্বলে উঠত এবং তাঁর মেঘমল্লার রাগে বৃষ্টি নামত ও সেই বৃষ্টিতে নির্বাপিত হতো আগুন। এই সকল শাহীদরবারভুক্ত সঙ্গীতজ্ঞ ছাড়াও মোঘল আমলে ছিল রাজদরবারভুক্ত গায়িকা ও নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। তারা বিবাহ অনুষ্ঠান, উৎসব ও ভোজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করত। বিভিন্ন নামে পরিচিত তাদের অনেক দল ছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় গোষ্ঠীটি ছিল কাঞ্চনী যারা আগে কাঞ্জাবি নামে পরিচিত ছিল এবং সম্রাট আকবর তাদের নাম দেন কাঞ্চনী।[১৮৪৭] শাহজাহানের শাসনকালে তারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় এবং তারা সেই সময়ে শাহীদরবারে দুইবার করে হাজির হতো।[১৮৪৮]

৭. বিখ্যাত নারী সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ

মোঘল আমলে মেওয়ারের মীরাবাঈ, রাজা মানসিংয়ের অষ্টম রানি মৃগনয়না ও মালোয়ার রূপমতি ছিলেন প্রসিদ্ধ নারী সঙ্গীতশিল্পী।.যেহেতু মোগল সম্রাটদের কাছে সঙ্গীত একটি শিল্পকলা রীতি হিসেবে পরিচিত ছিল সেহেতু এটা অস্বাভাবিক নয় যে তাঁদের সম্মানিত নারীরা এই শিল্পরীতির সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা অবশ্যই শাহীদরবারের উৎসবে হাজির হতেন এবং তাঁদের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের রচিত গান শোনার সুযোগ ছিল। কতিপয় রাজকীয় মোঘল মহিলাও চমৎকারভাবে গান করতেন, যন্ত্রসঙ্গীত বাজাতেন ও গান লিখতেন। নূরজাহান বেগম ছিলেন সঙ্গীতে পারদর্শিনী[১৮৪৯] এবং মমতাজমহল ও জীবন নিসা বেগমও ছিলেন তাঁর মতোই সঙ্গীতে পারদর্শিনী।[১৮৫০] নূরজাহান নিজেই ছিলেন একজন কবি এবং তিনি গীতিকবিতা লিখতেন। মনে হয়, সম্রাট শাহজাহান মমতাজের গান গওয়ার সময় তাঁর মধুর কণ্ঠে অভিভূত হতেন।[১৮৫১] জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র শাহজাদা পারভেজের সুন্দরী কন্যা নাদিরা বেগম এবং শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর নিবেদিতপ্রাণ পত্নী প্রতিভাসম্পন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর দ্রুপদ

১৮৪৬. Ibid., p. 176.

১৮৪৭. Ibid., p. 176.

১৮৪৮. Ibid., p. 176.

১৮৪৯. Beni Prasad, History of Jahangir, p. 172; J. Pool, Famous women of India (Calcutta, 1954), pp. 91-92.

১৮৫০. Rekha Misra, Women in Mughal India, p. 95.

১৮৫১. Maharani Sunity Devee, The beautiful Moghul Princess, pp. 17-18.

www.pathagar.com

সঙ্গীত পরিবেশন খুব পছন্দ করতেন শাহজাহান।[১৮৫২] শাহজাহান তাঁকে মিঞা তানসেন রচিত রাগ-রাগিনীর একটি বিশাল গ্রন্থ উপহার দেন।[১৮৫৩] আমাদের জানামতে হীরাবাঈ বা জৈনাবাদী ছিলেন একজন দাসীর মেয়ে যাঁকে আওরঙ্গজেব খুব ভালোবাসতেন তাঁর যৌবনকালে। জৈনাবাদীর সঙ্গীত বিষয়ে দক্ষতা ও আকর্ষণ আওরঙ্গজেবসহ অনেকের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল এবং তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁকে ভুলতে পারেননি।[১৮৫৪]

৮. নৃত্য

মোঘল আমলে নৃত্যকে সম্মানজনক বলে বিবেচনা করা হতো না এবং অভিজাত নারীরা এই শিল্পকলাটি শিখতে আগ্রহী ছিলেন না। এটা শুধু কয়েকটি পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মোঘল সম্রাটগণ রাজদরবারে নৃত্য অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। রাজকীয় নারীরা ঘোমটার আড়াল থেকে এসব অনুষ্ঠান দেখতেন। তাঁরা এসব অনুষ্ঠান দেখতে খুব পছন্দ করতেন এবং হেরেমেও প্রায়ই দেখতেন নাচের অনুষ্ঠান। অনেক মোঘল চিত্রে প্রকাশ পেয়েছে নৃত্য অনুষ্ঠানের প্রতি মোঘল নারীদের অনুরাগ।[১৮৫৫] নূরজাহান হেরেমের মধ্যে সস্তা ধরনের আমোদ-প্রমোদের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্যকে উৎসাহিত করতেন।[১৮৫৬] আওরঙ্গজেবের সময়ে নাচ ও গান শাহীদরবারে ছিল নিষিদ্ধ, কিন্তু হেরেমের মধ্যে নাচ-গানের অনুমতি ছিল।[১৮৫৭]

৯. অলংকরণ ও পোশাক ডিজাইন শিল্প

মোঘল হেরেমের নারীরা অলংকরণ শিল্প খুব পছন্দ করতেন এবং উৎসবাদিতে ও বিশেষ উপলক্ষে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতেন। গুলবদন বেগম তাঁর হুমায়ুননামাতে এমন কতকগুলো অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যখন রাজকীয় মহিলারা তাঁদের প্রাসাদ, বাগান ও পারিপার্শ্বিক স্থানগুলো অলংকরণের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করেছিলেন। বাবরের স্ত্রী ও হুমায়ুনের মা মাহাম বেগম অনেক সময় এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।[১৮৫৮] তাঁর প্রদত্ত একটি ভোজসভা উপলক্ষে তিনি প্রচলিত রীতি অনুসারে শুধু

১৮৫২. Muni Lal, Shahjahan (Ghaziabad; 1986), p. 209.
১৮৫৩. Ibid., p. 209.
১৮৫৪. J. Sarkar, Maasir-i-Alamgiri, vol. 1, p. 65.
১৮৫৫. Percy Brown, Indian painting under the Mughals (New york: 1975), Plate1.
১৮৫৬. Sugam Anand, The history of Begum Noorjahan, p. 73.
১৮৫৭. Manucci, Storia, vol. II, p. 335.
১৮৫৮. Gulbadan Begam's Humayun Nama, (tr.) pp. 113-14

www.pathagar.com

বাজারাগুলোকে আলোকিত করাই নয়, সেই সাথে অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও সৈনিকদের বাসস্থান আলোকিত করারও আদেশ দেন। গুলবদন বলেন, 'এই ঘটনার পরে আলোকসজ্জা ভারতে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়।'[১৮৫৯] এই ভোজসভা উপলক্ষে মাহাম বেগম বুটিদার শিল্পকর্ম শোভিত, গিলটি করা ও প্রচুর অলংকৃত তাঁবু ও দর্শকদের জন্য বিশাল তাঁবু স্থাপন করেন।[১৮৬০]

নূরজাহানের সৃজনশীলতার কোনো সীমা ছিল না এবং তাঁরই ব্যবস্থাপনায় অলংকরণ শিল্প উৎকর্ষের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে। রঙের সমন্বয় ও নকশার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল বিস্ময়কর ধারণা। আগ্রার দুর্গে মোসাম্মান বুরুজটি নূরজাহানের পরিকল্পনা অনুযায়ী অলংকৃত করা হয়েছিল এবং এখানেই শাহজাহান বন্দিদশায় দিন কাটিয়েছিলেন এবং বুরুজটি ছিল নূরজাহানের সময়ে তাঁর বাসভবন।[১৮৬১] আগ্রাতে অবস্থিত চমৎকার প্রেট্রভুরা কারুকার্য খচিত ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধের নির্মাণ কার্যটিও ছিল নূরজাহানের নিজস্ব পরিকল্পনাভিত্তিক। সম্রাটের দরবারটিও সুশোভিত করা হয় রুচিসম্মতভাবে।[১৮৬২] তাঁর গৃহব্যবস্থাপনার উৎকৃষ্ট কলাকৌশল এ ব্যপারে খরচের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিয়ে আনে। তাঁর সময়ে রাজকীয় কক্ষগুলোতে নতুন নতুন নকশার ভালো মানসম্পন্ন কাঠের আসবাবপত্র ও অন্যান্য শোভাবর্ধক সামগ্রী আনা হয়।[১৮৬৩] নূরজাহান ভোজসভার আয়োজনে ও অতিথি আপ্যায়নের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।[১৮৬৪] সম্রাট জাহাঙ্গীর চমৎকারভাবে ভোজসভার আয়োজনে তাঁর সামর্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

জাহাঙ্গীর তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন নূরজাহান বেগম কর্তৃক আয়োজিত কয়েকটি ভোজের অনুষ্ঠান সম্মন্ধে। শবে বরাত উপলক্ষে তিনি বিশাল পুকুরের মধ্যে অবস্থিত তাঁর অন্যতম বাসভবনে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন।[১৮৬৫] জাহাঙ্গীর নূর আফসান উদ্যানে প্রদত্ত একটি বিস্ময়কর ভোজসভা সম্মন্ধেও বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর অন্যান্য মহিলার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১৮৬৬] ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে ২ সেপ্টেম্বর নূরজাহান বেগম সৌর বর্ষ গণনা অনুসারে জাহাঙ্গীরের ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

১৮৫৯. Humayun Nama, (tr.) p. 113.
১৮৬০. Ibid., p. 113.
১৮৬১. E. B. Havell. A handbook to Agra and The Taj, p. 27.
১৮৬২. Sugam Anand. The history of Begum Noorjahan, p. 71.
১৮৬৩. Ibid., p. 72.
১৮৬৪. Khafi Khan, vol. I, p. 269.
১৮৬৫. Tuzuk-i-Jahangiri, (tr.) vol. I. p. 385.
১৮৬৬. Ibid., vol. II. p. 199.

www.pathagar.com

এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর লিখেছেন: নূরজাহান বেগম এই মর্মে আবেদন জানান যে, তাঁর ভাকিলেরা এই উপলক্ষে আপ্যায়নের আয়োজন করতে পারেন। সত্য সত্যই তাঁরা এই আয়োজনটি সম্পন্ন করেন যা দর্শকদের বিস্ময় বৃদ্ধি করেছিল। যখন থেকে প্রণয় প্রার্থী সম্রাটের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন থেকে যদিও তিনি সৌর ও চন্দ্র বর্ষ গণনারীতি অনুসারে সম্রাটের সকল ওজন পরিমাপ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রের পক্ষে মানানসই অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করতেন এবং জানতেন সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির জন্য কী করা প্রয়োজন; তবুও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি তুলনামূলকভাবে জনসমাবেশ শোভিতকরণ ও ভোজসভার আয়োজনে বেশি মনোযোগ দিতেন।[১৮৬৭]

নূরজাহান বেগমের যোগ্য নেতৃত্বে কারখানার পোশাক শিল্প, পোশাক পরিচ্ছদ ও স্বর্ণালংকার নকশা শিল্প চরম উৎকর্ষে উন্নীত হয়। এটা সুবিদিত যে তাঁর শৈশবকাল থেকেই তিনি সূচিশিল্পকর্মে আগ্রহী ও নিপুণ ছিলেন। তাঁর এই শৈশবকালীন বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে পোশাক ও পোশাকের কারখানা শিল্পে তাঁর উদ্ভাবনী প্রবণতায় রূপ লাভ করে। সেই সময়ে নূরজাহান কর্তৃক প্রবর্তিত বৈচিত্র্যময় পোশাক শিল্পরীতি বিদ্যমান ছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল দুদামি যা পুষ্পের মতো পেলব দুই ডাম ওজন বিশিষ্ট ঢিলা বহির্বাস হিসেবে ব্যবহার্য মসলিন কাপড়; ঘোমটা হিসেবে ব্যবহার্য পাঁচ তোলা ওজন বিশিষ্ট পঞ্চতোলিয়া নামক বস্ত্র; রুপার পাড়যুক্ত এক ধরনের বস্ত্রখণ্ড এবং রুপার বুটিতোলা বাদলা বা বাধা নামক এক ধরনের বস্ত্র।[১৮৬৮] তিনি নূর মহল নামক বুটি তোলা এক প্রকার স্বল্পমূল্যের বিবাহ উৎসবের পোশাক প্রবর্তন করেন। এটা পাওয়া যেত মাত্র পঁচিশ রুপিতে এবং গরিব লোকেরাও এটা সহজে কিনতে পারত। তাঁর ফার্স-ই-চন্দনি বা চন্দন কাঠের কার্পেট সারা দেশে বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং এটা বিভিন্ন নকশা ও রঙে পাওয়া যেত। এই নকশাগুলোর মধ্যে কয়েকটি এখনও প্রসিদ্ধ।[১৮৬৯] কার্পেটের নকশা তৈরিতে নূরজাহানের আগ্রহ ও উদ্ভাবনী শক্তি দেখতে পাওয়া যায় তাঁর পিতার সমাধিসৌধের বাইরে ও ভিতরের নকশাতে এবং এর অভ্যন্তরের আস্তরণ নির্মাণশৈলীতে। নারীদের পোশাক জ্যাকেটের সাথে পরিধেয় সম্মুখভাগে ঝালর যুক্তভাবে শোভিত বক্ষদেশের সাথে আঁটসাঁট বাঁধা আস্তিনযুক্ত ও হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত কুর্তিযুক্ত জাম্মু নামক পোশাক; আঁটসাঁট পায়জামা ও পাতলা তুলার দোপাটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৮৭০] নূরজাহান কতকগুলো সোনা ও রুপার অলংকারের নকশাও তৈরি

১৮৬৭. Tuzuk-i-Jahangiri, (tr.) vol. II, p. 214.
১৮৬৮. Findly, Noorjahan ...., p. 222; Beni Prasad, History of Jahangir, pp. 184-85.
১৮৬৯. Beni Prasad, History of Jahangir, p. 185.
১৮৭০. Sugam Anand, The history of Begum Noorjahan, p. 71.

www.pathagar.com

করেন। স্বর্ণালংকারের নতুন নতুন শিল্পরীতি ও সুন্দর নকশা ও তাঁর দ্বারা প্রচলিত হয়।[১৮৭১] একশ বছর পরে কাফি খান লিখেন যে, নূরজাহানের দ্বারা প্রচলিত ফ্যাশনগুলো এখনও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং পুরাতন ফ্যাসনগুলো শুধু পশ্চাদপদ আফগানদের শহরগুলোর মধ্যে টিকে রয়েছে।[১৮৭২] আওরঙ্গজেবের কন্যা শাহজাদি জীবন নিসাও ব্যাপক আগ্রহ ছিল সূচিশিল্প ও বুটিতোলা শিল্পকর্মে।[১৮৭৩]

১০. রন্ধনকার্য

এটা ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে কীভাবে অধিকতর চমৎকার বস্তুসমূহের প্রতি তাঁদের রুচিবোধ রাজকীয় রন্ধনশালা ও তাঁদের পাকস্থলো পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মোঘলদের রন্ধনশালায় প্রস্তুত বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবারগুলোই এর যথেষ্ট প্রমাণ। মোঘলরা তাঁদের খাদ্য তালিকাতে যে সমস্ত খাবারের প্রচলন করেন তা এখনও সারা পৃথিবীতে মোঘলাই রন্ধন শৈলীরূপে পরিচিত। সমগ্র পৃথিবীতে নারীরাই যে কোনো বাসগৃহে রান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত বলে জানা যায়। মোগলদের ছিল রন্ধনকার্য দেখাশোনার জন্য কিছুসংখ্যক রন্ধনকর্মী। কিন্তু এটা অযৌক্তিক বা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয় যে, মোঘল নারীরাও রন্দনকার্য দেখাশোনা করতেন ও এমনকি মাঝে মাঝে বিভিন্ন রকম খাবার নিজেরাই তৈরি করতেন।

নূরজাহান বেগম মোঘল রন্ধন শৈলীতে কতকগুলো বিশেষ রকমের খাবার প্রচলন করেন যা এখনও উন্নতমানের রন্ধনশালা ও উৎকৃষ্টতম রেস্তোরাঁতে দেখতে পাওয়া যায়।[১৮৭৪] কথিত আছে যে, হায়দ্রাবাদের শালার জং জাদুঘরে চমৎকারভাবে খোদিত একটি জরাজীর্ণ ঘোড়া ও রত্নখচিত ফল কাটার ছুরির মালিকা ছিলেন নূরজাহান বেগম।[১৮৭৫] শাহজাদি জাহানারা পছন্দ করতেন নির্দিষ্ট রকমের কয়েকটি খাদ্য রান্না করতে। তিনি নিজে সুফি সাধক হজরত মিয়া মীরের জন্য রান্না করতেন শাকসব্জি, রুটি ও অন্যান্য বিচিত্র রকমের খাবার।[১৮৭৬] আওরঙ্গজেবের পত্নী উদয়পুরী মহল একদা যখন তিনি আওরঙ্গজেবকে তাঁর বাসস্থানে নিমন্ত্রণ করতেন তখন একটি রাগাউট বা অল্পতাপে সেদ্ধ মাংস রান্না করতেন।[১৮৭৭]

১৮৭১. Beni Prasad, History of Jahangir, p. 185.
১৮৭২. Khafi Khan, vol. I, p. 269.
১৮৭৩. Zinat Kausar Muslim women in Medieval India,(New Delhi: 1992), p.181.
১৮৭৪. Findly, Noorjahan ...., p. 221.
১৮৭৫. Ibid., p. 221.
১৮৭৬. Rekha Misra, Women in Mughal India. p. 93.
১৮৭৭. Manucci, Storia, vol. III, pp. 258-259.

www.pathagar.com

১১. চিত্রাংকন

এটা সর্বশেষ হলেও সামান্যতম কথা নয় যে, মোঘলরা চিত্রাঙ্কন খুব পছন্দ করতেন এবং বাবর ও জাহাঙ্গীরের মতো কয়েকজন সম্রাট নিজেরাই ছিলেন নিপুণ চিত্রশিল্পী। কবি ও সঙ্গীত শিল্পীর মতো মোঘল রাজদরবারে অনেক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন পারস্য ও অন্যান্য মধ্য এশীয় দেশগুলো থেকে। চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে মোঘল নারীদের বিশেষ অবদান সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তৎকালীন কিছুসংখ্যক চিত্রই এর যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ।[১৮৭৮] দৃষ্টান্ত হিসেবে বারানসির (৬৮৩নং) ভারত কলাভবনের 'হেরেমের নারী চিত্রশিল্পী' শীর্ষক নিম কালাম ছবিটির কথা উল্লেখযোগ্য যাতে একজন মোঘল নারীকে চিত্রাঙ্কনে নিয়োজিত দেখা যায়।[১৮৭৯] কিন্তু তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। অন্য একটি চিত্রে দেখা যায় চিত্রশিল্পী হাসান গোলাম নূরজাহানকে একটি চিত্র প্রদর্শন করছেন এবং দরবারে নূরজাহান তা পরীক্ষা করে দেখছেন।[১৮৮০] জাহাঙ্গীরের আমলে ছিলেন নাদিরা বানু, রুকাইয়া বানু, সাহিফা বানু ও নিনির মতো কয়েকজন মহিলা চিত্রশিল্পী।[১৮৮১] কিন্তু এখন আর এমন কোনো চিত্রকর্ম নেই যার কৃতিত্ব কোনো রাজকীয় মোঘল মহিলার প্রতি আরোপ করা যায়।

১২. নূরজাহানের প্রভাব

বেনি প্রসাদের মতে, নূরজাহান ভালো ছবি আঁকতে পারতেন।[১৮৮২] কিন্তু অন্যান্য মোঘল মহিলার ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি এমন কোনো চিত্র নেই যার কৃতিত্ব নূরজাহানকে দেওয়া যেতে পারে। তথাপি কথিত আছে যে, নূরজাহান সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করেছেন মোঘল চিত্রকলাকে এবং তিনি নিজে এ ক্ষেত্রে খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন। আকবরের আমলে খাজা আব্দুস ছামাদ শিরিন কালাম কর্তৃক লিখিত এবং জাহাঙ্গীরের অধীন অনুচিত্র দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত কবি হাফিজের লিখিত দিওয়ান কপিতে রয়েছে নূরজাহানের সিলমোহর এবং তা থেকে বোঝা যায় কোনো এক সময়ে জাহাঙ্গীর এটা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।[১৮৮৩] কথিত আছে যে, জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁর প্রভাবের জন্য মহিলারা ক্রমবর্ধমানভাবে

১৮৭৮. George Michell. et. al, In the Image of man (New Delhi; 1982), p. 136.
১৮৭৯. S.P. Verma (eds). Art & Culture, p. 44.
১৮৮০. Stchoukine, plate vii.
১৮৮১. Art & Coulture. p. 44.
১৮৮২. Beni Prasad. History of Jahangir. p. 172.
১৮৮৩. A.K. Das. Dawn of Mughal Painting, p. 83.

www.pathagar.com

চিত্রকলার বিষয় হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[১৮৮৪] তিনি জাহাঙ্গীরের চিত্রকলার বিষয়ে পছন্দকেও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কুমারী মেরী ও যীশু খ্রিষ্টের ধর্মীয় ভাবমূর্তিমূলক চিত্রকলার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং তিনি এই ধর্মীয় ভাবমূর্তি অর্জন করেন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও পর্তুগিজ মিশনারিদের কাছ থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ধর্মীয় বিষয়গুলোর স্থান গ্রহণ করে রোমান দেবীদের ভাবমূর্তিগুলো। নারীদেরকে চিত্রায়িত করার ধরণাটিও বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। আগে তাদেরকে ঘোমটা পরিহিতভাবে চিত্রে দেখানো হতো এবং তথাকথিত মন্দ মহিলাদেরকে বন্যপ্রাণীর আহার্য বা সাগরে নিমজ্জমানরূপে দেখানো হতো। কিন্তু পরে নারীদেরকে উন্মুক্ত গ্রীবারেখা ও মধ্যচ্ছদাসহ, সুখদায়ক অঙ্গভঙ্গিতে ও সর্বতো উপায়ে আনন্দ অন্বেষণরত অবস্থায় দেখানো শুরু হয়।[১৮৮৫] এ ক্ষেত্রে অন্য যেকোন মোঘল রাজকীয় মহিলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায়নি। এ কথা জানা যায় যে, দারাশিকো মোঘল অনুচিত্রাবলির একটি বিস্ময়কর অ্যালবাম তাঁর স্ত্রী শাহজাদি নাদিরাকে উপহার দেন।[১৮৮৬] এই উপহার শুধু তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কারণে দেওয়া হয়নি; চিত্রকলার প্রতি নাদিরার পর্যাপ্ত আগ্রহের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এভাবে আমরা দেখি যে, মোঘল যুগে স্থাপত্য শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয় এবং মোঘল নারীরা এসব ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রাখেন। যদিও পুরুষদের তুলনায় তাঁদের কৃতিত্ব অনেক কম ছিল, তবুও আমরা যদি তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আর একবার ভেবে দেখি তবে এসব নারীর অবদান পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যাপক কৃতিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের সৃজনশীলতা ও নান্দনিক চেতনা।

১৮৮৪. P. Pal, Court painting of India, p. 44.
১৮৮৫. Findly, Noorjahan ...., pp. 224-26.
১৮৮৬. C.M.V. Stuart, gardens of the great Mughal's, p. 135.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ABBREVIATIONS

শিরোনাম পুরো করার জন্য উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখুন—

Ain.	Ain-i-Akbari by Abul Fazl
A.N.	Akbar Nama by Abul Fazl.
Badaoni	Muntakhab-ut-Tawarikh by Abdul Qadir Badaoni.
Bani Prasad.	History of Jahangir.
Bernier.	Travels in the Moghul Empire by Francois Bernier.
C. H. I.	Cambridge History of India.
E and D.	History of India as told by its own Historians by Elliot and Dowson.
Ferishta.	Gulshan-i-Ibrahimi Commonly Known as Tarikh-i- Ferishta by Muhammad Qasim Hindu Shah Ferishta.
Foster.	Early Travels in India edited by W. Foster.
Gulbadan.	Humayun Nama by Gulbadan Begum.
J.A.S.B.	Journal of the Asiatic Society of Bengal.
J.R.A.S.	Journal of the Royal Asiatic Society.
Jauhar	Tazkirat-ul-Waqiat by Jauhar.
Khafi Khan	Muntakhab-ul-Lubab by Khafi Khan.
Lahori	Padshah Nama or Badshah Nama by Abdul Hamid Lahori.
Manucci.	Storia do Mogor by Niccolao Manucci.
Pelsaert.	Jahangir's India by Francisco Pelsaert.
P.I.H.C.	Proceedings of the Indian History Congress.
Tod.	Annals and Antiquities of Rajasthan by James Tod.
Tuzuk	Tuzuk-i-Jahangiri by Emperor Nur-uddin Jahangir.
Waris	Badshah Nama by Waris
Tabqat	Tabqat –i-Akbari by Nizamuddin Ahmad (English translation)
Sinha	Madhyakaleen Hindi Kavitriyan by S. Sinha
Siyar	Siyar ul –Mutaakhirin by Ghulam Taba Tabai.

www.pathagar.com

S.Chandra	Parties and polities at The Mughal Court (1707-1740)by Satish Chandra.
Sardesai	New History of The Marathas .
Shivaji	Shivaji and his Times by J. N.Sarker.
Sarker	History of Aurangzeb by J. N.Sarker.
Maasir	Maasir-ul-Umara by Shah Nawaz Khan.
Shustry	Outlines of Islamic Culture by Shustry.
R & B	Rogers and Beveridge.
Ruqqat	Ruqqat-i-Alamgiri.
Qureshi	Administration of the Sultans of Delli.
Qazwini.	Badshah Nama by Qazwini.
Purchas	Purchas and His Pilgrims.
Pant	Commercial Policy of the Mughals.
Pietra Della Valle	Travels of Pietra Della Valle in India.
Peter Mundy	Travels in Europe and Asia by Peter Mundy, Vol. II.
pp.	Pages
p	Page
Ashub	Tarikh-i-Muhammad Shahi by Muhammad Bakhsha Ashub.
Altekar	The Position of Women in Hindu Civilization by Dr. A. S. Altekar.
Ashraf	Life and Condition of the people of Hindustan.
Adab	Adab-i-Alamgiri.
B. N	Babur Nama (English Translation).
Bazm	Bazm-i-Taimuria.
Bev.	Beveridge.
De lact	Empire of the Great Mughal by Delact
Early Travels	Early Travels in India Edited by W. Foster.
Fryer	New Account of the East Indies and Persia by Fryer
Hamilton.	A New Account of the East Indies by Alexander Hamilton.
H.N.G	Humayun Nama by Gulbadan Begum.
Irvine	Later Mughals.
I. H. R. C.	Indian Historical Records Commission
J. I. H.	Journal of Indian History.
Jafar	Education in Muslim India by S. M. Jafar.
Law	Promotion of Learning by N.N.Law
Manrique	Travels of China and India by Fray Sebastien Manrique, Vol. II.
Monserrate	The Commentarius by S.J.Monserrate.

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

1. Studies in Medieval Indian History-C.M.Agrawal. Jalandhar, prokas-1988.
2. Mustaid khan's Maasir-i-Alamgiri tr. Jadunath Sarkar Calcutta, Prokas-1947.
3. Studies in Mughal India-Jadunath Sarkar. Calcutta, Prokas-1947
4. Muslim Women in Medieval India-Zinat Kausar, New Delhi, Prakas-1992.
5. Glimpses of Medievel Indian Culture-Yusuf Hossain .
6. The Beautiful Mohul Princesses-Maharani Sunity Devee. London, Prakas-1918.
7. Social Status of North Indian Woman-Ila Mukhergee Agra, Prakas-1972.
8. The Dewan of Zeb-un Nissa-tr.Magan lal .
9. Medieval Indian Culture –A.L.Srivastava.Agra , Prakas-1964.
10. Indian ,Education in Ancient and Later times-F.E.keay. London, Prakas-1938.
11. Akbar the great Mughal vol.II-A.L.Srivastava.Agra. prakas-1967.
12. Some Aspects of North Indian Social Life- P.N. Ojha, patna, prakas-1961.
13. Akbar the great Mogul –V.A.Smith.New Delhi. Prakas-1988.
14. Medieval India under the Mohammadan Rule-Lamepoole.
15. Mustaid Khan's Maasir-i-Alamgiri tr. in Elliot and Dowson-vol.7.
16. The Story of women in India- Padmini Sen gupta, New Delhi, 1974.
17. Noorjahan, Empress of Mughal India- E. B. Findly, New York, 1993.
18. A Hand Book to Agra and the Taj. E.B. Havell. London. 1904.
19. A Guide of Fateh Pur Sikri- Md. Ashraf Husain, Delhi. Prakas- 1937.
20. Studies in Economic Life in Mughal India- Jagdish Narain Sarkar. Delhi, Prakas- 1975.
21. Biographical Dictionary of Prominent Muslim Ladies- Kabir Kausar and Inamul Kabir. New Delhi, Prakas- 1982.
22. Women Education in Ancient and Muslim Period- Sree Ram Sharma, Discovery Publishing House, 1996.
23. Women in Mughal India- Rekha Misra. Allahabad, Prakas- 1967.
24. Muntakhub-ut-Tawarikh, vol. II- Abdul Qadir Badauni- translate by Lowe.
25. India, Art and Culture- John Stuart Welch. New York Prakas-1985.
26. Rise and fall of the Mughal Empire- R.P. Tripathi. Allahabad, Prakas- 1960.
27. History of Begum Noorjahan- Sugam Anand.

www.pathagar.com

28. Education in Muslim India- S.M. Jafar, Lahore, Prakas- 1936.
29. The Mughal Empire- R C. Majumder, ed. Bombay, Prakas-1974.
30. Warring Women of India- D. S. Roy. Bombay, Prakas-1973.
31. Royal Mughal Ladies and their Contribution- Dr. Soma Mukherjee. Gyan Publishing House, New Delhi, Prokas-2001.
32. The Mughal Harem- K. S. Lal. Andithu Prokasoni, New Delhi, Prakas- 1988.
33. Social life of the Mughal Empires- M. A. Ansari, New Delhi, Prakas- 1983.
34. Law, Promotion of Learning in India- During Muhammaden Rule.
35. Indian Art & Culture, V P Jains, New Delhi, Prokas-2012.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com